হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার - ঢাকা - ১১

বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

প্রথম খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা

কর্তৃক অনুদিত।

চকবাজার - ঢাকা - ১১

প্রকাশনায় :
আল্‌হাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম আযম
হামিদিয়া লাইব্রেরী
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা—১১
দূরালাপনী : ২৪৪৪০৮
(বাংলাদেশ)

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
নবম সংস্করণ :
জেলকদ
১৩৯৮ হিজরী, ১৯৭৮ ইংরাজী।

হাদিয়া :
৪৬·০০ ছয়চল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রনে :
এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা—১
(বাংলাদেশ)

পরিচিতি

মওলানা শামছুল হক (রঃ) কর্ত্তৃক লিখিত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ اٰثَرُوا الدِّيْنَ عَلَى الدُّنْيَا

وَاٰثَرُوْهُ بِعَيْنِهٖ -

সারাবিশ্বের মানুষ জাতির কল্যাণ কামনা নয় শুধু, কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল মুসলিম জাতির এক জাতি এবং এক ভাষার কর্ম্মসূচী। প্রাথমিক যুগের বীর মুসলিমগণ তাঁদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া কর্ম্মসূচী অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দ্দান, ইরাক, লেবানন, মিশর, তিউনিস, আলজেরিয়া এমনকি স্পেন পর্য্যন্ত সকলের ভাষা একই ভাষা একই আরবী ভাষা হইয়া গিয়াছিল। সকলেই এক জাতি এবং এক ভাষাভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। একটু যখন দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা আসিল তখন পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ভাষা দেশীই রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অক্ষর একই আরবী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু হতভাগা আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যাহারা নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আরবী ভাষা ত দূরের কথা আরবী অক্ষরেও দেশী ভাষাকে লিখিয়া দেশের লোকের নিকট সমাদৃত করিতে পারি নাই। এমনকি বহু অগ্রে যে কাজ করার দরকার ছিল যে, দেশে যে ভাষা বা যে লিখন প্রণালী প্রচলিত আছে তাতেই কোরআন হাদীছ অনুদিত করিয়া দেশের লোকদের চাহিদা মিটানো হউক এবং আলো দান করা হউক, তাহাও করা হয় নাই। পরম পরিতাপের বিষয়—আজও বাংলা ভাষায় কোরআনের বা হাদীছের এমন কোন তরজমাকারক নাই বলিলেও চলে যাহাকে সর্ব্বদিক দিয়া বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যাইতে পারে। বিশ্বস্ত বলা যায় তাকে যার আগে থেকে কোরআনের এবং হাদীছের বিরুদ্ধে মতবাদ না আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় তাকে যার সব দিক দিয়া পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা আছে। যিনি চৌদ্দশ' বছর আগের ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্ত্তমান যুগের মানুষের ভাষায় অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন।

প্রায় ১০ বৎসর আগে আমি বোখারী শরীফের অনুবাদের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া ছিলাম, কিন্তু বোখারী শরীফের তরজমার কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। দেশের ও

জাতির চাহিদা অতি বেশী, প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক. সে জন্য বারবার মনে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু সাহস পাই নাই। ক্ষুধার্ত্ত যদি সুখাদ্য না পায়, তবে শেষে অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়াও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। আর দুনিয়াতে একদল লোক যে কুখাদ্য লইয়া বসিয়াও আছে—এই ভাবনায় মনে মনে বহুবার ব্যথিত হইয়াছি, তাহা সত্ত্বেও এত বড় বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ন্যায় কাজে হাত দিতে সাহস পাই নাই।

আল্লাহ দর্জ্জা বলন্দ করিয়া দিন আমার পরম দোস্ত মওলানা আজিজুল হক সাহেবের যে, তিনি এত বড় বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস করিয়াছেন। তিনি জওয়ানে ছালেহ্—তিনি বাস্তবিকই এই কাজের যোগ্যতা রাখেন। যতদূর আমার জানা আছে—বোখারী শরীফ বর্ত্তমান যুগে বাংলাদেশে তাঁহার চেয়ে অধিক যত্নসহকারে এবং আদ্যোপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং বোখারী শরীফের খেদমতও এতদূর কেহ করেন নাই। তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহে আলাইহের খাছোল-খাছ শাগের্দ। পড়ার জমানাতেই তিনি ১৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শরাহ উরদু ভাষায় লিখিয়াছেন। স্বয়ং হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁহার লেখা সঙ্গে সঙ্গে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। বোখারী শরীফ পড়ার পরও প্রায় এক বৎসর হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে থাকিয়া এছ্লাহে নফছ ও তজকিয়ায়ে বাতেনের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বোখারী শরীফের শরাহ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার যোগ্যতায় এবং বিশ্বস্ততায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অতঃপর কয়েকবার বোখারী শরীফ এবং অন্যান্য ছেহাহ্-ছেত্তা হাদীছের কেতাব দরছ দেওয়ার পর যখন বাংলাদেশের অভাব মিটানোর জন্য বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করা তিনি শুরু করিয়াছেন তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই।

আল্লার শোকর করিয়াছি, মক্কা শরীফে গিয়া—হাতীমে, মাতাফে, মাকামে-ইবরাহীমে, দোয়া করিয়াছি, মদীনা শরীফে রওজা পাকে দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়াছি—এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক তাঁহার দ্বারা নিন; বাংলার মুসলমানের যরূরত মিটান। মওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া লিখিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন; অনেক জায়গা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, অনেক জায়গা দেখিয়া কিছু কিছু ভাষা বানান সংশোধন করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ পাক তাঁহার দর্জ্জা বলন্দ করুন, কবুল করুন পাঠকগণকে ইহা হইতে ফয়েজ দান করুন, ইহ-পরকালের ভাল করুন। আমি গোনাহগার আল্লাহ পাকের মহান দরবারে করুণ-সুরে দোয়া করি। আমীন! ছোম্মা আমীন!!

—গুজারেশ—

অনেক সময় দেখা যায়, জ্ঞান চর্চ্চায় উপযুক্ত এবং সেই আখড়ার বীর পুরুষগণও নিজেদের অক্ষমতা ও নগণ্যতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ কোন মহা মনীষীর পক্ষেও এইরূপ করা অতিরিক্ত গণ্য হইবে না, কারণ জ্ঞান-সমুদ্র এতই সুগভীর, বিশাল ও সুপ্রশস্ত যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যে কোন বীরের বীরত্ব ও মহানের মহত্ব এই অথই সমুদ্রে খড়-কুটার ন্যায়ই বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—وما اوتيتم من العلم الا قليلا "মানবকে জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মাত্র যৎকিঞ্চিতই দান করা হইয়াছে।"

কিন্তু উপযুক্ত ও মহান ব্যক্তিগণ কর্তৃক নগণ্যতা প্রকাশের রীতি বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত অনুপযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও বাস্তবে নগণ্য ব্যক্তিদের বেলায় সমস্যার উদ্ভব হয় যে, তাহারা কিরূপে স্বীয় বাস্তব নগণ্যতা প্রকাশ করিবে? ভাষায় প্রকাশ করা নিষ্ফল; কারণ, মানুষ হিসাবে যতটুকু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী হওয়া সম্ভবপর উহার অধিকারীগণও নগণ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্যায়ই আমি আমার বাস্তব নগণ্যতাকে প্রকাশ করিতে ভাষার আশ্রয় বিফল বিবেচনা করিলাম।

তদুপরি পাঠকদের সম্মুখে আমার অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের ঝুলি ছড়ান থাকিল। উহা যে, কি সমস্ত কানাকড়ি ও অচল বস্তুসমূহের সমবায়, তাহা আপনাআপনিই প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

মহা গ্রন্থ বোখারী শরীফ বিশ্ববাসীর অন্তরে যে উচ্চাসন লাভ করিয়া আছে, উহা তাহার বাস্তব মর্য্যাদার কিয়দাংশ মাত্র; কিন্তু আমি অধমের জ্ঞানবিন্দু যে, সেই কিয়দাংশের মর্য্যাদানুপাতিক পিপাসাটুকু মিটাইতে কোন সাহায্য করিতে পারে না তাহা অতি সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় আমি নরাধমের পক্ষে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া "মন্ত্র না জানিয়া সাপের গর্ত্তে হাত দেওয়া" এরই শামিল। এই সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করিয়াই এই সুমহান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। রহমতে এলাহীর দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। তদুপরি আল্লাহ পাক এমন কতিপয় মহামনীষীর অছীলা আমাকে প্রদান করিয়াছেন যাঁহারা এই ময়দানের দার্শনিক এবং অপরাজেয় বীরপুরুষ।

তন্মধ্যে একজন—শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)। তাঁহার নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের বাসনায় আমি বঙ্গদেশ হইতে সুদূর বোম্বাইর নিকটবর্তী ডাভেলস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ছুটিয়া যাই; এক বৎসর তাঁহার খেদমতে অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণমালার প্রতি দৃষ্টিপাতের শক্তি আমাদের কোথায় ছিল?

তবে তাঁহার অধ্যাপনার সময় তাঁহার বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনাসমূহকে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং পরবর্ত্তী বৎসর দেওবন্দস্থিত তাঁহার বাসভবনে তাঁহারই ছোহবতে থাকিয়া ঐ পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন কার্য্য সমাধা করি। এইরূপ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বয়ং উহার সংশোধন করত: পূর্ণভাবে দেখিয়া যাইতেন। তাঁহারই প্রদত্ত মণি মুক্তা সমূহ যথারীতি সুবিন্যস্ত দেখিয়া তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং উহার একটি নকল নিজ হেফাজতে রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শায়খুল ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের চেষ্টা করা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের পরিচয় দেওয়ার সমতুল্য। তাঁহার সঙ্কলিত মোসলেম শরীফের শরাহ্, পবিত্র কোরআনের তফছীর এবং অন্যান্য অমূল্য সঙ্কলন সমূহ ব্যতীত তাঁহার স্বনামখ্যাত বিরাট ব্যক্তিত্বই তাঁহার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহ্ আলাইহের নিকট বোখারী শরীফের অধ্যয়ন আমার জন্য এই মহান কিতাবের দ্বিতীয়বার অধ্যয়ন ছিল। এর পূর্ব্বের বৎসর আমি প্রখ্যাত আলেমকুল শিরোমণি মাওলানা জাফার আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি যে, কত বড় বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাহা তাঁহার এই যুগের অদ্বিতীয় গ্রন্থ "এ'লাউস-সুনান" এর ন্যায় হাদীছের মহান কিতাব দেখিলেই অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত শুধু পাক-ভারতেই নহে, বরং মুসলিম জাহানে তিনি এতই সুপরিচিত যে, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু লিখিব তাহা রেশমের জামায় চটের তালিরূপেই পরিগণিত হইবে।

তদুপরি অনুবাদ কার্য্যে যাঁহার অতুলনীয় দান, সাহায্য ও সক্রিয় সহায়তা বিশেষরূপে লাভ করিয়াছি তিনি হইলেন ইসলামী চিন্তাধারার অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক ও স্বনামখ্যাত মোরশেদ কামেল মওলানা শামছুল হক (রঃ), যিনি আমার রূহানী পিতা এবং আমার অদ্বিতীয় মুরব্বী। বাল্যকাল হইতেই আমি তাঁহার স্নেহ-শীতল ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছি। তাঁহার পরিচয় বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি ধর্ম্মভীরু মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ মহিমা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার শাগেদ'ান সারা বাংলা পরিবেষ্টিত করিয়া আছে।

বোখারী শরীফ অনুবাদের মহান কার্য্য একমাত্র তাঁহার ফয়েজ-ব.কতের অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়—ঈমান ও দ্বিতীয় অধ্যায়—এল্‌ম প্রায় সম্পূর্ণই তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। অপরাপর অধ্যায়েও তাঁহার এইরূপ দান রহিয়াছে যে, বস্তুতঃ এই অনুবাদকে তাঁহারই অবদান বলা চলে। অনুবাদ কার্য্যে যাহাকিছু কৃতিত্ব রহিয়াছে উহার সবটুকু তাঁহারই ফয়েজ। ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সবটুকুই এই নরাধমের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রসূত। আমার দ্বারা কোন ত্রুটিবিহীন বিষয়বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকিলে তাহা তাঁহারই দোয়ার ফল।

মানুষ মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। আমার ন্যায় নালায়েকের পক্ষে তাহা অবশ্যম্ভাবী। পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে পণ্ডিতবর্গ এবং আলেমকুলের প্রতি অনুরোধ—ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইলে আমাকে অবহিত করিয়া অশেষ ছওয়াবের ভাগীহইবেন ; আমি উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার সর্ব্বশেষ আরজ—এই অনুবাদ-কার্য্য চলাকালীন আমার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। আমার পিতা শ্রদ্ধাভাজন মরহুম হাজী এরশাদ আলী আমার এই কাজের প্রতি সবিশেষ আগ্রহশীল ও অনুরাগী ছিলেন। আমাকে দীনের এল্‌ম শিক্ষাদানে তিনি অতিশয় যত্ন নিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম শয্যায় আমি এই কার্য্যের ছওয়াব ও সুফল লাভের বড় অংশীদাররূপে তাঁহাকে বহু আশা দিয়া থাকিতাম। আপনারা দোয়া করিবেন, আল্লাহ তায়ালা আমার আব্বাকে জান্নাতবাসী করেন এবং দয়ার দরিয়া মাবুদ আমাকে যেই কার্য্যের তৌফিক দান করিয়াছেন সেই কার্য্যের চেষ্টাকে কবুল করিয়া আমার আব্বা ও আম্মার রূহকে ইহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দেন। হে আল্লাহ! তোমারই অপার রহমতে এই নরাধমের দ্বারা যাহা কিছু চেষ্টা-সাধ্য সম্ভবপর হইয়াছে, তুমি স্বীয় করুণাবলে উহাকে কবুল কর। আমীন।

পবিত্র হজ্জের সফরে,
চট্টগ্রাম—১৫।৬।৫৭ ইং,

আরজ-গুজার
আজিজুল হক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বোখারী শরীফে অধিকাংশ হাদীছের এক একটি হাদীছ একাধিক—৫।১০ জায়গায় বর্ণিত আছে। কারণ, এক একটি হাদীছে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন মছআলাহ থাকে; সে সূত্রে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে একটি হাদীছই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে। সেমতেই আড়াই হাজার মূল হাদীছ প্রায় আট হাজারে পরিণত হইয়াছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহাও যে, স্থানের বিভিন্নতায় একটি হাদীছের অংশাবলীর মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা আসিয়াছে। সমুদয় স্থান হইতে মূল হাদীছটির বাক্যাবলী একত্রিত করিলে উহার কলেবর যাহা দাঁড়ায় সেই কলেবর একত্রে এক স্থানে পাওয়া বিরল। কিন্তু অনুবাদের সৌন্দর্য্য এবং পাঠকের পক্ষে অধিক উপকারী ব্যবস্থা একমাত্র ইহাই যে, প্রতিটি হাদীছ উহার সদমুয় অংশ সম্বলিতরূপে একত্রিত আকারে অনূদিত হয়। কিন্তু বার শত পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ গ্রন্থে ২, ৪, ১০, ২০ স্থানে বিক্ষিপ্তরূপে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত এক একটি হাদীছের বিভিন্ন অংশ খুঁজিয়া বাহির করা কতই না কঠিন! এই নরাধমের জন্য ত অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত—এমন একখানা কেতাব আমার হস্তগত হয় যাহাতে ঐরূপ প্রতিটি হাদীছের প্রত্যেকটি স্থান নিরুপণ ও পৃষ্ঠার সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে; এই বিষয়েই কেতাবখানা রচিত। ঐ কেতাবখানা ব্যতিরেকে বোখারী শরীফ অনুবাদের সৌন্দর্য্য-সাধন এই যুগে সম্ভব নহে। ঐ কেতাবের রচয়িতা শেখ আবদুল আজিজ (রঃ)। পাঠকদের নিকট বিশেষ অনুরোধ, সকলে তাঁহার জন্য ফেরদাউস-বেহেশতের দোয়া করিবেন।

অত্র আলোচনা দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, যেই পরিচ্ছেদে যেই হাদীছ অনূদিত আছে মূল গ্রন্থের সেই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত উক্ত হাদীছের অনুবাদে অতিরিক্ত বাক্যাবলী বা বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধনী না থাকিলে মনে করিবেন—এই বাক্য বা অংশ মূল গ্রন্থের কোন স্থানে নিশ্চয় উল্লেখ আছে।

আরজ-গুজার—**আজিজুল হক**

পরম সম্পদ

ছাইয়েদী ছনদী মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ১৯৫৬ সনে হজ্জ করিতে যান। সেই বৎসরই রমযান মাসে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজ নরাধমের হাতে আরম্ভ হয়। চরম ও পরম সৌভাগ্য যে, তিনি হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যেক স্থানেই এ বিষয়ে নরাধমের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং লিখিত অনেক কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে—তাঁহার পবিত্র মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে বসিয়া তাহাজ্জুদের সময় তিনি যে দোয়া করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা লিখিতরূপে পাইয়াছি। ইহা আমার নিকট নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় পরম সম্পদবিশেষ। তাই বরকতের জন্য নিম্নে উহারই ফটোব্লক দেওয়া হইল।

1-8-56

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

الحمد لله وحده - والصلوة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده

[illegible] روضة من رياض الجنة [illegible]

[illegible]

মুখবন্ধ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের সময় হইতেই জগদ্বাসীর এক বিরাট অংশ তাঁহার আলো ও নূরে-হেদায়েত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি আস্থাহীন রহিয়াছে। তাহাদের এই অনাস্থা বিস্ময়ের কিছু নহে। কারণ তাহারা কাফের, তাহারা ইসলামের দাবীদার নয়; অতএব তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর তথা তাঁহার আদর্শ ও তাঁহার বাণীর প্রতি আস্থাবান হইবে কেন? কিন্তু যাহারা মোসলমান হওয়ার দাবীদার—যাহারা আল্লার উপর, কোরআনের উপর, আল্লার রসুলের উপর ঈমান রাখার দাবী করিয়া থাকে এবং "আশহাদু-আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" কলেমা পড়িয়া মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সত্য রসুলরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাঁহার আদর্শ ও সুন্নত তথা তাহার বাণী ও হাদীছকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতে পারে না!

হাদীছ তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বাণীরূপে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দশত বৎসর হইতে বিশ্বব্যাপী মোসলেম জাতির মধ্যে বিরাজ করিতেছে সেই অমূল্য রত্নকে নানা ছলে-বলে ও অপকৌশলে এন্‌কার ও অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করা অযৌক্তিক বৈ নহে? মোসলেম জাতি যে যুগে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত ছিল, যখন তাহাদের গুণ ও জ্ঞান বিশ্বজয়ী ছিল এবং যে যুগ ধর্ম্মীয় বিষয়ে সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল যুগ ছিল সেই সোনালী যুগে এরূপ কোন উক্তির আভাষ কোথাও পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মীয় আকর্ষণ ও জ্ঞান-মর্য্যাদায় দুর্ব্বলতম—বর্ত্তমান যুগে ঐ ধরণের কোন উক্তি শুনা গেলে তাহা বড়ই আশ্চর্য্য-জনক ও অনুতাপের যোগ্য হইবে এবং উহাকে মোসলেম সমাজের মধ্যে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ও সমাজ দেহে এক ব্যধির প্রাদুর্ভাব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ক্ষেত-খামার যখন শস্য-শ্যামল না থাকে তখনই উহার মধ্যে অবাঞ্ছিত আগাছাসমূহ আপনা-আপনিই মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং মানব দেহ যখন জীবনীশক্তি ও শোধিত রক্ত হারাইয়া ফেলে তখনই উহাতে খোস-পাঁচড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আ'লেমুল গায়েব—তিনি পূর্ব্ব হইতে সব কিছু অবগত আছেন; তাঁহার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ এসব অবাঞ্ছিত মনোভাবের মুখোশ খুলিয়া দিয়া স্বীয় উম্মতকে স. র্ক করিয়া গিয়াছেন। যথা—

أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ

فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ

فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ

الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ......

১ম—ক

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—হে মোসলমান! সতর্ক থাকিও: সেই যুগ দূরে নহে যেই যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা গোঁপে তেল মাখিয়া তোমাদের মধ্যে প্রচারণা চালাইবে যে—কোরআন শরীফের মধ্যে যতটুকু হালাল-হারাম উল্লেখ আছে, ততটুকুর উপরই আমল কর। (নবী (দঃ) বলেন—)

হুশিয়ার! আমি সতর্ক করিয়া যাইতেছি—তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া-বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে—আল্লার রসুল অর্থাৎ আমি যে বস্তুকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিব উহাও ঐরূপ হারামই গণ্য যাহার হারাম হওয়ার ঘোষণা কোরআন শরীফে আছে। (কোরআন আল্লার বাণী এবং রসুল যাহা বলিবেন তাহাও স্বয়ং আল্লার তরফ হইতেই অহী মারফাৎ প্রাপ্ত। যেমন,) আমি ঘোষণা দিতেছি, গৃহপালিত গাধা এবং হিংস্র জন্তু (খাওয়া) হারাম (আবু দাউদ শরীফ)। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবাণীর হাদীছ আরও অনেক আছে।

দুনিয়ার বিলুপ্তি বা কেয়ামত যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী এক একটি করিয়া বাস্তবায়িত হইতেছে। তাই মোমেন মোসলেম ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা সতর্ক থাকিবে; যখনই এরূপ কোন ছলনাময়ী উক্তি শুনিবে যে—কোরআন শরীফে যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট তাহাই মানিয়া চলিব; হাদীছ (নামে যেই জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দ শত বৎসর হইতে প্রচলিত তাহা) মানিতে প্রস্তুত নহি ইত্যাদি, তখনই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করতঃ ঐ প্ররোচনা হইতে দূরে থাকিবে।

কোরআন মানিয়া চলার ধূঁয়া তুলিয়া বা যুক্তির ভাওতা দিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ অস্বীকার করা বস্তুতঃ কোরআনের বিরোধিতা ও যুক্তির অবমাননাই বটে।

সংক্ষেপে কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হইতেছে এবং সরল যুক্তির কয়েকটি ধারা বর্ণিত হইতেছে, যদ্দারা হাদীছ নামে প্রচলিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অপরিহার্য্যতা এবং নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হইবে। সুধীগণ সুষ্ঠু পরিবেশে নির্ম্মল মস্তিষ্কে চিন্তা করিবেন ইহাই আশা।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ "আমাদের কর্ত্তব্য—খাঁটী কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

—→(০)←—

হাদীছ কাহাকে বলে: রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে, উহাকে হাদীছ বলে।

হাদীছের মর্য্যাদা: হাদীছের মর্য্যাদা নির্ণয় করা আল্লার রসুল বা পয়গাম্বরের মর্য্যাদা উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। পয়গাম্বর কে হন? তাঁহার মর্ত্তবা কত উর্দ্ধে, এসব প্রশ্ন এত জটিল যে, ইহা বুঝিতে সুষ্ঠু ও পবিত্র মস্তিষ্কের এবং গভীর ও প্রশস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন।

রসুল বা নবীর মর্ত্তবা: মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এত কর্ম্মক্ষমতা ও উন্নতির শক্তি দান করিয়াছেন যে, সেই শক্তি সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার তুলনায় সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইলেও উহা এত ব্যাপক যে, উহাকে ব্যপকতার দিক দিয়া পর্য্যাপ্ত বরং অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেই পর্য্যাপ্ত শক্তি বলে মানুষ বিরামহীন পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিতে পারে,

উচ্চ দরের বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ও সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক হইতে পারে। এমনকি খাঁটী ও একনিষ্ঠ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিশ্বস্রষ্টা—সারা জগতের আলো, জ্ঞান ও শক্তির মালিক আল্লাহ তায়ালার সহিত তাঁহার জেক্‌র, তায়াত এবং স্মৃতি-ভক্তি ও আনুগত্যের দ্বারা দৃঢ় গোপনসূত্র স্থাপন করিয়া লওয়া যায় তবে মানুষ "বেলায়েতের" এবং মা'রেফতের তথা আল্লার ওলী হওয়ার মর্ত্তবায় পোঁছিতে পারে। আল্লার ওলীর মর্ত্তবা অনেক উর্দ্ধে। এই মা'রেফাত ও বেলায়েতের মধ্যেও আবার অনেকগুলি স্তর আছে। এক একটি স্তর অন্যটি হইতে এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, তাহা অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ওলীর দর্জ্জা হইতে বহু উর্দ্ধে শহীদ ও ছিদ্দিকের দর্জ্জা। ওলী, শহীদ, ছিদ্দিক এসবের দর্জ্জা বহু উর্দ্ধে হইলেও ইহা মানুষের সাধনার মাধ্যমে হাসিল হইয়া থাকে। এই সব মানুষের আয়ত্তের বাহিরে নয়।

কিন্তু নবুওতের মর্ত্তবা এত উর্দ্ধে যে, তাহা ওলী, শহীদ, সিদ্দিক সকলেরই নাগালের বাহিরে। কেহই সাধনার বলে নবুওত পাইতে পারে না। নবী একমাত্র আল্লার রহমতেই নবুওত পাইয়া থাকেন, সাধনায় উহা অর্জিত হয় না; অবশ্য উহার জন্য এবং উহা রক্ষণের জন্য ও উহার হক আদায় করার জন্য বিরামহীনরূপে সর্ব্বাধিক কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়।

নবী ও রসুলের জ্ঞান সর্ব্ব উর্দ্ধে ঃ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ওলী ও নবীগণের দর্জ্জা ও মর্ত্তবার ব্যবধান অনুযায়ী তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও ব্যবধান আছে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের জ্ঞান হইতেছে শুধু কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান; সেই জন্যই উহাতে সত্যতা থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বহু ভুল এবং অসত্যও থাকিয়া যায়। ওলীদের জ্ঞান তার চেয়ে উর্দ্ধে; কারণ তাঁহাদের জ্ঞান কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান নহে, বরং সমস্ত জ্ঞানের আকরের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আহরিত জ্ঞান, কিন্তু তাঁহাদের সেই জ্ঞান আহরণের পথ পূর্ণ পরিষ্কার পরিপক্ক ও সুরক্ষিত নয়, তাই তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও অতিক্রম ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু নবীদের জ্ঞান আল্লার নিকট হইতে সরাসরি প্রাপ্ত অহীর জ্ঞান—উহাতে কোন দিক দিয়াই সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)এর জ্ঞান সর্ব্বাধিক উর্দ্ধে ঃ

নবীদের মধ্যেও বিভিন্ন মর্ত্তবা বিদ্যমান আছে; স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ "আমি রসুলগণের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছি।" সর্ব্ব উর্দ্ধে হইলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। তাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই এই সাক্ষ্য দিতেছেন—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বা কল্পনা হইতে বলেন না; আমি যাহা বলিয়া দেই ঠিক অবিকল তাহাই তিনি বলেন। এই বিষয়টি মাওলানা রুমী এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

"আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যই ঠিক ঠিক অবিকলরূপে রসুলের কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী জলীল ও জব্বার আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ......

অর্থাৎ যদি সে (মোহাম্মদ দঃ) কোন একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বানাইয়া বলিত তবে আমার সর্ব্বগ্রাসী হস্তে তাহাকে ধরিয়া যখন তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রীকে ছিঁড়িয়া দিতাম।

অহীর পরিপক্কতা : নবীদের জ্ঞান প্রাপ্তির সূত্র ও পথ হইল অহী। অহীবাহক হইলেন জিব্রাঈল ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য—কোটি কোটি ফেরেশতাদের সর্ব্বপ্রধান চারিজনের মধ্যে প্রধানতম। সমূহ কুপ্রবৃত্তি ও অপকর্ম্মের ইচ্ছাশক্তি হইতে পূর্ণ পবিত্ররূপে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাছড়া জিব্রাঈল (আঃ) "আমীন" অর্থাৎ আল্লার আমানতবাহক বলিয়া পরিচিত। ফেরেশতাদের শক্তি সামর্থ্যও কল্পনাতীত; বিশেষতঃ হযরত জিব্রাঈলের শক্তি। এতদসত্ত্বেও যখন জিব্রাঈল ফেরেশতা আল্লার তরফ হইতে রসুলুল্লার প্রতি অহী বহন করিয়া আনিতেন তখন বাহ্যিক বা স্থূল সতর্কতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপ হইত তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا

رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

অর্থাৎ অহী এত সুরক্ষিতরূপে এত সুবন্দোবস্তের সহিত আসে যে, আল্লাহ তায়ালা বহু সংখ্যক ফেরেশতা প্রহরীর দ্বারা আদ্যোপান্ত পাহারা নিযুক্ত করিয়া রাখেন,* (যাহাতে আল্লার প্রেরিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শয়তান বা নফ্‌সের বিন্দুমাত্র দখল আসিতে না পারে, বিন্দুমাত্র কল্পনা বা ভুল, মিথ্যা ও ব্যতিক্রম-অতিক্রমের লেশমাত্র তার সঙ্গে মিশ্রিত হইতে না পারে। এইরূপে সুদৃঢ় রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অহী প্রেরণের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করেন) যদ্দারা জগদ্বাসীকে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারেন যে—আল্লার বাণী, আল্লার অহী তাহারা (অহীবাহকগণ) অবিকল ঠিক ঠিক রূপে পৌঁছাইয়াছেন, বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন উহাতে হয় নাই বা উহাতে মানুষের রচনার ও কল্পনার লেশমাত্র নাই।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন অহী কত সুরক্ষিত বস্তু! ইহাই হইতেছে নবীগণের আহরীত জ্ঞানের একমাত্র পথ ও সূত্র। তাই নবীর জ্ঞান, নবীর বাণী, নবীর সমস্ত কথাবার্ত্তা এবং কার্য্যকলাপ খাঁটী ও সত্যের প্রতীক। উহাতে অখাঁটী ও অসত্যের বিন্দুমাত্র অবকাশ আসিতেই পারে না। কারণ নবী স্বয়ং নিষ্পাপ, তাঁহার প্রতিটি বাণী, এবং প্রতিটি কার্য্য ও জ্ঞানের উৎস

---

* আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার জন্য কোন কিছু ব্যবস্থারই আবশ্যক হয় না। কিন্তু মানুষ স্থূলজগতে বাস করে; তাহাদের দৃষ্টি বাহ্যিক ও স্থূল ব্যবস্থাদির প্রতিই ধাবিত ও নিবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্য জগদ্বাসীর ভাবধারা ও ভঙ্গিমার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহা তাহাদেরই রুচিসম্মত বলিয়া প্রকাশও করিয়া দেন। নতুবা স্বয়ং কাদেরে-মোত্‌লাক, আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ এসবের প্রত্যাশী মোটেই নহেন।

আল্লাহ তায়ালা : প্রতিটি বিষয়বস্তু আল্লার নিকট হইতে রসুলের নিকট পৌঁছিবার একমাত্র সূত্র অহী। তাই এক্ষেত্রে খাঁটি ও অসত্যের সম্ভাবনার কোন ছিদ্রপথই কোথাও নাই।

কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য :

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসুলের হাদীছও যদি অহীর মারফৎ আল্লার তরফ হইতে হইয়া থাকে তবে কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআন ও হাদীছে পার্থক্য নাই বলা যাইতে পারে এই অর্থে যে, উভয়ই আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অহী মারফৎ নবীকে দান করা হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এই যে—কোরআনের অর্থ ও ভাষা (Text) উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে অহী মারফৎ আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং জিব্রাইল কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, তাই কোরআনের আয়াত ও বাক্য নামাযে তেলওয়াত করা হয় এবং ইহাকে "অহী মত্‌লু" ও আল্লার কালাম বলা হয়। হাদীছের অর্থ ও বিষয়-বস্তু আল্লার তরফ হইতে অহী মারফৎ প্রাপ্ত বটে, কিন্তু উহার শব্দ ও বাক্য রসুলের রচিত। কোরআন-হাদীছের আসল উৎস একই। তাই কোরআন আল্লার বাণী যেমন নির্ভুল, হাদীছও তদ্রূপ নির্ভুল। ইহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য যাহারা রসুলের সেই বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাদের দ্বারা কৃত্রিম বা মিথ্যা রচনার সন্দেহ থাকিতে পারে বটে। সেই জন্যই হাদীছবিশারদ মোহাদ্দেছগণ জাল ও কৃত্রিম সন্দেহের হাদীছগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং সত্য ও শুদ্ধ হাদীছসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

রসুলের পায়রবী তথা হাদীছের অনুসরণ অপরিহার্য্য প্রমাণে পবিত্র কোরআন :

কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত। কতিপয় আয়াত এই—

(১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ :—হে মোসলমান জাতি! রসুলুল্লার জীবনের মধ্যে—তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর নমুনা ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা :—আল্লাহ তায়ালা মানবকে বহু আদেশ-নিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে তাহার উপর এই গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন যে, সে যেন স্রষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও রাযী রাখিয়া জীবন যাপন করে। মানব যাহাতে এই গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তায়ালা বহু ব্যবস্থাই করিয়াছেন, এমনকি নমুনাও পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই নমুনার তৈরী ও গঠিত হও তবেই আমার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য যে—ফরমাইশদাতার নমুনাকে উপেক্ষা করিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করা দূরের কথা। উপেক্ষাকারী অমার্জনীয়, দোষী ও শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শেষ যুগে আল্লার সেই মনোনীত নমুনা হইলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এবং যেরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কোন যুগ, কাল বা দেশ ও জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নহেন, তদ্রূপ মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও কাল, যুগ, দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলের জন্যই আল্লার মনোনীত নমুনা।

মানুষ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত নমুনা তথা রসুলের আদর্শে স্বীয় জীবনকে গঠন ও পরিচালিত করিতে হইবে—যাহা একমাত্র হাদীছের মাধ্যমেই পাওয়া যাইতে পারে। হাদীছ-ভাণ্ডার গৃহীত না হইলে আয়াতের মর্ম্ম বৃথা প্রতিপন্ন হইবে।

(২) أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

অর্থ—তোমরা আল্লার আদেশ পালন কর এবং রসুলের আদেশ পালন কর।

কোরআনের বহু আয়াতেই আল্লার আনুগত্য ও তাঁহার আদেশাবলীর অনুসণের তাকিদ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানেই ঐ সঙ্গে রসুলুল্লার আনুগত্য ও অনুসরণের উপরও সমপরিমাণ জোর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মানব কল্যাণের জন্য উভয়টি একই পর্য্যায়ভুক্ত।

(৩) وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থঃ—যে ব্যক্তি আল্লার ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ অবলম্বন করিবে সে-ই অতি মহান কামিয়াবি ও সাফল্যের অধিকারী হইবে।

اطاعت এতা'আত অর্থ অনুসরণ করা; এই একটি শব্দই আল্লাহ ও আল্লার রসুল উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব যেমন আল্লার এতা'আতের অর্থ কোরআনের অনুসরণ এবং উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, তেমনি রসুলের এতা'আতের অর্থ হাদীছের অনুসরণ এবং ইহাও কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

(৪) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থঃ—হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি আমার পক্ষ হইতে স্পষ্ট ঘোষণা শুনাইয়া দিন যে—হে মানব! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসার (ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করায় সচেষ্ট বলিয়া) দাবী করিতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে (তোমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে যে—) স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে—আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিভাজন হওয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের উপব সম্যকরূপে নির্ভর করে।

(৫) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থঃ—রসুলুল্লাহ (দ) তোমাদিগকে যাহা আদেশরূপে দান করিয়াছেন তাহা পূর্ণরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লও এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাক।

(৬) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

অর্থঃ—হে মোহাম্মদ (দঃ)! আমি আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য শান্তিবাহক রূপে পাঠাইয়াছি। (আপনার অনুসরণ ও অনুকরণে জগদ্বাসী প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে।)

(৭) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রসুলরূপে পাঠাইয়াছি।"

হাদীছের অপরিহার্য্যতার যুক্তিঃ (১) মোসলমান মাত্রই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে, ইহা অবধারিত। এই ঈমানের তাৎপর্য্য কি শুধু এতটুকু বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি যে, তিনি একজন নবী ও রসুল ছিলেন? ইহা কখনও হইতে পারে না, কারণ এই বিশ্বাস ত হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবীর প্রতিই স্থাপন করা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় ও অপরিহার্য্য অঙ্গ; ইহা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মোসলমান হইতে পারে না। তবে মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষত্ব কি রহিল? যে কারণে اشهد ان محمدا رسول الله মোহাম্মদ (দঃ)এর কালেমা ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ পরিগণিত, অথচ اشهد ان موسى رسول الله و عيسى رسول الله মূছা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের কলেমাকে সেই মর্য্যাদা দান করা হয় নাই। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক আকিদারূপে এবং কোরআনের অকাট্য আয়াতসমূহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে—হযরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বীয় যুগ হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত—স্থান, কাল ও জাতি নির্বিশেষে বিশ্বমানবের জন্য রসুল ও নবী; পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ এরূপ নহেন; এই পার্থক্যের তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ কি হইবে?

এই সমস্ত বিষয়ের মূলে একটি মাত্র তত্ত্ব রহিয়াছে যে—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ এতাআ'ত, এত্তেবা'—অনুকরণ ও অনুসরণ কেয়ামত পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যেক নাজাতকামীর জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে পূর্ববর্ত্তী নবীগণের মোটামুটি সমর্থন যে, তাঁহারা আল্লার খাঁটী পয়গাম্বর ছিলেন, এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বেলায় শুধু এতটুকু যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার আদেশসমূহকে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। আর ইহা স্পষ্ট যে, হাদীছ-ভাণ্ডার গ্রহণ ব্যতিরেকে এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন সম্ভব নহে।

(২) শরীয়ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা কোরআন শরীফের মধ্যে মূলনীতি রূপে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু ঐ সব মূলনীতিসমূহকে কার্য্যে পরিণত করা এবং একটি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব কর্ম্মপদ্ধতি, কার্য্যধারা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রসুলের হাদীছের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কোরআন শরীফে নামাযের উল্লেখ আছে—اقيموا الصلوة "নামায আদায় কর।" কিন্তু নামায কত ওয়াক্ত, কোন্ কোন্ সময় কি কি পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে, উহার শুদ্ধ-অশুদ্ধতার বিধি-বিধান কি কি এবং আল্লার নির্দ্দেশিত নামায কি আকারের হইবে তাহা রসুলের বর্ণনা হাদীছেই পূর্ণরূপে জানা যাইতে পারে। তদ্রূপ কোরআন শরীফে আছে—و اتوا الزكوة "যাকাত দান কর" কিন্তু কি পরিমাণ মালে কি পরিমাণ দিতে হইবে? কত দিন পর পর দিতে হইবে? তাহা একমাত্র রসুলের বর্ণনা হাদীছের মাধ্যমেই জানা যায়। এইরূপে হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের হুকুম-আহকাম কোরআন শরীফে শুধু মাত্র মূলতঃ উল্লেখ

হইয়াছে। এরূপ বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেওয়া হয় নাই যাহা কার্য্যক্ষেত্রে যথেষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ কোরআন শরীফে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকার আবশ্যকও ছিল না, কারণ নমুনা ও ব্যাখ্যাকারী রসুল সঙ্গে সঙ্গেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাহী ফরমান ও মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, হাদীছ কোরআন হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, বরং কোরআনেরই ব্যাখ্যা। যেমন কোরআন শরীফে ঈমানের বর্ণনা করা হইয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার আরও বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী হাদীছবিশারদগণ ১০, ২০, ৫০, ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ সমস্ত হাদীছ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং "ঈমানের অধ্যায়" নামে নাম দিয়াছেন। এইরূপে কোরআন শরীফে অতি সংক্ষেপে নামাযের উল্লেখ হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং কার্য্যবিধির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ঐ সব হাদীছকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া "নামাযের অধ্যায়" নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে অজুর অধ্যায়, গোসলের অধ্যায়, যাকাতের অধ্যায়, রোযার অধ্যায়, হজ্জের অধ্যায়, বিবাহের অধ্যায়, তালাকের অধ্যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়, জেহাদের অধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অধ্যায় হাদীছের কিতাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তের প্রত্যেকটিরই মুল বস্তু কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে, উহারই কার্য্যপদ্ধতি ও বিস্তারিত বিবরণ হাদীছের দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিতের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ বিষয় সম্বলিত কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া পরে তৎসম্বন্ধীয় হাদীছ সমূহ উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকন্তু কোরআনের মধ্যে শত শত আয়াত এরূপ আছে যে, শুধু আমাদের উপর উহাদের মর্ম্ম গ্রহণের ভার ছাড়িয়া দিলে সঠিকভাবে উহার উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য হইত না, বরং শরীয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে আমরা নিশ্চয় ভুল করিতাম। যেমন— কোরআন শরীফে আছে—فاعتزلوا النساء فى المحيض "ঋতুবতী স্ত্রী হইতে দূরে থাক।" নিছক এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা ইহার অর্থ এই বুঝিতাম যে, স্ত্রীদিগকে ঐ সময় সর্বপ্রকারে দূরে রাখ—তাহাদের সঙ্গে আহার, নিদ্রা, উঠা, বসা কিছুই করিও না। অথচ ইসলামের বিধান ও শরীয়তের নির্দেশ এইরূপ নহে, বরং ইহা ইসলাম বিরোধী ইহুদীদের রীতি। ইহার সঠিক তত্ত্ব একমাত্র রসুলের হাদীছ দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—افعلو كل شئ الا النكاح "সহবাস ছাড়া আহার-নিদ্রা, উঠা-বসা ইত্যাদি সবই ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত করিতে পার।" ইহাই শরীয়তের সঠিক বিধান। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ উক্ত আয়াতের শব্দগুলি ব্যাপক আকারের ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরআনের এরূপ ব্যাখ্যা একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনার সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে; তাছাড়া অন্য কাহারও এরূপ ব্যাখ্যা দিবার অধিকার নাই। আরও দেখুন, কোরআন শরীফে আছে—

ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله...

"যাহারাই স্বর্ণ, রৌপ্য জমা করিয়া রাখিবে, উহাকে আল্লার রাস্তায় খরচ না করিবে তাহাদের ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।" এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে—

কেহই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা রাখিতে পারিবে না, প্রয়োজনাবশিষ্ট দান করিবে। অথচ ইসলামের বিধান এরূপ নহে। এই আয়াতের বাস্তব উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যাখ্যা দ্বারাই সাব্যস্ত হইতে পারে। তাঁহার হাদীছে প্রমাণিত আছে, ما ادى زكوته فليس بكنز "যে ধন-দৌলতের যাকাত দেওয়া হয় উহা উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত নহে।"

এই ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআনের উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভবই নহে এবং এই ব্যাখ্যা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। এই জন্যই হাদীছকে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়; এই ব্যাখ্যার অপরিহার্য্যতা কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে।

আলোচ্য বিষয়ের আরও একটি সরল প্রমাণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কয়েকটি গুণ ও করণীয়কার্য্য প্রকাশ করতঃ বলেন—

يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ -

অর্থঃ—"আল্লাহ তায়ালা আরববাসীদের মধ্য হইতে এমন একজন রসুল পাঠাইয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লার (কালামের) আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন, তাহাদিগকে আল্লার কিতাব—কোরআন এবং হেকমত তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন।" এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় সুবিজ্ঞ সেকালের আরববাসীগণের নিকট আরবী ভাষায় কোরআনের আয়াত (يتلو عليهم) পাঠ করিয়া শুনাইবার পর (و يعلمهم الكتاب) ঐ কোরআনের শিক্ষাদান করার তাৎপর্য্য কি? আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের যে শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল কেয়ামত পর্য্যন্ত আমাদের ন্যায় মোসলমানগণের জন্য সেই শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোন্ বস্তুর দ্বারা মিটিয়া যাইবে?

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি তথ্যমূলক বিষয় রহিয়াছে। উহা এই যে, এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যক্রম রূপে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ জগদ্বাসীকে পাঠ করিয়া শুনান। (২) মানব জাতিকে পবিত্র করা। (৩) তাহাদিগকে আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দান করা। (৪) এবং হেকমত শিক্ষা দান করা।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই চারিটি কার্য্যক্রম কোরআন শরীফের বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআন ভিন্ন আরও একটি জিনিস বিতরণ ও শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন যাহাকে "হেকমত" বলা হইয়াছে।

অতঃপর বিশ্বভাণ্ডারে তল্লাশী চালাইলে দেখা যাইবে যে, মানব জাতি রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আল্লার কিতাব ভিন্ন আরও যাহা লাভ করিয়াছে তাহা হইল একমাত্র সুন্নাহ, যাহাকে হাদীছ বলা হইয়া থাকে। প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত এবং আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব মোসলেম কর্ত্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত ইমাম মালেক মদনীর "মোয়াত্তা" নামক কিতাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বাণী এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে যে—

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন, "আমি তোমাদের নিকট দুইটি মহান বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, সেই বস্তুদ্বয়কে যাবৎ তোমরা আঁকড়াইয়া থাকিবে তাবৎ কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না—(১) আল্লার কিতাব ও (২) আল্লার রসুলের সুন্নত।"

হাদীছের অপরিহার্য্যতা বর্ণনার পর। এখন আমরা দেখাইতে চাই যে, ঐ অপরিহার্য্য জ্ঞান ভাণ্ডার—হাদীছে-রসুল (দঃ) সর্ববাদী সম্মত প্রমাণের বিধানেই নির্ভরশীলরূপে বিদ্যমান আছে।

হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার যুক্তিযুক্ত সুত্র ঃ দুনিয়াতে কোন ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার পর বা কোন কথা ব্যক্ত হওয়ার পর পরবর্ত্তী কালে প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঐ ঘটনা বা কথা প্রমাণিত হইবার জন্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও যুক্তি-জ্ঞান অনুসারে কি কি সূত্র আছে যদ্দ্বারা উহা তর্কাতীত, নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বের যুক্তিবাদী, জ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ এক বাক্যে ইহাই বলিবেন যে, ঐরূপ ঘটনা বা কথার প্রমাণের জন্য একমাত্র সূত্র হইল সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্য দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকার প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষ শ্রোতার মৌখিক সাক্ষ্য, দ্বিতীয় প্রকার তাহাদের লিখিত সাক্ষ্য। ইহাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই যে, উভয় প্রকারের সাক্ষ্যই সর্ব্বক্ষেত্রে অবলম্বিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্য লিখিত সাক্ষ্য হইতে কোন দিক দিয়াই কম নহে, বরং আইন-আদালতে মৌখিক সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য। কোন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য লিখিয়া আদালতে পত্রাকারে পাঠাইলে মৌখিক সাক্ষ্যের ন্যায় উহা সরাসরি গ্রহণীয় হয় না। অধিকন্তু লিখিত সাক্ষ্যও মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, কারণ লিখকের মৃত্যুর পর উহা লিখকের স্বলিখিত হওয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যই একমাত্র পথ।

বিশ্বের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার ইতিহাস-শাস্ত্র, মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই রচিত হইয়াছে। মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হইলে বিশ্বের সব কিছুই অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি বংশ পরিচয়—মাতা-পিতার পরিচয় ইত্যাদি মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা মানুষের জীবন মরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিত কালেও তাঁহার হাদীছসমূহ মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার ছাহাবী ছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেন এবং নানা দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেকটি হাদীছকে প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করার সুযোগ হওয়া সম্ভব ছিল কি? তিনি বিভিন্ন দেশে স্বীয় মোবাল্লেগ (প্রচারক) পাঠাইতেন, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন; তাঁহারা তাঁহার বাণীসমূহ প্রচার করিয়া থাকিতেন এবং ঐরূপে সেই সকল মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সমস্ত জগতে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং মৌখিক সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা অতি সুস্পষ্ট। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার বাণীর মধ্যে বড় ছোট প্রত্যেকটি বাণীই রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের পর্য্যন্ত পরম্পরা ঐ মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ কি ? হাদীছ প্রমাণিত করিতে সূত্র পরম্পরা মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের তালিকাকেই ইসলামী পরিভাষায় "সনদ" বলা হয় এবং প্রত্যেক সাক্ষীকে 'রাবী' বলা হয়। রাবী শুধু সাক্ষ্য দিয়াই চলিয়া যান নাই বরং রীতিমত শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং শ্রোতাগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সাক্ষ্যাদাতা ওস্তাদ এবং শ্রোতা শাগেদ´ পরিগণিত হইয়াছেন। যে কোন মহামনীষি কর্ত্তৃক হাদীছ বলিয়া বর্ণিত কোনও বাক্যকে সনদ ব্যতিরেকে রসুলুল্লার (দঃ) হাদীছ বলিয়া ইসলাম কস্মিনকালেও [illegible]মোদন করে নাই। একটি শব্দ সম্বন্ধেও হাদীছ বলিয়া দাবী করিলে সেখানে সনদ বা সাক্ষ্যের বিবরণ দিতে হইবেই। তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি হাদীছই সর্ব্ববাদী সম্মত নীতি, ও যুক্তি অনুযায়ী তথা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ তথা সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা ও পরিপক্কতা ঃ

যে কোন সাক্ষ্যের মধ্যেই মিথ্যা প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। মৌখিক সাক্ষ্যের তুলনায় লিখিত সাক্ষ্যের মধ্যে এই সম্ভাবনার অবকাশ কোনও অংশে কম নহে। মৌখিক কাহারও প্রতি মিথ্যা রূপে কোন বিষয়ের বা কথার সম্পর্ক আরোপ করা অপেক্ষা লিখিতভাবে উহা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নহে। তদুপরি অনিচ্ছাকৃত ভাবে লেখার মধ্যে ভুল হওয়া বা লিখিত বস্তু পর্য্যায়ক্রমে নকল হইয়া আসার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাওয়া নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক। যাহা হউক লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার সাক্ষ্যের মধ্যেই অসত্যের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়াতে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া গত্যন্তর নাই, অন্যথায় সারা জগত অচল হইয়া পড়িবে। অবশ্য মিথ্যা সাক্ষ্য এড়াইবার জন্য সর্ব্বক্ষেত্রেই সাক্ষ্যদাতার প্রতি নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

সনদের সত্যতা ঃ হাদীছের সাক্ষ্য অর্থাৎ "সনদ" গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মোহাদ্দেছ—হাদীছ-বিশারদগণ বহুমুখী শর্ত্ত-শরায়েত ও অতি কড়াকড়ি, আরোপ করিয়া যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন উহা অন্যত্র একেবারেই বিরল, এমনকি বিশ্বে ইহার নজীর কেহই কোথাও দেখাইতে পারিবে না। ঐ সমস্ত কড়াকড়ি দৃষ্টে বিশ্ববাসীকে এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা যাইতে পারে যে, হাদীছের প্রামাণিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নাই।

ঐ সমস্ত নিয়ন-কানুন লিপিবদ্ধ করিয়া "উসুলে-হাদীছ" বা হাদীছের প্রামাণিকতা পরীক্ষা করার নিয়ম-কানুন নামে একটি বিশেষ শাস্ত্র সঙ্কলন করা হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রে বহু কিতাব লেখা আছে। নিম্নে ঐ সকল নিয়ম-কানুনের কতিপয় ধারা ও উপধারা উদ্ধৃত হইল।

হাদীছরূপে গ্রহণীয় হইবার জন্য সাধারণতঃ উহার সনদে চারিটি প্রধান বিষয়ের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে নজর দিতে হইবে। যথা—(১) যত শত বা হাজার বৎসর পরেই হউক না কেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সূত্র-পরম্পরায় পর্য্যায়ক্রমে যতজন সাক্ষীর মাধ্যমে হাদীছখানা পৌঁছিয়াছে, এক এক করিয়া সমস্ত সাক্ষীর পরিচিত নামের তালিকা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, কোন একজনের নামও যেন বাদ না পড়ে, নতুবা হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না।* এই ধারাটির সহিত আবার দুইটি উপধারাও রাখা হইয়াছে।

(নোটটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(ক) উক্ত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে প্রতিটি সাক্ষী বা রাবী তাঁহার পূর্ব্বের সাক্ষ্যদাতার নাম উল্লেখ করার সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিবেন যে, আমি "অমুকের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন" বা "অমুকে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।" কোন একজন সাক্ষীও যদি ঐরূপ স্পষ্ট শব্দ না বলিয়া কোন অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন এরূপ বলেন যে—"সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে" একটি সাক্ষীর বেলায়ও এইরূপ অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হইলে ঐ সনদ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বহু রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। ইমাম বোখারী (রঃ) এরূপ সনদ গ্রহণ ব্যাপারে সর্ব্বাধিক কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন।

লক্ষ্য করুন! কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; যে—"সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে" এরূপ বলিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, সলীম সরাসরি কলীমের মুখে শুনিয়াছে। বরং এরূপও হইতে পারে যে, অন্য কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে শুনিয়াছে, অথচ ঐ ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ নাই, ইহাতে ১ নম্বর ধারা লঙ্ঘন হওয়ার আশঙ্কা আছে। এইরূপ সামান্য সন্দেহের অবকাশও যেন না থাকিতে পারে, তজ্জন্য এই উপধারা রাখা হইয়াছে। এমনকি যদি কোন রাবী'র বিষয় এরূপ প্রমাণিত হয় যে, সে এরূপ অস্পষ্ট ভাষার আড়ালে প্রকৃত প্রস্তাবেই ১ নম্বর শর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে তবে হাদীছের পরিভাষায় তাহাকে "মোদাল্লেস" বলা হইবে। এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বস্থানে সন্দেহজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক সাক্ষী ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপরের সাক্ষী উভয়ের জীবনকাল ও বাসস্থান এরূপ পর্য্যায়ের হইতে হইবে যেন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা অসম্ভব না হয়।

(২) সাক্ষ্যদাতাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীছ বিশারদগণের নিকট নাম-ঠিকানা, গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্র এবং কোন্ কোন্ ওস্তাদের নিকটে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে পরিচিত হইতে হইবে। সাক্ষ্যদাতাদের একজনও অপরিচিত হইলে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় নহে।

(৩) আগাগোড়া প্রতিটি সাক্ষীই জ্ঞানী, খাঁটী সত্যবাদী*, সচ্চরিত্র, মোত্তাকী, পরহেজগার, শালীনতা ও ভদ্রতাসম্পন্ন, সৎ-স্বভাবের হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি জীবনে মাত্র একবার হাদীছ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা উক্তির জন্য ধরা পড়িলে ঐ ব্যক্তির শুধু ঐ মিথ্যা

---

* মোহাদ্দেছগণ প্রত্যেক হাদীছের সঙ্গে উহার সনদ বা সাক্ষীগণের তালিকা উল্লেখ করেন, যথা—ইমাম বোখারী বলেন, মোহাদ্দেছ হোমায়দী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি সুফিয়ান নামক মোহাদ্দেছের মুখে শুনিয়াছেন, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ আনছারীর মুখে শুনিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তায়মীর নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি আল'কামা ইবনে আবী অক্কাছের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছেন, তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঘোষনা দিতে শুনিয়াছেন যে, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি......انما الاعمال بالنيات

লক্ষ্য করুন। একটি বিষয়কে হাদীছরূপে প্রমাণ করিতে বোখারী (রঃ) স্বীয় ওস্তাদ হইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্ত সাক্ষ্যদাতাদের পূর্ণ তালিকা বর্ণনা করিলেন। এইরূপেই মোহাদ্দেছগণ হাদীছকে সনদযুক্ত বর্ণনা করেন। বোখারী শরীফের প্রত্যেকটি হাদীছ সনদ সহ বর্ণিত আছে। সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে অনুবাদে সনদ উল্লেখ হয় নাই। (পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাদীছই নহে, বরং তাহার সারা জীবনের সমস্ত হাদীছই অগ্রাহ্য হইবে। তওবা করিলেও তাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাছাড়া অন্য কোন বিষয়েও মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলে বা শরীয়ত বিরোধী আকিদা বা কার্য্যকলাপে লিপ্ত প্রমাণিত হইলে বা অসৎ প্রকৃতির লম্পট ও নীচ-স্বভাবের লোক হইলে তাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না।

(৪) প্রত্যেকটি সাক্ষী তাহার স্মরণশক্তি সম্পর্কে অতিশয় পাকাপোক্ত, সুদক্ষ ও সুদৃঢ় সংরক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে ↑ এবং ইহাও সুপ্রমাণিত হওয়া আবশ্যক যে, প্রতিটি

: মোহাদ্দেছ—হাদীছ বর্ণনাকারী ও হাদীছ শিক্ষাদানকারী বা হাদীছের সাক্ষীগণের সত্যবাদীতার পরীক্ষা কঠোরভাবে করা হইত। উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন কতিপয় আলেম পরিক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তির স্ব-গ্রাম ও স্ব-গোত্রে যাইয়া তাহার সত্যবাদিতা যাচাই করিতেন। এই ব্যক্তি জীবনে কখনও মিথ্যা বলে নাই প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করতঃ মোহাদ্দেছ বা হাদীছ বর্ণনাকারী ও শিক্ষাদানকারীরূপে গ্রহণ করা হইত; নতুবা নহে।

এরূপ পরীক্ষার একটি নজীর চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবুহাতেম—মোহাম্মদ ইবনে হাব্বান روضة العقلاء কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠায় সনদযুক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

রিব্‌য়ী ইবনে হেরাশ (রঃ) যিনি প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—যখন তাঁহার পরীক্ষা হইল এবং তাঁহার বস্তি ও গোত্রের লোকগণ একবাক্যে তাঁহার সততার সাক্ষ্য দিল তখন একজন শত্রু তাঁহার মোহাদ্দেছ গণ্য হওয়ার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করিল। সে তৎকালীন শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজ-ইবনে ইউসুফকে বলিল, রিবয়ী' ইবনে হেরাশ আজ মোহাদ্দেছ শ্রেণীভুক্ত হইবেন; তাঁহার বস্তি ও গোত্রের সকলে তাঁহার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিয়াছে। আপনি একটু লক্ষ্য করিলেই তিনি একটি মিথ্যায় জড়িত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার দুইটি ছেলেকে আপনি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আদেশ করিয়াছেন, তাহারা নিজ গৃহেই পলাতক আছে। তাহাদের পিতা রিবয়ী' ইবনে হেরাশ তাহা অবগত আছেন। আপনি তাঁহাকে ছেলেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিবেন। সে ভাবিয়াছিল, হাজ্জাজ অতি ভয়ঙ্কর শাসনকর্ত্তা, তাই রিবয়ী' ইবনে হেরাশ নিশ্চয় সন্তানদ্বয়ের প্রাণ রক্ষার্থে বলিবেন যে, আমি ছেলেদ্বয়ের খবর জ্ঞাত নহি। এইভাবে তিনি মিথ্যায় জড়িত হইয়া পড়িবেন।

সেমতে শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজ তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রিবয়ী'? তিনি বলিলেন, হাঁ। আপনার ছেলেদ্বয়ের খবর জানেন কি? তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, তাহারা গৃহের মধ্যেই পলাতক রহিয়াছে। এইভাবে তিনি সত্যবাদীতার দ্বারা হাজ্জাজের ন্যায় পাষাণ আত্মাকেও জয় করিয়া ফেলিলেন। হাজ্জাজ তাঁহার পরিপক্ক সত্যবাদীতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সততা ও সুনামের ঘোষণা করিয়া দিলেন।

↑ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কোন মোহাদ্দেছ হাদীছের শিক্ষা ও সাক্ষ্যদাতা গণ্য হইবার জন্য তাঁহার সত্যবাদিতা পরীক্ষিত হইত। তদ্রূপ তাঁহার স্মরণশক্তিও পরীক্ষা করা হইত। স্বয়ং বোখারী (রঃ)কে এরূপ পরীক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) প্রথম জীবনে বাগদাদে উপস্থিত হইলে স্থানীয় হাদীছবিশারদগণ তাঁহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা একশতটি হাদীছ তৈয়ার করিলেন; ঐ হাদীছ সমুহের মুল হাদীছ ও সনদের মধ্যে গড়মিল এবং আরও নানাপ্রকার উলট-পালট করিয়া সাজাইলেন। অতঃপর (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাক্ষী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে হাদীছখানা পূর্ণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করতঃ সবিশেষ মনোযোগের সহিত মুখস্ত করিয়া বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ের প্রমাণ এইরূপে হইবে যে, উক্ত সাক্ষী যে যে হাদীছ আজীবন শত শত বার বর্ণনা করিয়া আসিয়াছে কোন সময়ই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য বা কোনরূপ গড়মিল পরিলক্ষিত হয় নাই। + যখন যে সাক্ষীর বর্ণনার মধ্যে এরূপ গড়মিল দেখা যাইবে তখন হইতে আর ঐ সাক্ষীর বর্ণনায় কোন হাদীছ সঠিক প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে না।

দশজন আলেম নির্দ্দিষ্ট করা হইল যাঁহারা ঐ ভুল হাদীছসমুহের দশটি করিয়া পর পর ইমাম বোখারীর সম্মুখে পেশ করিবেন এবং তাঁহার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহা করা হইল। প্রত্যেকটি হাদীছের সঙ্গে তিনি শুধু এতটুকু বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, এরূপ কোন হাদীছ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। একশত গড়মিল হাদীছ পেশ করা শেষ হইলে পর তিনি ঐগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, অমুক ব্যক্তি প্রথমে এই হাদীছটি পেশ করিয়াছেন, উহাতে এই এই ভুল আছে, উহার প্রকৃত রূপ এই। এইভাবে একশত হাদীছের বিষয়ে মন্তব্য করিলেন ; ঐ ভুল হাদীছগুলি তাঁহার সম্মুখে যে ধারাবাহিকতায় পেশ করা হইয়াছিল উহাতেও কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

কী স্মরণশক্তি ! একশত ভুল হাদীছ একবার মাত্র শুনিয়া অবিকলরূপে এবং তরতিব সহ কণ্ঠস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন ; পরীক্ষকগণের নিকট এই বিষয়টি অতি বিস্ময়কর ছিল।

+ ইমাম বোখারী সঙ্কলিত "কিতাবুল-কুনা" ৩৩ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শাসনকর্ত্তা মারওয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর হাদীছ কণ্ঠস্থ রাখার ক্ষমতা পরিক্ষার গোপন উদ্দেশ্যে নানারূপ ছলে-বলে তাঁহার দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করাইলেন এবং মারওয়ানের সেক্রেটারী পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া গোপনে ঐ সব হাদীছ অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পর মারওয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ)কে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন এবং সেক্রেটারীকে পূর্ব্বে লিখিত লিপি সহ আড়ালে বসাইলেন। অতঃপর আবু হোরায়রা (রাঃ)কে এক বৎসর পূর্ব্বে বর্ণিত হাদীছসমুহ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি এক একটি করিয়া বর্ণনা করিলেন। সেই সেক্রেটারীর সাক্ষ্য যে, দীর্ঘ এক বৎসর ব্যবধান সত্ত্বেও এত বেশী সংখ্যক হাদীছের দ্বিতীয়বার বর্ণনার মধ্যে একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম ছিল না।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) তৎকালীন রাষ্ট্রিয় প্রেসিডেণ্ট হেশাম কর্ত্তৃক এইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইমাম জাহাবীর সঙ্কলিত "তাজকেরা" কেতাবের প্রথম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আমার ছেলের জন্য কতকগুলি হাদীছ লিখাইয়া দিন। তিনি একজন সরকারী কেরাণীকে ডাকিয়া চারি শত হাদীছ লিখাইয়া দিলেন। প্রেসিডেণ্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে এক মাস কাল পরে ডাকিয়া পূর্ব্বে লিখিত লিপিখানা হারাইয়া যাওয়ার ভান করিয়া ঐ ৪ শত হাদীছ পুনরায় লিখাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন, বস্তুতঃ পূর্ব্বের লিপি হারাইয়া ছিল না। চারিশত হাদীছের নূতন পুরাতন লিপিদ্বয়ে এক অক্ষরেরও পার্থক্য হইল না।

এই ধারা অনুসারেই বহু বড় বড় গণ্যমান্য হাদীছ বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পর তাঁহাদের ঐ অবস্থায় বর্ণিত হাদীছ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয় নাই। তাছাড়া যাহাদের সাধারণ কথাবার্ত্তায় বেশী ভুল দেখা গিয়াছে তাহাদের হাদীছও গ্রহণীয় হয় নাই।*

হাদীছ পরীক্ষার এই চারিটি প্রধান শর্ত্ত। আরও বহু খুটিনাটি বিষয়াদি আছে যাহা সুবিজ্ঞ আলেমগণ অবগত আছেন; যাহার দ্বারা হাদীছের প্রামাণিকতা আরও অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

এইরূপ শর্ত্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাদীছ বিশারদগণের মধ্য হইতেই যুগে যুগে এক শ্রেণীর মনীষীবৃন্দ এক বিরাট ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যাহার মূল্য বর্ত্তমান যুগের আপন-ভোলা মোসলেম সমাজ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিজাতীগণ, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবীদার—ইউরোপবাসীগণও নতশিরে মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই অমূল্যরত্ন—মহান ইতিহাস ভাণ্ডার একমাত্র মোসলমানদেরই অমরকীর্ত্তি। ইহার নজীর অন্য কোন জাতি কোন কালে দেখাইতে সক্ষম হয় নাই এবং হইবেও না। সেই অমূল্য রত্নটি হইল এক বিশেষ শাস্ত্র যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় (اسماء الرجال) "আছমাউর রেজাল" অর্থাৎ হাদীছের সাক্ষ্যদাতা ও রাবীগণের জীবনেতিহাস বা জীবন-চরিত বলা হইয়া থাকে। তাহাতে উল্লিখিত চারিটি ধারা এবং উহা ছাড়াও হাদীছের সাক্ষ্যদাতাদের বিষয় সংক্রান্ত যে সমস্ত খুটিনাটি বিষয়াদি রহিয়াছে সে সব দৃষ্টে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিটি রাবী' তথা হাদীছের সাক্ষ্যদাতার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত ও অপরিচিত নাম, বংশ-পরিচয়, বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী হাদীছ-বিশারদগণ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি মন্তব্য সমূহ এবং তাঁহার সৎগুণাবলী বা দোষ-ত্রুটির বিস্তারিত বিবরণ এবং তিনি যে সমস্ত লোকের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের ফিরিস্তি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

---

* মোহাদ্দেছগণ স্মরণশক্তির প্রতি কত সতর্ক থাকিতেন সে সম্পর্কে ইমাম তিরমিজির (রঃ) একটি ঘটনা আছে। তিরমিজি (রঃ) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ছিলেন তবুও হাদীছ শিক্ষা দিতেন, এমনকি ভ্রমণাবস্থায়ও তাঁহার সঙ্গে হাদীছ পিপাসুগণ থাকিতেন। একদা তিনি উষ্ট্রে আরোহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন; পথিমধ্যে একস্থানে তিনি অল্প সময়ের জন্য মাথা নত করিয়া রাখিলেন। সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ঐ স্থানে মাথা নত করিলেন কেন? তিনি বলিলেন, ঐ স্থানে কি একটি বৃক্ষ রাস্তার উপর ঝুকিয়া পড়ে নাই যে, উষ্ট্রারোহীদের মাথা উহাতে আঘাত পাইবে? সকলেই বলিল, ঐ স্থানে কোন বৃক্ষই নাই। তিনি বলিলেন, বহু দিন পূর্ব্বে—চক্ষু ভাল থাকাকালীন আমি এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময় এই পথে ঐরূপ একটি বৃক্ষ ছিল, আমি ঐ স্থানটিকে সেই বৃক্ষতল মনে করিয়া মাথা নত করিয়াছি। তোমরা স্থান-সংলগ্ন বস্তির লোকদের নিকট সঠিক তথ্য অবগত হও। ঐ স্থানে কোন সময় ঐরূপ বৃক্ষ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া না গেলে আমি হাদীছ বর্ণনা করা বন্ধ করিয়া দিব; মনে করিব, আমার স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

সত্য সত্যই ঐ বস্তির বয়োবৃদ্ধদের নিকট জানা গেল, পূর্ব্বকালে ঠিক এই স্থানে ঐরূপ বৃক্ষ ছিল। তখন তিনি স্বীয় স্মরণশক্তি বহাল থাকায় আল্লার শোকর আদায় করিলেন।

এই শাস্ত্রের শুধু প্রসিদ্ধ ও সচর চর প্রচলিত কিতাব সমূহের মধ্যে উল্লিখিত আকারে ৮৫০০০ হাজার রাবী বা সাক্ষ্যদাতার জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধাকারে বিশ্ব-ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজ্জর আসকালানী (রঃ) কর্ত্তৃক চার খণ্ডে সঙ্কলিত "আল্-এসাবাহ্" নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহারই একাদশ খণ্ডে সঙ্কলিত "তাহ্জীবুত-তাহ্জীব" কিতাবে ১২৪৫৫ সংখ্যক লোকের বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁহার পূর্ব্বে হাফেজ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন ও হাফেজ শামছুদ্দীন জাহাবীর ন্যায় বড় বড় মনীষী এই বিষয়ে বহু কিতাব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন।

এই শাস্ত্রে সর্ব্ব মোট ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ রাবী বা হাদীছ বর্ণনাকারী সাক্ষীদের বিস্তারিত জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (তদবীনে হাদীছ)

প্রসিদ্ধ জার্ম্মানী ডঃ স্প্রেঙ্গার যিনি ১৮৫৪ ইং সনে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন এবং আরবী সহ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোন জাতি অতীতেও হয় নাই, বর্ত্তমানেও নাই যে জাতি মোসলমানদের ন্যায় "আছ্মাউর-রেজাল" শাস্ত্রের অবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবনেতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়।" (উপরোল্লেখিত আল্ এছাবাহ নামক কিতাবের ইংরেজী ভুমিকায় তিনি এই কথা লিখিয়াছেন।)

বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফের বিশেষত্ব ঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যে চারিটি ধারার বিষয় আলোচনা হইল, ঐ কয়টি হইল সাধারণ ধারা। অর্থাৎ কোন হাদীছকে সাধারণ ভাবে নির্ভরযোগ্য বলিতে হইলে ঐ সব ধারা উহার সাক্ষ দাতাদের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট হাদীছ-বিশারদগণ তাঁহাদের কোন কোন গ্রন্থের জন্য উক্ত চারিটি ধারা সম্বলিত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও অন্যান্য গুণাবলী দৃষ্টে আরও শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন। তদুপরি আরও বহু বিশিষ্ট গুণাবলীর শর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন। আটা বা ময়দা সাধারণতঃ প্রথমে মোটা চালুনী দ্বারা চালা হয়, তারপর উহা সুক্ষ্ম চালুনীতে চালা হয় ; কেহ কেহ আবার উহাকে কাপড়ে ছাকিয়া ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় ঐ আটা বা ময়দার মধ্যে যেমন কোন প্রকার আবর্জ্জনা থাকিতে পারে না ; তেমনি হাদীছের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে যাহাতে কোন রূপ সন্দেহ বা ভেজাল থাকিতে না পারে তজ্জন্য হাদীছের রাবী' বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। এবং এই শ্রেণী বিভক্তির দিক দিয়া যিনি যেই গ্রন্থের জন্য যত বেশী সুক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার বিশ্লেষণে অতিশয় কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সেই গ্রন্থ তত পরিপক্ক ও বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই দিক দিয় সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছেন, ইমাম বোখারী (র) ও তাঁহারই শাগের্দ ইমাম মোসলেম (রঃ)। এবং উক্ত মহামনীষীদ্বয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দুইখানা গ্রন্থ—"বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফ" দুনিয়ার বুকে আজ বার শত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে এই শ্রেণীর সমুদয় গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহারা সর্ব্ব মোট ৫০০০০০ রাবী বা বর্ণনাকারী—হাদীছের সাক্ষীদের মধ্যে সচরাচর পরিচিত ৮৫০০০ রাবী' বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া ২৪০৪ জন রাবীকে সুক্ষ্মদর্শীতার কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দুগ্ধ হইতে মাখন বাহির করার ন্যায় বাছিয়া লইয়াছেন।

বোখারী শরীফের বিশেষত্বঃ

ইমাম বোখারী (রঃ) ও ইমাম মোসলেম (রঃ) এই দুইজন ওস্তাদ শাগের্দের মধ্যে সাধারণ নিয়মকেই আল্লাহ তায়ালা বজায় রাখিয়াছেন। ওস্তাদ ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁহার গ্রন্থখানাই বিশ্বের বুকে অগ্রগণ্য হইয়াছে। তিনি আরও সুক্ষ্মতমভাবে যাচাই করিয়া বোখারী শরীফ গ্রন্থের জন্য ২৪০৪ জন হইতে ৬২০ জনকে বাদ দিয়াছেন। তাই তাঁহার এই গ্রন্থখানা সর্ব্বাধিক উচ্চতর শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বে প্রবাদরূপে স্বীকৃত রহিয়াছে—

اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري -

অর্থাৎ আল্লার কিতাব—কোরআন শরীফের পরেই বিশ্বস্ততার সর্ব্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বোখারীর এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ বোখারী শরীফ। এবং এই জন্যই ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহ হাদীছ-শাস্ত্রের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বোখারী (রঃ) পর্য্যন্ত যে সকল সাক্ষ্যদাতা বা রাবীর মাধ্যমে এই গ্রন্থের মধ্যে হাদীছ গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মোট সংখ্যা হইল প্রায় ১৮০০।* তন্মধ্যে ১৩৫৪ জন হইলেন এইরূপ যাঁহাদের মাধ্যমে ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম উভয়েই হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই শীর্ষস্থানীয় পরিগণিত। অবশিষ্ট ৪৩০ হইতে কিছু অধিক সংখ্যক রাবীর নিকট হইতে শুধু বোখারী (রঃ) হাদীছ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐসব রাবী বা সাক্ষ্যদাতা ইমাম বোখারীর সুক্ষ্মতম বাছনীর মধ্যে গ্রহণীয়রূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শুধু ইমাম মোসলেমও প্রায় ৬২০ সংখ্যক রাবী হইতে হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহাদেরকে সুক্ষ্মতম বাছনীতে তাঁহার বিশেষ গ্রন্থ বোখারী শরীফের ক্ষেত্রে বাদ দিয়াছেন।

মোট ২৪০৪ জন মানুষের জীবনেতিহাস কোনও অসাধ্য বা অপ্রকাশ্য বস্তু নহে, বরং পূর্ব্বালোচিত "আছমাউর-রেজাল" শাস্ত্রের কিতাবসমূহে আলেখ্য পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া শত শত বৎসরকাল হইতে জগদ্বাসীর হাতে ও তাহাদের দৃষ্টিগোচরে বিদ্যমান রহিয়াছে; তদুপরি শুধু এই ২৪০৪ জন মানুষের পূর্ণ জীবনী সঙ্কলিত ও সুরক্ষিত আছে—যাহার জন্য قرة العينين فى رجال الصحيحين নামক একখানা কিতাবও পূর্ব্বকাল হইতেই বিশ্বের বুকে প্রচলিত রহিয়াছে। উল্লিখিত বিষয়াবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করিতেছি, সুষ্ঠুরূপে প্রত্যেকটি রাবীর জীবনী অনুধাবন করতঃ তাঁহারাই বিচার করুন এই সমস্ত লোকদের দ্বারা কোনও মিথ্যা বর্ণনা প্রদান বা কোনরূপ মিথ্যানুষ্ঠান কত দূর সম্ভব।

---

* এই ১৮০০ শতের মধ্যে ১০১ জন হইলেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী। ছাহাবীগণ বিশ্বস্তাতায় প্রশ্নের উর্দ্ধে, তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও সত্যবাদিতা পূর্ব্বাপর মোসলেম জাহানের সর্ব্ববাদী সম্মত বিষয়। অবশিষ্ট ১৬০০ শতের অধিকাংশই তাবেয়ী'ন বা তাবয়ে-তাবেয়ী'ন তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটতম সোনালী যুগের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রসুলুল্লার আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য

অধুনা কোন কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মুখেও এইরূপ প্রশ্ন শোনা যায় যে, দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসরের পুরাতন আদর্শাবলী, বিশেষতঃ পর্ব্বতমালা বেষ্টিত মরু অঞ্চল-অধিবাসী অনুন্নত যুগ ও অনুন্নত দেশের একটি লোক যে আদর্শ গড়িয়াছিলেন বর্ত্তমান অগ্রগামী ও উন্নতিশীল জগতে তাহা চলিবে কেন? বর্ত্তমানে জগত বহুদুর আগে বাড়িয়া গিয়াছে, এই অসাধারণ অগ্রগতির যুগে—এই বিজ্ঞানের যুগে পেছনের পুরাতন আদর্শ অচল হইতে বাধ্য। এত অগ্রগামী যুগের চাহিদা এত পশ্চাতের আদর্শ কিরূপে মিটাইতে পারে?

ইসলামী আদর্শের সুফল এবং অনৈসলামিক রীতিনীতির কুফল যাহা বাস্তব জগতেই প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে উহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া নিয়া শুধু মাত্র মৌখিক বিতর্কের উপর উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, হযরত মোহাম্মদ—রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাবই হইল এই প্রশ্নের মুল। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে শুধু মাত্র দুইটি তথ্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি, অকপট চিত্তে উহার বাস্তবতা অনুধাবন করিতে পারিলে মূল প্রশ্নের অসারতা সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠিবে।

প্রথম তথ্য—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) স্থূল বিজ্ঞানের হিসাবে যতই অনুন্নত দেশের, অনুন্নত যুগের এবং যতই পুরাতন কালের হউন না কেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আদি-অন্ত সকল দেশ ও সকল পরিবেশের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার রসুল। এবং আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল যুগ, দেশ ও পরিবেশের প্রতিটি বস্তুর অবস্থার পুর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন-الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কি সৃষ্টি সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাত থাকিবেন না? তিনি সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়ের এবং অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানের আকরও বটেন।"

তিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের সম্মুখে নুতন-পুরাতন, অতীত-ভবিষ্যৎ বলিতে কিছু নাই, সব কিছুই সমানভাবে তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রের বিন্দু। সেই মহান স্রষ্টার সঙ্গে ছিল হযরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লার দৃঢ় যোগসূত্র এবং তাঁহার প্রতিটি বাক্য ও চিন্তাধারার উৎস ছিলেন সেই মহান স্রষ্টা। এই ঘোষণাই পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিয়াছে—وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى "মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিজের মনোবৃত্তি হইতে কিছুই বলেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন সৃষ্টিকর্ত্তার তরফ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া সেই অহীর বিকাশ সাধন করেন মাত্র।" সুতরাং তাঁহার আদর্শ বস্তুতঃ তাঁহার রচিত বস্তু নহে, বরং বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্বনিধি সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা-প্রদত্ত বস্তু। উহার পাওয়ার ও শক্তিকে আমাদের নিজেদের রচিত আদর্শের পাওয়ার ও শক্তির মাপকাঠিতে পরিমাণ করা নিতান্তই ভুল হইবে; মনকে তোলার পাথরে পরিমাপ করা অপেক্ষা অধিক বোকামী হইবে।

দ্বিতীয় তথ্য:-বাক্য-বচনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জ্ঞান ও আদর্শ বিতরণ করা সম্পর্কে বিশ্বনবী ও সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে

আল্লাহ তায়ালা এমন একটি বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি ও গুণ দান করিয়াছিলেন যাহা অন্য কোন মানুষ ত দূরের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নবীকেও আল্লাহ তায়ালা উহা দান করিয়াছিলেন না।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে এই বিষয়টির প্রতি বিশ্ববাসীকে সজাগ ও সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন—

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ......وَاُرْسِلْتُ

اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ -

হাদীছখানা মোসলেম শরীফ ১৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল নবীগণের উপর ছয়টি বস্তুর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মূল হাদীছের মধ্যে পূর্ণ ছয়টির উল্লেখই রহিয়াছে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু তিনটি—) (১) আমাকে আল্লাহ তায়ালা "জাওয়ামেউল কালেম" গুণ দান করিয়াছেন। (৫) আমি সারা বিশ্বমানবের রসুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি। (৬) নবীগণের আগমন আমার উপরই শেষ, আমার পরে কোন নবী আসিবেন না। (২২৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ছয়টি বস্তুর প্রথম বস্তুটি হইল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়; অর্থাৎ "জাওয়ামেউল-কালেম"। "জাওয়ামে" শব্দটি বহুবচন, ইহার অর্থ "ব্যাপক পরিধিময় বস্তু।" "কালেম" শব্দটিও "কলেমা" শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ (১) শব্দ (২) চিন্তাধারা—মনন, চিন্তন বা অন্তরের আলোচনা ও গবেষনা (৩) আদর্শ বা নীতি নির্দ্ধারক বাক্য ও বচন। যেমন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর-রসুলুল্লাহ"কে "কলেমা-তৈয়্যাব" বলা হয়।

হজরত (দঃ) বলিতেছেন—ব্যাপক পরিধিময় চিন্তা বলে ব্যাপক পরিধিময় আদর্শ ও নীতি ব্যাপক শব্দাবলীতে রচিত ও প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি ও গুণ আল্লাহ তায়ালা খাছ ভাবে আমাকে দান করিয়াছেন, অন্য কোন নবীরও এই ক্ষমতা বা গুণ ছিল না।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সারগর্ভময় উক্তিটির সঠিক মর্য্যাদা দান করিলেই মূল প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যায়। মনে হয় যেন হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত তথ্যটি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ও গুণ হইতে নিঃসৃত চিন্তাধারা, আদর্শ ও বাক্যাবলীর ব্যাপক পরিধি দেশ, কাল ও যুগ নির্ব্বিশেষে সকলকে বেষ্টিত করিবে ইহাই হইল হযরতের উক্ত সারগর্ভময় উক্তিটির সার্থকতা এবং এই জন্যই হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই ধরণের গুণ অন্যান্য নবীগণের জন্য আবশ্যকও ছিল না, কারণ তাঁহাদের আবির্ভাব বিশেষ জাতি ও কালের জন্য সীমাবদ্ধ রূপের ছিল। পক্ষান্তরে (১) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর আবির্ভাব হইল দেশ, কাল, জাতি, যুগ নির্ব্বিশেষে বিশ্ব-মানব জাতির জন্য (২) এবং তাঁহার রেছালত, নবুয়ত ও পয়গাম্বরী কায়েম থাকিবে জগৎ-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। এই দুইটি বিষয়কেই হযরত (দঃ) পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরতের আদর্শ যদি দেশ, কাল, যুগ ও জাতি নির্ব্বিশেষের জন্য না হয় তবে এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের সংবিধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

হাদীছ সংরক্ষণে বিশেষ তৎপরতা

হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতেই তাঁহার প্রতিটি হাদীছ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। ছাহাবীগণ অত্যধিক তৎপরতার সহিত হাদীছ কণ্ঠস্থ ও সংরক্ষণের প্রতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। অবশ্য বিশেষ কারণাধীনে উহা ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত না। কারণটি এই যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় কোরআন শরীফ ক্রমান্বয়ে নাজেল হইতেছিল এবং ব্যাপকভাবে কোরআনের প্রতিটি অক্ষর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইত। এমনকি স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সদা সর্ব্বদা চারজন বিশেষজ্ঞ লেখককে এ কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখনই কোন আয়াত নাজেল হইত তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের কোন একজনকে ডাকিয়া উহা লিপিবদ্ধ করাইতেন। এই চারজন ছাড়া আরও অনেকেই লিখিয়া রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মোসলমানই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। অবশ্য সেই যুগের রীতি অনুযায়ী অস্থি, বৃক্ষ-পত্র, প্রস্তর, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর উপরে ঐ সকল আয়াত লিখিয়া রাখা হইত। কিতাব বা পুস্তক আকারে একত্র সন্নিবেশিতরূপে লেখা হইত না। যেহেতু কোরআন শরীফ বিচ্ছিন্ন আকারে অঙ্কিত থাকিত, একত্রিতভাবে পুস্তক আকারে সুবিন্যস্ত ছিল না, সেই জন্য কোরআনকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখার অভিপ্রায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বিশেষ ব্যবস্থা ও সতর্কতামূলক পন্থা হিসাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে—কোরআন শরীফের ন্যায় ব্যাপকভাবে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকেও লিপিবদ্ধ করা সাময়িকভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ সর্ব্ব-সাধারণের ভাষা ও বক্তব্য ইত্যাদি এবং কোরআনের ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে গুণ, মর্য্যাদা ও বিশেষত্বের দিক দিয়া তারতম্য ও পার্থক্য করা যেরূপ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ ও কোরআনের মধ্যে-পার্থক্য নির্ণয় ততটা সহজ বোধগম্য ও স্পষ্ট নহে। যেমন, আরবী ভাষার গুণাগুণ ও মর্য্যাদা আলোচনার বিশেষ শাস্ত্র এল্‌মুল-বালাগাতেও এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কোরআন ও হাদীছ উভয়ের আসল উৎস-মূল একই; যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এবং ভাষাগুণও আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিশেষভাবে দান করিয়াছিলেন—اوتيت جوامع الكلم সুতরাং এইরূপ নিকটতম সৌসাদৃশ্যমূলক দুইটি বস্তু যদি একই সময়ে তাও আবার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা কিতাবের আকারে নয়, বরং সেকালের রীতি অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ধরণের চর্ম্ম-খণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড অস্থি-খণ্ড বা পত্র ইত্যাদিতে লিখিত ও সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদবস্থায় উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল। অতএব, এই সাময়িক অজুহাতের দরুন অর্থাৎ কোরআনকে পূর্ণ সতর্কতার সহিত স্বতন্ত্রভাবে প্রথমে ভালরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম ও পরিচিত করাইবার জন্য হাদীছ ব্যাপকভাবে লিখিবদ্ধ

করিতে নিষেধ করা হয়। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় এইজন্য ব্যাপকভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

বলা বাহুল্য—এই নিষেধাজ্ঞাই রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুরাগী ছাহাবীদের জন্য হাদীছ সংরক্ষণের কাজে বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রতি অধিক সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতিটি হাদীছকে অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে অত্যধিক সচেষ্ট হইলেন। এমনকি যেহেতু হাদীছ লিপিবদ্ধ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার অর্থ ছিল যে, কোরআন শরীফের ন্যায় ব্যাপকভাবে লেখা যাইবে না, সেই জন্য কোন কোন ছাহাবী হাদীছ লিখিয়া মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন এবং দরকার অনুযায়ী সুনিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)কে পুনরায় শুনাইয়া পরিপক্ক ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। ছাহাবী আনাছ (রাঃ) ও ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা বলিতেন—

هذه احاديث سمعتها من رسول الله وعرضتها عليه

"এই সমস্ত হাদীছ আমি নিজে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মুখে শুনিয়াছিলাম ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম।" আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—আমার নিকট যত বেশী হাদীছ সংরক্ষিত আছে ইহার চাইতে অধিক হাদীছ অন্য কোনও ছাহাবীর নিকট আছে বলিয়া মনে করি না। তবে হাঁ! আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট অধিক হাদীছ থাকিতে পারে; কারণ তিনি হাদীছ লিখিয়া রাখিতেন, আমি হাদীছ লিখিতে বিশেষ তৎপর ছিলাম না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ যাহা পরবর্ত্তী মোসলেম সমাজ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহার সংখ্যা ৫৩৭৪। আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজেই বলিতেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা আমার হাদীছের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমরের এই ঘটনা প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট হইতে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হাদীছ সমূহ এক একটি করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এমনকি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মুখ হইতে শ্রুত সমুদয় বার্ত্তাই কি লিখিয়া রাখিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার স্বাভাবিক অবস্থা এবং ক্রোধাবস্থা উভয় অবস্থার বার্ত্তা সবই লিখিব কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ; এবং তিনি স্বীয় ঠোঁটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই ঠোঁটদ্বয়ের মধ্য হইতে কোন অবস্থাতেই না-হক্ক কথা বাহির হয় না।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে তাঁহারই নির্দ্দেশে যে, বহু সংখ্যক হাদীছ লিখিয়াছিলেন তাহা কিতাব বা পুস্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল, সেই কিতাবের নাম ছিল—"ছাদেকাহ" সত্যের প্রতীক; যাহার হাদীছ সংখ্যা ৫৩৮৪ এরও উর্দ্ধে হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগের প্রবাহ সেই অমূল্য রত্ন পুস্তিকাখানা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু উহার সঙ্কলক আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীছ পূর্ব্ব যুগের মোহাদ্দেছগণের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত প্রায় সাত শত হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

বিশ্বের ন্যায়-বিচারক ও জ্ঞানীগণ চিন্তা করুন! দুনিয়ার কোন সাক্ষ্যদাতা কি তাহার সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুকে এরূপ তৎপরতার সহিত সংরক্ষণ করিয়া থাকে? অথচ দুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। ছাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে'-তাবেয়ীগণ বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সাক্ষ্যের দ্বারা হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা সীমাহীন ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব্ব বর্ণনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানেই হাদীছ লিখিত হইয়া থাকিত, এমনকি স্বয়ং তাঁহার আদেশে পুস্তিকা আকারেও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যাবৎ কোরআন শরীফ গ্রন্থাকারে একত্রিতরূপে সংরক্ষিত এবং উহার প্রতিটি আয়াতের সহিত মোসলমানগণ পূর্ণরূপে পরিচিত না হইয়াছিল তাবৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিষেধ অনুযায়ী হাদীছকে ব্যপকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং উহাকে পুস্তক আকারে প্রচার করার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই। বরং ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিরূপে রক্ষিত অবস্থায় এবং সাধারণ্যে পূর্ব্বালোচিত সন্দেহমুক্ত মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সূত্র-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল।

হাদীছ সংরক্ষণের দ্বিতীয় ধাপ:

তারপর যখন প্রথমে আবু বকর (রাঃ) এবং পুনরায় তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) কোরআন শরীফকে সরকারী পরিচালনাধীনে একটি পূর্ণ গ্রন্থাকারে একত্রিত করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং মোসলমানগণ দিন দিন কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সহিত পূর্ণ পরিচিত হইয়া গেলেন, এদিকে মোসলমান শাসনকর্ত্তা খলীফাগণও ইসলামী রাষ্ট্রের মুলে কুঠারাঘাতের সমস্ত রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঝামেলা হইতে মুক্ত হইলেন, তখন ৯৯ হিজরী সনে অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এন্তেকালের শতাব্দীর মধ্যেই মাত্র ৮৯ বৎসর পরে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার মহত্ব ও গুণাবলী আজ তের শত বৎসর পরেও বিশ্ব-ইতিহাসের আকাশে দীপ্ত সুর্য্যের ন্যায় উজ্জল ও ভাস্কর। এবং তাঁহার অসাধারণ গুণরাজি ও মহত্বের দরুণ বিশ্ববাসী তাঁহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় চারি-রত্ন খেলাফায়ে-রাশেদীনের সংলগ্নস্থানে অভিষিক্ত করতঃ পঞ্চম খোলাফায়ে-রাশেদীন উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

এই স্বনামধন্য মহান ব্যক্তি খলীফা হওয়ার পর, তিনি এক মহান কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোরআন শরীফ পূর্ণভাবে স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া মোসলমানদের নিকট পূর্ণ পরিচিতির আসন লাভ করিয়াছে এবং এক স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব আকারে একত্রিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহার মধ্যে আর কোন প্রকার সংমিশ্রণের আশঙ্কা আদৌ নাই। সুতরাং তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন হিসাবে সরকারীভাবে স্বীয় পরিচালনাধীনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ এবং তাঁহাদের শাগের্দগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে এবং কণ্ঠস্বরূপে রক্ষিত হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া একত্র করার কার্য্যে অগ্রণী হইলেন। যেহেতু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের প্রধান কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা, সেই জন্য খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত গভর্ণর আবু বকর ইবনে হযমকে এই আদেশ পাঠাইলেন—

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

"আমার আদেশ—আপনি তন্ন তন্ন করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক একটি হাদীছকে খুঁজিয়া বাহির করুন এবং লিপিবদ্ধ করিতে থাকুন। আমার ভয় হইতেছে, এরূপ না করিলে কালক্রমে এই জ্ঞান-ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক—ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।" (বোখারী শরীফ)

সুধীবর্গ! লক্ষ্য করুন—সেকালে বিশ্ব-মোসলেম একটি মাত্র রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। সেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বা খলীফাতুল-মোসলেমীন—তাও প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্র যেখানে সর্ব্বক্ষমতার একমাত্র অধিকারী প্রেসিডেণ্ট হইয়া থাকেন, সেই প্রেসিডেণ্ট নিজ পরিচালনাধীন স্বীয় নিযুক্ত গভর্ণরগণের নিকট এরূপ লিখিত আদেশ পাঠাইয়া যে কার্য্য পরিচানলনা করিলেন উহা যে কি ধরণের হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর প্রথম শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই হাদীছ সমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধের যুগ আরম্ভ হইল এবং সরকারী পরিচালনাধীনেই তাহা আরম্ভ হয়। কথিত আছে—الناس على دين ملوكهم "রাষ্ট্রের নীতি ও গতির দ্বারা অন্যান্য সমস্ত জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে"। সুতরাং সমগ্র মোসলেম জাতিই এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল এবং ঘরে ঘরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ খোঁজ করতঃ সাক্ষ্যদাতাদের নিকট হইতে হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কার্য্যে ব্যপক সাড়া পড়িয়া গেল। মদীনাবাসী ইমাম মালেক হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আহমদ ইবনে-হাম্বল, ইমাম আওযায়ী, ইমাম যোহ্‌রী, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাছায়ী, প্রমুখ শত শত বিশিষ্ট ইমামগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ সমুহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মোয়াত্তা" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেক ইমামের কিতাবই আজ বার শত বৎসরের অধিক কাল হইতে বিশ্বের বুকে গ্রহণীয় হইয়া আসিতেছে।

সেই যুগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ খুঁজিয়া বাহির করার কিরূপ প্রেরণা মোসলেম সমাজে জাগিয়াছিল তাহার নমুনা বোখারী শরীফের ১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছের ঘটনা পাঠ করিলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঘটনাটি এই—একজন লোক একটি মাত্র হাদীছের জন্য স্বীয় আবাসভুমি মদীনা হইতে প্রায় ৬০০ শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দামেস্ক শহরে আবুদ্-দারদা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হাজির হইলেন, ঐ একটি মাত্র হাদীছে-রসুল ছাহাবীর মুখে শুনিয়া আসাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ছায়ীদ ইবনে-মোছাইয়েব—বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদ্দেছ বলেন, আমি এক একটি হাদীছের তালাশে একাধারে কয়েক দিন ও কয়েক রাত্র ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছি।

আবুল-আলীয়া নামক মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের যুগের হাদীছ পিপাসুগণের এরূপ পিপাসা ছিল যে, তাঁহারা বছরা শহরে বসিয়া তথাকার লোক মারফৎ কোন

একটি হাদীছ লাভ করার পর যদি শুনিতে পাইতেন যে, এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী এখনও মদীনায় জীবিত আছেন ; তবে সরাসরি ঐ ছাহাবীর মুখে হাদীছটি শুনিবার উদ্দেশ্যে বছরা হইতে সুদূর মদীনায় উপস্থিত হইতেন। বছরা হইতে মদীনার দূরত্ব প্রায় ৪ শত মাইল। তদুপরী স্বয়ং ছাহাবীদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাও লক্ষ্য করুন—বোখারী শরীফের ১৭ পৃঃ বর্ণিত আছে, ছাহাবী জাবের (রাঃ) স্বয়ং ছাহাবী হইয়াও একটি মাত্র হাদীছ হাসিল করার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং জাবের (রাঃ) উক্ত ঘটনার বিবরণ দানে বলিয়াছেন, লোক মুখে শুনিতে পাইলাম, সিরিয়ায় অবস্থিত একজন ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে একটি বিশেষ হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই খবর শুনামাত্র আমি একটি উষ্ট্র ক্রয় করিলাম এবং উহার উপর সওয়ার হইয়া দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করতঃ মদীনা হইতে সিরিয়ায় পৌঁছিলাম। খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম ঐ ছাহাবী—আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস আনছারী (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি লোক মারফৎ এই খবর পাঠাইলাম যে, জাবের আপনার দ্বারে অপেক্ষারত দণ্ডায়মান। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি আবদুল্লার পুত্র জাবের? আমি বলিলাম—হাঁ। এই খবর শুনা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ ছাহাবী বাহির হইয়া আসিলেন, আমরা উভয়ে কোলাকুলি করিলাম এবং বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি বিশেষ একখানা হাদীছ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা শুনিবার জন্য মদিনা হইতে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি, কারণ ঐ হাদীছখানা আমি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিতে পারি নাই। অতঃপর সেই ছাহাবী ঐ হাদীছখানা আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। (জামেউল-বয়ান ১৩ পৃঃ)

এইরূপে আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ), আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং আরও ছাহাবীর নামে অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁহারা স্বীয় কণ্ঠস্থ হাদীছের এক একটি বাক্য শুদ্ধির জন্য মদীনা হইতে মিশরে অবস্থানকারী সঙ্গী ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়াছেন। আমরা এ ধরণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া কল্পনা করিব, কারণ ইসলামের প্রাণবস্তু—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আমাদের হ্রাস পাইয়াছে।

সেই যুগের ইমামগণ এইরূপভাবে শত শত, হাজার হাজার, সাক্ষ্যদাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লক্ষ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই লক্ষ লক্ষ সংগৃহীত হাদীছ হইতে সূক্ষ্মতমরূপে বাছিয়া এক একখানা হাদীছ-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১০,০০০০০ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বাছিয়া ৩০,০০০ হাদীছ সম্বলিত একখানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বোখারী (রঃ) ছয় লক্ষেরও অধিক হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮০০জন সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে প্রায় ৪০০০ হাদীছ বাছিয়া একত্রিত করিয়া বক্ষ্যমান গ্রন্থ "ছহীহ্-বোখারী" সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, ইহারও মূল হইল শুধু মাত্র ২৬০২ বা ২৫১৩টি হাদীছ।* এইরূপে বহু সংখ্যক হাদীছ গ্রন্থ আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে।

ইমাম বোখারীর শিক্ষকতায় ৯০ হাজারেরও অধিক লোক বোখারী শরীফ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে এক লক্ষ লোক তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(* নোটটি পর পৃষ্ঠার নীচে দেখুন)

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে

হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্ব-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত ইমাম বোখারীর আসল নাম ছিল—মোহাম্মদ। তিনি পরিচিত ছিলেন—আবু আবদুল্লাহ নামে। পিতার নাম ছিল—ইসমাঈল, পিতামহের নাম ছিল ইব্রাহীম, প্রপিতামহের নাম ছিল—মুগীরা। ১৯৪ হিজরী ১৩ শওয়াল শুক্রবার, জুমার নামাযের বাদ তিনি বোখারা শহরে ভূমিষ্ট হন। ২৫৬ হিজরী ১লা শওয়াল শনিবার রাত্রে (শুক্রবার দিবাগত রাত্রে) সমরকন্দের অন্তর্গত খরতঙ্গ নামক গ্রামে ইহ-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পর দিন (ঈদের দিন) জোহরের নামাযান্তে সেই গ্রামেই সমাহিত হন। তাঁহার বয়স তখন ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর ছিল। মৃত্যুকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন, প্রপিতামহ মুগীরা পারস্য হইতে খোরাসানের বোখারা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই ইমাম বোখারীর পিতা মারা গিয়াছিলেন। তিনি মাতার নিকটই প্রতিপালিত হন। আহমদ নামে তাঁহার বড় এক ভ্রাতা ছিলেন। ইমাম বোখারীর পিতাও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইমাম বোখারীর উপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত দেখা যাইতে ছিল। ইমাম বোখারী বাল্যাবস্থায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার মাতা সে জন্য আল্লার দরবারে দোয়া করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)কে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি বলিতেছেন—তোমার কান্নাকাটির দরুণ আল্লাহ তায়ালা তোমার ছেলের চক্ষু ভাল করিয়া দিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিতে পাইলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি লেখা-পড়া আরম্ভ করার পর দশ বৎসর বয়সে আমার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এল্‌হাম হয় যে, আমি যেন হাদীছ কণ্ঠস্থ করায় তৎপর হই। তখন হইতেই আমি অন্য সব ছাড়িয়া হাদীছ শিক্ষার প্রতি ধাবিত হইলাম। হাদীছ শিক্ষার জন্য সিরিয়া, মিশর, আল-জাযায়ের, বছরা, কুফা, বাগদাদ, হেজাজ ইত্যাদি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিলাম। ১৮ বৎসর বয়সে আমি বিবিধ গ্রন্থ সঙ্কলনে ব্যাপৃত হই। মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্ত্তী

---

* ৪০০০ এবং ২৬০২ সংখ্যাদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, এস্থলে দুইটি জিনিষ—একটি হইল মূল হাদীছ তথা রসুলের বাণী ইত্যাদি, দ্বিতীয়টি হইল উক্ত হাদীছের সাক্ষ্যদাতাগণের নামের ফিরিস্তি তথা সনদ। বলা বাহুল্য—একটি হাদীছের বিভিন্ন সনদ থাকে, এমনকি এক একজন সাক্ষ্যদাতার বিভিন্নতায় একটি মূল হাদীছের এক এক শত সনদও হইয়া থাকে। হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় মূল হাদীছ ও সনদের সমষ্টিকে হাদীছ বলা হয়; এই সুত্রে একটি মূল হাদীছ এক শত বা ততোধিক হাদীছ পরিগণিত হইতে পারে। মোহাদ্দেছগণের সংগৃহীত হাদীছের যে সংখ্যা বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা এই পরিভাষার ভিত্তিতেই। বোখারী শরীফে মূল হাদীছের সংখ্যা ২৬০২ কাহারও গণনায় ২৫১৩। উক্ত সংখ্যক মূল হাদীছই পরিভাষিক সঙ্গা মতে প্রায় ৪০০০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে বহু সংখ্যক হাদীছ একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; প্রত্যেক স্থানের হাদীছকে ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে বোখারীর হাদীছ সংখ্যা হইবে ৭২৭৫।

স্থানে বসিয়া, হাদীছের সাক্ষ্যদাতা বা রাবীগণের জীবনেতিহাস রচনায় একখানা কিতাব সঙ্কলন করি। ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৬ বৎসর বয়সে নিশাপুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হাদীছের দরস বা শিক্ষা দান করিতেন। দেশময় সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল; ইহাতে তথাকার কোন কোন মানুষের মধ্যে একটু রেশা-রেশির ভাব উদিত হইল। তাই বোখারী (রঃ) নিশাপুর ত্যাগ করতঃ বোখারার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের জনগণ ইমামকে পুনরায় স্বদেশে পাইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত রাজ্যের শাসনকর্ত্তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

ঘটনা এই ছিল যে—খালেদ ইবনে আহমদ নামক বোখারার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা ইমাম বোখারীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, স্বয়ং তিনি বা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইমাম বোখারীর সঙ্কলিত কিতাব অধ্যয়ন করিতে চাহেন। ইমাম বোখারী যেন সেই শাসনকর্ত্তা—আমীরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া এই কার্য্য সমাধা করেন। বোখারী (রঃ) পরিষ্কার জানাইলেন—

انی لا اذل العلم ولا احمله الی ابواب السلاطین فان کانت له حاجة الی شیء منه فلیحضرنی فی مسجدی اوفی داری فان لم یعجبك هذا فانت سلطان فامنعنی من المجالس لیکون لی عذر عند الله یوم القیامة انی لا اکتم العلم -

"দেখুন! আমি কখনও এলেমকে অপমাণিত ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিব না। (লক্ষ লক্ষ গরীব জন সাধারণকে উপেক্ষা করিয়া) এই মহান রত্ন—এল্‌মকে আমীর-ওমরাদের দরওয়াজার প্রত্যাশী বানাইতে পারিব না। অতএব আমীর সাহেব যদি এল্‌মের প্রতি অনুরাগী ও আকৃষ্ট থাকেন তবে তিনি যেন আমার মসজিদ বা বাড়ীতে উপস্থিত হন। আর যদি তিনি আমার এই ব্যবস্থাবলম্বনে অসন্তুষ্ট হন এবং আমার শিক্ষাদান কার্য্যে বাধা প্রদানের মনস্থ করেন তবে আমি সে বিষয় আদৌ শঙ্কিত নহি। কারণ, তাঁহার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যদি আমার এই কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় তবে আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বলিয়া ক্ষমার্হ গণ্য হইতে পারিব যে—আমি স্বেচ্ছায় এল্‌ম চর্চ্চা বন্ধ করিয়া দেই নাই।"

শাসনকর্ত্তা আমীর এই নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনার দ্বারা সুফল লাভ না করিয়া কুফলের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং শুধু নিজেরই নহে বরং সমস্ত বোখারাবাসীদের দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিলেন। তিনি ইমাম বোখারীর এই ন্যায় সঙ্গত উত্তরে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণে বোখারী (রঃ)কে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিলেন।

হাদীছে-কুদসীতে আছে— من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত শত্রুতা ধারণ করে, তাহার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি!" এখানে ঠিক তাহাই হইল—ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই কিছু দিনের মধ্যে আল্লার অভিশাপে পতিত হইল। কিন্তু ইমাম বোখারী আর দেশে রহিলেন না। তিনি বোখারা হইতে "বাইকান্দ" নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময় সমরকন্দের লোকেরা ইমাম বোখারী (রঃ)কে সমরকন্দ

আগমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। সেমতে তিনি সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে খরতঙ্গ নামক গ্রামে যেখানে তাঁহার কিছু আত্মীয়-স্বজনের বসবাস ছিল, তথায় তিনি অবস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি সমরকন্দ মুখী পুনঃ যাত্রা করিবেন—এমতাবস্থায় সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার আগমন সম্পর্কে সমরকন্দবাসীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেই যাত্রা ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত ঘটনা সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের পর এই বলিয়া আল্লাহকে ডাকিলেন—

اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت فاقبضنى اليك

"হে আল্লাহ! এই সুপ্রশস্ত জগৎ আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব হে প্রভু, তুমি আমাকে আপন কোলে উঠাইয়া লও।" আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব—বোখারীর এই ডাক ব্যর্থ হইতে দিলেন না। তাঁহার আবদার পুরণ করা হইল এবং মাত্র এক মাসের মধ্যেই হাদীছ শাস্ত্রের সুনির্ম্মল গগণ হইতে এই জ্যোতিষ্মান সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল।

رحمه الله تعالى و ادخله جنة الفردوس

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আদম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন—এক রাত্রে আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি স্বীয় ছাহাবীগণের এক জমাত সহ এক স্থানে অপেক্ষমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি কাহার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের অপেক্ষা করিতেছি। স্বপ্ন বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন পরে যখন আমি ইমাম বোখারীর মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমি যে সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়ই ইমাম বোখারীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইমাম বোখারীর পবিত্র আত্মা ইহকাল ত্যাগ করিয়া পরকালের অতিথি হইলে পর স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া এই অতিথির অভ্যর্থনা করেন। হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই দেখিয়া থাকে; কেননা শয়তান কখনও আমার রূপ ধারণ করিতে পারে না।

গালেব ইবনে জিব্রিল নামক খরতঙ্গ গ্রামবাসী—ইমাম বোখারী (রঃ) যাঁহার অতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—ইমাম বোখারীকে কবরের মধ্যে রাখা মাত্রই কবরের চতুষ্পার্শ্বে মেশ্‌কের ন্যায় সুঘ্রাণ ও সুবাস ছড়াইতে লাগিল এবং ঐ সুবাস বহুদিন স্থায়ী ছিল। দেশ-বিদেশের লোক জেয়ারতের জন্য আসিয়া তথাকার মাটি নেওয়া আরম্ভ করিল, এমনকি আমরা অবশেষে ঐ কবরকে মজবুত বেষ্টনী দ্বারা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম।

ইমাম বোখারী স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে একদা স্বপ্নে দেখিলাম—আমি একটি পাখা হাতে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া

রহিয়াছি এবং ঐ পাখার দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে মশা-মাছি ইত্যাদি হটাইয়া রাখিতেছি। ভাল একজন তা'বীর বর্ণনাকারীর নিকট এই স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি এমন কোন কাজ করিবে যদ্দারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মৌজু' বা জাল ও মিথ্যা হাদীছের সম্বন্ধ করার মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমার মনে প্রেরণা জাগিল যে, আমি এমন একখানা কিতাব লিখিব যাহার মধ্যে সন্দেহমুক্ত ছহীহ্ হাদীছই থাকিবে; যে হাদীছ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিবে উহা গ্রহণ করিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া আমি পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদে-হারামে বসিয়া এই কিতাব লিখিতে আরম্ভ করি।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই কিতাবের মধ্যে প্রতিটি হাদীছ এতদূর সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতা, জ্ঞান, এল্‌ম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিটি হাদীছকে সূক্ষ্মরূপে বাছিয়া ও পরখ করিয়া লওয়ার পরেও প্রত্যেকটি হাদীছ লিখিবার পূর্ব্বে গোছল করতঃ দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এস্তেখারা করার পর যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই হাদীছটি সন্দেহ-লেশহীন ও ছহীহ্ তখনই আমি উহাকে আমার এই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, ইহার পূর্বে নহে। এই কিতাবের পরিচ্ছেদ সমূহ পবিত্র মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্ত্তী বসিয়া সাজাইয়াছি এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদ লিখিতেও দুই দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। এইরূপে আমি স্বীয় কণ্ঠস্থ ছয় লক্ষ হাদীছ হইতে বাছিয়া ষোল বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছি—এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে, আমি যেন এই কিতাবখানাকে লইয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হইতে পারি।

আরও কতিপয় শুভ স্বপ্ন ঃ

নজম ইবনে ফোজাইল নামক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় রওজা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে হাঁটিতেছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যে যে স্থানে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন ইমাম বোখারী তাঁহার পিছনে ঠিক ঠিক ঐ স্থান সমূহে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন। বোখারা নিবাসী আবু হাতেম নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন।

ইমাম বোখারীর একজন বিশিষ্ট শাগের্দ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট যাইতেছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহাকে আমার সালাম বলিও।

আবু যায়েদ মারওয়াযী নামক প্রসিদ্ধ একজন মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি পবিত্র কা'বা-ঘরের সংলগ্ন স্থানে শুইয়াছিলাম, তদবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিতেছেন, হে আবু যায়েদ। তুমি কত কাল ইমাম শাফেয়ীর কিতাব পড়াইতে থাকিবে, আমার কিতাব পড়াও না কেন? আমি আরজ করিলাম—হুজুর! আপনার কিতাব কোন্‌টি? হযরত (দঃ) উত্তরে ফরমাইলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল যে কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছেন উহাই আমার কিতাব।

একটি জিজ্ঞাসার উত্তর

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ ইং মর্নিংনিউজ ইংরাজী দৈনিকে বাংলা অনুবাদ বোখারী শরীফের মুখবন্ধ হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি লইয়া কুমিল্লার জনৈক মুসলিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইমাম বোখারী তাঁহার সংগৃহিত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে অত্র গ্রন্থে অল্প সংখ্যক হাদীছ গ্রহণ করিলেন অপরগুলি বাদ দিলেন কেন?

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং তারিখের দৈনিক আজাদে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হইয়াছিল; পাঠকদের উপকারার্থে নিম্নে উহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। মূল প্রশ্নের উত্তরে যে সব তথ্যের আবশ্যক প্রথমে তাহা ক্রমিক নম্বরে বর্ণনা করা হইতেছে—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে হাদীছ উহাই যাহা রসুলে করীম (দঃ)-এর তরফ হইতে আসিয়াছে। আর রসুলে করীমের তরফ হইতে পাওয়া গিয়াছে—সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত ঐরূপ একটি বাক্যও উপেক্ষা করার অবকাশ মোসলমানের জন্য নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে সাক্ষীগণ তথা রাবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে যাহা কিছু বর্ণনা করেন প্রাথমিক আলোচনায় ঐ সবকেই হাদীছ আখ্যায় ব্যক্ত করা হয়।

(২) দুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, কোন কোন সাক্ষ্য মিথ্যা কৃত্রিম, জালও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজুহাতে সত্য সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করিলে জগত অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং সব সাক্ষ্য গ্রহণ করাও যায় না আবার সব সাক্ষ্য উপেক্ষা করাও যায় না। বরং সত্যের মাপকাঠিতে সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে বাছনী করিতে হয়।

(৩) বহু সংখ্যক সাক্ষ্যের বাছনী করিতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই উহার মধ্যে বিভিন্ন রকম ও প্রকার পরিলক্ষিত হইবে যথা—সত্য ও বিশুদ্ধ সাক্ষ্য, মিথ্যা ও জাল সাক্ষ্য এবং দুর্ব্বল সাক্ষ্য—এর মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণী পাওয়া যাইবে।

হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণ চুলচেরা বিচারে হাদীছ প্রাপ্তির সাক্ষ্য বাছনির মধ্যে নিম্ন রকম বিভক্তি করিয়াছেন। সাক্ষ্যদাতার গুণাবলী ও উহার মান এবং সাক্ষ্য প্রদানের সুষ্ঠুতার ভিত্তিতেই এই বিভক্তি যথা—(ক) যে সাক্ষ্যে সত্য ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠির সমুদয় গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় এবং উচ্চমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (খ) যে সাক্ষ্যে ঐ গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু সাক্ষ্যদাতার স্মৃতিশক্তি ঐ শ্রেণীর উচ্চমান অপেক্ষা কিঞ্চিত হাল্‌কা। (গ) যে সাক্ষ্যের মধ্যে ঐসব গুণাবলীর অভাব রহিয়াছে, কিন্তু মিথ্যা গণ্য হওয়া বা সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোন হেতু তথায় নাই। (ঘ) যে সাক্ষ্যের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন ত্রুটি বা হেতু রহিয়াছে। (ঙ) যে সাক্ষ্যে এমন কোন সাক্ষ্যদাতা রহিয়াছে যাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে নয়, কিন্তু অন্য কোথাও মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে। (চ) যে সাক্ষ্যে এমন কোন সাক্ষ্যদাতা রহিয়াছে যাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনায় সারা জীবনে একবারও কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে—এইরূপ ব্যক্তি হাজার তওবা করিলে তাহার সাক্ষ্যে কখনও কোন একটি হাদীছও গ্রহণীয় হইবে না।

(৪) সাক্ষ্যের প্রকার ও শ্রেণী বিভক্তির দ্বারাই পরবর্ত্তী লোকদের জন্য হাদীছরূপে প্রাপ্ত বর্ণনা সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—"ক" গ্রুপের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হাদীছ

সমূহকে ছহীহ্ (বিশুদ্ধ) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ এইগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবেই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। "খ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছ (ক) গ্রুপের নিকটবর্ত্তীই কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরে: এই হাদীছকে হাছান (ভাল) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ ইহা সম্পর্কেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে, ইহা রসুলুল্লারই (দঃ) হাদীছ। "গ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে জয়ীফ (দুর্ব্বল) তথা দুর্ব্বল প্রমানে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "ঘ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মরদুদ—উপেক্ষণীয়, মোন্‌কার—অগ্রহণীয়, মোয়াল্লাল—ত্রুটিযুক্ত প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "ঙ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মত্‌রুক—বর্জ্জনীয় প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "চ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মৌজু'—জালিয়াত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়।

(৫) কালেক্‌সন—সংগ্রহ করা, ভেরীফিকেশন—বাছনি করা, সিলেক্সন—গ্রহণ করা এইসব ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কাজ। সংগ্রহের সময় মোহাদ্দেছগণ সাধারণতঃ হাদীছ নামে প্রচারিত ও বর্ণিত অনেক কিছুকেই কুড়াইয়া লইতেন; সংগ্রহের স্বাভাবিক নিয়মও তাহাই। অতঃপর বাছনি ও গ্রহণের সময় এক এক মোহাদ্দেছ এক এক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই নীতি পালনের মাধ্যমেই সংগৃহীত সংখ্যার বিরাট অংশ খশিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য—উক্ত নীতির কঠোরতার তারতম্যের ভিত্তিতেই বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদের নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্ম কৃত্রিম, বর্জ্জনীয়, উপেক্ষণীর ও দুর্ব্বল শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টেই হাদীছ নামে বর্ণিত বহু বর্ণনাকে জয়ীফ, মৌজু', মোন্‌কার, মত্‌রুক ইত্যাদি নামের আখ্যা দেওয়া হয় এবং ঐ সবকে এড়াইয়া চলা হয়। নতুবা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত একটি অক্ষরকেও ঐরূপ আখ্যার দ্বারা স্পর্শ করা মোসলমানের পক্ষে অসম্ভব।

(৬) ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার সংগৃহিত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে বাছনি করিয়া শুধু ঐ হাদীছ সমূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন যাহা "ক" গ্রুপের সাক্ষ্যে প্রমাণিত, অন্য কোন গ্রুপের হাদীছকে তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে শামিল করেন নাই; তার ফলেই ইমাম বোখারীর সর্ব্ব মোট সংগৃহিত হাদীছের সংখ্যা এবং এই গ্রন্থের গৃহিত হাদীছের সংখ্যা—উভয় সংখ্যায় বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে এবং এত বড় কঠোর বাছানিই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ একজন স্বর্ণকার বা স্বর্ণবণিক তাহার পেশাগত সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া হাজার হাজার স্বর্ণ খণ্ডের মান নির্ণয় ও বাছনি করতঃ অল্প সংখ্যক খণ্ড গ্রহণ করে। তাহার সেই পেশাগত দীর্ঘ সাধনায় অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার বাছনি কার্য্যের রহস্যকে পত্র-পত্রিকা মারফৎ হাতড়ানো যে বৃথা চেষ্টা তাহা অতি সুস্পষ্ট। হাদীছ শাস্ত্র ত কত মহান, কত উর্দ্ধের, কত সুক্ষ্ম, কত গভীর, কত প্রশস্ত এবং কত বিস্তীর্ণ! এই বিশাল ময়দানে ঐরূপ উদ্যোগ গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করি।

—→(০)←—

সূচী-পত্র

তৃতীয় অধ্যায়—অজু

বিষয়	পৃষ্ঠা
উত্তমরূপে অজু করা	১৮২
উভয় হাতে মুখ ধুইবে	১৮৩
প্রত্যেক কাজের আরম্ভে বিছমিল্লাহ বলা	”
স্ত্রী-সহবাসের দোয়া	”
পায়খানায় যাইতে কি দোয়া পড়িবে	১৮৪
মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেবলামুখী হইবে না	”
পা-দানিতে বসিয়া মল ত্যাগ করা	১৮৫
মল ত্যাগে নারীদের প্রান্তরে যাওয়া	”
পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা	১৭৮
ডান হাতে এস্তেঞ্জা করিবে না	”
কুলুখ ব্যবহার করা চাই	১৮৮
লিদ দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করা নিষেধ	”
অজুর অঙ্গসমূহ ধুইবার পরিমাণ	”
পূর্ণাঙ্গ অজুর পর নামাযের ফজিলত	”
নাকে পানি দেওয়া	১৯০
পায়ের গোড়ালী ভালরূপে ধৌত করা	১৯১
চাপ্পলের মধ্যে পা ধৌত করা	”
ডান দিকের কাজ প্রথম করিবে	১৯২
অজুর জন্য যথাসাধ্য পানি তাল্লাস করিবে	”
একটি মোজেযা	”
চুল ভিজান পানি পাক	”
কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে কি করিবে	১৯৩
একটি কুকুরের প্রতি দয়ার সুফল	”
মল-মুত্র দ্বারে কিছু বাহির হইলে	১৯৪
নামাজের অপেক্ষায় থাকার ফজিলত	১৯৫
অজুর মধ্যে সাহায্য গ্রহণ করা	”
বে-অজু কোরআন পড়া জায়েব	”
মাথায় ক্রে আসার দরুণ অজু নষ্ট হয় না	”
সম্পূর্ণ মাথা মাছেহ করা	১৯৬
অজুর ব্যবহৃত পানি ব্যবহার করা	”
মেয়েলোকের ব্যবহৃত অবশিষ্ট পানি	১৯৮
অজুর পানির বরকত	”
বিভিন্ন পদার্থের তৈরী পাত্রে অজু করা	”
একটি মোযেজা	”
এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা	১৯৯
চামড়ার মোজার উপর মছেহ করা	”
গোস্ত খাইলে অজু নষ্ট হইবে না	”
ছাতু, দুগ্ধ খাইয়া কুলি করিবে	২০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তন্দ্রা দ্বারা অজু নষ্ট হয় না	”
অজু থাকাবস্থায় পুনঃ অজু করা	২০১
প্রস্রাব হইতে পূর্ণ সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ	২০১
প্রস্রাবান্তে পানি ব্যবহার করা আবশ্যক	”
মাটির উপর প্রস্রাব করা হইলে	২০২
শিশুর প্রস্রাবও নাপাক	”
কাহাকেও নিকটে রাখিয়া প্রস্রাব করা	২০৩
দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা কিরূপ ?	”
রক্ত লাগিলে তাহা ধুইতে হইবে	২০৪
কাপড়ে বীর্য লাগিলে কি করিবে ?	”
হালাল জানোয়ারের প্রস্রাব	”
তরল পদার্থে নাপাকি পড়িলে	২০৫
অপ্রবাবিত পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ	২০৬
নামায অবস্থায় নাপাকির সংস্পর্শন	”
থুথু শ্লেষ্মা নাপাক নয়	২০৭
মাদকীয় পদার্থ দ্বারা অজু হয় না	২০৮
দরকার বশতঃ মেয়ে পিতার শরীর স্পর্শ করিতে পারে	”
মেছওয়াক করা	”
অজু অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত	২০৯
শয়নকালের দোয়া	”

চতুর্থ অধ্যায়—গোসল

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোসল	২১০
গোসলের পূর্ব্বে অজু করা	২১১
স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল করা	”
গোসলের পানির পরিমাণ	”
গোসলে তিনবার মাথায় পানি ঢালা	”
পূর্ণ শরীরে একবার পানি ঢালা	২১২
দুধের হাড়ির পানিতে গোসল করা	”
নাপাকি ছাফ করার পর হাত ধোয়া	”
হাত পাক থাকিলে ধোয়ার প্রয়োজন নাই	”
একাধিক বার স্ত্রী সঙ্গমের পর গোসল	২১৩
পূর্ব্বের সুগন্ধি থাকিলেও গোসল হইবে	”
ফরজ গোসল ভুলিয়া মসজিদে আসিলে	”
প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধুইবে	২১৪
নির্জ্জন স্থানে উলঙ্গ হইয়া গোসল করা	”
নির্জ্জন স্থান না হইলে পর্দ্দা করিবেই	”

আজানের বিবরণ

অনুবাদক হইতে ইমাম বোখারী (রঃ) পর্য্যন্ত বোখারী শরীফের সনদ*

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রঃ)

১। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাব্রী (রঃ)
২। " আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ সরখ্সী (রঃ)
৩। " আবদুর রহমান ইবনে মুজাফ্ফর দাউদী (রঃ)
৪। " আবদুল আউয়াল ইবনে ঈসা সিজযী (রঃ)
৫। " আস-সেরাজুল হোসাইন ইবনুল মোবারক যবীদী (রঃ)
৬। " আবুল আব্বাস—আহমদ ইবনে আবু তালেব (রঃ)
৭। " ইব্রাহীম ইবনে আহমদ তন্নুখী (রঃ)
৮। " শেহাবুদ্দীন—আহমদ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ)
৯। " যায়নুদ্দীন—যাকারিয়া আনছারী (রঃ)
১০। " শামছুদ্দীন রমলী (রঃ)
১১। " আহমদ ইবনে আবদুল কুদ্দুস শান্নাবী (রঃ)
১২। " আহমদ আল-কোশাশী (রঃ)
১৩। " ইব্রাহীম আল-কুর্দী (রঃ)
১৪। " আবু তাহের—মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রঃ)
১৫। " শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)
১৬। " আবদুল আজীজ দেহলভী (রঃ)
১৭। " মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (রঃ)
১৮। " আবদুল গণী মোজাদ্দেদী (রঃ)**
মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (রঃ)—১৯। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব (রঃ)
শায়খুল-হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রঃ)—২০। মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ)
মাওঃ শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)—২১। মাওঃ জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)

আজিজুল হক

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমি বোখারী শরীফের অধ্যাপনা দুই জন ওস্তাদ হইতে লাভ করিয়াছি। একজন শায়খুল-ইসলাম শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ), অপর জন মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)। সেমতে উভয় ওস্তাদের সনদই বর্ণনা করা হইল। অবশ্য উভয় সনদই ঊর্দ্ধমুখী চতুর্থ ধাপে তথা শাহ আবদুল গণী মোজাদ্দেদীর উপর মিলিত হইয়াছে।

** তিনি শাহ ওলীউল্লাহ-খান্দানের শাহ আবদুল গণী নহেন। বরং তিনি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহে আলাইহের খান্দানের।

আরম্ভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং

السَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ●

সালাম সমস্ত নবী ও রসুলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্ব্বশেষ নবী তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাও তোমার কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্ব্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن !!!

আমীন। আমীন!! আমীন!!!

রহমানুর রহীম আল্লার নামে—

রসুলুল্লাহ (দঃ)এর প্রতি অহী এবং উহার প্রাথমিক অবস্থা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهٖ

"আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছিলাম।" অর্থাৎ মানব জাতির সংস্কার ও জীবন গঠনের যে নীতি ও আদর্শ আপনার নিকট প্রেরণ করা হইতেছে এর ছেলছেলাহ্ বা ক্রমানুবর্ত্তন হযরত নূহ (আঃ) হইতে শুরু হইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী নবীগণের প্রতি যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ভাবে আপনার প্রতিও আসিয়াছে। আল্লার তরফ হইতে এরূপ নীতি ও আদর্শ নাযেল হওয়া নূতন বিষয় নহে, যাহা দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে।

হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের প্রতি অহী সাধারণতঃ জাগতিক প্রয়োজন ও জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্য-পদ্ধতি শিক্ষা দানের বিষয়েই বেশী মাত্রায় অবতীর্ণ হইত, ধর্ম্মীয় বিষয় মোটামুটি ও মৌলিক আকারে থাকিত। ইহজীবনেই পরকালের অধিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা—শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ ও আহকাম নূহ (আঃ) হইতেই নাযেল হওয়া আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সম্পূর্ণতা লাভ করে, তাই এখানে হযরত নূহের প্রতি প্রেরিত অহীর তুলনাই উল্লেখ করা হয়েছে।

১। হাদীছ ঃ— عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمعت

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ - وَاِنَّمَا

لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ

اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ

يَتَـزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ*

অর্থ—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় জানিও—আল্লার নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়্যত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তাহার কাজের ফলাফল আল্লার নিকট তদ্রূপ পাইবে যদ্রূপ সে নিয়্যত করিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আল্লার রসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে, সে আল্লার এবং রসূলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই পাইবে। পক্ষান্তরে এত বড় কষ্টের নেক কাজটিও ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন হীনস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া করিলে—যেমন, কিছু টাকার লোভে বা কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার এবং কামরিপু চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে করিলে তাহার ফল তদ্রূপই সে পাইবে যদ্রূপ সে নিয়্যত করিয়াছে।

নিয়্যত অর্থ ঃ—মনে মনে চিন্তা করতঃ উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া কাজ করা।

হিজরত অর্থ ঃ—যে কোন স্থানে, যে কোন সংসর্গে বা যে কোন পরিবেশে থাকিয়া আল্লার দীন পালন করা দুষ্কর হইয়া পড়িলে আল্লার আদেশ মতে সেই স্থান, সেই সংসর্গ, সেই পরিবেশ পরিত্যাগ করা। প্রথম যুগে মোসলমানগণ মক্কায় তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আল্লার তরফ হইতে তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে। এই মহান কাজকে কোরআন-হাদীছের ভাষায় "হিজরত" বলা হয়।

সরল ব্যাখ্যা ঃ—মানুষ যখনই কোন কাজ করে, সে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য মনে মনে ঠিক করিয়া ঐ কাজের প্রতি অগ্রসর হয়—ইহা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তাহার কর্ম্মের ফলাফল আল্লার নিকট পাইবে। যেমন, "হিজরত" অতি বড় পুণ্যের কাজ—অতি কঠোর ফরজ কাজ ; এতে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী সবকিছু পরিত্যাগ করিতে হয়। কোরআন-হাদীছে হিজরতের অনেক ছওয়াব, অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি সবকিছু পরিত্যাগ করতঃ এই কঠিন আমলের জন্য প্রস্তুত হইবে, নিশ্চয় সে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়া অগ্রসর হইবে। যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় এই মহান ত্যাগের দ্বারা আল্লাকে এবং আল্লার রসূলকে সন্তুষ্ট করা এবং মদীনাতে থাকিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, তবে সে তাহার এই কর্ম্মের ফল তাহার উদ্দেশ্য ও নিয়্যত অনুসারেই পাইবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও ফজিলতের অধিকারী হইবে, আল্লার নিকট

* এই হাদীছ খানা বোখারী শরীফের সাত জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে হাদীছ খানা অসম্পূর্ণ উল্লেখ হওয়ায় ৯৯৯ পৃঃ হইতে সম্পূর্ণ হাদীছ খানা এখানে উদ্ধৃত হইল।

বড় মর্ত্তবা পাইবে, তাহার এই দেশত্যাগ সার্থক হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়া হিজরত করিবে, যেমন সুখ্যাতি লাভ করা, টাকা উপার্জ্জন করা, কোন রমণীর প্রেম করা বা এই জাতীয় অন্য কোন হীনস্বার্থ হাসিল করা, সে কোনরূপ ছওয়াব বা ফজিলত পাইবে না, বরং আল্লার নিকট তাহার হিজরত অনর্থক হইবে। যেরূপ নানারকম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করা হয়, তাহার জন্য মদীনায় আসাও তদ্রূপই গণ্য করা হইবে। আল্লার নিকট হিজরতরূপে গৃহিত হইবে না। এত কষ্ট, এত ত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়্যত খালেছ ও শুদ্ধ না হওয়ার কারণে আল্লার নিকট এত কঠিন আমলেরও কোন মুল্য হয় না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে হিজরতকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, হিজরত এত বড় মহৎ কাজ ও মহান ত্যাগ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিয়্যতের তারতম্যের কারণে তাহার ফলাফলেও কতদুর পার্থক্য হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেকটি কাজেই নিয়্যতের তারতম্যের কারণে পার্থক্য থাকিবে। যেমন— অন্য এক হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (একদল লোক হইতে) সর্ব্বপ্রথম বিচারের জন্য কেয়ামতের দিন এমন একজন লোককে হাজির করা হইবে, যে স্বীয় জীবন কোরবান করিয়া শহীদ হইয়াছিল। সে আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত নেয়ামতসমূহ উপভোগ করিয়াছে (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, আগুন, পানি, মাটি বাতাস, আহার, নিদ্রা, বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ ইত্যাদি) সেই সমস্ত তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি এই সমস্ত নেয়ামতের শোকর কি করিয়াছ ? শোক্‌রিয়া স্বরূপ কি কি কাজ করিয়াছ ? সে উত্তর করিবে, হে প্রভু! আমি তোমার দীনের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত কোরবান করিয়াছি, জেহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছি, তোমার ইসলামের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করি নাই। তখন **আল্লাহ** বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ—তুমি আমার জন্য বা আমার দীন-ইসলামের জন্য জেহাদ কর নাই, তুমি জেহাদ করিয়াছ নাম ও যশের জন্য, বড় বীর পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য। তুমি সে ফল পাইয়াছ, অর্থাৎ লোকে তোমাকে "বড় বীর পুরুষ" বলিয়াছে। আমার জন্য তুমি কোন কাজ কর নাই, সুতরাং আমার এখানে তোমার কোন পুরুস্কার নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আদেশ পাইয়া তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন আলেমকে হাজির করা হইবে। তিনি কোরআন-হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে বাহিক ভাবে তদ্রূপ আমলও করিতেন, তাহাকেও পূর্ব্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি উত্তর দিবেন, দয়াময় প্রভু! আমি জীবন ভর আপনার কোরআন এবং আপনার রসুলের হাদীছ শিক্ষা করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়াছি—এ সবই একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তোমার

উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে আলেম সাহেব, হাফেজ সাহেব, মাওলানা সাহেব বলিয়া সম্মান করুক, (হাদিয়া নজরানা পেশ করুক ইত্যাদি,) সে সব তুমি পাইয়াছ। লোকে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান ও তাজীম করিয়াছে। তুমি আমার জন্য বা আমার ইসলামের জন্য কিছুই কর নাই; কাজেই আমার নিকট তোমার কোন পুরস্কারও নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাহাকেও হেঁচড়াইয়া টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন ছখী দানশীল ধনীকে উপস্থিত করা হইবে। তাহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করা হইবে এবং সে উত্তর করিবে, হে দয়াময় প্রভু! যে যে স্থানে দান করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও সে সমস্ত জায়গায় আমি দান-খয়রাত করিয়াছি—একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলিবেন—তুমি মিথ্যুক, তোমার নিয়্যতে ছিল যে, তোমার নাম হউক; লোকে তোমাকে দাতা বলুক, তা লোকে বলিয়াছে। সত্যিকারভাবে তুমি আমার উদ্দেশ্যে কিছুই কর নাই; কাজেই আমার কাছে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর তাহাকেও ঐরূপে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। (মোসলেম শরীফ)

পাঠকবর্গ! হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যেকটি কার্য্য এবং প্রত্যেকটি বাক্যের ভিতর জগদ্বাসীর জন্য অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শ মূলনীতি নিহিত থাকে। আলোচ্য হাদীছটির ভিতরেও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তার জীবন গঠন ব্যাপারে অতি মূল্যবান একটি মূলনীতি রহিয়াছে। এখান হইতে উহা চয়ন করিয়া লইয়া জীবনের কর্ম্মসূচীর মূলে ইহাকে স্থান দান করাই স্বীয় জীবনকে স্বার্থক করার একমাত্র উপায় এবং ইহা ব্যতিরেকে তাহার জীবন ব্যর্থ হইতে বাধ্য—এই সতর্কবাণীও প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত।

সেই মূলনীতিটি হইল এছলাহে-নিয়্যত অর্থাৎ নিয়্যত তুরস্ত করা। এতদ্দ্বারা তুইটি বিষয় বুঝায়; প্রথমতঃ—কার্য্যের পূর্ব্বে উদ্দেশ্য স্থির করা, গাফলতীর সহিত লক্ষ্যহীন অবস্থায় কোন কাজ না করা। দ্বিতীয়তঃ—উদ্দেশ্য স্থির হওয়ার পর উহাকে আল্লাহ ও রসুলের নির্দ্ধারিত কষ্টি পাথরে ঘসিয়া দেখা যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ ও রসুল সন্তুষ্ট হইবেন, কি অসন্তুষ্ট? মোটকথা কর্ম্ম জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এরূপ সতর্কতামূলক হওয়া চাই যেমন বাবলা কাঁটার গভীর জঙ্গলে নগ্ন পা রাখিতে হইয়া থাকে। সদা শঙ্কিত থাকিবে, যেন আমার প্রভু আমাকে এরূপ কোনও উদ্দেশ্য চয়নে না দেখেন যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

এই মূলনীতির প্রভাব অতি ব্যাপক। মানব জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত ক্ষেত্রের যত কাজ তার সম্মুখে আসিবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ তাহাকে অতি সতর্কতা সহকারে এই মূলনীতিটি সামনে রাখিয়া উহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, আন্দোলনের ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এবং

সাংসারিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, শিল্প ব্যবসায় ও চাকুরী জীবনের দায়িত্ব পালনে এই মূলনীতির দ্বারা মানব সমাজ বহু উন্নতি সাধন করিবে এই আশায়ই স্বয়ং রসুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার পরে তাঁহার সুযোগ্য খলিফা ওমর (রাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া সর্ব্বসাধারণ্যে এই হাদীছখানা এবং এই মূলনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালের নেতৃত্ব দখলকারী লীডারগণ এবং আন্দোলনকারী কর্ম্মীগণ সকলেই এই মুলনীতিকে বাদ দিয়া এই মহামূল্যবান আদর্শ হইতে বহু দুরে সরিয়া নেতৃত্ব ও আন্দোলন চালাইতেছেন। তারই ফলে যে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতিটি কর্ম্মীর প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত, মহান, অতি উন্নত এবং কামিয়াব হওয়া উচিৎ ছিল, সেই উম্মত নামধারীদের প্রতিটি কাজই আজ বিফল ও দুর্নীতিপূর্ণ হইতেছে। দুর্নীতি দুর করার বহু প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হইতেছে বটে, কিন্তু সেই প্লান প্রোগ্রামই আবার দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জাতি ও দেশকে বাঁচাইতে হইলে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের ভিতর এই মুলনীতির আদর্শ অনুযায়ী এখলাছ, লিল্লাহিয়্যাত—আল্লার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, আখেরাতের হিসাবের ভয় করা, আল্লার দীন-ইসলামের ও মোসলেম জাতির উন্নতি সাধনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং আল্লার বান্দাদের সেবার জন্য কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ, মনোবল ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই হাদীছে বর্ণিত মূলনীতির আদর্শ যেমন বড় বড় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়সমূহেও প্রযোজ্য এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এই আদর্শের অনুসরণ করিলে প্রকৃত উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন আতর ইত্যাদি সুগন্ধি যদি কেহ শুধু সুগন্ধ উপভোগের বা সুন্দর পরিপাটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে উহা একটি "মোবাহ" কাজ হইবে; উহাতে ছওয়াব বা গোনাহের প্রশ্নই আসে না। আর যদি কেহ নিজের অহঙ্কার বা লোক সম্মুখে নিজের বড়ত্ব ও অন্যান্য লোকদের হেয়ত্ব প্রকাশার্থে অথবা উহা হইতেও জঘন্য—বেগানা নারী বা পুরুষদের চিত্তাকর্ষণার্থে ব্যবহার করে, তবে এই সুগন্ধ এবং সুপরিপাট্য তার পক্ষে অতি বড় গোনাহে পরিণত হইবে। আর যদি কেহ এই সব জিনিস ব্যবহার করে রসুলুল্লাহ (দঃ) সুগন্ধ পছন্দ করিতেন এই উদ্দেশ্যে বা লোক সমাজে গেলে খারাব গন্ধে তাহাদের কষ্ট হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এবং সুগন্ধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা নিজের মন, মস্তিক প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ থাকিবে, নিজের কর্ত্তব্য কাজ, দায়িত্ব পালান, এবাদত-বন্দেগী ভাল ভাবে করা যাইবে—এই উদ্দেশ্যে, তবে এই সাধারণ কাজের জন্যও সে বহু ছওয়াব আহরণ করিতে পারে। এইরূপে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমন, মেহনত ইত্যাদি জীবন ধারণের কাজ-কর্ম্মে আল্লার নির্দ্ধারিত দায়িত্ব পালন

ও আল্লার বন্দেগী সমাধা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয়ের নিয়্যত করিলে এ সমস্ত কার্য্য সমূহও এবাদতে পরিণত হয়। বিবাহ কার্য্য এবং স্ত্রী ব্যবহারে যদিও স্থুল দৃষ্টিতে কামরিপু চরিতার্থ করাই হয় তবুও নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখা, কুপথ ও কুকর্ম্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, নেক সন্তান হাসিল করা, আখেরাতের পথে এবং কর্ত্তব্য পালনে সাহায্যকারী সংগ্রহ করা, সুন্নতের পায়রবী করা ইত্যাদি সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়্যত করিলে এই সব কাজও বড় বন্দেগীরূপে গণ্য হয় এবং অনেক ছওয়াব হাসিল হয়।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! চিন্তা করুন, সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়্যত করাতে এবং একটু চিন্তা করিয়া দেলের নিয়্যতটা খাঁটী করিয়া লওয়াতে খাদ্যের স্বাদ বদলাইয়া যায় না, আতরের ঘ্রাণ নষ্ট হয় না, পরিশ্রমের আয়-রোজগার কম হইয়া যায় না, স্ত্রী ব্যবহারে আনন্দও কম হইয়া যায় না, সব কিন্তু থাকে, কিন্তু শুধু দেলটা ঠিক করিয়া নিয়্যতটা একটু খোদার দিক করিয়া লওয়াতে কত নেকী কত ছওয়াব হাসিল হইয়া থাকে; কাজের মূল্য ও উৎকর্ষতা কত বাড়িয়া যায়! সত্য বলিতে গেলে পিতল সোনায় পরিণত হয়।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা এমনই অমূল্য রত্ন যে, এই শিক্ষার ভিতর দিয়া দুনিয়ার কোন কাজে, দুনিয়ার কোন উন্নতি প্রগতির ব্যাপারে আদৌ কোন ক্ষতি হয় না—অথচ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ খুলিয়া যায়। এমনকি সাধারণতঃ যে সমস্ত কাজ-কর্ম্মকে ভোগ-বিলাস মনে করা হয়, উহার ভিতর দিয়াও খোদাকে পাইবার এবং আখেরাতের দৌলত উপার্জ্জনের পথ পরিস্কার হইয়া যায়। এখানেই কোরআন-হাদীছের শিক্ষার তাৎপর্য্য যে, ইহাতে দুনিয়া নষ্ট না করিয়াই আখেরাতের পথ দেখান হইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগের জড়বাদী মতবাদগুলিতে চিরস্থায়ী জীবনের আখেরাতকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া শুধু ক্ষণস্থায়ী জীবন এই দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা হইতে অজ্ঞ থাকার দরুন প্রতি মুহূর্ত্তে শত-শত নেকী হাসিলের সুযোগ হইতে আমরা মাহরূম ও বঞ্চিত থাকিতেছি।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের যাবতীয় কার্য্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:—(১) মা'ছিয়াত অর্থাৎ মন্দ কাজসমূহ, (২) হাছানাত অর্থাৎ ভাল ও সৎ কাজসমূহ, (৩) মোবাহাত অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের কাজসমূহ।

যে সমস্ত কাজ কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় গোনাহ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে 'মা'ছিয়াত' বলা হয়। যথা:—ঘুষ লওয়া, চুরি করা, জেনা করা, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া, শরাব পান করা, আমানতে খেয়ানত করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, নামায

না পড়া, যাকাত না দেওয়া, রোযা না রাখা, আল্লার রসুলের বা কোরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ইত্যাদি সমস্তই পাপ এবং মন্দ কাজ। নিয়্যতের দ্বারা এই শ্রেণীর কাজ সমূহকে কিছুতেই ভাল বা ছওয়াবের কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়, অধিকন্তু যদি কেহ পাপ কাজ ছওয়াবের নিয়্যতে করে তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে আল্লার নিষিদ্ধ কাজ করে অথচ মুখে বলে যে আমি এই কাজ করিতেছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যেমন কেহ নিমের ফল খাইতেছে আর বলিতেছে আমি মিষ্টি স্বাদ পাইবার জন্য নিমের ফল খাইতেছি। এইরূপ ব্যক্তিকে শুধু বোকা নয় পাগল বলিতে হইবে। এই জন্যই শরীয়তের ভাষায় এরূপ ব্যক্তিকে শুধু ফাছেকই নয় বরং কাফের বলা হইবে। কারণ সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে।

যে সমস্ত কাজকে শরীয়তে ভাল বা জরুরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাকে "হাছানাত" বলা হয়। যেমন—নামায পড়া, রোজা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, সত্য কথা বলা, ন্যায় বিচার করা, মেহমানের খেদমত করা, পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা, গরীবের সাহায্য করা, মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, দায়িত্ব পালন করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, সতীত্ব রক্ষা করা, মুরব্বীকে মান্য করা, ছোট-দিগকে স্নেহ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। হাছানাত বা সৎকার্য্যাবলী অবশ্য করণীয়—না করিলে শাস্তি হইবে এইরূপ অপরিহার্য্য পর্য্যায়ের হইলে তাহাকে "ফরয" বা "ওয়াজেব" বলা হয়। করিবার জন্য তাকীদ থাকিলে তাহাকে সুন্নতে-মোয়াক্কাদা বলা হয়, এবং শুধু ভাল কাজ বলিয়া প্রশংসা করা হইলে বা করিবার জন্য আদেশ না করিয়া শুধু উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহাকে মোস্তাহাব বা নফল বলা হয়। হাছানাত পর্য্যায়ের কাজগুলি সুষ্ঠু নিয়্যত ব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন এবং নিস্ফল হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লার নিকট ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য থাকে না। বরং অপনিয়্য-তের দরুণ হাছানাত অপকর্ম্মে ও মা'ছিয়াতে পরিণত হইয়া যায়। যেমন—সবচেয়ে বড় হাছানাহ (নেক কাজ) হইতেছে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থাৎ আল্লার এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য, আখেরাতের হিসাব নিকাশ ও বেহেশত দোযখের অস্তিত্ব এবং আল্লার বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী হাদীছের সত্যতা স্বীকার করা। ইহাও যদি কেহ শুধু মুখে মুখে স্বীকার করে কিন্তু দেলে দেলে আল্লাহ ব্যতীত হীনস্বার্থ ইত্যাদি অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য রাখে তবে তাহাকে বলে মোনাফেক। মোনাফেকের জন্য দোযখের সর্ব্বনিম্ন স্তর এবং সবচেয়ে বেশী শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। নামায ইসলামের প্রধান রোকন; ইহা যদি কেহ বিনা নিয়্যত তথা অন্ততঃ মনের মধ্যে নামায পড়ার এরাদা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে পড়ে তবে আদৌ কোন মূল্য নাই, নামায হইবে না। আর যদি কেহ অপনিয়্যতে অর্থাৎ রিয়াকারী—লোক-দেখানো বা সুখ্যাতি আহরণ ইত্যাদি হীনস্বার্থের নিয়্যতে পড়ে তবে তাহাতে ছওয়াবের পরিবর্ত্তে

ভীষণ আজাব—ওয়ায়েল নামক দোযখের শাস্তি হইবে পবিত্র কোরআন ৩০ পারা ছুরা মাউনে আছে—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ......

"ওয়ায়েল-দোযখ ঐ শ্রেণীর নামাযীদের জন্য যাহারা নামাযের ব্যাপারে গাফেল— সময় সময় পড়িলেও উদাসীনরূপে পড়ে ; যাহারা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামায পড়ে।"

প্রত্যেক নেক কাজেই নিয়্যত খালেছ করার একান্ত প্রয়োজন আছে। নিয়্যত খালেছ না হইলে আজাবের কারণ হইবে। যেমন মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে সব কাজে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার দিয়াছেন তাহাকে বলে মোবাহাত। যেমন—খাওয়া, পরা, শোওয়া, কথা বলা, দেখা, শোনা, হাটা, চলা, জীবিকা উপার্জ্জন করা, কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করা, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বিজ্ঞানে উন্নতি করা, বিভিন্ন দেশ পর্যটন করা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা ইত্যাদি। নিয়্যতের তারতম্য বিশেষভাবে মোবাহ পর্য্যায়ের কার্য্যসমূহেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। মোবাহ পর্য্যায়ের যে কোন একটি কাজ আল্লার সন্তুষ্টি ও আল্লার দাসত্বের ধ্যান করতঃ নিয়্যত ঠিক করিয়া করিলে তখন আর ঐ কাজটি শুধু মোবাহ থাকে না, উহা একটী উচ্চ পর্য্যায়ের ছওয়াবের ও এবাদতের কাজে পরিণত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐ কাজটিকেই কোন অপনিয়্যতে করিলে উহা মা'ছিয়ত বা গোনাহের কাজে পরিণত হইয়া যায়। যেমন ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) বর্ণনায় দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত মোবাহ কাজ সমূহকে নেক কাজে বা গোনাহতে পরিণত করা নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে। এই হাদীছের ইহাই তাৎপর্য্য যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য একদিকে যেমন মা'ছিয়াত ও হাছানাতের ময়দানের চেয়ে মোবাহাতের ময়দানকে অধিক প্রশস্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ এইসব মোবাহাত অর্থাৎ দুনিয়াদারীর সামান্য সামান্য পিতলের জিনিসকে কিরূপে সোনায় পরিণত করিয়া ক্ষণস্থায়ী ইহজীবনের শান্তির ও উন্নতির সহিত চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনের অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ লাভের উপায় করিতে হইবে, সেই ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

এই হাদীছখানাতে অহী সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা হয় নাই। তা সত্ত্বেও ইমাম বোখারী ইহাকে অহীর বর্ণনার শিরোনামাভুক্ত কেমন করিয়া করিলেন ? এ বিষয়ে সমালোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। সোজা কথা এই যে, যেহেতু দীন ও সত্য ধর্ম্মের ভিত্তিপাত হয় অহীর দ্বারা এবং মানুষের জীবন গঠন আরম্ভ হয় নিয়্যতের দ্বারা। দেল ঠিক করিয়া মকছুদ ও লক্ষ্য স্থির করিয়া—যে আমার একমাত্র মকছুদ ও জীবনের

চরম ও পরম লক্ষ্য আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা— এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করার দ্বারাই হয় মানুষের জীবন গঠনের ভিত্তিপাত। সেই জন্য নিজে আমল করিয়া দেখাইবার জন্য এবং পাঠকবর্গকেও তদনুরূপ আমল করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কেতার আরম্ভ করার ও অহীর কথা বর্ণনা করার পূর্ব্বে নিয়্যত সম্বন্ধে হাদীছখানা বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها سئل هشام بن حارث

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِىْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ(কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন, কোন সময় এমন হয় যে, একটি (চিত্তাকর্ষক) টুণ্‌ টুণ্‌ শব্দ আমি শুনিতে পাই। (সেই আওয়াজ আমাকে এই জগতের অনুভূতি হইতে উদাসীন করিয়া অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া নেয়। তখন আল্লার বাণী আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে থাকে এবং ঐ আওয়াজ বন্ধ হইতে না হইতেই যাহা বলা হয় সব কিছুই আমি অন্তরস্থ এবং মুখস্থ করিয়া লই।) এই প্রকারের অহী আমার জন্য বড়ই শ্রান্তিদায়ক হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আল্লার বাণী আমাকে বলিয়া দেন, আমি তাহা মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই। (এই দ্বিতীয় প্রকারের অহীতে বিশেষ কোন শ্রান্তি বা কষ্ট হয় না।) প্রথম প্রকারের অহী সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি অতি প্রচণ্ড শীতের সময়ও নবী (দঃ)কে অহী নাযেল হওয়ার সময় ঘর্ম্মাক্ত হইতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ— صلصلة الجرس অর্থ ঘন্টার অবিরাম টুণ্‌ টুণি আওয়াজ। এই আওয়াজ অহী আসার সঙ্কেত স্বরূপ ছিল। ইহা কখনও কখনও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। যেমন ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—অহী নাযেল

হওয়ার সময়ে আমরা মৌমাছির ঝাক্ উড়িয়া বেড়াইবার সময় যেমন এক প্রকার অবিরাম গুঞ্জন শুনা যায়, ঐরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। অহী নাযেল হওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক কোন কষ্ট শ্রম হইত কি না ; এবং কেন ? প্রথম প্রকার অহীর দরুণ যে, রসুলুল্লার দেহে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইত তাহা বিবি আয়েশার চাক্ষুষসাক্ষ্যে যে, প্রচণ্ড শীতের সময় হযরতের চেহারা মোবারক এবং দেহ হইতে ঘাম ঝরিতে থাকিত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মানুষের সাকার দেহ নশ্বর জড়পিণ্ড তাহার নিরাকার অনন্ত অসীম আত্মার জন্য এক প্রকার খাঁচার মত। এই খাঁচার সহিত আত্মার একটা যোগাযোগ নিশ্চয়ই থাকে। এই যোগাযোগকে ছিন্ন করিয়া যখন তাহার সকল আত্মা যিনি, তাঁহার দিকে পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়, তখন তাহার নিশ্চয়ই কষ্ট ও শ্রান্তি হয়, কিন্তু এই শ্রান্তি যে, কি মধুর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এই যোগাযোগ যখন পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, তখন দেহের উপর যে, কি চাপ পড়ে তাহা একজন ছাহাবীর বর্ণনায় কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন--একদিন আমি হযরতের পাশাপাশি বসিয়াছিলাম ; হযরতের উরু সামান্য পরিমাণে আমার উরুর উপর ছিল। এই অবস্থায় মাত্র ২।৩ শব্দের একটি অহী নাযেল হওয়াতে আমি মনে করিতেছিলাম যে, হয়ত আমার উরুর সমস্ত হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। চাক্ষুষ জগতে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত এই হইতে পারে যে, একটি সাধারণ লোহার বা তামার তারের সহিত বিদ্যুৎ শক্তির যোগাযোগ করিয়া দিলে ঐ তারটির বাহিক পরিবর্ত্তন না হইয়াও তাহার ভিতর এক ভীষণ চাপের ঢেউ খেলে। তাহাতে ঐ তারটির ভিতরে যে অপরিসীম শক্তি ও তাপ মাত্রার সঞ্চার হয় তাহা-বাহ্যতঃ দৃশ্য না হইলেও তারটিকে স্পর্শ করিলেই তাহা অনুভূত হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, অহী নাযেল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত।

৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অহী আসার ভূমিকা ও প্রাথমিক সূচনা আরম্ভ হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন আকারে। স্বপ্নে তিনি যাহা দেখিতেন ঠিক তাহাই দিবালোকের মত প্রকাশ পাইত।* কিছুকাল এই অবস্থা চলার পর নিজ হইতেই হরযতের অন্তরে লোকালয়

* এই অবস্থা হেরা পর্ব্বতের গুহায় নির্জ্জন বাসের ঘটনার ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। এর পূর্ব্বেও কোন কোন ঘটনা সময় সময় প্রকাশ পাইত। মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, সময় সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ও আলো দেখিতেন। রাস্তায় চলার সময় গাছপালা তাহাকে ছালাম করিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—আমি এখনও মক্কায় সেই সব গাছপালাগুলিকে চিনি যেগুলি আমাকে নবুয়তের পূর্ব্বে সালাম করিত।

হইতে সংস্রবহীন হইয়া নির্জ্জনে থাকার প্রেরণা উদিত হইল। তিনি হেরা নামক পর্ব্বত গুহায় (মক্কা শহরের লোকালয় হইতে তিন মাইল দুরে) যাইয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খাইবার জন্য প্রত্যহ বাড়ী আসিতেন না, পানাহারের জন্য সামান্য কিছু সম্বল লইয়া যাইতেন এবং তথায় একাদিক্রমে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিয়া যাপন করিতেন। অনেক দিন পর একবার বিবি খাদিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং আবার ঐরূপ একসঙ্গে অনেক রাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে রত হইবার জন্য কিছু পানাহারের সম্বল সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে তিনি হেরা পর্ব্বত গুহায় নির্জ্জনে আল্লার ধ্যান ও এবাদতে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন হেরা গুহার ভিতরেই তাঁহার নিকট প্রকৃত সত্য আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—আল্লার তরফ হইতে জিব্রিল ফেরেশ্‌তা অহী (আল্লার বাণী) বহন করিয়া প্রকাশ্যভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, আপনি পড়ুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—আমি ত পড়া শিখি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন--তখন সেই ফেরেশতা (হযরত জিব্রিল (আঃ)) আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিলেন যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার মত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন—আপনি পড়ুন। আমি প্রথম বারের মতই বলিলাম, আমি ত কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—তখন ঐ ফেরেশ্‌তা পুনরায় দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, আপনি পড়ুন। আমি (এইবারও) বলিলাম, আমি ত কোন দিন পড়া শিখি নাই। তিনি তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গন করিয়া চাপিয়া ধরিলেন* এবং ছাড়িয়া দিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ

الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - **

---

* এইরূপে আলিঙ্গনের দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভিতরে ফয়েজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আসিতেছিল। তাই তৃতীয়বার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তিনি পড়িতে পারিলেন; পড়াও যেমন তেমন পড়া নয়—মানে, মতলব, হকিকত, গুরুত্ব মূলতত্ত্ব সহ পড়া।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই পাঁচটি আয়াত (মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া) লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বাড়ী ফিরিলেন। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে এখনও তাঁহার হৃদযন্ত্র থর থর করিয়া

** প্রথম বারে এই ছুরার উক্ত পাঁচটি আয়াতই নাযেল হয়। আয়াত কয়টির অর্থ এই :—আপনি আপনার সেই মহাপ্রভু পালনকর্ত্তার নাম লইয়া পড়ুন, (নিজ শক্তিতে নয় ; সর্ব্বশক্তির আকর যিনি তাঁহার নামের বরকতে আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইবে।) যিনি সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি মানুষের মত জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ এত উচ্চদরের জীবকে অতি নিকৃষ্ট পদার্থ জমাট রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি পড়ুন ; আপনার প্রভু দয়ার সাগর, অত্যন্ত দয়ালু (তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ; মানুষ কিছুই জানিত না) তিনিই (বুদ্ধিহীন, বাকশক্তিহীন, জীবনীশক্তি বিহীন) কলমের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আপনি বুদ্ধি-বিবেক, জীবনীশক্তি সব কিছু রাখেন। আপনাকে জ্ঞান ও পড়ার ক্ষমতা তিনি নিশ্চয় দিতে পারিবেন ; সেই শক্তি লাভের সূত্ররূপে সেই মহাপ্রভুর মহান নামের বরকত ও অছিলা গ্রহণ করতঃ পড়িবার জন্য আপনি প্রস্তুত হউন ; এখন হইতে যত কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইবে সবই পড়িবার জন্য প্রস্তুত ও সাহসী হউন। ভবিষ্যতে আর কোন কিছু পড়িতে সাহস হারা হইবেন না ; শুধু পড়াই নয়, প্রতিটি কর্তব্য কাজে মহাপ্রভুর নামের অছিলায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার অমোঘ ব্যবহার করতঃ সাহসী হইয়া দাঁড়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তিনবার ফেরেশতার আহ্বান—"আপনি পড়ুন" সেখানেও আরবী শব্দ "একরা" ছিল ; উহা মুল অহী তথা কোরআনের আয়াত-ভুক্ত ছিল না ; উহা ছিল ফেরেশতার কথা। উক্ত তিনবারের "একরা—পড়ুন" ক্রিয়াপদের কর্ম্মপদই ছিল চতুর্থবারে পঠিত আয়াত খানা। আর এই আয়াতে যে "একরা" রহিয়াছে উহা আল্লার কালাম—কোরআনের অংশ ; এই ক্রিয়াপদের কর্ম্মপদ হইল—যত কিছু পড়ার মত তোমার সম্মুখে আসিবে। উপস্থিত রসুলকে সম্বোধন করিয়া পড়ায় অক্ষমতা প্রকাশের ঘটনা লক্ষ্যে পড়াকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতঃ মানব-গোষ্ঠীকে বলা হইয়াছে, কোন কর্ত্তব্য কাজে সাহস হারা না হইয়া মহাপ্রভুর নামের সূত্রে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনার অছিলা ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ছোট-বড় প্রত্যেক কাজেই তাহা করিবে, কারণ প্রত্যেক কাজেই প্রভুর সাহায্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনের এই উপদেশ কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রযোয্য। একটি দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তিকে তাহার মুরব্বির তরফ হইতে লিপি পৌছাইবার সময় আপনি বলিলেন, পড়। উক্ত লিপিতে লেখাছিল, সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত পড় ; আপনার আহ্বান—"পড়" এবং লিপিতে লেখা উপদেশ—"মনোযোগের সহিত পড়" অর্থাৎ সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত পড়িবা ; উভয় "পড়" শব্দের তাৎপর্য্যে যে ব্যবধান তদ্রূপ ব্যবধানই রহিয়াছে জিব্রিল ফেরেশতার আহ্বান—"পড়ুন" এবং আল্লাহ তায়ালার কালামের অংশ—"মহাপ্রভুর নামে পড়ুন"—এই উভয় "পড়ুন" এর মধ্যে। আরও সরল দৃষ্টান্ত—শিক্ষক ছাত্রকে বলে, পড়—এক্‌রা বিস্‌মে রাব্বেকা "মহা প্রভুর নাম লইয়া পড়।" এই উভয় "পড়"-এর মধ্যে যে পার্থক্য তদ্রূপই আলোচ্য স্থলে।

কাঁপিতে ছিল+। তাই তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া (গৃহ-সঙ্গিনী পতি সর্ব্বস্ব প্রাণ) খাদিজার কাছে আসিলেন এবং (জ্বরাক্রান্তির আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায়) বলিলেন—আমার গায়ে কম্বল দাও, আমার গায়ে কম্বল দাও। খাদিজা (রাঃ) কম্বল আনিয়া গায়ে দিলেন। কিছু সময় পর ঐ জ্বর-জ্বরভাব এবং ভয়-ভয়ভাব চলিয়া গেল। অতঃপর হযরত (দঃ) খাদিজাকে সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। হযরত (দঃ) (বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মস্ত বড় ভারি বোঝা তাঁহার উপর চাপান হইবে বোধ হইতেছে, তাই তিনি) বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে—আমার জীবনে কুলাইবে কি না? আমার শরীরে সহ্য হইবে কি না, না জীবন বাহির হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। খাদিজা (রাঃ) (অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রায় বাল্যকাল হইতেই জানিতেন এবং দীর্ঘ পনর বৎসর হইতেও একেবারে অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপেই বসবাস করিয়াছেন। তিনি) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, كلا والله ما يخزيك الله ابدا—খোদার কসম, কিছুতেই নয়, আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করিবেন না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করিবেন—আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা মানবতার চরম উৎকর্ষের মূল সাতটি খাছলতই আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। যথা :—)

১। انك لتصل الرحم :—আপনি আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মীয়তার হক আদায় করতঃ আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেন না এবং সম্পর্ক-ছেদন করেন না।*

+ এই অবস্থায় কম্পন বা ভয় কোন অস্বাভাবিক বস্তু নয়। হঠাৎ অতি বড় একটি বোঝার চাপ তাঁহার উপর পড়িয়াছে—জিব্রিল ফেরেশতার সহিত মোলাকাত ; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান অসীম অফুরন্ত শক্তির আকরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা অত্যধিক ফয়েজের চাপ, সর্ব্বোপরি ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্ব ভারের চাপ—এতগুলি চাপ হঠাৎ এক সঙ্গে। কাজেই রক্ত মাংসের শরীরে জ্বর, কম্পন ইত্যাদি না হইয়া পারে না। রসুলুল্লার আত্মা ও আধ্যাত্মিক শক্তি যত বড়ই হউক না কেন দেহটি ত মানুষেরই দেহ ছিল।

* সাধারণতঃ লোক সমাজে মামু ভাগ্নে, চাচা ভাতিজা, চাচাত ভাইদের সঙ্গেই বিষয় সম্পত্তির সহিত জড়িত থাকার কারণে ঝগড়া বিরোধ মনোমালিন্য বেশী হয়। কিন্তু হযরত রসুলুল্লার শিক্ষা এই যে, এই সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা জন্মান যাইবে না। তাদের সঙ্গে মিলন ও সৌহৃদ্য বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বভাব হযরতের নবুয়ত পাওয়ার পূর্ব্বেই ছিল, তার প্রমাণ খাদিজার এই সাক্ষ্য। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন কথা এবং স্বজন-প্রীতি ভিন্ন কথা। স্বজন-প্রীতি যাহা অতীব দুষণীয় তাহা হইতেছে এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া, আমানতের খেয়ানত করিয়া, বিচার ক্ষেত্রে অথবা ষ্টেটের বা অন্য কোন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

২। وتصدق الحديث—আপনি সদা সত্যবাদী ; মিথ্যা কথা বলেন না। *

৩। وتؤدى الامانة — আপনি চিরকাল পূর্ণ মাত্রায় অতিশয়বিশ্বাসী আমানতদার ; আমানতের খেয়ানত আপনি কখনও করেন নাই। (ব্যক্তিগত লেনদেনের আমানত, পারিবারিক আচার ব্যবহারের আমানত, সামাজিক বিচার অথবা খেদমত ও সেবার আমানত সবই উদ্দেশ্য।)

৪। وتحمل الكل —যে সব অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অন্ধ খঞ্জ আছে, আপনি তাহাদের বোঝা বহন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জ্জন করার ক্ষমতা নাই তাহাদের রুজির, খাওয়া-পরার ও থাকার বন্দোবস্ত আপনি করিয়া দেন।

৫। وتكسب المعدوم —আপনি বেকার সমাস্যার সমাধান করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাদের উপার্জ্জন ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অভাবগ্রস্ত ; আপনি তাহাদের কাজের ব্যবস্থা উপার্জ্জনের সংস্থান করতঃ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

৬। وتقرى الضيف —আপনি অতিথি সেবা, মেহমানের খেদমত করিয়া থাকেন।

৭। وتعين على نوائب الحق —আপনি যাবতীয় প্রকৃতিক দুর্যোগক্ষেত্রে দুস্থ জনগণের সাহায্য কল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন।

মানবতার উৎকর্ষ এই গুণগুলি যেই মানুষের মধ্যে আছে সেই মানুষ সফলকাম না হইয়া পারে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে কখনও অকৃতকার্য্য করেন না।

খাদিজা (রাঃ) এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া হযরতকে লইয়া বংশের বৃদ্ধ মুরব্বি চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। অরাকা সত্যান্বেষী সুজ্ঞানী লোক ছিলেন, অতি বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জাহেলিয়াতের যমানাতেই তিনি সত্য ধর্ম্মের তালাশে সিরিয়া দেশে যাইয়া ঈসায়ী ধার্ম্মীয় এক খাঁটী আলেমের নিকট খাঁটী ঈসায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি এবরানী ভাষা লিখিতেন এবং এবরানী হইতে ইঞ্জিল কেতাবের আরবী তরজমাও করিতেন। (তাহাতে পূর্ব্বের আসমানী কেতাব সমূহে তাঁহার দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি নবীগণের প্রতি অহী ও অহীবাহক ফেরেশতা জিব্রিলের বিষয় জানিতেন।) খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে বলিলেন, হে চাচা-পুত্র ভ্রাতা! আপনার ভাই-পো কি বলেন একটু শুনুন! খাদিজা (রাঃ)

প্রতিষ্ঠানের চাকুরী পদ বা টাকা পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পক্ষপাতিত্ব করা, ইহা হারাম। পক্ষান্তরে নিজের ব্যক্তিগত জান মাল দিয়া যথাসম্ভব আত্মীয়গণের হক আদায় করা জরুরী এবং ফরয।

* এই বাক্যটি বোখারী শরীফের ৭৪০ পৃষ্ঠায় এবং পরবর্ত্তী বাক্যটি ফতহুলবারী কেতাবে উল্লেখ আছে।

ঘটনার কিছু বর্ণনাও দিলেন। অতঃপর অরাকা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন— বলুন! আপনি কি দেখেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমস্ত ঘটনা অরাকাকে খুলিয়া বলিলেন। অরাকা বলিলেন, এ-ত সেই মঙ্গলময় আল্লার দুত জিব্রিল ফেরেশতা—যাঁহাকে আল্লাহ মূছা আলাইহেচ্ছালামের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। হায় আফছুছ! যদি সেদিন আমি যুবক হইতাম—যেদিন আপনি আল্লার বাণী প্রচার করিবেন। হায় আফছুছ! যদি সেদিন আমি জীবিত থাকিতাম—যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িবে। শেষের বাক্যটি শুনিয়া হযরত স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, কি? আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করিবে! অরাকা বলিলেন—হাঁ, হাঁ, ! যে সত্য ধর্ম্ম আপনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন এইরূপ সত্য ধর্ম্ম বাণী যে কেহ দুনিয়াতে লইয়া আসিয়াছেন দুনিয়াবাসী তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া ছাড়ে নাই। যদি আমি সেই দিন পাই (অর্থাৎ জীবিত থাকি) তবে আমি প্রাণপণে যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব।*

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই অরাকা এন্তেকাল করিলেন। হেরা পর্ব্বত-গুহার এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য অহী বন্ধ থাকিল।↑

অহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা বর্ণনা পূর্ব্বক জাবের (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন (অহী বন্ধ থাকাবস্থায় যখন আমি অতি ব্যস্ত ও অস্থির ছিলাম+

---

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে কাহারও নিকট যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই বা যাইতে উদ্যতও হন নাই। বিবি খাদিজাই তাঁহাকে অরাকার নিকট লইয়া গিয়াছেন। ইহা মাতৃজাতির স্বভাব সুলভ কোমলতা যে, তাঁহার প্রিয়জনের কোনরূপ অস্থিরতা দেখিলে প্রাচীন পারদর্শী জ্ঞানীদের কাছে যাতায়াত করিয়া অতি শীঘ্র প্রিয়জনের অস্থিরতা দূর করিতে চেষ্টা করেন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদৌ কোনরূপ অস্থির ছিলেন না, বরং সব ব্যাপারই তিনি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। নবুওতের পদ-মর্য্যাদা, ফেরেশতার পরিচয়, অহীর হকিকত সব কিছুই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য নূতন নূতন—প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক কিছু কষ্ট এবং গুরু দায়িত্বের বোঝার চাপের দরুণ মনেও নানা কথার উদয় হইতেছিল এবং প্রাণ প্রিয়া খাদিজার কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন খাদিজার বুদ্ধিমত্তা এবং হামদরদীর উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। খাদিজার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সঙ্গে অরাকার নিকট যাইতেও কোন ওজর আপত্তি করেন নাই। অরাকাও কোন খারাপ কথা বলেন নাই বা খারাপ লোক ছিলেন না। বরং অরাকা রসুলুল্লার উম্মতের মধ্যে শামিল কি না এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে 'মোমেন' ছিলেন এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে অরাকাকে বেহেশতের নহর কূলে সাদা রেশমী পোয়াক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। নবীর স্বপ্ন অহী।

↑ (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তখনকার ঘটনা)—একদা আমি পথ চলিবার কালে হঠাৎ উর্দ্ধ দিকের একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন উর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি, সেই ফেরেশতা (জিব্রিল) যিনি হেরা পর্ব্বতের গুহায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন তিনিই আসমান জমিন পৃথিবীর মাঝখানে (অতিশয় জমকালো সোনার কুরসীতে আকাশ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এত বিরাট আকারে দেখিলাম যে,) তাঁহাকে দেখিয়া আমি পুনরায় ভয় পাইয়া গেলাম• এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে

↑ এক রেওয়ায়েত আছে—অহী প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল এবং অন্য একজন ফেরেশতাকে হযরতের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হযরত জিব্রিল (আঃ)ও মাঝে মাঝে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু যেহেতু প্রথমবারের অহীর ভারে হযরতের অনেক কষ্ট হইয়াছিল ; তাই তিন বৎসর যাবৎ আর অহী আনেন নাই। হযরতের কিন্তু শারীরিক কষ্ট হইলেও মানসিক কোন কষ্ট হয় নাই। বরং অহী বন্ধ হওয়ার কারণে মনোবেদনা ও বান্ধবের মিলনের বিচ্ছেদ-যাতনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। সাময়িক ভাবে অহী বন্ধ করিয়া এইরূপ আগ্রহ ও মিলনাকাঙ্খা বর্দ্ধিত করাই আল্লার হেকমত ছিল। সাধারণতঃ বলা হয় অহী ছয়মাস কাল বন্ধ ছিল।

+ অহী প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবের সহিত মিলন-সূত্র। বান্ধবের মিলনের যে কি স্বাদ তাহা একমাত্র প্রেমিকজন ব্যতীত অন্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। যাঁহারা আল্লার প্রেমিক হইয়া খাঁটী পীরের কাছে তালকীন লইয়া আল্লার জেকের মোজাহাদা করতঃ আল্লার প্রেমকে সত্যিকার ভাবে খাঁটী ও স্থায়ী করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা আল্লার প্রেমের মিলনের স্বাদের কিঞ্চিৎ নজীর বা নমুনা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। এত বড় স্বাদের জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের মন কত উতলা এবং কত উৎকণ্ঠিতই না হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী বন্ধ থাকাকালে এইরূপ বিচ্ছেদ-যাতনাই ভোগ করিতেছিলেন এবং বিচ্ছেদ-যাতনা সময় সময় এত চরমে পৌঁছিয়া যাইত যে, তিনি হেরা পর্ব্বতের চূড়ার উপরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু পরম প্রেমিক তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমাগ্নির আহুতি অনুক্ষণ গোপনে নিরীক্ষণ করিতেন, সান্ত্বনাও দিতেন, প্রেমাগ্নিও বাড়াইতেন। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধ জগতের বাণী আসিত يا محمد انك لرسول الله হে মোহাম্মদ। কি করেন আপনি? আপনি যে আল্লার রসুল—প্রেরিত দূত। সাধারণ দূত নহেন, আল্লার প্রতিনিধি দূত। আপনাকে যে সেই প্রতিনিধিত্বের সমস্ত গুরুদায়িত্ব বহন করিতেই হইবে।

• শৈশবাবস্থায় উস্তাদকে, পীরকে বা অন্য কোন মুরব্বিকে দেখিয়া ছেলেরা ভয় পায়। কিন্তু সে ভয় কোনরূপ ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় হয় না, বরং বড়দের আদব যাদের অন্তরে আছে তাদের উপর প্রাথমিক অবস্থায় এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত শক্তিমত্তার প্রভাব পতিত হয়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লামের এই ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয় ছিল, অন্য কিছুই নহে।

চরম ও পরম লক্ষ্য আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা—এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করার দ্বারাই হয় মানুষের জীবন গঠনের ভিত্তিপাত। সেই জন্য নিজে আমল করিয়া দেখাইবার জন্য এবং পাঠকবর্গকেও তদনুরূপ আমল করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কেতার আরম্ভ করার ও অহীর কথা বর্ণনা করার পূর্ব্বে নিয়্যত সম্বন্ধে হাদীছখানা বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। হাদীছঃ—عن عائشة رضى الله تعالى عنها سأل هشام بن حارث

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ اَحْيَانًا يَأْتِيْنِىْ مِثْلَ

صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ

وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَتْ

عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ

فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ(কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন, কোন সময় এমন হয় যে, একটি (চিত্তাকর্ষক) টুণ্‌-টুণ্‌ শব্দ আমি শুনিতে পাই। (সেই আওয়াজ আমাকে এই জগতের অনুভূতি হইতে উদাসীন করিয়া অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া নেয়। তখন আল্লার বাণী আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে থাকে এবং ঐ আওয়াজ বন্ধ হইতে না হইতেই যাহা বলা হয় সব কিছুই আমি অন্তরস্থ এবং মুখস্থ করিয়া লই।) এই প্রকারের অহী আমার জন্য বড়ই শ্রান্তিদায়ক হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আল্লার বাণী আমাকে বলিয়া দেন, আমি তাহা মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই। (এই দ্বিতীয় প্রকারের অহীতে বিশেষ কোন শ্রান্তি বা কষ্ট হয় না।) প্রথম প্রকারের অহী সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি অতি প্রচণ্ড শীতের সময়ও নবী (দঃ)কে অহী নাযেল হওয়ার সময় ঘর্ম্মাক্ত হইতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ—صلصلة الجرس অর্থ ঘণ্টার অবিরাম টুণ্‌-টুণি আওয়াজ। এই আওয়াজ অহী আসার সঙ্কেত স্বরূপ ছিল। ইহা কখনও কখনও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। যেমন ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—অহী নাযেল

হওয়ার সময়ে আমরা মৌমাছির ঝাক্ উড়িয়া বেড়াইবার সময় যেমন এক প্রকার অবিরাম গুঞ্জন শুনা যায়, ঐরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। অহী নাযেল হওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক কোন কষ্ট শ্রম হইত কি না ; এবং কেন ? প্রথম প্রকার অহীর দরুণ যে, রসুলুল্লার দেহে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইত তাহা বিবি আয়েশার চাক্ষুষসাক্ষ্যে যে, প্রচণ্ড শীতের সময় হযরতের চেহারা মোবারক এবং দেহ হইতে ঘাম ঝরিতে থাকিত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মানুষের সাকার দেহ নশ্বর জড়পিণ্ড তাহার নিরাকার অনন্ত অসীম আত্মার জন্য এক প্রকার খাঁচার মত। এই খাঁচার সহিত আত্মার একটা যোগাযোগ নিশ্চয়ই থাকে। এই যোগাযোগকে ছিন্ন করিয়া যখন তাহার সকল আত্মা যিনি, তাঁহার দিকে পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়, তখন তাহার নিশ্চয়ই কষ্ট ও শ্রান্তি হয়, কিন্তু এই শ্রান্তি যে, কি মধুর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এই যোগাযোগ যখন পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, তখন দেহের উপর যে, কি চাপ পড়ে তাহা একজন ছাহাবীর বর্ণনায় কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন--একদিন আমি হযরতের পাশাপাশি বসিয়াছিলাম ; হযরতের উরু সামান্য পরিমাণে আমার উরুর উপর ছিল। এই অবস্থায় মাত্র ২।৩ শব্দের একটি অহী নাযেল হওয়াতে আমি মনে করিতেছিলাম যে, হয়ত আমার উরুর সমস্ত হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। চাক্ষুষ জগতে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত এই হইতে পারে যে, একটি সাধারণ লোহার বা তামার তারের সহিত বিদ্যুৎ শক্তির যোগাযোগ করিয়া দিলে ঐ তারটির বাহ্যিক পরিবর্ত্তন না হইয়াও তাহার ভিতর এক ভীষণ চাপের ঢেউ খেলে। তাহাতে ঐ তারটির ভিতরে যে অপরিসীম শক্তি ও তাপ মাত্রার সঞ্চার হয় তাহা-বাহ্যতঃ দৃশ্য না হইলেও তারটিকে স্পর্শ করিলেই তাহা অনুভূত হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, অহী নাযেল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত।

৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অহী আসার ভূমিকা ও প্রাথমিক সূচনা আরম্ভ হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন আকারে। স্বপ্নে তিনি যাহা দেখিতেন ঠিক তাহাই দিবালোকের মত প্রকাশ পাইত।* কিছুকাল এই অবস্থা চলার পর নিজ হইতেই হরযতের অন্তরে লোকালয়

---

* এই অবস্থা হেরা পর্ব্বতের গুহায় নির্জ্জন বাসের ঘটনার ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। এর পূর্ব্বেও কোন কোন ঘটনা সময় সময় প্রকাশ পাইত। মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, সময় সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ও আলো দেখিতেন। রাস্তায় চলার সময় গাছপালা তাহাকে ছালাম করিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—আমি এখনও মক্কায় সেই সব গাছপালাগুলিকে চিনি যেগুলি আমাকে নবুয়তের পূর্ব্বে সালাম করিত।

হইতে সংস্রবহীন হইয়া নির্জ্জনে থাকার প্রেরণা উদিত হইল। তিনি হেরা নামক পর্ব্বত গুহায় (মক্কা শহরের লোকালয় হইতে তিন মাইল দুরে) যাইয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খাইবার জন্য প্রত্যহ বাড়ী আসিতেন না, পানাহারের জন্য সামান্য কিছু সম্বল লইয়া যাইতেন এবং তথায় একাদিক্রমে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিয়া যাপন করিতেন। অনেক দিন পর একবার বিবি খাদিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং আবার ঐরূপ একসঙ্গে অনেক রাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে রত হইবার জন্য কিছু পানাহারের সম্বল সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে তিনি হেরা পর্ব্বত গুহায় নির্জ্জনে আল্লার ধ্যান ও এবাদতে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন হেরা গুহার ভিতরেই তাঁহার নিকট প্রকৃত সত্য আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—আল্লার তরফ হইতে জিব্রিল ফেরেশ্‌তা অহী (আল্লার বাণী) বহন করিয়া প্রকাশ্যভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, আপনি পড়ুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—আমি ত পড়া শিখি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—তখন সেই ফেরেশতা (হযরত জিব্রিল (আঃ)) আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিলেন যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার মত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন—আপনি পড়ুন। আমি প্রথম বারের মতই বলিলাম, আমি ত কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—তখন ঐ ফেরেশ্‌তা পুনরায় দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, অপনি পড়ুন। আমি (এইবারও) বলিলাম, আমি ত কোন দিন পড়া শিখি নাই। তিনি তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গন করিয়া চাপিয়া ধরিলেন* এবং ছাড়িয়া দিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ

الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - **

---

* এইরূপে আলিঙ্গনের দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভিতরে ফয়েজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আসিতেছিল। তাই তৃতীয়বার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তিনি পড়িতে পারিলেন ; পড়াও যেমন তেমন পড়া নয়—মানে, মতলব, হকিকত, গুরুত্ব মূলতত্ত্ব সহ পড়া।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই পাঁচটি আয়াত (মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া) লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বাড়ী ফিরিলেন। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে এখনও তাঁহার হৃদযন্ত্র থর থর করিয়া

** প্রথম বারে এই ছুরার উক্ত পাঁচটি আয়াতই নাযেল হয়। আয়াত কয়টির অর্থ এই :—আপনি আপনার সেই মহাপ্রভু পালনকর্তার নাম লইয়া পড়ুন, (নিজ শক্তিতে নয় ; সর্ব্বশক্তির আকর যিনি তাঁহার নামের বরকতে আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইবে।) যিনি সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি মানুষের মত জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ এত উচ্চদরের জীবকে অতি নিকৃষ্ট পদার্থ জমাট রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি পড়ুন ; আপনার প্রভু দয়ার সাগর, অত্যন্ত দয়ালু (তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ; মানুষ কিছুই জানিত না) তিনিই (বুদ্ধিহীন, বাকশক্তিহীন, জীবনীশক্তি বিহীন) কলমের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আপনি বুদ্ধি-বিবেক, জীবনীশক্তি সব কিছু রাখেন। আপনাকে জ্ঞান ও পড়ার ক্ষমতা তিনি নিশ্চয় দিতে পারিবেন ; সেই শক্তি লাভের সূত্ররূপে সেই মহাপ্রভুর মহান নামের বরকত ও অছিলা গ্রহণ করতঃ পড়িবার জন্য আপনি প্রস্তুত হউন ; এখন হইতে যত কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইবে সবই পড়িবার জন্য প্রস্তুত ও সাহসী হউন। ভবিষ্যতে আর কোন কিছু পড়িতে সাহস হারা হইবেন না ; শুধু পড়াই নয়, প্রতিটি কর্তব্য কাজে মহাপ্রভুর নামের অছিলায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার অমোঘ ব্যবহার করতঃ সাহসী হইয়া দাঁড়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তিনবার ফেরেশতার আহ্বান—"আপনি পড়ুন" সেখানেও আরবী শব্দ "একরা" ছিল ; উহা মুল অহী তথা কোরআনের আয়াত-ভুক্ত ছিল না ; উহা ছিল ফেরেশতার কথা। উক্ত তিনবারের "একরা—পড়ুন" ক্রিয়াপদের কর্মপদই ছিল চতুর্থবারে পঠিত আয়াত খানা। আর এই আয়াতে যে "একরা" রহিয়াছে উহা আল্লার কালাম—কোরআনের অংশ ; এই ক্রিয়াপদের কর্মপদ হইল—যত কিছু পড়ার মত তোমার সম্মুখে আসিবে। উপস্থিত রসুলকে সম্বোধন করিয়া পড়ায় অক্ষমতা প্রকাশের ঘটনা লক্ষ্যে পড়াকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতঃ মানব-গোষ্ঠীকে বলা হইয়াছে, কোন কর্ত্তব্য কাজে সাহস হারা না হইয়া মহাপ্রভুর নামের সূত্রে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনার অছিলা ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ছোট-বড় প্রত্যেক কাজেই তাহা করিবে, কারণ প্রত্যেক কাজেই প্রভুর সাহায্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনের এই উপদেশ কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রযোয্য। একটি দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তিকে তাহার মুরব্বির তরফ হইতে লিপি পৌছাইবার সময় আপনি বলিলেন, পড়। উক্ত লিপিতে লেখাছিল, সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত পড় ; আপনার আহ্বান—"পড়" এবং লিপিতে লেখা উপদেশ—"মনোযোগের সহিত পড়" অর্থাৎ সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত পড়িবা ; উভয় "পড়" শব্দের তাৎপর্য্যে যে ব্যবধান তদ্রূপ ব্যবধানই রহিয়াছে জিব্রিল ফেরেশতার আহ্বান—"পড়ুন" এবং আল্লাহ তায়ালার কালামের অংশ—"মহাপ্রভুর নামে পড়ুন"—এই উভয় "পড়ুন" এর মধ্যে। আরও সরল দৃষ্টান্ত—শিক্ষক ছাত্রকে বলে, পড়—এক্‌রা বিস্‌মে রাব্বেকা "মহা প্রভুর নাম লইয়া পড়।" এই উভয় "পড়"-এর মধ্যে যে পার্থক্য তদ্রূপই আলোচ্য স্থলে।

কাঁপিতে ছিল+। তাই তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া (গৃহ-সঙ্গিনী পতি সর্ব্বস্ব প্রাণ) খাদিজার কাছে আসিলেন এবং (জ্বরাক্রান্তির আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায়) বলিলেন—আমার গায়ে কম্বল দাও, আমার গায়ে কম্বল দাও। খাদিজা (রাঃ) কম্বল আনিয়া গায়ে দিলেন। কিছু সময় পর ঐ জ্বর-জ্বরভাব এবং ভয়-ভয়ভাব চলিয়া গেল। অতঃপর হযরত (দঃ) খাদিজাকে সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। হযরত (দঃ) (বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মস্ত বড় ভারি বোঝা তাঁহার উপর চাপান হইবে বোধ হইতেছে, তাই তিনি) বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে—আমার জীবনে কুলাইবে কি না? আমার শরীরে সহ্য হইবে কি না, না জীবন বাহির হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। খাদিজা (রাঃ) (অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রায় বাল্যকাল হইতেই জানিতেন এবং দীর্ঘ পনর বৎসর হইতেও একেবারে অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপেই বসবাস করিয়াছেন। তিনি) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, كلا والله ما يخزيك الله ابدا —খোদার কসম, কিছুতেই নয়, আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করিবেন না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করিবেন—আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা মানবতার চরম উৎকর্ষের মূল সাতটি খাছলতই আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। যথাঃ—)

১। انك لتصل الرحم ঃ—আপনি আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মীয়তার হক্ক আদায় করতঃ আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেন না এবং সম্পর্ক-ছেদন করেন না।*

\+ এই অবস্থায় কম্পন বা ভয় কোন অস্বাভাবিক বস্তু নয়। হঠাৎ অতি বড় একটি বোঝার চাপ তাঁহার উপর পড়িয়াছে—জিব্রিল ফেরেশতার সহিত মোলাকাত ; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান অসীম অফুরন্ত শক্তির আকরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা অত্যধিক ফয়েজের চাপ, সর্ব্বোপরি ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্ব ভারের চাপ—এতগুলি চাপ হঠাৎ এক সঙ্গে। কাজেই রক্ত মাংসের শরীরে জ্বর, কম্পন ইত্যাদি না হইয়া পারে না। রসুলুল্লার আত্মা ও আধ্যাত্মিক শক্তি যত বড়ই হউক না কেন দেহটি ত মানুষেরই দেহ ছিল।

* সাধারণতঃ লোক সমাজে মামু ভাগ্নে, চাচা ভাতিজা, চাচাত ভাইদের সঙ্গেই বিষয় সম্পত্তির সহিত জড়িত থাকার কারণে ঝগড়া বিরোধ মনোমালিন্য বেশী হয়। কিন্তু হযরত রসুলুল্লার শিক্ষা এই যে, এই সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা জন্মান যাইবে না। তাদের সঙ্গে মিলন ও সৌহৃদ্য বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বভাব হযরতের নবুয়ত পাওয়ার পূর্ব্বেই ছিল, তার প্রমাণ খাদিজার এই সাক্ষ্য। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন কথা এবং স্বজন-প্রীতি ভিন্ন কথা। স্বজন-প্রীতি যাহা অতীব দুষণীয় তাহা হইতেছে এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া, আমানতের খেয়ানত করিয়া, বিচার ক্ষেত্রে অথবা ষ্টেটের বা অন্য কোন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

২। وتصدق الحديث—আপনি সদা সত্যবাদী ; মিথ্যা কথা বলেন না। *

৩। وتؤدى الامانة — আপনি চিরকাল পূর্ণ মাত্রায় অতিশয়বিশ্বাসী আমানতদার ; আমানতের খেয়ানত আপনি কখনও করেন নাই। (ব্যক্তিগত লেনদেনের আমানত, পারিবারিক আচার ব্যবহারের আমানত, সামাজিক বিচার অথবা খেদমত ও সেবার আমানত সবই উদ্দেশ্য।)

৪। وتحمل الكل —যে সব অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অন্ধ খঞ্জ আছে, আপনি তাহাদের বোঝা বহন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জ্জন করার ক্ষমতা নাই তাহাদের রুজির, খাওয়া-পরার ও থাকার বন্দোবস্ত আপনি করিয়া দেন।

৫। وتكسب المعدوم —আপনি বেকার সমাস্যার সমাধান করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাদের উপার্জ্জন ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অভাবগ্রস্ত ; আপনি তাহাদের কাজের ব্যবস্থা উপার্জ্জনের সংস্থান করতঃ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

৬। وتقرى الضيف —আপনি অতিথি সেবা, মেহমানের খেদমত করিয়া থাকেন।

৭। وتعين على نوائب الحق —আপনি যাবতীয় প্রকৃতিক দুর্যোগক্ষেত্রে দুস্থ জনগণের সাহায্য কল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন।

মানবতার উৎকর্ষ এই গুণগুলি যেই মানুষের মধ্যে আছে সেই মানুষ সফলকাম না হইয়া পারে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে কখনও অকৃতকার্য্য করেন না।

খাদিজা (রাঃ) এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া হযরতকে লইয়া বংশের বৃদ্ধ মুরব্বি চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। অরাকা সত্যান্বেষী সুজ্ঞানী লোক ছিলেন, অতি বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জাহেলিয়াতের যমানাতেই তিনি সত্য ধর্ম্মের তালাশে সিরিয়া দেশে যাইয়া ঈসায়ী ধার্ম্মীয় এক খাঁটী আলেমের নিকট খাটী ঈসায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি এবরানী ভাষা লিখিতেন এবং এবরানী হইতে ইঞ্জিল কেতাবের আরবী তরজমাও করিতেন। (তাহাতে পূর্ব্বের আসমানী কেতাব সমূহে তাঁহার দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি নবীগণের প্রতি অহী ও অহীবাহক ফেরেশতা জিব্রিলের বিষয় জানিতেন।) খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে বলিলেন, হে চাচা-পুত্র ভ্রাতা! আপনার ভাই-পো কি বলেন একটু শুনুন! খাদিজা (রাঃ)

প্রতিষ্ঠানের চাকুরী পদ বা টাকা পয়সা দেওরার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পক্ষপাতিত্ব করা, ইহা হারাম। পক্ষান্তরে নিজের ব্যক্তিগত জান মাল দিয়া যথাসম্ভব আত্মীয়গণের হক আদায় করা জরুরী এবং ফরয।

* এই বাক্যটি বোখারী শরীফের ৭৪০ পৃষ্ঠায় এবং পরবর্ত্তী বাক্যটি ফতহুলবারী কেতাবে উল্লেখ আছে।

ঘটনার কিছু বর্ণনাও দিলেন। অতঃপর অরাকা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন! আপনি কি দেখেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমস্ত ঘটনা অরাকাকে খুলিয়া বলিলেন! অরাকা বলিলেন, এ-ত সেই মঙ্গলময় আল্লার দুত জিব্রিল ফেরেশতা—যাঁহাকে আল্লাহ মূছা আলাইহেচ্ছালামের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। হায় আফছুছ! যদি সেদিন আমি যুবক হইতাম—যেদিন আপনি আল্লার বাণী প্রচার করিবেন। হায় আফছুছ! যদি সেদিন আমি জীবিত থাকিতাম—যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িবে। শেষের বাক্যটি শুনিয়া হযরত স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, কি? আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করিবে! অরাকা বলিলেন—হাঁ, হাঁ,! যে সত্য ধর্ম্ম আপনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন এইরূপ সত্য ধর্ম্ম বাণী যে কেহ দুনিয়াতে লইয়া আসিয়াছেন দুনিয়াবাসী তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া ছাড়ে নাই। যদি আমি সেই দিন পাই (অর্থাৎ জীবিত থাকি) তবে আমি প্রাণপণে যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব।*

অতঃপর অল্পদিনের মধেই অরাকা এন্তেকাল করিলেন। হেরা পর্ব্বত-গুহার এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য অহী বন্ধ থাকিল।↑

অহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা বর্ণনা পূর্ব্বক জাবের (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন (অহী বন্ধ থাকাবস্থায় যখন আমি অতি ব্যস্ত ও অস্থির ছিলাম+

---

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে কাহারও নিকট যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই বা যাইতে উদ্যতও হন নাই। বিবি খাদিজাই তাঁহাকে অরাকার নিকট লইয়া গিয়াছেন। ইহা মাতৃজাতির স্বভাব সুলভ কোমলতা যে, তাঁহার প্রিয়জনের কোনরূপ অস্থিরতা দেখিলে প্রাচীন পারদর্শী জ্ঞানীদের কাছে যাতায়াত করিয়া অতি শীঘ্র প্রিয়জনের অস্থিরতা দূর করিতে চেষ্টা করেন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদৌ কোনরূপ অস্থির ছিলেন না, বরং সব ব্যাপারই তিনি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। নবুওতের পদ-মর্য্যাদা, ফেরেশতার পরিচয়, অহীর হকিকত সব কিছুই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য নূতন নূতন—প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক কিছু কষ্ট এবং গুরু দায়িত্বের বোঝার চাপের দরুণ মনেও নানা কথার উদয় হইতেছিল এবং প্রাণ প্রিয়া খাদিজার কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন খাদিজার বুদ্ধিমত্তা এবং হামদরদীর উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। খাদিজার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সঙ্গে অরাকার নিকট যাইতেও কোন ওজর আপত্তি করেন নাই। অরাকাও কোন খারাপ কথা বলেন নাই বা খারাপ লোক ছিলেন না। বরং অরাকা রসুলুল্লার উম্মতের মধ্যে শামিল কি না এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে 'মোমেন' ছিলেন এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে অরাকাকে বেহেশতের নহর কূলে সাদা রেশমী পোয়াক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। নবীর স্বপ্ন অহী।

↑ (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তখনকার ঘটনা)—একদা আমি পথ চলিবার কালে হঠাৎ ঊর্দ্ধ দিকের একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন ঊর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি, সেই ফেরেশতা (জিব্রিল) যিনি হেরা পর্ব্বতের গুহায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন তিনিই আসমান জমিন পৃথিবীর মাঝখানে (অতিশয় জমকালো সোনার কুরসীতে আকাশ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এত বিরাট আকারে দেখিলাম যে,) তাঁহাকে দেখিয়া আমি পুনরায় ভয় পাইয়া গেলাম* এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে

↑ এক রেওয়ায়েত আছে—অহী প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল এবং অন্য একজন ফেরেশতাকে হযরতের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হযরত জিব্রিল (আঃ)ও মাঝে মাঝে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু যেহেতু প্রথমবারের অহীর ভারে হযরতের অনেক কষ্ট হইয়াছিল ; তাই তিন বৎসর যাবৎ আর অহী আনেন নাই। হযরতের কিন্তু শারীরিক কষ্ট হইলেও মানসিক কোন কষ্ট হয় নাই। বরং অহী বন্ধ হওয়ার কারণে মনোবেদনা ও বান্ধবের মিলনের বিচ্ছেদ-যাতনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। সাময়িক ভাবে অহী বন্ধ করিয়া এইরূপ আগ্রহ ও মিলনাকাঙ্খা বর্দ্ধিত করাই আল্লার হেকমত ছিল। সাধারণতঃ বলা হয় অহী ছয়মাস কাল বন্ধ ছিল।

+ অহী প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবের সহিত মিলন-সূত্র। বান্ধবের মিলনের যে কি স্বাদ তাহা একমাত্র প্রেমিকজন ব্যতীত অন্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। যাঁহারা আল্লার প্রেমিক হইয়া খাঁটী পীরের কাছে তালকীন লইয়া আল্লার জেকের মোজাহাদা করতঃ আল্লার প্রেমকে সত্যিকার ভাবে খাঁটী ও স্থায়ী করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা আল্লার প্রেমের মিলনের স্বাদের কিঞ্চিৎ নজীর বা নমুনা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। এত বড় স্বাদের জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের মন কত উতলা এবং কত উৎকণ্ঠিতই না হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী বন্ধ থাকাকালে এইরূপ বিচ্ছেদ-যাতনাই ভোগ করিতেছিলেন এবং বিচ্ছেদ-যাতনা সময় সময় এত চরমে পৌঁছিয়া যাইত যে, তিনি হেরা পর্ব্বতের চূড়ার উপরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু পরম প্রেমিক তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমাগ্নির আহুতি অনুক্ষণ গোপনে নিরীক্ষণ করিতেন, সান্ত্বনাও দিতেন, প্রেমাগ্নিও বাড়াইতেন। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধ জগতের বাণী আসিত يا محمد انك لرسول الله হে মোহাম্মদ! কি করেন আপনি? আপনি যে আল্লার রসুল—প্রেরিত দূত। সাধারণ দূত নহেন, আল্লার প্রতিনিধি দূত। আপনাকে যে সেই প্রধিনিধিত্বের সমস্ত গুরুদায়িত্ব বহন করিতেই হইবে।

• শৈশবাবস্থায় উস্তাদকে, পীরকে বা অন্য কোন মুরব্বিকে দেখিয়া ছেলেরা ভয় পায়। কিন্তু সে ভয় কোনরূপ ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় হয় না, বরং বড়দের আদব যাদের অন্তরে আছে তাদের উপর প্রাথমিক অবস্থায় এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত শক্তিমত্ত্বার প্রভাব পতিত হয়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লামের এই ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয় ছিল, অন্য কিছুই নহে।

আসিয়া এইবারও বলিলাম—دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي "আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও, আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও। এই দিন এই পাঁচটি আয়াত বা ছুরা নাযেল হয়—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - ↑

তারপর আর অহী বন্ধ হয় নাই, অনবরত পর পর অহী আসিতে লাগিল।

৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—প্রথম প্রথম যখন অহী নাযেল হইত তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) অনেক কষ্ট করিতেন। এমনকি, জিব্রিল ফেরেশতা যখন অহী পড়িয়া শুনাইতেন, তখন হযরত (দঃ) সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়িয়া পড়া আরম্ভ করিতেন ; × যাহাতে অহীর একটি অক্ষরও ছুটিয়া না যায় বা বেশী কম না হইতে পারে। ইহাতে রসুলুল্লার (দঃ) অনেক কষ্ট হইত ; যাহা লাঘব করার জন্য কোরআনের এই চারিটি আয়াত নাযেল হয়।

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ -

---

↑ ইহা ২৯ পারা মোদ্দাচ্ছেরের প্রথম পাঁচটি আয়াত। অর্থ :—হে কমলিওয়ালা ! (কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া থাকার সময় নাই।) আপনি উঠুন, লোকদিগকে (তাদের 'রব' প্রভু সম্বন্ধে, প্রভুর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং আখেরাতে যে প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইয়া এই সব দায়িত্বের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দিন। (মানব সমাজের কল্যাণ সাধন এবং তাহাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাহাদেরই হিতের জন্য তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য বাণী প্রচার করাই ইসলাম ধর্ম্মের প্রথম আদেশ।) এবং আপনি (নামায কায়েম করিয়া—প্রভুকে সেজদা করিয়া প্রভুর নিকট মাথা নত করতঃ) প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। কাপড় জামা, দেহ ও আত্মা পবিত্র করুন। (এক আল্লার হইয়া যান ;) যাবতীয় অপবিত্রতা—বিশেষতঃ মূর্ত্তি পূজা গায়রুল্লার পূজা এবং এক আল্লার প্রেম আল্লার ভক্তি ব্যতিরেকে আল্লাহ বিরোধী যত কামনা বাসনা প্রেম ভক্তি অর্চ্চনা আরাধনা আছে সব চিরতরে বর্জ্জন ও ত্যাগ করিয়া থাকুন— এ পর্য্যন্ত যেরূপ পাক-পবিত্র রহিয়াছেন চিরকালই তদ্রূপ থাকিবেন।

× ইহা বড়ই কঠিন কাজ। কারণ ইহাতে জিহ্বা, ঠোঁট, কান ও মন চারিটি অঙ্গকে একই সঙ্গে কর্ম্মব্যস্ত রাখিতে হয়।

অর্থাৎ—(হে প্রিয় রসুল !) আপনি অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার জন্য (এত কষ্ট করিবেন না—) সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়িবেন না, জিব্রিল যখন পড়েন আপনি মন দিয়া কান লাগাইয়া শুনিবেন । সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়ার এবং পুনরায় আপনার মুখে অবিকলরূপে পড়াইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর ন্যস্ত, ইহার জিম্মাদার আমি। অতএব, আমি যখন (জিব্রিলের মুখে আমার অহী) পড়িব তখন আপনি শুধু মনোযোগের সহিত অনুধাবন ও শ্রবণ করিবেন। পুনরায় বলিতেছি, ঐ অহী পূর্ণরূপে আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করান ও নির্ভুলরূপে পড়াইয়া দেওয়া আমার জিম্মায় রহিয়াছে। (ছুরা কেয়ামাহ্)

এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। শুধু জিব্রিল যখন যাহা পড়িতেন খুব মনোযোগ দিয়া পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে তাহা কান লাগাইয়া শুনিতেন। তাহাতেই সব কিছু তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত এবং জিব্রিল চলিয়া যাওয়ার পর অবিকলরূপে উহা পড়িতে পারিতেন, একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হইত না।

৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানব জগতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অপেক্ষা বড় দাতা আর হয় নাই হইবেও না; তিনিই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করিয়া যখন রমজান শরীফ আসিত— যখন জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন, তখন তাঁহার দানশীলতার সীমা পরিসীমা থাকিত না। জিব্রিল (আঃ) পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যহ আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরআন দওর করাইতেন।↑

ইবনে আব্বাস (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ফয়েজ, বরকত ও আধ্যাত্মিক) দান-দৃষ্টি জীবনীশক্তিবাহী বসন্তের মলয় বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ক্রিয়াশীল ছিল।

↑ দওর করানোর অর্থ—পরস্পর একে অন্যকে পাঠ করিয়া শুনানো ; যেমন বর্ত্তমানেও হাফেজদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, একজন হাফেজ সাহেব প্রথমে পড়েন, অন্য হাফেজ সাহেব শুনিতে থাকেন—যাহাতে একটি জের জবরেরও ভুল না হয়। তারপর দ্বিতীয় হাফেজ সাহেব পড়েন, প্রথম হাফেজ সাহেব শুনেন। এইরূপে পুরা কোরআন শরীফ একে অন্যকে শুনান এবং পুরা কোরআন শরীফের হেফজ কায়েম রাখেন। এইরূপেই জিব্রিল (আঃ) পড়িয়া শুনাইতেন হযরতকে, আবার হযরত পড়িয়া শুনাইতেন জিব্রিলকে। প্রত্যেক রমজানেই এইরূপ করিতেন—এমনকি যে বৎসর রসুলুল্লাহ (দঃ) এন্তেকাল করেন সেই বৎসর সম্পুর্ণ কোরআন শরীফ দুইবার দওর করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছের এই অংশই অত্র পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, অহী সংরক্ষণে কিরূপ বাহিক সুব্যবস্থাও আল্লাহ [illegible] কোরআন অহীরই প্রধান বস্তু।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত মানব জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছখী বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দানশীল ছিলেন। হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কখনও কোন সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি "না" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। রসুলুল্লার (দঃ) মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে; ছনিয়ার ধন-দৌলত তাঁহার মর্যাদার তুলনায় অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু। এই সব বস্তু দান করা ত তাঁহার নিকট খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই হাদীছে যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছখী ও দাতা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে, বরং আরও ব্যাপক। অর্থাৎ যে দানের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পশুত্বের স্বভাববিশিষ্ট মানুষের জড়পিণ্ড ও মাটির দেহের মর্য্যাদা আধ্যাত্মিক উন্নতির কারনে ফেরেশতারও উর্দ্ধে উঠিয়া যায় সেই আধ্যাত্মিক ফয়েজ দানেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন। রসুলুল্লার (দঃ) ফয়েজ কত শক্তিশালী কত ব্যাপক ছিল তাহা কিঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি করিবার জন্য বসন্তের মলয় বায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ছনিয়ার বুকে বসন্তের বায়ুর দ্বারা কি ব্যাপক পরিবর্ত্তনই না আসে! হিম ঋতুর প্রকোপে গাছের পাতা ঝরিয়া গাছগুলি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় থাকে, তরু লতা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় বিবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া যায়, সমস্ত পশু-পক্ষী এমনকি মানুষের মনের পুলক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যখনই ঋতুরাজ মধুকাল বসন্তের হাওয়া জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে থাকে—তখনই পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, ঘাস-পাতা, গাছপালা সকলেই নূতন জীবন ধারণ করিয়া উঠে। বসন্তের জীবনী শক্তি-বাহী মলয় বায়ুর বদৌলতে গাছপালার শুষ্ক ডালগুলি নূতন পাতায় ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, অগ্নিদগ্ধ মাটি সবুজ ঘাসে ছাইয়া যায়, সকলের প্রাণেই উল্লাসের ঢেউ খেলিতে থাকে। তেমনই ভাবে যুগ যুগান্তব্যাপী মৃতবৎ আত্মাসমূহ এবং মেঘাচ্ছন্ন অন্তকরণগুলি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ছোহবতের ও শিক্ষার ফয়েজ ও বরকতের কল্যাণে শুধু সজীব, জীবন্ত ও আলোকিতই নহে—বরং এমন সঞ্জীবনী-শক্তিসম্পন্ন, জীবনদাতা ও আলোদাতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত জগতকে নূতন জীবনের ও নূতন আলোকের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। এই তথ্যটি কোন এক কবি কি ভসুন্দরাবে বুঝাইয়াছেন!

در فشانی نے تری
قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا
آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر
غیروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی
جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

অর্থাৎ রসুলুল্লার ফয়েজ ও শিক্ষা সমূহ কি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিল যে, তিনি বিন্দুকে সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানে ও গুণে নগণ্য বিন্দুবৎ ছিল তাহাদিগকে তিনি সাগর সমতুল্যরূপে গড়িয়াছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে আলোকপূর্ণ ও অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে তিনি শুধু জীবিতই নহে— জীবনদাতারূপে গঠন করিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরাই ছিল পথভ্রষ্ট—তাহাদিগকে তিনি গঠন করিয়াছিলেন সারা জগতের পথ প্রদর্শক ও পরিচালকরূপে।

আলোচ্য হাদীছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু যেরূপ বসন্তের সুশীতল মলয় বায়ুর দ্বারা জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আধ্যাত্মিক ফয়েজের সামান্য ছিটা ফোটার দ্বারা তার চাইতে অধিক জীবনীশক্তি জগদ্বাসী লাভ করিয়াছে ও কেয়ামত পর্যন্ত তাহা লাভ করিতে থাকিবে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন এই ছুনিয়াতে ছিলেন তখন তাঁহার ছোহবত ও সাহচর্য্য দ্বারা এবং মজলিসের দ্বারা এই ফয়েজ বিতরিত হইত। উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাত্রসমূহ তদ্বারা ফলিত ও ফুলিত হইত। হানযালা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী একদিন হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া এই অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ বর্ণনা করিয়াছেন। হানযালা (রাঃ) হযরতের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনার ছোহবতে ও সাহচর্য্যে যখন আমরা থাকি তখন আমাদের মনের এমন অবস্থা হয় যে আমরা আল্লাকে, আখেরাতকে এবং বেহেশত-দোজখকে যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যখন আপনার দরবার হইতে উঠিয়া স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যাইয়া মিশি তখন আর দেলের ঐরূপ অবস্থা থাকে না; ঈমানের আভা যেন কম হইয়া যায়। এরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। হযরত বলিলেন—আমার মজলিসে তোমাদের দেলের যে অবস্থা হয় ঐ অবস্থা সব সময় থাকিলে তোমরা এত উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে যে, ফেরেশতাগণ রাস্তাঘাটে এবং তোমাদের শয়ন শয্যায় তোমাদের সঙ্গে মোছাফাহা করিতেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এন্তেকালের পর এই নেয়ামত হইতে ছুনিয়া মাহরূম হইয়া গিয়াছে। কারণ, সেই মোবারক দরবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সেই মোবারক নজরও উঠিয়া গিয়াছে। আনাস (রাঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমরা হযরত রসুলুল্লার (দঃ) দাফন কার্য্য সমাধা করিতে না করিতেই আমাদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হইয়াছে। ছাহাবী আনাসের উক্তির অর্থ এই নয় যে, ছাহাবীগণের ঈমান পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

না, না, ঈমানের জ্যোতি ও আভার উপর কিঞ্চিৎ মলিনতা আসিয়া গিয়াছে। এই কথাটিই মাওলানা রুমী এইভাবে বুঝাইয়াছেন :—

گر ز باغ دل خلالے کم بود — بر دل سالک هزاران غم بود

অর্থাৎ আল্লার আশেক যাঁহারা তাঁহাদের অন্তর—উদ্যান হইতে একটি মাত্র তৃণ কমিয়া গেলেই তাঁহারা অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়েন যে, হায়! আমাদের ঈমান বুঝি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান নষ্ট হয় না। ঈমানের আভা ও জ্যোতি কিছু কমিয়া যায় মাত্র।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ফয়েজ তাঁহার পর তাঁহার প্রদত্ত কোরআন-হাদীছের এলেমের ও আলেমের মাধ্যমে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا وَاَنَا اَجْوَدُ بَنِیْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ بَعْدِیْ

رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ ۔

অর্থাৎ আল্লার চেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আর কেহ নাই। তারপর মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আমি। আমার পরে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা সেই আলেম ব্যক্তি যিনি এলেম হাসিল করিয়াছেন এবং ছুনিয়ায় মত্ত না হইয়া সেই এলেম প্রচার ও প্রসারেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এই বিষয়টিই মাওলানা রুমী এইরূপে বুঝাইয়াছেন :—

چونکه خورشید رفت و ما را کرد داغ

چاره نبود در مقامش از چراغ

چونکه گل رفت و گلستان شد خراب

چاره نبود در مقامش از گلاب

অর্থাৎ সূর্য্য যখন আমাদিগেকে অন্ধকারে ফেলিয়া অস্তমিত হইয়া যায় তখন চেরাগ জ্বালাইয়া কিঞ্চিৎ আলো হাসিল করা ব্যতিরেকে আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না। গোলাপ ফুল যখন ছুনিয়াতে পাওয়া যায় না এবং গোলাপ ফুলের উদ্যান নষ্ট হইয়া যায়, তখন গোলাপী আতর ও গোলাপের পানি হইতে সুগন্ধি লাভ করা ব্যতিরেকে গোলাপ ফুলের সুগন্ধি হাসিল করার অন্য কোন উপায় থাকে না। এইরূপ নবী (দঃ) যখন ছুনিয়াতে নাই, নবীর মজলিস নাই, নবীর দৃষ্টি নাই, তখন নবীর খাঁটী নায়েবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের মজলিসে নবীর বাণী শ্রবণ করা ব্যতিরেকে মানব মুক্তির অন্য কোনও পথ নাই।

৬। **হাদীছ :—*** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— আবু সুফিয়ান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, ** ছোলেহ্-হোদায়বিয়ার+ পর তিনি বাণিজ্য করিতে সিরিয়া দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মক্কার কাফের কোরায়েশ দলের আরও অনেক সওদাগর ছিল। তিনি বলেন, এই সময় হঠাৎ একদিন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। হেরাক্লিয়াস তখন ইলিয়া শহরে (বায়তুল-মোকাদ্দাসে) আসিয়াছিলেন।÷ সেখানে তিনি দরবার সাজান এবং দরবারে তাঁহার পরিষদবর্গের সম্মুখে একসঙ্গে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান; দোভাষীর মারফৎ কথাবার্ত্তা হয়। হেরাক্লিয়াস দোভাষী মারফৎ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশে যে লোকটি নবুয়তের দাবী করিতেছেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় আপনাদের মধ্যে কেহ আছেন কি? যদি থাকেন, তিনি কে? আবু সুফিয়ান বলেন—আমি বলিলাম, হাঁ আছে, আমিই তাঁহার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হেরাক্লিয়াস তখন আমার সম্বন্ধে বলিলেন, এই লোকটিকে আমার নিকট বসাও এবং তাহার অন্যান্য সাথীদিগকে তাহার নিকটবর্ত্তী পিছনে বসাও। তারপর হেরাক্লিয়াস দোভাষীকে বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে) বল, আমি ইহার নিকট (আবু সুফিয়ানের নিকট) নবুয়তের দাবীদার লোকটি সম্বন্ধে

---

* এই হাদীছখানার তরজমা মদীনা শরীফে রসুলুল্লার মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে—রওজা শরীফ সংলগ্ন "রওজাতুম মিন্ রিয়াজিল জান্নাহ"তে বসিয়া লেখা হইয়াছে।

** আলোচ্য ঘটনাটি যখন সংঘটিত হইয়াছিল তখন আবু সুফিয়ান কাফের ছিলেন কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মোসলমান অবস্থায় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

+ ষষ্ঠ হিজরীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবা সঙ্গে লইয়া "ওমরা" করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর মক্কার নিকটবর্ত্তী "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে কোরায়েশগণ কর্ত্তৃক তিনি মক্কায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধের হুঙ্কার শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ একটি মীমাংসায় উপনীত হইয়া দশ বৎসরের মেয়াদে একটি সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি চুক্তিই ইতিহাসে "সোলেহ-হোদায়বিয়া" নামে পরিচিত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইন্‌শা-আল্লাহ তৃতীয় খণ্ডে রসুলুল্লার জেহাদ সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণে বর্ণিত হইবে। সোলেহ-হোদায়বিয়ার দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোরায়েশদের জন্য সিরিয়ার বাণিজ্য পথে মোসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট অবরোধ দূর হইল এবং তাহারা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরারম্ভ করিল।

÷ রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছিল, রোম সম্রাট খৃষ্টান হেরাক্লিয়াস মান্নত মানিয়া ছিলেন যে, যদি রোমানগণ এই যুদ্ধে জয়ী হয় তবে তিনি পদব্রজে পবিত্র ইলিয়া (বায়তুল মোকাদ্দস) জেয়ারত করিবেন। যুদ্ধে রোমানগণ জয়ী হইলে সম্রাট হেরাক্লিয়াস বায়তুল মোকাদ্দসে উপস্থিত হয়।

কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি কোন কথা মিথ্যা বলেন, তবে আপনারা তাঁহার মিথ্যাটুকু আমাকে ধরাইয়া দিবেন। আবু সুফিয়ান (এখন মোসলমান অবস্থায়) বলিতেছেন যে, খোদার কসম—যদি তখন মানবতার অনুভূতি এবং সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক মিথ্যাবাদীরূপে প্রচারিত হওয়ার লজ্জা আমাকে বাধা প্রদান না করিত তাহা হইলে আমি রোম সম্রাটের নিকট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করিয়া তাঁহার মিশনকে ব্যর্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই ছাড়িতাম না।

হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর :

হেরাক্লিয়াস—এই লোকটির জন্ম কিরূপ বংশে ?

আবু সুফিয়ান—তাঁহার জন্ম অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে।

হেরাক্লিয়াস—এইরূপ কথা অর্থাৎ নবুয়তের দাবী আপনাদের বংশে তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ করিয়াছেন কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার দলভুক্ত হয় বেশী, না—গরীব জনসাধারণ ?

আবু সুফিয়ান—গরীব জনসাধারণ।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার দলের লোক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, না—কমিতেছে ?

আবু সুফিয়ান—কমিতেছে না, বরং ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়িতেছে।

হেরাক্লিয়াস—কেহ তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ কোনও দোষ-ত্রুটি দেখিয়া সে ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করে কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—নবুয়তের দাবী করিবার পূর্ব্বে কখনও কি এই লোকটির কোন মিথ্যাবাদিতা আপনাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—এই লোক কি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ?

আবু সুফিয়ান—না।

কিন্তু আমরা সম্প্রতি একটি সন্ধিচুক্তি করিয়াছি ; জানি না ঐ ব্যাপারে তিনি কি করেন !+ (আবু সুফিয়ান বলেন,) এই কথাটুকু ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার মত সুযোগ আমি আর পাই নাই।

+ আবু সুফিয়ান এখানে চুক্তিভঙ্গের যে আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রসুলুল্লার কোনও ত্রুটির দরুণ নহে, বরং কোরায়েশগণই সন্ধির শর্ত্তের বরখেলাফ রসুলুল্লার পক্ষীয় এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজ পক্ষীয় দলকে গোপনে সমর সাহায্য করিয়া চুক্তিভঙ্গের সূচনা করে। আবু সুফিয়ান নিজেদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফলের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার (দলের) সঙ্গে আপনাদের কোনও যুদ্ধ হইয়াছে কি? এবং হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে?

আবু স্থফিয়ান—হাঁ, যুদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধে কখনও তিনি জয়ী হন, আমরা পরাজিত হই (যেমন বদরের যুদ্ধ)। কখনও আমরা জয়ী হই, তিনি পরাজিত হন (যেমন ওহোদের যুদ্ধ)।

হেরাক্লিয়াস—তিনি আপনাদিগকে কি কি আদেশ করিয়া থাকেন?

আবু স্থফিয়ান—তিনি আমাদিগকে এই কাজসমূহের আদেশ করিয়া থাকেন:—

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ

وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَوَفَاءِ الْعَهْدِ

وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَالصِّلَةِ *

১। এক আল্লার বন্দেগী কর, অন্য কাহারও পূজা করিও না, কাহাকেও আল্লার সহিত শরীক করিও না (—মানুষ-পূজা, মূর্ত্তি-পূজা, দেব-দেবীর পূজা, পীর-পয়গাম্বর পূজা ইত্যাদি করিও না) এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ কর।

২। নামায কায়েম কর। (ঐ তৌহিদকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করিতে কাহাকেও সেজদা না করিয়া এক আল্লাহকে সেজদা করতঃ নামায পড়।)

৩। যাকাৎ দান (করিয়া গরীবের উপকার) কর। (গরীবের প্রতি দয়ালু হও)।

৪। সত্যবাদী হও (মিথ্যা বলিও না, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বিশ্বস্ত প্রমাণিত হও)।

৫। সংযমী হও। (চরিত্রের সততা ও সতীত্ব রক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন-যাপনে কামরিপু ও লোভরিপু দমন করিয়া যাবতীয় দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা বর্জ্জন করিয়া চল)।

৬। আমানতের পূর্ণ হেফাজত করিয়া প্রত্যেকের হক নিজ দায়িত্ব জ্ঞানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও (আমানতে খেয়ানত বা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করিও না)।

৭। মানুষের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী হইও না, বরং প্রত্যেকের সাথে মধুর ব্যবহার দ্বারা মিল-মহব্বত কায়েম রাখ। বিশেষতঃ মাতা পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, মামু-ভাগ্নে, ফুফু-খালা এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, যাহাদের সহিত সকল সময় মেলামেশা ও উঠাবসা হইয়া থাকে তাহাদের

* الزكوة বোখারী শরীফে ১৮৭ পৃষ্ঠায়, وفاء العهد ফতহুলবারীতে এবং اداء الامانة মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।

সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিও না। সর্ব্বাবস্থায় তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার দ্বারা পরস্পর মিল-মহব্বত কায়েম রাখিয়া চল।*

আবু সুফিয়ান বলেন—এই দশটি প্রশ্ন ও উত্তরের পর হেরাক্লিয়াস প্রতিটি উত্তরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোভাষীকে বলিলেন—তুমি বুঝাইয়া দাও যে, আমি প্রথম প্রশ্ন তাঁহার (রসুলুল্লার) বংশ সম্বন্ধে করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, তাঁহার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লার রসুলগণ উচ্চ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছি যে, ইতিপূর্বে আপনাদের মধ্যে এই দাবী কেহ করিয়াছে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি এরূপ কথা ইতিপূর্বে কেহ বলিয়া থাকিত, তবে আমি মনে করিতাম যে, লোকটি অন্যের অনুকরণ করিতেছে; অন্যের দেখাদেখি একটা কথা বলিতেছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার বাপ-দাদা পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ রাজা বাদশা ছিলেন কি না? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহ রাজা বাদশাহ থাকিতেন তবে সন্দেহ করা যাইত যে, হয়ত তিনি তাঁহার বাপ-দাদার সিংহাসন লাভ করিতে চাহেন। চতুর্থ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, উক্ত লোকটি এই কথা বলার পূর্ব্বে অর্থাৎ নবুয়তের দাবী করার পূর্ব্বে কখনও কোন কথায় তাঁহাকে আপনারা মিথ্যাবাদী রূপে পাইয়াছেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার ধারণা এই যে, যে লোক জীবন ভর মানুষের বেলায় মিথ্যা পরিহার করিয়া আসিয়াছেন তিনি যে হঠাৎ আল্লার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন ইহা অসম্ভব। পঞ্চম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুগামী হইতেছে বেশী, না—গরীব জনসাধারণ? আপনি বলিয়াছেন যে, গরীব জনসাধারণ। আমার মন্তব্য এই যে, সাধারণতঃ গরীব জনসাধারণই প্রথমে সত্য নবীগণের অনুগামী হইয়া থাকে! ষষ্ঠ প্রশ্ন এই করিয়া-

---

* আরবী ভাষায় الصلة শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, এত দীর্ঘ অনুবাদ করিয়াও আমার মনে হইতেছে না যে, শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি।

আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার করা তাহাদের উপকার করা, বিপদে তাহাদের সাহায্য করা ইহা মানব চরিত্রের অতি উচ্চ স্তরের স্বভাব, ইহাকে স্বজন-তোষণ বলা যায় না। নিন্দনীয় স্বজন-তোষণ ও ঘৃণিত স্বজন-প্রীতির অর্থ এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মীয়ের মন রক্ষা করা—যেমন রাষ্ট্রীয় আমানতের মাল বা পদ উপযুক্ত স্থানে ও যোগ্যতর ব্যক্তিকে না দিয়া নিজের অযোগ্য আত্মীয়কে দেওয়া। নিজের মাল আত্মীয়কে দেওয়া দূষণীয় নহে এবং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে নয়, বরং যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাপিয়া যদি কোন যোগ্যতম আত্মীয়কে রাষ্ট্রীয় পদ বা মাল দেওয়া হয় তাহা হইলেও দূষনীয় হইবে না।

ছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, না—কমিতেছে ? আপনি বলিয়াছেন, বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিক পক্ষে সত্য ধর্ম্ম এবং সত্য ঈমানের ইহাই লক্ষণ যে, ক্রমান্বয় উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে—এইভাবে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সপ্তম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কেহ সেই ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় অপছন্দ করিয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে কি ? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ঈমান ও সত্যিকারের ধর্ম্ম যখন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন সে উহাতে এত আস্বাদ লাভ করে যে, সে আর তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। অষ্টম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, এই লোকটি বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করেন কি ? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্য নবীগণ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। নবম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, আপনাদের সঙ্গে তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে ? আপনি বলিয়াছেন—যুদ্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধে কখনও তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, আবার কখনও পরাজিতও হইয়াছেন। আমার মন্তব্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থিব ব্যাপারে সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বদা জয়ী হওয়া পয়গাম্বরের কোন বিশেষত্ব নহে বরং কষ্ট, সাধনা, তিতিক্ষা, পরাজয় ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া পরিণামে জয়যুক্ত হওয়াই তাঁহাদের সাধারণ নিয়ম। দশম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তিনি কি কি আদেশ ও নিষেধ করিয়া থাকেন ? আপনি বলিয়াছেন যে, তিনি এক আল্লার বন্দেগী করিতে আদেশ করেন, কাহাকেও আল্লার শরীফ করিতে নিষেধ করেন—(মূর্ত্তি বা দেব-দেবীর পূজা বা মানুষ পূজা করিতে নিষেধ করেন।) আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িতে, সত্যবাদী হইতে, বিশ্বস্ত, সদাচারী ও সংযমী হইতে, পরোপকারী সদয় ও সদ্ব্যবহারকারী হইতে বলেন। আমার মন্তব্য এই যে, আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন বাস্তবিকই যদি সে সব সত্য হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, এই ব্যক্তি অতি শীঘ্র আমার পায়ের তলার এই দেশ পর্য্যন্ত জয় ও অধিকার করিয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (অর্থাৎ আখেরী পয়গাম্বর—শেষ যামানার নবী) আসিবেন। কিন্তু আমার এই ধারণা ছিল না যে, তিনি আপনাদের আরববাসীদের মধ্য হইতে হইবেন।* যদি

* পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কিতাব সমূহে আমাদের হজরত (দঃ) সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথা বর্ণিত ছিল। কিন্তু পাদ্রিগণ আসল কিতাবের বর্ণনা ও শব্দাবলী পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। হেরাক্লিয়াস আসল কিতাবের প্রকৃত বর্ণনা দেখেন নাই। পরিবর্ত্তিত বর্ণনা দেখিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, আখেরী পয়গাম্বর আরব দেশে পয়দা হইবেন।

আমি বুঝি যে, আমি তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিব, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিব। আর যদি আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ও সাহচর্য-লাভ জোটে তবে তাঁহার পদ ধৌত করিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য প্রকাশ করার পর হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত পত্রখানা আনাইলেন এবং উহা পাঠ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পত্রখানা দেহ্ইয়া কল্‌বী নামক ছাহাবীর হাতে বোছরার * শাসনকর্ত্তার মারফৎ হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানার ভাষা ও মর্ম্ম এই ছিল।

بسم الله الرحمن الرحيم -

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ - سَلَامٌ
عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ -
اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ - فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ
اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

"বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহীম"

প্রেরক—আল্লার দাস, আল্লার নিয়োজিত ও প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ।

প্রাপক—রোমান জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি হেরাক্লিয়াস।

সম্ভাষণ—শান্তি তাহাদের জন্য যাহারা সত্য ধর্ম্মের অনুসারী। অতঃপর :—

আমি আপনাকে ইসলামের আকুল আহ্বান জানাইতেছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন (স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তার আনুগত্য স্বীকার করুন)। তাহা হইলেই আপনি শান্তি (ও মুক্তি) লাভ করিতে পারিবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (পরকালের মুক্তি এবং

* বর্ত্তমান জর্দ্দানের অন্তর্গত তৎকালীন একটি শহরের নাম বোছরা।

ইহকালের রাজত্বের সম্মান ও সুখ ভোগ) দান করিবেন।* যদি আপনি আমার এই আহ্বানে সাড়া না দেন, তবে (আপনার পাপ ত আপনার থাকিবেই, তদতিরিক্ত) আপনার প্রজাবর্গ ও অনুচরবর্গের পাপের বোঝাও আপনার উপর পড়িবে। (আল্লাহ তাঁহার স্বীয় পবিত্র বাণীর মধ্যে নবী ও নবীর উম্মতগণের পক্ষ হইতে ফরমাইয়াছেন) হে কেতাবধারী জ্ঞানিগণ! আসুন! (সংস্কার পরিহার করিয়া ও স্থির মস্তিষ্ক লইয়া আমরা চিন্তা করি—) আপনাদের ও আমাদের মধ্যে (পার্থক্য কতটুকু এবং ঐক্যমত কতটুকু?) যতটুকু ঐক্যমত ততটুকুর মধ্যে আমরা এক হইয়া যাই। আপনারাও নাস্তিক নন আমরাও নাস্তিক নই। আপনারাও সাকারবাদী মূর্তিপূজক বা দেব-দেবীর পূজারী নন—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী এবং আমরাও সাকারবাদী নই, মূর্তিপূজক বা দেব-দেবীর পূজারী নই; নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী। আসুন আমরা সকলে একত্র ও একতাবদ্ধ হইয়া এক নিরাকার খোদার বন্দেগী করি; এক খোদার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরীক না করি; এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও—কোন মানুষকে বা কোন সৃষ্ট পদার্থকে আমরা খোদা রূপে গ্রহণ না করি। (মুখের কথায় বা অন্যকে বুঝাইতে অনেকেই সততার পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু যাহার মধ্যে কার্য্যতঃ ও স্বার্থের বিপক্ষেও সততা পাওয়া যায় সে-ই প্রকৃত মানুষ। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে,) তোমাদের আন্তরিক আহ্বানেও যদি তাহারা সাড়া না দেয়, তবে খবরদার! তোমরা যেন স্রোতে ভাসিয়া না যাও। একতালাভ করিতে গিয়া মূলমন্ত্র যেন ভুলিয়া না যাও। যদি তাহারা তোমাদের এই সরল সত্য ডাকে সাড়া না দেয় তবে তোমরা (আদৌ কোনরূপ ভয়, দুর্ব্বলতা বা হীনমন্যতা—Inferiority complex নিজেদের মধ্যে আসিতে দিও না।) দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা কিন্তু অটল অনড়—এক খোদারই উপাশক এক খোদারই আনুগত্য স্বীকারকারী।

আবু সুফিয়ান বলেন—হেরাক্লিয়াস যখন তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং পত্র পড়া শেষ হইল, তখন লোকদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল ও হৈ হোল্লাড় পরিয়া গেল। (আর কোন কথা হইতে পারিল না;) আমাদিগকে বাহির করিয়া দেয়া হইল। বাহিরে আসিয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম ওহে! আমার মনে

---

* হেরাক্লিয়াস নাছরানী ছিলেন। ইহুদী বা নাছরানী ইসলাম গ্রহণ করিলে হাদীছ অনুযায়ী সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে এবং তাঁহার অনুকরণ করিয়া অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিবে' সে কারণেও তিনি অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবেন।

হয় আবু কাবশার পুত্রের + (মনোবাঞ্ছা যেন পুরা হইয়া যাইবে,) তাঁহার মিশন এত শক্তিশালী হইয়াছে যে, শ্বতাঙ্গদের রাজা রোম সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করে। আবু সুফিয়ান বলেন—সেই হইতেই আমার বিশ্বাস জন্মিয়া ছিল যে, মোহাম্মদ (দঃ)-এর মিশন বিজয়ী ও সফলকাম হইবে—এমনকি মক্কাবিজয়ের সময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক ও সামর্থ দান করিলেন।

ইবনে নাতুর* হেরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান পাদ্রী ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত হেরাক্লিয়াসের বন্ধুত্বও ছিল। তিনি বলিয়াছেন—হেরাক্লিয়াস যখন ইলিয়া (বায়তুল-মোকাদ্দস) আসিয়াছিলেন, তখন একদিন সকাল বেলায় তাঁহাকে খুবই বিষন্নচিত্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখাইতেছিল। তখন দরবারের একজন পাদ্রী বলিলেন, আমরা আপনাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখিতেছি! (কারণ কি ?) ইবনে নাতুর বলেন, হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যখন দরবারের লোকেরা চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আজরাত্রে আমি জ্যোতিবিদ্যার গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, খত্‌নাধারী জাতির বাদশাহ জয়লাভ করিয়াছেন। ↑ অতএব দেখ। দরকার,

---

+ রসুলুল্লার আদি পূরুষদের মধ্যে কোন একজন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম ছিল আবু কাবশাহ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার দুধ বাপের এইনাম ছিল। মক্কার কাফেরগণ রসুলুল্লার প্রতি শত্রুতামুলক ভাবে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই অপরিচিত লোকটির সহিত সম্পৃক্ত করিয়া রসুলুল্লাহকে অভিহিত করিত। "মোহাম্মদ" শব্দের অর্থ প্রশংসিত তাছাড়া কোরায়েশ বংশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির দ্বারা পরিচয় করাইলে রসুলুল্লার মর্যাদা বাড়িয়া যায় তাই তাহারা ঈর্ষা বশে রসুলুল্লাহকে ইবনে আবী কাবশাহ তথা আবু কাবশার বংশধর বা পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত।

* ইবনে নাতুর একজন প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

↑ হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তদ্বারাই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখা যায় কদাচিৎ উহার কোনও কোনটা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গেও খাপ খাইয়া যায়। যেমন, এই ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল—ঐ সময় কোরায়েশগণ রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে ছোলেহ হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছোলেহ ও সন্ধিই রসুলুল্লার (দঃ) তথা মোসলেম জাতির বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। কারন ইতিপূর্ব্বে কোথাও মোসলেম জাতির সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল না। হোদায়বিয়ার ঘটনাতে আরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় কোরায়েশগণ দলবদ্ধভাবে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায় স্বাধীন জাতি ও শক্তি হিসাবে মোসলমান জাতির সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। এখান হইতেই রসুলুল্লার (দঃ) তথা মোসলেম জাতির জয়ের সুচনা হয়। হেরাক্লিয়াস জ্যোতিবিদ্যার দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্ত্তমান জাতি নিচয়ের মধ্যে কোন্ জাতি খতনা করে। দরবারের সকলেই বলিল, ইহুদী জাতি ভিন্ন অন্য জাতি খত্‌না করে না। কিন্তু ইহুদী জাতি এত দুর্ব্বলচেতা, বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ যে, ইহাদের জন্য আপনি মোটেই চিন্তা করিবেন না। অবশ্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্ত্তাগণকে আপনি লিখিয়া পাঠান যে, ইহুদী জাতিকে যেন সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা হইতেছিল এমন সময় হেরাক্লিয়াসের দরবারে একজন লোককে উপস্থিত করা হইল যাহাকে গাস্‌সানের শাসনকর্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন; সে লোকটি রসুলুল্লার খবর বলিতেছিল। সে লোকটির নিকট যখন হেরাক্লিয়াস সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন দরবারের লোকদিগকে আদেশ করিলেন, দেখ—এই লোকটির খত্‌না করান কি না? সকলে লোকটিকে দরবারের বাহিরে লইয়া গিয়া দেখিয়া বলিল যে, হাঁ—

পন্থীদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ পন্থায় রসুলুল্লার (দঃ) আবির্ভাব ও বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেন কাহারও কোন ওজর আপত্তির সুযোগ না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা অনেক গ্রহ নক্ষত্রকে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও বিষয় বস্তুর আবির্ভাবের আলামত ও নিদর্শন বা কার্যকারণ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন গ্রহ নক্ষত্রের এই প্রভাবকে আল্লাহ তায়ালা চাক্ষুস প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন—যেমন সূর্য্যের তাছির ও কার্য্যকারিতায় দিবা-রাত্রির আবর্ত্তন ঘটে ও ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, চন্দ্রের তাছিরে জোয়ার ভাটা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অনেক গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা জাগতিক পরিবর্ত্তনের যোগাযোগ রাখিয়াছেন। কোনও একজন পয়গাম্বরকে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয় বিস্তারিত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু পূর্ব্বেই এই বিদ্যার আসল বিষয় বস্তুগুলি জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায়। পরবর্ত্তী জ্যোতিবিদগণ এ বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানের দাবী করে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। কারণ, আসল বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সঠিকভাবে গণনা করার ক্ষমতা কাহারও হইতে পারে না। তাই অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় জ্যোতিষীদের গণনা শতকরা নিরানব্বইটাই মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত হয়। আন্দাজী ঢিল ছোড়ার ন্যায় কোনও একটা হয়ত লক্ষ্য বস্তুতে লাগিয়া যায় এবং প্রচারের সময় ঐ একটাই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তা-ছাড়া এসব বিষয়ের চর্চ্চায় সাধারণ্যে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর ধারণার সুত্রপাত এই হয় যে, জাগতিক পরিবর্ত্তন ও সাধারণ ঘটনা সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত নগণ্য সৃষ্ট পদার্থগুলির অপরিহার্য্য প্রভাব, শক্তি, ক্ষমতা ও দক্ষতার ধারণাই মনের কোণে জাগিয়া উঠে। এরূপ ধারণা শেরেক ও কুফুরী। এক হাদীছে আছে—"কোন এক রাত্রে বৃষ্টিপাত হইল, আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক এই বৃষ্টির ব্যাপারে কাফের সাজিবে—তাহারা বলিবে যে, "অমুক নক্ষত্রের দ্বারা বৃষ্টিপাত হইয়াছে"। প্রচলিত জ্যোতিবিদ্যায় এরূপ অত্যধিক ভুল, মিথ্যা ও শেরেক এবং কুফুরীর সুত্রসমূহ বিদ্যমান থাকায় উহা শিক্ষা করা ও বিশ্বাস করা শরীয়তে একেবারে হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

তাহারা সকলেই খত্না করিয়া থাকে। অতঃপর হেরাক্লিয়াস বলিলেন, ইহারাই বর্ত্তমান যুগের বাদশাহ। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ইহাদেরই বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে।

তারপর হেরাক্লিয়াস রোম শহরে তাঁহার জনৈক বন্ধু—যিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কিতাব সমূহে হেরাক্লিয়াসের সমতুল্য বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখিলেন এবং ইলিয়া হইতে হেমস শহরে গমন করিলেন। হেমস শহরে থাকা অবস্থায়ই রোমের সেই বন্ধুর উত্তর পাইলেন। উত্তরে তিনি হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে একমত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, আখেরী যমানার নবী আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আরবের তিনিই সেই নবী।

অতঃপর হেমস শহরেই হেরাক্লিয়াস রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া আনিলেন এবং একটি দ্বিতল রাজপ্রাসাদে তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া বাহিরে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস উপরতলা হইতে লোকদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে রোমবাসিগণ! যদি ইহ-পরকালের মুক্তি ও মঙ্গল চাও এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা কর, তবে তোমরা এই নবীর হাতে 'বায়আত'—দীক্ষা গ্রহণ কর; তাঁহার আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হইয়া যাও। মাত্র এইটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবারস্থ লোকগণ জংলী গাধার ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বহির্গমনের জন্য ছুটিয়া চলিল, কিন্তু দরওয়াজাসমূহ বন্ধ থাকায় তাহারা বাহির হইতে পারিল না; যেহেতু পূর্ব্ব হইতেই এ ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেরাক্লিয়াস এই দৃশ্য দর্শনে যখন লোকদের ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গেলেন। (তিনি নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইলেন যে, রসুলুল্লার প্রতি তাঁহার যে, ভাবের উদয় হইয়াছে এবং যে প্রকার ভাবাবেগের ফলে তিনি পূর্ব মন্তব্যসমূহ করিয়াছিলেন সে ভাবের উপর চলিতে থাকিলে তাঁহার হাতে রাজত্ব থাকিবে না। তাই তিনি রাজত্বের লোভে ও ক্ষমতার মোহে তাঁহার সেই উপস্থিত ভাবকে বিসর্জন দিয়া দেশবাসীকে যে সত্য কথা বলিয়াছিল উহার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন।) তিনি পুনঃ লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ওহে! আমি তোমাদিগকে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছি তদ্দ্বারা তোমাদের নিজ ধর্ম্মের উপর কতটুকু আস্থা ও দৃঢ়তা আছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছি। সেমতে আমি দেখিতেছি, স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং সমবেতভাবে তাঁহাকে সেজদা করিয়া চলিয়া গেল। এই ছিল হেরাক্লিয়াসের শেষ অবস্থা। ↑

(নোটটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— অধুনা অনেকেই এই বিষয়টি বুঝিতে মারাত্মক ভুল করিয়া থাকে। অর্থাৎ হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি যে প্রকাশ্য আহ্বান জানাইলেন যে, যদি তোমরা ইহ পরকালের মুক্তি কামনা কর, তবে এই নবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর। এতদসত্ত্বেও হেরাক্লিয়াস মোমেন ও মুসলমান বলিয়া গণ্য হন নাই। এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, (এই ঘটনার আনুমানিক দুই বৎসর পর) তবুকের যুদ্ধের সময় হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি নিজেকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিয়া বলিয়াছেন—

كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على نصرانيته

'মিথ্যাবাদী খোদার দুষমন। ধোকাবাজী করিয়াছে ; সে কস্মিনকালেও মুসলমান নহে ; বরং সে এখনও নাছরানী ধর্ম্মের উপরই রহিয়াছে। এখানে অনেকের মনেই প্রশ্ন উদয় হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি এত সুন্দর মর্য্যাদাপূর্ণ সন্মানসূচক মন্তব্যকারী হেরাক্লিয়াসের ন্যায় ব্যক্তি মুসলমান বলিয়া গণ্য হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইসলাম ও ঈমানের পূর্ণ হাকিকত ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

↑ এখানে একই ঘটনার তিনটি খণ্ড উল্লেখ করা হইয়াছে ; (১) আবু সুফিয়ানের বর্ণনা (২) ইবনে নাতুরের বর্ণনা (৩) হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপ। একই ঘটনা প্রবাহের এই তিনটি অংশ। এখানে একটি কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত আরববাসী লোকটি ও দেহইয়া কালবী নামক পত্রবাহক ছাহাবী একই ব্যক্তি! তদ্রূপ গাসসানের শাসনকর্ত্তা ও বোছরার শাসনকর্ত্তাও একই ব্যক্তি। পূর্ণ ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এই যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইলিয়া শহরে থাকাকালীন অবস্থায় জ্যোতিবিদ্যার দ্বারা খত্‌নাধারী জাতির বাদশার জয় অনুভব করিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনায় রত ছিলেন। এদিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পত্রখানা লইয়া আরববাসী দেহ্ইয়া কালবী বোছরায় নিযুক্ত গাসসান কবিলার শাসনকর্ত্তা মারফত তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন, তখন দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা ঘটিল। হেরাক্লিয়াস তখন পত্র প্রেরকের পরিচয় মোটামুটি জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হাল হকিকত পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য পত্র খুলিয়া পাঠ করিবার পূর্ব্বেই আবু সুফিয়ানের দলকে ডাকা হয় এবং প্রথম খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা ঘটে। হট্টগোলের ভিতর দিয়া হেরাক্লিয়াসের দরবার ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কথা জনসাধারণ গ্রহণ করিবে না। তাই তিনি রোম নিবাসী নাছারাদের প্রসিদ্ধ আলেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাদ্রীর নিকট বিস্তারিত বিষয় লিখিয়া চিঠি দিলেন এবং ইলিয়া ত্যাগ করিয়া দেশের বিশিষ্ট শহর হেমসে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া ঐ পাদ্রীর নিকট হইতে উত্তর পাইলেন। পাদ্রীকে তাঁহার সহিত একমত দেখিয়া দেশবাসীকে এই সত্য নবীর আনুগত্যের আহ্বান জানাইবার সাহস করিলেন এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইল।

ঈমানের হাকিকত বা তাৎপর্য্য ঃ

মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান ও বিবেক রত্নই নহে—বরং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুও আছে। যাঁহারা সাধনা করিয়া সংযম অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের দ্বারা রিপুকে জয় করিতে পারেন তাঁহারাই মানুষ হইতে পারেন; নতুবা শুধু জ্ঞান অর্জ্জনের দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। হেরাক্লিয়াস ইতিপূর্ব্বে আসমানী কেতাবের বা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে ভাবাবেগ বশতঃ যাহা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার মূলে শুধু তাঁহার জ্ঞান ও পরিচয় লাভই ছিল। কিন্তু ঈমান রত্ন হাসিলের জন্য শুধু ভাবের উদয় ও জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, বরং উদীয়মান ভাব ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার ভয়-ভীতি, মোহ ও লালসা এবং সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কার ইত্যাদিকে বিসর্জ্জন দিয়া ত্যাগ স্বীকার করতঃ পূর্ণভাবে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং জীবনের সমস্ত স্তরে সেই আনুগত্যের প্রস্তুতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে ঈমানও হাসিল হয় না, মুক্তিও পাওয়া যায় না। স্বার্থোদ্ধার বা স্বার্থহানির অপচিন্তা কিম্বা সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কারের মোহ ইত্যাদির সংঘর্ষের সময় নফছের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার এবং মনে-প্রাণে সেই আনুগত্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে যে ঈমান হাসিল হয় না তাহার প্রমাণ কোরআন শরীফেই পরিস্কার উল্লেখ রহিয়াছে—

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

অর্থাৎ—"ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাহাদের রসুলুল্লার পরিচয় ও জ্ঞান এরূপ হাসিল রহিয়াছে যেরূপ তাহাদের স্বীয় সন্তান সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট পরিচয় হাসিল আছে।"

কিন্তু যেহেতু তাহারা এই পরিচয় ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নাই, তাই তাহারা ঈমানদার গণ্য হয় নাই—কাফেরই রহিয়া গিয়াছে।

হেরাক্লিয়াসের জ্ঞান ছিল, ভাবাবেগও অত্যধিক ছিল, কিন্তু স্বার্থের অর্থাৎ রাজত্বের চিন্তা ছিল ততোধিক। যদি তিনি এই স্বার্থের লোভ ও রাজত্বের মোহকে সত্যের খাতিরে ত্যাগ করিতে পারিতেন তবেই তিনি মুক্তি পাইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে, রাজত্ব চলিয়া যাইবে, তখনই তিনি উদীয়মান ভাবকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে "যদি আমি বুঝি"

ইত্যাদি দুর্ব্বলতাসূচক ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্বউদিত ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিলেন এবং দেশবাসীকে যে সত্যের ডাক শুনাইয়াছিলেন উহার বিকৃত অর্থ করিয়া অবিচলিত চিত্তে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করার মত সৎসাহস হইতে বিরত রহিলেন। কাজেই তিনি ইসলাম ও ঈমান রত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে অবিচলরূপে অকাতরে এবং নির্ভয়ে সত্যকে গ্রহণ করার উজ্জল দৃষ্টান্ত হেরাক্লিয়াসেরই বন্ধুর ঘটনায় সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়; যাহা ছিল প্রকৃত ঈমান।

হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনা ঃ

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, রোম শহরে হেরাক্লিয়াসের এক বন্ধু ছিলেন, যাঁহার নিকট হেরাক্লিয়াস সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই বন্ধুরই একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। সেই বন্ধুটির নাম ছিল "জাগাতের"। হেরাক্লিয়াস তাঁহার নিকট পত্র লিখার পর পত্রবাহক ছাহাবী দেহইয়া (রাঃ)কে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, রোম শহরে একজন বড় পাদ্রী আছেন তাঁহার নাম জাগাতের। রোমাবাসিগণ তাঁহার অত্যধিক অনুগত। আপনি তাঁহার নিকট রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা নিয়া উপস্থিত হউন। তিনি রোমবাসিগণকে আহ্বান জানাইলে আশা করা যায় তাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। দেহ্ইয়া (রাঃ) পত্রখানা লইয়া জাগাতেরের নিকট উপস্থিত হইলেন। জাগাতের রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা পাঠ মাত্র রসূলুল্লার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তাঁহার মন-প্রাণ ভরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি খৃষ্টানী পোষাক ত্যাগ করিয়া নতুন পোষাক পরিধান করতঃ কোনরূপ ইতস্ততঃ ব্যতিরেকে সত্য ধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান পূর্ব্বক খোলাখুলি ভাবে রোমবাসীদিগকে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। রোমবাসীগণ সংস্কারাচ্ছন্ন থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহারে মারিয়া ফেলিল। দেহ্ইয়া (রাঃ) হেরাক্লিয়াসের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জাগাতেরের সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হেরাক্লিয়াস উহা শুনিয়া বলিলেন, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমার ভয় হয় ইসলাম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানগণ আমাকে মারিয়া ফেলিবে। দেখুন জাগাতের রোমবাসীদের নিকট আমার তুলনায় অধিক শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তবুও তিনি বাঁচিতে পারিলেন না!

আরও একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঃ

দেহ্ইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রোমবাসীগণ হেরাক্লিয়াসের দরবার হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং একজন প্রধান পাদ্রীকেও ডাকাইয়া আনিলেন। সমস্ত রোমবাসীদের উপর এই পাদ্রীর অতিশয় প্রাধান্য

ছিল। তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা দেখা মাত্রই বলিলেন—ইনিই সেই আখেরী যামানার নবী যাঁহার শুভাগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা (আঃ) দিয়াছিলেন। যে যাহাই বলুক, অথবা আমাকে মারিয়া ফেলুক, আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিবই এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার অনুসরণ করিবই। হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আমি এরূপ করিলে ত আমার রাজত্ব থাকিবে না। তখন ঐ পাদ্রী পত্রবাহক দেহ্ইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই পত্রদাতা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চলিয়া যান এবং তাঁহার খেদমতে আমার সালাম পেশ করিয়া এই সংবাদ দিবেন যে, আমি "আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" পড়িয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছি। রোমবাসী আমার কথা মানে নাই। এই বলিয়া তিনি রোমবাসীকে সত্য ধর্ম্মের আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন," জাগাতের" ও এই পাদ্রী স্বীয় প্রাধান্য, মান-সম্মান, ভয়-ভীতি বা সংস্কার ইত্যাদির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনুগত্য মানিয়া লইতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করিলেন না, ইহাকেই বলে প্রকৃত ঈমান। হেরাক্লিয়াস কিন্তু এইরূপ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই "রাজত্ব চলিয়া যাইবে" এই ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি পত্রবাহক দেহ্ইয়া (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—আমি জানি যে, তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য নবী, কিন্তু আমি আমার দেশবাসীকে ভয় করি, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে এবং আমার রাজত্ব চলিয়া যাইবে, নতুবা আমি তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিতাম। (ফতহুলবারী)

হেরাক্লিয়াসের অবস্থা এই ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কিতাব সমূহের প্রমাণাদি ও জ্যোতিবিদ্যার নিদর্শনাবলীর প্রভাবেই তাঁহার অন্তরে ঐ প্রকার ভাবাবেগের উদয় হইয়াছিল। পরন্তু তিনি ইচ্ছাকৃত কিছুই করেন নাই বরং ঐ স্বউদিত ভাবকে চাপিয়া রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনাও করিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুফল:

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার অতি প্রিয় মাহবুব; তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিফল যায় না। তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষাকারীকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দিয়া থাকেন; সে কাফের হইলে চির জাহান্নামী হওয়া হইতে অব্যাহতি পায় না, কিন্তু জাহান্নামে আজাব ভোগ অবস্থায়ও উহার ফল ভোগ করিতে পারে। যেমন,

আবু লাহাবের ন্যায় মূঢ় কাফের যাহার চিরআজাবগ্রস্ত হওয়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত ; সে প্রতি সোমবারে তাহার দুইটি অঙ্গুলির মধ্য হইতে শীতল পানীয় পাইয়া থাকে, শুধু এই জন্যে যে, হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদে আনন্দিত হইয়া সুসংবাদ প্রদানকারিণী ক্রীতদাসীকে ঐ দুইটি অঙ্গুলীর ইশারা করতঃ মুক্তি দিয়াছিল।

হেরাক্লিয়াস স্বীয় দোষে ঈমান হইতে মাহরূম ও বঞ্চিত রহিয়াছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চিঠিকে সে সম্মান করিয়াছিল, তজ্জন্য শুধু তাহাকেই নয়, বরং তাহার বংশধরগণকেও আল্লাহ তায়ালা উহার সুফল প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হেরাক্লিয়াস কর্তৃক তাঁহার পত্রের সম্মান প্রদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ثبت الله ملكه "আল্লাহ তাহার রাজ্যকে কায়েম রাখুন।" আল্লার প্রিয় নবীর এই আশীর্ব্বাদ বাণী বৃথা যায় নাই। বরং এই সৎকার্য্যের ফলেই রোমানদের রাজ্য ধ্বংস হয় নাই, বহুকাল তাহাদের মধ্যে রাজত্ব চলিয়াছিল। কারণ তাহারা ঐ পত্রখানাকে রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া সোনার সিন্ধুকে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল এবং বংশ পরম্পরায় তাহারা একে অন্যকে এই অছিয়ত করিয়া যাইত যে, এই পত্রখানা বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিও। যাবৎ ইহা আমাদের হাতে থাকিবে তাবৎ আমাদের রাজত্ব কায়েম থাকিবে। পক্ষান্তরে পারস্য সম্রাট হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রের অবমাননা করিয়াছিল, রাগান্বিত হইয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ শুনিয়া বদ দোয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলুন।" ফলে অল্পকালের মধ্যেই পারস্য সম্রাট সবংশে জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। (ফতহুলবারী)

প্রথম অধ্যায়

ঈমান

পাঁচটি মৌলিক জিনিসের উপর ইসলাম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত। উহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান হইতেছে 'ঈমান'। ঈমান কাহাকে বলে ?

আল্লার নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা কিছু বহন করিয়া আনিয়া কোরআনরূপে এবং হাদীছের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করিয়াছেন ঐ সবকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকার করিয়া কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত থাকাকে 'ঈমান' বলে। অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া মুখে স্বীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার সমুদয় আদেশ নিষেধগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে পরিণত করার নাম ইসলাম। সমস্ত আদেশ নিষেধগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার সৌকর্য্য এবং আন্তরিক বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতিফলনের তারতম্য অনুপাতে ঈমানের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই উন্নতি ও অবনতির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ ছাড়া ঈমানের বহু শাখা প্রশাখাও আছে। যেমন--আল্লার প্রিয় ব্যক্তি, বস্তু ও কার্য্যকে ভাল বাসা এবং আল্লার অপ্রিয় যাবতীয় বস্তুকে অপছন্দ করা ঈমানের একটি প্রধান শাখা। স্বীয় চরিত্রে ঐ শাখা প্রশাখার উন্মেষ ও অস্তিত্বের কম বেশী হওয়ার দরুনও ঈমানের উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে।

আরবী ভাষায় ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু যে ঈমান মানব জাতির কল্যাণের উৎস এবং পরকালের নাজাত, মুক্তি ও সুখ শান্তির একমাত্র পথ সে ঈমান শুধু মাত্র বিশ্বাসের নামই নহে। বরং সেই ঈমান-রত্ন বহু সাধনার ধন। সাধনা ব্যতিরেকে ঐ অমূল্য রত্ন হাসিলও হয় না, রক্ষিতও হয় না। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্যই বোখারী (রঃ) কয়েকজন মনীষীর কয়েকটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করিতেছেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের অনুরূপ খলিফা ও বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার আলজেরিয়াস্থ গভর্ণরকে একটি হেদায়েত-নামা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন— "নিশ্চয় জানিও ঈমানের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্য্যায়ের অনেকগুলি বিষয়বস্তু রহিয়াছে— (১) ফরয ও ওয়াজেবসমূহ, (যে গুলি অবশ্য করণীয়, যেমন—আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার করতঃ কলেমা পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাৎ দান করা, হজ্জ করা, দ্বীনের এল্‌ম শিক্ষা করা, জেহাদ করা ইত্যাদি।) (২) মশরু" বা জায়েয বিষয়সমূহ (যে গুলির উপর মানুষ

তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে)। (৩) নির্দ্ধারিত সীমা সমূহ, (অনেক স্থলে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দেন নাই। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন সেই সকল সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি মোটেই নাই। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চক্ষু দান করিয়াছেন এবং তদ্দারা জাগতিক কাজকর্ম্ম দেখা ও আল্লার সৃষ্টি জগতের নৈপুণ্য দেখিয়া জ্ঞান আহরণ করার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তু দেখিতে পারিবে না। যেমন—অন্যের ছতর (গুপ্তস্থান) দেখা; বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। এইরূপে মানুষের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ও শক্তিকে পরিচালিত করিবার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ঐ নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা মহাপাপ)। (৪) সুন্নাহ—অথাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার খোলাফায়ে-রাশেদীনের আদর্শসমূহ। (এই আদর্শসমূহ হইতে আদব-কায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সাধনা, ভজনা ও এবাদত বন্দেগীর জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রভৃতিকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ঐ পবিত্র আদর্শকে মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করা চলিবে না।) যাহারা ঈমানের অঙ্গ স্বরূপ উপরোক্ত চারিটি বিষয়বস্তুকে পূর্ণরূপে আয়ত্ব ও রক্ষা করিবে তাহাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা এইগুলিকে যত্ন ও সাধনার সহিত পূর্ণ না করিবে তাহাদের ঈমান অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব বুঝা গেল যে, ঈমান কেবলমাত্র বিশ্বাসের নামই নহে; কর্ম্মময় জীবনের অন্তহীন সাধনা ও প্রযত্ন উহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এ কথাও উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে—যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি ঈমানের এই সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দান করিব, যাহাতে জনসাধারণের পক্ষে উহা বুঝিতে ও তদনুযায়ী আমল করিতে সহজ হয়। আর যদি আমি মরিয়া যাই, তবে জানিয়া রাখিও—তোমাদের সংসর্গে থাকিয়া হুকুমত করার আদৌ কোন অভিপ্রায় আমার নাই।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন— ليطمئن قلبي

অর্থাৎ আমি আমার অন্তরের সমস্ত অছ্‌অছাহ্ (মানবীয় দুর্ব্বলতা) দুর করতঃ একীন ও বিশ্বাসকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া ঈমানের উন্নতি সাধন করিতে চাই।

ছাহাবী মোয়ায ((রাঃ) তাঁহার সঙ্গিদিগকে বলিতেন—ভাই! একটু বস; কিছুক্ষণ আমরা (দ্বীনের কথা, আল্লাহ ও রসুলের কথা আলোচনা করিয়া) ঈমানকে বর্দ্ধিত ও উন্নত করি।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিতেন—প্রতিবন্ধকতাময় কর্ম্ম জীবন এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশের পরীক্ষার ভিতর দিয়া যে অটল বিশ্বাস প্রমাণিত হয় উহাই আসল পূর্ণাঙ্গ ঈমান। ঐরূপ বিশ্বাস ব্যতিরেকে শুধু মুখে বুলি আওড়ানো বা ভাবাবেগ প্রকাশের নাম ঈমান নহে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন—প্রত্যেক জিনিসেরই কোন না কোন গুণাগুণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকিবেই; এই সব গুণাগুণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই জিনিষটির পরিচয় হয়। তদ্রূপ ঈমানেরও কতিপয় গুণ এবং প্রতিক্রিয়া আছে—উহা এই যে, ঈমানদার ব্যক্তির আল্লার উপর বিশ্বাস, ভয় ও ভক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, (আল্লার স্পষ্ট আদিষ্ট কাজগুলি ত করেই এবং নিষিদ্ধ কাজগুলিও চিরতরে বর্জ্জন করেই এতদ্ব্যতীত) যে কোন কাজে বা কথায় তাহার মনে যদি সামান্য মাত্র খটকা বা সংশয়ের উদয় হয় যে, হয়ত এই কাজটি বা কথাটি পরিণামে আল্লার অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে বা ইহাতে আল্লার অনুমোদন না থাকিতে পারে, ঈমানের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাও সে বর্জ্জন করিয়া চলে। মানুষের জীবনে এই অবস্থা যখন উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে এবং খাঁটী তাকওয়া তাহার হাসিল হয়। কোরআন শরীফের একটি আয়াতে আছে :—

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا

وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

অর্থ :—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূছা ও ঈছা (প্রভৃতি সমস্ত পয়গাম্বরগণকে একই ধর্ম্ম এবং একই ঈমান ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদেশ করিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই মূল ধর্ম্মকে সকলে ঠিক রাখ—ইহাতে বিভিন্ন মত পোষণ করিও না।

অন্য এক আয়াতে আছে :— لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

অর্থ :—তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন তরিকা ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিগত তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন নবীগণের শরীয়তের ধর্ম্ম পালনের পদ্ধতি ও প্রণালীর এবং ধর্ম্ম চরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে হয়ত পার্থক্য আছে বটে ; কিন্তু মূল ধর্ম্মের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই। এক আল্লার দাসত্ব স্বীকার করতঃ একান্ত অনুগত হইয়া তাঁহার আদেশ পালনার্থে প্রতিযোগিতা করিয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়াই ঈমানের আসল মূল। এখানে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি আচরণের পার্থক্য স্বরূপ বলা যায়—যেমন নামায কায়েম করার হুকুম প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই ছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করার হুকুম হইয়াছে শুধু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তে।

অন্য এক আয়াতে আছে :—قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

অর্থ :—তোমরা যদি আমার প্রভু আল্লাহকে না ডাক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা না কর, তবে তাহাতে আমার প্রভুর কোনই ক্ষতি নাই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এখানে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা (দোয়া) করাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব, সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ঈমানরত্ব কত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত এবং কত খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ঈমান শুধু বিশ্বাস করার নামই নহে।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর

৭। হাদীছ :— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত। (১) এক আল্লাহই মাবুদ, অন্য কোনও মাবুদ (পূজনীয়) নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল ; ইহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া লওয়া, (২) নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা, (৩) যাকাৎ দান করা, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযান মাসে রোজা রাখা।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার যে সমস্ত পন্থা আছে বা যত প্রকার নেক ও সৎকাজ আছে উহার প্রত্যেকটিই মূল ঈমানের শাখা-প্রশাখা ; অতএব, ঈমানের শাখা অনেক । ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে কোরআনের দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে মানব জাতির কল্যাণের ও সত্যিকারের মানুষ হওয়ার পন্থারূপে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি মোটামুটি কাজ আঙ্গুলের উপর গণনা করিয়া দিয়াছেন । সেই হিসাবে আয়াত দুইটি অতি মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে উহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে করা হইতেছে । প্রথম আয়াত ঃ—

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۔ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۔ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۔

অর্থ ঃ— প্রকৃত প্রস্তাবে নেক ও সৎকাজ এইগুলি ঃ—(১) সর্ব্ব প্রথমে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা দেল ও অন্তরকে ঠিক করিতে হইবে—(ক) আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া ভয় ও ভক্তির সহিত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আল্লাহই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতেই আমরা আসিয়াছি । (খ) আবার একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে । চোখ, কান, হাত, পা, জ্ঞান, বুদ্ধি, আলো-বাতাস ধন-দৌলত ইত্যাদি যাহা কিছু নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, আমরা উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছি কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহার হিসাব দিতে হইবে ।

সেই শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আল্লার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের সদ্ব্যবহার করতঃ হিসাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। (গ) ফেরেশতাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা নিষ্পাপ, ত্রুটিহীন; কখনও আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করেন না, বা তাঁহাদের দ্বারা কোন ভুল ত্রুটি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা আল্লার বাণী পয়গাম্বরগণের নিকট অবিকলরূপে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এবং ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। (ঘ) আল্লার কোরআনকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ইহার অন্তর্গত কোন একটি অক্ষরের মধ্যেও আদৌ কোনরূপ সন্দেহ দোষ বা ভুল ত্রুটি নাই। (ঙ) আল্লার নবীগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা আল্লার প্রেরিত সম্পূর্ণ নিষ্পাপ মানুষ ও সত্য পথ প্রদর্শক ছিলেন। যে যুগের, যে দেশের বা যে জাতির জন্য যিনি নবী হইয়া আসিয়াছেন—সেই যুগে, সেই দেশের সমগ্র জাতি তাঁহাকেই আদর্শ পথপ্রদর্শকরূপে মানিয়া চলিতে হইবে, যেমন—কেয়ামত পর্য্যন্ত শেষ যুগের জন্য সমগ্র বিশ্বমানবের পয়গাম্বর হইলেন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলকে একমাত্র তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

(২) পার্থিব ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পত্তির দিকে স্বভাবগত ভাবে মানুষের মনের মায়া ও আকর্ষণ থাকা সত্বেও আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধন-সম্পত্তি যথাস্থানে দান করিতে হইবে। যথা—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগকে, (পিতৃহীন, কর্ম্মশক্তিহীন অসহায়) এতিম বালক বালিকাদিগকে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদিগকে, (যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও অভাব মোচনে অক্ষম) পথিকদিগকে, (যাহারা প্রবাসে অভাবে পড়িয়াছে।) যাচ্ঞাকারী ভিক্ষুকদিগকে, (যে সব অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আতুর ইত্যাদি কর্ম্মশক্তিহীনতার দরুণ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে।) এবং দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে, (তাহাদের মুক্তির জন্য) দান করিতে হইবে।*

(৩) আল্লার নির্দ্দেশিত এবং তাঁহার রসুলের (দঃ) প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী আল্লার দাসত্বের প্রতীক নামায কায়েম (পূর্ণাঙ্গে আদায় ও জারী করিতে হইবে।)

(৪) স্বীয় ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাৎ স্বরূপ দিতে হইবে।

(৫) অঙ্গীকার করিলে উহা রক্ষা করিতে হইবে। (আল্লার সহিত অঙ্গিকার বা মানুষের সহিত অঙ্গীকার—সমস্ত অঙ্গীকারই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে)।

---

* এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যাকাৎ ভিন্ন এই সমস্ত দানের স্থান সমুহ বর্ণিত হইল। ইহার যথাস্থানে যাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৬) ধৈর্য্যধারণের অভ্যাস করিতে হইবে। ভীষণ অভাবের তাড়নার সময়, দুর্বিসহ রোগ যাতনার সময় এবং শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি ভীষণ বিপদের সময়।

যাহারা এই সৎগুণাবলী অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই খাঁটী সত্যবাদী এবং তাহারাই প্রকৃত ঈমানদার ও মোত্তাকী পরিগণিত হইবে। (২ পাঃ ৬ রুঃ)

দ্বিতীয় আয়াতঃ—(১৮ পাঃ ১ রুঃ)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ط اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ - الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আটটি গুণ অর্জ্জনের শর্ত্ত উল্লেখে বলিতেছেন।

স্বীয় জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছে তাহারা—

(১) যাহারা (আল্লাহ ও আল্লার রসুলকে মান্য করিয়া কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ, বেহেশত-দোষখকে বিশ্বাস করিয়া) ঈমানদার হইয়াছে।

(২) যাহারা ভয় ও ভক্তির সহিত, আল্লার দরবারে কাকুতি-মিনতির সহিত নামায কায়েম করিয়াছে।

(৩) যাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা হইতে বিরত রহিয়াছে। (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, কর্ম্মশক্তি, চলনশক্তি, চিন্তাশক্তি, প্রভৃতি যে সব অমূল্য শক্তির সমারোহ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করিয়াছেন ঐগুলিকে জীবনের স্থায়ী উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। অবনতির বা অনর্থক কাজে অপচয় করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে)।

(৪) যাহারা পবিত্রতা সাধন করিয়াছে। (আত্মার পবিত্রতা, দেহের পবিত্রতা, বস্ত্রের পবিত্রতা, স্ত্রীর পবিত্রতা, অর্থের পবিত্রতা, ইত্যাদি সর্ব্ব

প্রকারের পবিত্রতাই ইহার অন্তর্ভুক্ত। হিংসা, বিদ্বেষ, নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, স্বার্থান্ধতা, ক্রোধান্ধতা, কপটতা, মোহান্ধতা, ইত্যাদি অপবিত্র স্বভাব সমূহ হইতে আত্মাকে শোধিত রাখিতে হইবে। সুদ, ঘুষ, শোষণ, দুর্নীতি, চুরি-জুয়াচুরি, ধোকাবাজী ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার হারাম উপায় হইতে অর্থকে পবিত্র রাখিতে হইবে। তদুপরি শরীয়ত অনুযায়ী যাকাৎ দান করিতে হইবে। অর্থের উপরই মানুষের সর্ব্বস্ব নির্ভর করে, তাই অর্থের অপবিত্রতা তাহার প্রতিটি স্তরকেই অপবিত্র করিয়া দেয়। (কাজেই অর্থের পবিত্রতা ব্যতিরেকে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।) ×

(৫) যাহারা সংযম অভ্যাস করিয়া কামরিপুকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ দেহের রাজা ও জীবনীশক্তির মূলধন বীর্য্যের অপচয় বা অপব্যয় করে নাই। অবশ্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা রমণী অথবা (এর চেয়েও অধিক আধিপত্য যাহার উপর স্থাপিত হইয়াছে; বিবাহের ন্যায় শরীয়ত অনুমোদিত অপর সূত্র—) স্বত্ব-সূত্রে অর্জ্জিত রমণীর গর্ভে মানব বীজ বপনোদ্দেশ্যে যদি বীর্য্য ব্যয় করে তবে তাহা দুষণীয় নহে। এতদ্ব্যতীত যাহারা অন্য কোনও গর্হিত উপায়ে (হস্ত মৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন, বেগানা স্ত্রী দর্শন, স্পর্শন বা ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা) বীর্য্য ব্যয় করিবে ও কামরিপু চরিতার্থ করিবে তাহারা নিশ্চয়ই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হইবে।

(৬, ৭) যাহারা নিজেদের নিকট গচ্ছিত আমানতের এবং নিজেদের ওয়াদা অঙ্গীকারের পূরাপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। আমানতের অর্থ—দায়িত্ব গ্রহণ করা। দায়িত্ব অনেক প্রকারের আছে—যথা আল্লার আমানত ↑, সামাজিক আমানত, রাষ্ট্রিয় আমানত, চাকরী ও পদের আমানত, ব্যক্তিগতভাবে গচ্ছিত টাকা-পয়সা, জমি-জমা বা গোপনীয় কথার আমানত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে

× এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন কোন ব্যক্তি অসহায় আশ্রয়হীন ও বিপদগ্রস্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাহার ডাক শোনেন না, কারণ তাহার পানাহারের বস্তু ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেকটিই হারাম এবং অসদুপায়ে উপার্জ্জিত।

↑ আল্লার আমানতের অর্থ:—আল্লার আদেশ ও নিষেধাবলী অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করা। এই গুরুদায়িত্বকেই কোরআন শরীফের ২২শ পারা ৫ম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা আমানত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—আমি আসমান, জমিন ও পর্ব্বতমালাকে আমার আমানত বা বিশেষ একটি গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাইলে উহারা সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিল, কিন্তু মানব জাতিকে সেই আহ্বান জানান হইলে তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লইল।

অঙ্গীকার এবং শপথও অনেক প্রকারের আছে—আল্লার নিকট শপথ, সমাজের নিকট শপথ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের শপথ, ব্যক্তিগত ওয়াদা রক্ষার শপথ ইত্যাদি।

(৮) যাহারা আজীবন নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান রহিয়াছে।

অর্থাৎ কখনও সে সাধনায় ক্লান্ত হয় নাই—স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে কোনও বাধা বিপত্তি লক্ষ্য না করিয়া চিরজীবন একনিষ্ঠ সাধনা করিয়াই গিয়াছে।

যাহারা এই গুণগুলি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, তাহারাই হইবে ফেরদৌস বেহেশ্‌তের অধিকারী, তাহারা তথায় অমর জীবন লাভ করিয়া অনন্তকাল অফুরন্ত সুখ-শান্তি লাভ করিবে।

৮। হাদীছ ঃ—عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা ষাট হইতে অধিক এবং লজ্জা-শরম ঈমানের অন্যতম শাখা।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য এক হাদীছে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তর হইতেও অধিক বলিয়া উল্লেখ আছে। কোন কোন হাদীছে সাতাত্তর এর প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—ঈমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইল ইহা স্বীকার করা যে—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনও মা'বুদ নাই এবং সর্ব্বাপেক্ষা ছোট শাখা—কষ্টদায়ক বস্তুকে চলাচলের পথ হইতে অপসারিত করা।

লজ্জা-শরমকে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা বলা হইয়াছে। কারণ, ঈমান যেমন মানুষকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে, তদ্রূপ লজ্জা-শরমও মানুষকে অনেক কুকর্ম্ম হইতে বিরত রাখে।

লজ্জা-শরম মানব চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। দুর্ব্বলতা ও পবিত্রতা এই দুইয়ের সংমিশ্রনে ঐ গুণটির উৎপত্তি। নিন্দিত হইবার আশঙ্কায় যে কোনও কাজ করিবার বা কথা বলিবার প্রতি মানুষের মনে যে একটা অনিচ্ছা ও সঙ্কোচভাব এবং দুর্ব্বলতা স্বভাবতঃ উদিত হয় তাহাকেই হা'য়া বা লজ্জা-শরম বলা হয়।

প্রকার ভেদে লজ্জা-শরমও কয়েক প্রকার। যথা—ভাল কাজ করিতে বা কোনও ভাল কথা বলিতে যদি শরম বোধ হয় তবে উহা প্রকৃতপক্ষে শরম নহে, বরং উহা এক প্রকার দুর্ব্বলতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে ; এরূপ শরমকে ঈমানের শাখা বলা হয় নাই। যেমন—কোন দরকারী কথা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে এই

ভাবিয়া শরম বোধ হয়, এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে কি মনে করিবে? বা কোনও কামেল পীরের সাহচর্য্যে থাকিতে এই মনে করিয়া লজ্জা করা যে, লোকে বলিবে, মোল্লার তাবেদার হইয়াগিয়াছে। কিম্বা কোনও গরীব অসমর্থ ব্যক্তি তাহার বোঝাটা মাথায় উঠাইয়া দিবার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে সাহায্য করিতে শরম বোধ হয় এই ভাবিয়া যে, লোকে কি মনে করিবে? এইগুলিকে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হয় নাই, বরং এইগুলি এক প্রকারের অহঙ্কার-সঞ্জাত হীনমন্যতা Inferity complex অর্থাৎ মনের নীচতা ও দুর্ব্বলতা মাত্র।

যে শরমকে হাদীছে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে উহা এই—নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতামূলক কাজ করিতে বা অভদ্র ব্যবহার করিতে বা ফাহেশা ও পাপের কাজ করিতে বা প্রকাশ্যে স্বামী স্ত্রী-সুলভ ব্যবহার করিতে বা পরপুরুষ, পরস্ত্রীর সহিত পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্ত্তা বলিতে ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্য্যে যে শরম বোধ হয়। বস্তুতঃ এই পর্য্যায়ের শরমকেই প্রকৃত প্রস্তাবে লজ্জা-শরম বলা যাইতে পারে; কারণ, এসবের মধ্যে পবিত্রতার প্রাধান্য রহিয়াছে, শুধু দুর্ব্বলতা ও অশক্তিই নহে।

এক হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লার শোকর—আমরা ত আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা সাধারণতঃ যতটুকু লজ্জা করিয়া থাক, শুধু ঐটুকুই আমার উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করার দাবী রাখে, তাহার কর্ত্তব্য—স্বীয় মাথা (অথাৎ মাথার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি আছে, যথা—স্মরণশক্তি, বিবেচনাশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি) এবং মাথা সংলগ্ন ইন্দ্রিয়গুলি, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদিকে কুকর্ম্ম ও কুপথ হইতে বিরত রাখা। পেট এবং পেট-সংলগ্ন রিপু (নফছ ও গুপ্তঅঙ্গ)কে তদ্রূপ রক্ষা করা, (অর্থাৎ হারাম খাওয়া ও ব্যভিচারী কার্য্য হইতে বিরত থাকা।) তদুপরি তাহার আরও কর্ত্তব্য হইবে যে, মৃত্যু তথা এই অস্তিত্বের বিলুপ্তিকে স্মরণ করতঃ আখেরাতের দিকে ধাবিত হওয়া এবং দুনিয়ার মোহ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করা। যে ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ পুরাপুরি সাধন করিবে, সে-ই আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। (তিরমিজী শরীফ)

একজন মহামনীষী লজ্জার ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন—তোমার সর্ব্বস্বের মালিক (আল্লাহ তায়ালা) যেন তোমাকে এমন জায়গায় বা এমন কাজে দেখিতে না পান, যেখানে যাইতে বা যাহা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন—ইহাই প্রকৃত লজ্জা।

এই সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত লজ্জা শরম কাহারও হাসিল হইলে সে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হইতে পারে। এই সূত্রেই 'হায়া' বা লজ্জা-শরমকে ঈমানের একটি অন্যতম বিশিষ্ট শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোসলমান কে?

৯। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার কোনও কথা বা কার্য্যের দ্বারা অন্য মোসলমানদের কষ্ট না ঘটে। মোহাজের ঐ ব্যক্তি যে আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ ও বর্জন করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—"মোসলেম" শব্দের মধ্যে শান্তির অর্থ নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং যাহার দ্বারা অন্যের অশান্তি ঘটে, তাহাকে মোসলেম বলা যাইতে পারে না। তদ্রূপ মোহাজের অর্থ "ত্যাগী"। যে আল্লার নিষিদ্ধ বস্তুকে পরিত্যাগ না করিবে, তাহাকেও ত্যাগী বলা যাইতে পারে না। অন্য এক হাদীছে আছে—"মোমেন ঐ ব্যক্তি যাহার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের আস্থা থাকে এবং তাহার তরফ হইতে সমস্ত লোক নির্ভয়ে ও নিরাপদে থাকিতে পারে!" "মোমেন" শব্দের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থাভাজন হওয়ার অর্থ নিহিত আছে; সুতরাং যাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা না যায় ও যাহার তরফ হইতে মানুষ নির্ভয়ে নিরাপদে থাকিতে না পারে, তাহাকে "মোমেন" বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ মোসলেম বা মোমেন শব্দের দাবীদারদের মধ্যে চরিত্রগুণ উল্লিখিত পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা সে ঐ নামের উপযুক্ত নহে।

লক্ষ্য করুন—ইসলাম কত বড় মহান ধর্ম্ম যে উহার নির্দ্ধারিত প্রতিটি নামবাচক শব্দের মধ্যেও শান্তি, শৃঙ্খলা, সততা এবং সংযম ইত্যাদি গুণের মহান আদর্শ সমূহের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইসলামের উত্তম স্বভাব কি?

১০। হাদীছ ঃ—ছাহাবী আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোসলমান? হজরত (দঃ) বলিলেন, যাহার কোনও কথা বা কার্য্য দ্বারা অন্য মোসলমানের কোন কষ্ট না হয়।

ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ অন্ন দান ঃ

১১। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه
انّ رجلا سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اىّ الاسلام خير قال
تطعم الطّعام وتقرء السّلام على من عرفت ومن لم تعرف -

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্ন দান করা এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা।

ব্যাখ্যা ঃ সালামের উদ্দেশ্য শুধু মুখে "আসসালামু আলাইকুম" বলাই নহে, মুখে বলার সঙ্গে কার্য্য ও চরিত্রের দ্বারা উহার অর্থকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—পরিচিত অপরিচিত সকলকেই শান্তি, নিরাপত্তা ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে অন্যত্র আরও তিনটি গুণের উল্লেখ আছে, যথা—মিষ্টভাষী হওয়া—কর্কশভাষী না হওয়া, স্বীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং গভীর রাত্রে যখন অন্য সকলে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করতঃ নামায পড়া।

ঈমানের একটি বিশেষ শাখা

১২। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال
لا يؤمن احدكم حتّى يحبّ لاخيه ما يحبّ لنفسه -

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না যাবৎ না সে অন্য মোসলমান ভাই-এর জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার পছন্দ করে, যেরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য একটি হাদীছের দ্বারা এই হাদীছটির তাৎপর্য্য আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। "এক ব্যক্তি রসুলুল্লার (দঃ) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে চাই, কিন্তু আমি জেনাকারী (ব্যভিচার) হইতে বিরত থাকিতে অক্ষম। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে স্নেহভরে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার মা বোন বা মেয়ের সঙ্গে

অপর কেহ জেনা করে ? সে রক্তাক্ত চোখে উত্তর করিল—ইহা কার্য্যে পরিণত করা ত দূরের কথা কেহ এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা মাত্রই আমি তাহাকে তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করিয়া ফেলিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি যে মহিলার সঙ্গে জেনা করিবে সেও ত কাহারও মা, বোন বা মেয়ে হইবে।

কি সুন্দর শিক্ষা ও কত যুক্তিপূর্ণ উপদেশ! এর সুফল কত ব্যাপক। এই আদর্শের ভিত্তিতে সকল প্রকার ঝগড়া, বিবাদ, দ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, খেয়ানত, ধোকাবাজী, কাহারও অনিষ্ট করা ইত্যাদি এমনকি চুরি, ডাকাতি সকল প্রকার ব্যভিচারেরই অবসান হইতে পারে।

রসুলুল্লার (দঃ) মহব্বৎ ঈমানের মুল

১৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার জান—তোমাদের কেহ মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ না তাহার নিকট আমার মহব্বৎ ও ভালবাসা তাহার মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক হয়।

১৪। **হাদীছ ঃ**— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ

اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার অর্থাৎ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারিবে না, যাবৎ না সে তাহার মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে এবং জগতের সমস্ত লোক অপেক্ষা অধিক মহব্বত ও ভালবাসা আমার সঙ্গে রাখিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এক হাদীছে বর্ণিত আছে, একদা ওমর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন—আপনার প্রতি আমার মহব্বত সকলের চাইতে বেশী আছে, কিন্তু নিজের জীবন হইতে বেশী মনে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, তা হইবে না ; নিজের জীবন হইতেও অধিক মহব্বত আমার সঙ্গে রাখিতে হইবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন, এখন স্বীয় জীবন হইতেও অধিক মহব্বত আপনার সঙ্গে আমার হাসিল হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, -এখন আপনি মোমেন হইতে পারিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিজের প্রতি অধিক মহব্বতের আদেশ স্বীয় কোনও স্বার্থের জন্য করেন নাই; বরং মানবের কল্যাণের জন্যই এই আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা রসুল (দঃ)কে স্বীয় সন্তুষ্টি ও পছন্দের নমুনা বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রসুলের (দঃ) অনুসরণের উপরই মানব জাতির কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে। পরন্তু, পূর্ণ অনুসরণ অত্যধিক মহব্বৎ ও ভালবাসা ব্যতিরেকে হয় না।

এখানে মহব্বতের অর্থ রসুল হিসাবে ভক্তি ও ভালবাসা তাহাও শুধু মৌখিক ও ভাবাবেগের বা আত্মীয়তার মহব্বৎ উদ্দেশ্য নয়। বরং রসুল হিসাবে এরূপ গভীর মহব্বৎ যাহার দরুণ রসুলুল্লার (দঃ) আনুসরণ ও অনুগত্যের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ জন্মে। কোন প্রকার স্বার্থ, মোহ, ভয় বা কষ্টই তাঁহার অনুসরণ ও আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম না হয়। সাধারণ ভালবাসা বিভিন্ন কারণে অনেক কাফেরের মধ্যেও দেখা যায়, যেমন—রসুলুল্লার (দঃ) চাচা আবু তালেব রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিতেন। কিন্তু আবু তালেবের সেই ভালবাসা কেবলমাত্র স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বা নিজ গোষ্ঠির ভাল ছেলে হিসাবে ছিল, আল্লার রসুল হিসাবে নহে।

ঈমানের স্বাদ লাভ করার উপায়

১৫। হাদীছ :— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال — ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ۔

অর্থ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—এমন তিনটি গুণ আছে যে, কাহারও ভিতরে ঐ তিনটি গুণের সমাবেশ হইলে সে ঈমানের মাধুর্য্য ও সুস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে। (১) আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্ব্বাধিক মহব্বৎ হওয়া, অর্থাৎ পার্থিব আকর্ষণ অপেক্ষা আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্ব্বাধিক মনের টান ও প্রাণের আকর্ষণ হওয়া। (২) কাহাকেও ভালবাসিলে তাহা একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই হওয়া। অর্থাৎ আল্লার প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং আল্লার অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যেই অপ্রিয় গণ্য করা; কাহারও সহিত কাম-ভাবের বশে বা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভালবাসা না করা। (৩) ইসলাম ও ঈমানের প্রতি এত গাঢ় অনুরক্ত হওয়া যে, ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া কুফুরির দিকে যাওয়াকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া তুল্য অপছন্দনীয় গণ্য করা।

ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন

১৬। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال —

اٰيَـةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ۔

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আনছারদের (মদীনাবাসী ছাহাবীদের) সঙ্গে মহব্বৎ রাখা ঈমানের আলামত ও নিদর্শন। তাঁহাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করা মোনাফেকীর পরিচায়ক।

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে "আনসার"—দ্বীনের সহায্যকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই হিসাবে যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করে তবে সে নিশ্চয় মোনাফেক হইবে। আর মিত্রভাব পোষণ করিলে নিশ্চয় উহা তাহার ইসলামের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হইবে।

ইসলামী জীবনের শপথ ও অঙ্গীকার

১৭। হাদীছ ঃ— ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার ছাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আমার নিকট শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ কর এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, আল্লার সহিত কোনও বস্তুকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, জেনা (ব্যভিচার) করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না *, কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে না—ভিত্তিহীন অপবাদ ও অভিযোগ আনিবে না এবং আমার (তথা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের) বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—যে আদেশ আল্লার বিধান বিরোধী না হয়। (রসুল (দঃ) আরও বলিলেন—)

যে ব্যক্তি এই সব অঙ্গীকার অনুযায়ী চলিবে, নিশ্চয়ই সে আল্লার নিকট তাহার সুফল ও পুরস্কার পাইবে। পরন্তু, যদি কেহ কোনও নিষিদ্ধ কাজ করিয়া ফেলে এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাস্তি তাহার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই

---

* ইসলাম-পূর্ব্ব যুগে আদিম বর্ব্বর আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ে সন্তান হওয়াকে তাহারা অপমান মনে করিত; এমনকি কোনও নিষ্ঠুরাত্মা পিতা স্বীয় কন্যা সন্তান জীবিতাবস্থায়ই মাটি চাপা দিয়া দিত। কেহ কেহ আবার অধিক খরচে পড়িয়া অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেলে মেয়ে উভয় শিশু সন্তান মারিয়া ফেলিত। এই সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার মূলে ইসলাম কুঠারাঘাত হানিয়াছে—এই সবের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফের একাধিক আয়াত নাযেল হইয়াছে; রসুলুল্লাহ (দঃ)ও ঐরূপ কুসংস্কার হইতে বিরত থাকার অঙ্গীকার লইয়াছেন।

শাস্তি (গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কারণ, ঐ শাস্তি) তাহার গোনাহের কাফ্‌ফারা হইবে, অর্থাৎ—ঐ শাস্তি দ্বারা তাহার গোনাহ মাফ হইবে। কিন্তু যদি তাহার ঐ কাজ জন সমাজে প্রকাশ না হওয়ায় শরীয়তের বিধান গত জাগতিক শাস্তিভোগ হইতে সে রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে গোনাহের বিচারের ভার আল্লার উপর ন্যাস্ত থাকিবে; আখেরাতে তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন মাফও করিতে পারেন। সেমতে ছাহাবীগণ এই শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন।

দ্বীন রক্ষার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা বড় ধর্ম্ম

১৮। হাদীছ ঃ— عن ابى سعيد قال رسول صلى الله عليه وسلم

يُوشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ ۔

অর্থ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই দিন অতি নিকটবর্ত্তী—যখন একজন মোসলমানের জন্য উত্তম সম্পদ হইবে মাত্র কয়েকটি বকরী, যেগুলিকে লইয়া সে পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়ায় বা যেখানে ঘাস-পাতা জন্মায় এমন স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেখানেই বসবাস করিবে। (সমস্ত জগৎ তখন ফেৎনাফাসাদে পরিপূর্ণ হইবে, তাই) সে স্বীয় দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লোকালয় হইতে সরিয়া পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ— উল্লিখিত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের কর্ত্তব্য হইল দ্বীন ও ধর্মকে সর্ব্বাগ্রে ও সকলের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া। যখন চতুর্দ্দিকের ফেৎনা-ফাসাদের দ্বারা স্বীয় দ্বীন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইবে তখন দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য ধন-জন, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গলে নির্ব্বাসিত জীবন যাপনেও কুণ্ঠিত না হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে ও প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে।

আল্লার মা'রেফাত অনুপাতে তাঁহার প্রতি ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে

'আল্লার মা'রেফাত'-এর অর্থ—আল্লাকে চেনা ও আল্লার তত্ত্ব জ্ঞান হাসিল করা। ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন ও আয়ত্তাধীন ক্রিয়াবিশেষ। অবশ্য বাহ্যিক অঙ্গের ক্রিয়া নহে, বরং ইহা অন্তরের ঐকান্তিক সাধনার প্রক্রিয়া। সুতরাং উহা নিজে নিজেই

উৎপত্তি হয় না, বরং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উহা অর্জ্জন করিতে হয়। প্রথমতঃ দেলের ময়লা সমূহ (হীন স্বার্থ-চিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি)কে দুর করিতে হইবে। এই সকল আবিলতা ও কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া দেল যখন আয়নার মত পরিস্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং তদবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতঃ আল্লার ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়, তখন দেলের মধ্যে আল্লার মহৎ গুণাবলী প্রতিবিম্বিত ও বিকশিত হইয়া থাকে। আল্লার ঐ মহৎ গুণাবলীকে দেলের মধ্যে ধরিয়া ও ভরিয়া রাখা এবং হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখার নামই "মা'রেফাত"। আল্লার এই মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান হাসিল করাই মানব-জীবনের চরম কাম্য বস্তু। ইহা হাসিল করা মানুষের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাহিরে নয়, বরং ইচ্ছা করিলে সাধনা করিয়া হাসিল করিতে পারে। কারণ, মানুষের বাহ্যিক অঙ্গের প্রক্রিয়াগুলি যেমন তাহার ইচ্ছাধীন ; তাহার আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সৎ বা অসৎ ক্রিয়াগুলিও তেমনি তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বহির্ভূত নহে ↑। তাই মানুষের চেষ্টা ও সাধনার তারতম্যে আল্লার মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান কম বা বেশীরূপে হাসিল হইয়া থাকে এবং এই মা'রেফাত লাভের তারতম্য অনুপাতেই মানুষের ভিতরে আল্লার ভয়ের সঞ্চার হয়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্যটিই স্বীয় অবস্থার দ্বারা সম্যক ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীদিগকে কোন আমলের আদেশ করিতে এমন আমলের আদেশ করিতেন যাহা সর্ব্বদা সহজে করিয়া যাওয়া সম্ভব হয়। সে জন্য (তিনি যথাসম্ভব অল্প ও সহজ আমলের শিক্ষা দিতেন। ছাহাবীগণ নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন ; তাহারা বেশী বেশী ও কঠিন কঠিন এবাদৎ ও সাধনা নিজেদের উপর টানিয়া লইবার চেষ্টায় থাকিতেন এবং মনে মনে এরূপ ভাব পোষণ করিতেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষ্পাপ, তাঁহার মর্ত্তবা অতি ঊর্দ্ধে ; সেই জন্য এবাদতের প্রয়োজন তাঁহার নাই। এই ভাবিয়া) তাঁহারা কোন কোন সময় বলিয়া ফেলিতেন—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) ! আমরা ত আপনার মত নই ; আপনী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ—পূর্ব্বাপর সমস্ত গোনাহ-ই আপনার জন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তাই আপনার ন্যায় আমাদের কম এবাদৎ করিলে চলিবে কেন ?)

↑ এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ঘোষণা করিয়াছেন—
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم অর্থাৎ—তোমাদের অন্তকরণ ইচ্ছাকৃত-ভাবে যে সকল ক্রিয়া সমাধা করিবে তজ্জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন, যদি অন্তরের ক্রিয়াকলাপ মানুষের আয়ত্তাধীন না হইত, তবে উহার দরুণ সে দায়ী হইত না।

এরূপ উক্তিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন ; তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর রাগের নিদর্শন প্রকাশ পাইত। তারপর ঐ ভুল ধারণা নিরসনে বলিতেন, নিশ্চয় জানিও—আল্লাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করিয়া থাকি। কারণ, আল্লার মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী আছে আমার।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা দ্বারা রসূলুল্লাহ (দঃ) এরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ—আমার মর্ত্তবা বড় সে জন্য আমি খোদাকে ভয় কম করিব, তাঁহার এবাদৎ বন্দেগী কম করিব, শুইয়া শুইয়া আরামে জীবন যাপন করিব। না, না—তাহা কখনই নহে। আল্লাহ যেমন আমার মর্ত্তবা বড় করিয়াছেন, আমাকে তাঁহার মা'রেফাত এবং তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী দান করিয়াছেন ; সেই অনুপাতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয়ও সকলের চেয়ে বেশী করিয়া থাকি। তবে আমি তোমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য এমন নীতি, এমন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চাই, যাহা সকলে সর্ব্ব সময় অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশী এবদৎ করিতেন, যেমন এক হাদীছে আছে—রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত, কোন কোন সময় পা ফাটিয়াও যাইত। এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ত নিষ্পাপ, আপনি কি জন্য এত কষ্ট করেন ? রসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন—"যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ করিয়াছেন, আমি কি তজ্জন্য তাঁহার শোকর আদায় করিব না ?"

পাঠকবৃন্দ ! উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে—আল্লার মা'রেফাত যাহার মধ্যে যত বেশী হইবে আল্লার ভয়ও তাহার মধ্যে তদনুপাতে বেশী হইবে। অধুনা অনেকেই মা'রেফাত হাসিলের দাবী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার ভয়, আল্লার এবাদৎ-বন্দেগী, সাধনা, আরাধনা ইত্যাদিতে তাহাদিগকে সেরূপ অগ্রণী দেখা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ভুয়া দাবীদারদিগকে ধোকাবাজ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঈমানের প্রতি কিরূপ অনুরাগ আবশ্যক

ইমাম বোখারী (রঃ) ১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন মোসলমানকে ঈমানের প্রতি এরূপ আসক্ত ও দৃঢ় অনুরাগী হইতে হইবে যাহার ফলে ঈমানের বিপরীত তথা কুফরের প্রতি তাহার ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, অসন্তোষ এবং ভীতি ও ত্রাস ঐরূপ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয় যেরূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রতি রহিয়াছে। এই অবস্থাটা মূল ঈমানের বিশেষ অঙ্গ ; যাহার মধ্যে এই অবস্থা নাই তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং এই অবস্থার পরিমাণ অনুপাতেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ হইবে। ঐ অবস্থা ব্যতিরেকে ঈমান অত্যন্ত ক্ষীণ ও মৃতবৎঃ।

ঈমানের পরিমাণ কম বেশী হওয়ার প্রমাণ

২০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তিগণ বেহেশ্‌তে এবং দোযখিরা দোযখে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন—যাহাদের অন্তরে অন্ততঃ সরীষাবীজের পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে এমন অবস্থায় দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন যে, তাহারা অনবরত আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদিগকে আবে-হায়াতের (জীবনী শক্তির) নদীতে ফেলা হইবে। সেখান হইতে তাহারা নূতন জীবন লাভ করতঃ অতিশয় সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের দ্বারা ঈমান একটি পরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তু হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং উহার পরিমাণে কম-বেশী হওয়াও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অন্য এক হাদীছে ঈমানের কম-বেশী হওয়া সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে যে—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিবেন, দোযখবাসীদের মধ্যে যাহাদের অন্তরে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমিত ঈমানের অস্তিত্ব দেখিতে পাও তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আইস। দ্বিতীয়বার বলিবেন, যাহাদের অন্তরে অর্দ্ধ দীনার পরিমিত ঈমান খুঁজিয়া পাও, তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। তৃতীয়বার বলিবেন, যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্বও পাও, তাহাকেও বাহির করিয়া লও। তার পরেও এমন এক শ্রেণীর লোক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে যাহাদের অন্তরে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তাহাদের সেই ঈমান এতদূর সূক্ষ্ম হইবে যে, উহার অস্তিত্ব নবী ও ফেরেশ্‌তাগণের অনুভূতির আওতায় আসিবে না; তাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দোযখ হইতে বাহির করিবেন।

লজ্জা-শরম ঈমানের শাখা

২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জনৈক আনছারী ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে লজ্জা-শরমের ব্যাপারে নছিহত ও ভৎ‍র্সনা করিতেছিল (যে, তুমি এত লজ্জা কর কেন?) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে এ বিষয়ে রাগ করিও না; (লজ্জা-শরম ভাল জিনিষ) যেহেতু লজ্জা-শরম ঈমানের একটি শাখা।

ব্যাখ্যা ঃ—লজ্জা-শরম এক জিনিষ এবং হেয়মন্যতা বা আত্মাভিমান প্রসূত মনের নীচতা ও দুর্ব্বলতা (Inferiority complex) ভিন্ন জিনিষ। এ বিষয়ে ৮ নং

হাদীছের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। লজ্জা-শরমের বিষয়ে কাহাকেও রাগ বা তিরস্কার করা চাই না; যেমন এই হাদীছে বর্ণিত হইল। কিন্তু মনের নীচতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার করার শিক্ষা দিবে।

ইসলামের স্বীকারোক্তি এবং নামায ও যাকাৎ আদায় করিলে তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে মোসলমান গণ্য হইবার জন্য এবং মোসলমান হিসাবে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও দাবী-দাওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যক। প্রথমতঃ তাহার কোন কার্য্য বা কথা ইসলামের স্বীকারোক্তির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে নামায ও যাকাৎ আদায় করার ব্যাপারে সে ত্রুটিহীন হয়। এই দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব কাহারও মধ্যে পাওয়া গেলে তাহাকে মোসলমান দলভুক্তরূপে মানিয়া লইতে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্য্যায়ের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারাদি দানের ব্যাপারে তাহার আন্তরিকতা- সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হইবে না; সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দেওয়ার জন্য সে আল্লার নিকট দায়ী থাকিবে। অবশ্য যদি কোনও ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহাকে পার্থিব শাস্তি বিধানও করা হইবে। ইসলামী সংবিধানের উল্লিখিত ধারাটি কোরআন ও হাদীছ উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনের আয়াত—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অর্থ:—অতঃপর (হে মোসলমানগণ! তোমাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে—) যদি তাহারা (কাফেরগণ) ইসলামদ্রোহিতা—কূফর* শের্‌ক বর্জ্জন করিয়া (খাঁটী তৌহিদের দিকে অর্থাৎ এক আল্লাহকে, আল্লার বাণীকে, আল্লার প্রেরিত পয়গাম্বরকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লওয়ার দিকে) প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাৎ আদায় করে, তবে তাহাদিগকে মুক্ত পরিবেশের সুযোগ দান কর— তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা দান কর। (১০ পাঃ ৭ রুঃ)

---

* 'কুফর' অর্থ আল্লাহকে, আল্লার বাণীকে, আল্লার রসুলকে স্বীকার ও গ্রহণ করার মতবাদ উপেক্ষা করা। 'শের্‌ক' অর্থ আল্লাহকে স্বীকার করার সঙ্গে মাবুদরূপে অন্য কাউকে কিম্বা আল্লাহ বিরোধী বস্তু ও মতবাদকে স্বীকার করিয়া চলা—উভয়টিই তৌহীদ বিরোধী।

২২। **হাদীছ** ঃ— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكوةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا

مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ـ

অর্থ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লার তরফ হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন বিপথগামী জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—জেহাদ করিয়া যাই যে পর্য্যন্ত না তাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে যে, এক আল্লাহই মাবুদ ও উপাস্থ ; তিনি ভিন্ন অন্য কোনও মাবুদ বা উপাস্থ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রস্থল এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাৎ দান করিবে। যাহারা এই কয়টি কাজ পূর্ণ করিবে তাহারা (মোসলমান হিসাবে) জান-মাল রক্ষার অধিকার পাইবে। অবশ্য ইসলামের বিধান লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। (আর উল্লিখিত বাহ্যিক কার্য্যাবলীর দ্বারা শুধুমাত্র পার্থিব আত্মরক্ষার অধিকার পাইবে।) আন্তরিক অবস্থার জন্য (অন্তর্য্যামী) আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী থাকিবে। (তদনুসারেই পরকালে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহার হিসাব নিকাশ হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ— যে ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে সে জান-মালে নিরাপত্তার অধিকারী হইবে, কিন্তু ইসলামী আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ যাহা শরীয়তে বিধিবদ্ধ আছে উহা তাহার উপর অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হইবে। যেমন—চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে, জেনা করিলে 'ছঙ্গ-ছার' (প্রস্তরাঘাতে প্রাণনাশ) করা হইবে, খুনের বদলে খুন করা হইবে, ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠান সমূহ পালন না করিলে তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করা হইবে ইত্যাদি।

স্মরণ রাখিবে প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্তি ইহকালের জন্য রক্ষাকবচ বটে, কিন্তু অন্তরে কুটিলতা রাখিয়া বাহ্যিক দলভুক্তির দ্বারা কেহ কখনও মোমেন হইতে পারিবে না এবং পরকালে নাজাত ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না ; বরং মোনাফেকের অধিক আজাব হইবে।

ঈমান একটি (ইচ্ছাকৃত ও উপার্জিত) প্রধান আমল

উপরোক্ত শিরোনামার তাৎপর্য্য এই যে—ঈমান যেহেতু একটি আন্তরিক বস্তু, ইহা কোনও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অর্জ্জিত হয় না, তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করাও নিতান্ত ভুল হইবে যে, ঈমান হাসিল করার ব্যাপারে মানুষের নিজস্ব কিছু করণীয় বা চেষ্টা চরিত্রের প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ, প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান একটি প্রধান "আমল"। আমল কাহাকে বলা হয়? আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেচনা শক্তি দান করিয়াছেন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি পরিচালনার দ্বারা সকল প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য কর্ম্মশক্তিও দান করিয়াছেন। সেই বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনও অঙ্গের দ্বারা কোনও কার্য্য সমাধা করাকেই আমল বলে। এতদ্দৃষ্টে ঈমানও একটি আমল। কারণ, ঈমানের উৎপত্তিস্থল "ক্বল্‌ব" অর্থাৎ দেল বা অন্তকরণ। ক্বল্‌ব মানুষের একটি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। মানুষ স্বীয় বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া তাহার ক্বল্‌ব অঙ্গের দ্বারা ঈমান রত্ন অর্জ্জন করিতে পারে। বরং এরূপ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জ্জিত ঈমানকেই শরীয়তে উত্তম ঈমান গণ্য করা হয়। সুতরাং ঈমান নিছক একটি ঐচ্ছিক ও অর্জ্জনীয় আমল, শুধু তাহাই নহে বরং সর্ব্বপ্রধান আমল। কারণ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ধর্ম্মীয় কার্য্যবলী ঈমানেরই ডাল-পালা ও শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। ঈমানের মূল ও শিকড় অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত এবং উহার শাখা-প্রশাখা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই নাজাতকামীদের কর্ত্তব্য হইবে সর্ব্বদা মূল ঈমানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমবায়ে উহাকে সরস, সতেজ ও শ্যামল রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। আলোচ্য শিরোনামার বিষয়টির প্রমাণে কতিপয় কোরআনের আয়াত ও একটি হাদীছ উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম আয়াত :—وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"(আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদিগকে জাগতিক জীবনে তাহাদের কৃত সাধনার প্রতি সন্তুষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ বলিবেন, (হে বেহেশতবাসী!) তোমাদিগকে এই বেহেশতের দ্বারা পুরস্কৃত করা হইয়াছে তোমাদের কৃত আমলের বদৌলতে।" (২৫ পাঃ ১৩ রুঃ)

এখানে আমল দ্বারা ঈমানকেও বুঝাইয়াছে, বরং বেহেশতের অধিকারী হইবার জন্য ঈমানই সর্ব্ব প্রধান নির্ভরস্থল। যদি ইহা ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা অর্জ্জিত না হইত, তবে ইহার প্রতিদান বা পুরস্কার কিরূপে হইতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াত ঃ— فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহ তায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা (মানব) জীবনভর কি আমল করিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিব এবং বিচার করিব।" (১৪ পাঃ ৬ রুঃ)

অনেক ইমামগণ এখানে "আমল" শব্দের উদ্দেশ্য ঈমান বলিয়াছেন—অর্থাৎ প্রত্যেক মানবকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—"মাবুদ বা উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কোনও মাবুদ নাই"—এই স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার-বাক্যের উপর সে পূর্ণরূপে আমল করিয়াছে, অথবা অন্য কাহাকেও মাবুদ বানাইয়া সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করিয়াছে ?

উল্লিখিত জিজ্ঞাস্য বস্তুটিই ঈমান ; ঈমান মানুষের ইচ্ছা ও অর্জ্জন-ক্ষমতাভুক্ত না হইলে উহার জন্য প্রশ্ন করা হইবে কেন ; কেনই বা সে উহার জন্য দায়ী হইবে ?

২৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হইল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমল কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি খাঁটী বিশ্বাস স্থাপন করা অর্থাৎ ঈমান। পুনরায় আরজ করা হইল—তারপর ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। আবার আরজ করা হইল—তারপর ? হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ (আদব, মহব্বৎ, ভক্তি, ভজনা ও সাধনার সহিত) হজ্জ করা যাহা আল্লার দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—জেহাদ, হজ্জ ইত্যাদির ন্যায় ঈমানও একটি আমল, বরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমল—যাহা যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনায়ই হাসিল হইতে পারে।

খাঁটী ও অখাঁটী ইসলামের বিশ্লেষণ

যদি খাঁটীভাবে সর্ব্বান্তকরণে ইসলামকে গ্রহণ করা না হয়, শুধু আত্মরক্ষামূলক বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাহ্যিক দলভুক্তি ও আনুগত্য দেখান হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ইসলামের আদৌ কোনও মূল্য হইবে না। এরূপ ইসলামের নামধারী ব্যক্তি মোমেন হওয়ার দাবীও করিতে পারে না, তাহাকে মোমেন বলিয়া আখ্যায়িতও করা যাইবে না। পবিত্র কোরআনেই আছে—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۔

অর্থাৎ :—একদল গ্রাম্যলোক যাহাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লোক দেখানো ভাবে কিছু বাহ্যিক আমল তাহারা করিত; তাহারা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঈমানের দাবী-দার হইল। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আদেশ করিলেন, "আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা মিথ্যাবাদী—তোমরা ঈমানদার হও নাই; তবে হাঁ, প্রকাশ্যে ইসলামের আনুগত্য দেখাইতেছ, এইটুকুই দাবী করিতে পার। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই। (২৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হইল—পার্থিব লোভ, স্বার্থোদ্ধার বা ভয় ইত্যাদির দরুণ মৌখিক স্বীকারোক্তি ও বাহ্যিক আমলের ইসলাম আল্লার নিকট মূল্যহীন হইবে।*

বাহ্যিক স্বীকারোক্তি ও আমলের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটিভাবে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও নিষ্ঠার সহিত ইসলামের যাবতীয় অনুশাসনকে গ্রহণ করার দৃঢ় প্রস্তুতি থাকিলে সেই

---

* বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম বিবর্জিত শিক্ষা ও বিধর্ম্মীয় সভ্যতার অনুকরণ-প্রিয়তার যুগে এক প্রকার মোসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা শুধু বংশগত ভাবেই মোসলমান। অর্থাৎ মোসলমান পূর্ব্বপুরুষ ও মুসলিম বাপ-দাদার ঔরষজাত হিসাবে মোসলমান বলিয়া পরিচিত। সামাজিক বাধ্য-বাধকতা বা শুধু স্ফূর্ত্তি উপভোগ ও দলভুক্তি হিসাবে ঈদ, কোরবাণী ইত্যাদি এমনকি হজ্জযাত্রার ন্যায় মোসলমানদের বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতেও যোগদান করে, কিন্তু স্বীয় বিবেচনাশক্তি দ্বারা পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া এরূপ মনোবল ও দৃঢ়তা অর্জ্জন করে নাই যে, একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত মতবাদ ও আল্লার মনোনীত ধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণীয় বিধায় আমি সর্ব্বান্তকরণে উহাকেই গ্রহণ করিতেছি এবং অন্য সমস্ত মতবাদ বর্জনীয় অতএব আমি সে সব বর্জন করিতেছি। এহেন বংশানুক্রমিক মোসলমানদের সতর্ক হওয়া এবং উক্ত আয়াতের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

মদীনার ঐ গ্রামবাসী মোনাফেকের দল যাহারা কেবল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও ঈমানের দাবী করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের উপর প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম ও ঈমানের কোনই প্রভাব ছিল না এবং ইসলামের প্রতি তাহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাও ছিল না। পক্ষান্তরে তাহারা ইসলামকে অচল হেয় মনে করিত, এমনকি খাঁটি মোসলমানদিগকে বোকা, নির্ব্বোধ ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। এই সকল মোনাফেক মোসলমানীর দাবীদারদের সহিত বর্ত্তমান যুগের নামধারী বংশগত মোসলমানদের তুলনা করিলে মোটেই অতিরঞ্জিত বা অন্যায় হইবে না। কারণ, ইহারা শুধু যুগ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পঞ্চায়েতী নেতৃত্ব ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমুহকে এই বিরাট-মোসলেম সমাজের নিকট হইতে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্য নিজেদেরকে মোসলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামের কোনও প্রভাবই তাহাদের উপর নাই এবং ইসলামের প্রতি কোনরূপ দরদ, শ্রদ্ধা, দৃঢ়তা বা একীন তাহাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত নাই।

ইসলামই আল্লার নিকট গ্রহণীয় হইবে। একমাত্র এই প্রকার ইসলামকে উদ্দেশ্য করিয়াই কোরআনের ঘোষণায় রহিয়াছে—إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ; আল্লার মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম" (৩পাঃ ১০রুঃ)। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না।

২৪। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, তিনি একদল লোককে দান করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে এমন একজন লোককে তিনি কিছুই দিলেন না, যাহাকে আমি ঐ দলের মধ্যে সর্ব্বোত্তম (দ্বীনদার-পরহেজগার) বলিয়া মনে করিতাম। এতদ্দৃষ্টে আমি আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি অমুক ব্যক্তিকে দান করিলেন না? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে "মোমেন"। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (এরূপ দৃঢ়ভাবে) "মোমেন" বলিও না, "মোসলেম" বল। আমি কিছু সময় চুপ করিয়া রাহিলাম, কিন্তু আমার মনে ঐ খেয়াল ও ধারণা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আমি পুনরায় ঐরূপ বলিলাম; তিনিও পুনরায় ঐরূপই বলিলেন—"মোমেন" বলিও না, "মোসলেম" বল। তৃতীয়বার ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হে সায়া'দ! (অনেক সময়) আমি অপছন্দনীয় ব্যক্তিকেও দান করি শুধু এই কারণে যে, (তাহার ঈমান এখনও দুর্ব্বল;) আমার আশঙ্কা হয়··· (তাহাকে দান করিয়া স্বচ্ছল না রাখিলে অভাবে পড়িয়া) সে হয়ত (ইসলাম ত্যাগ পূর্ব্বক) দোযখের পথে চলিয়া যাইতে পারে।↑

ব্যাখ্যা ঃ—"মোমেন" শব্দের অর্থ ঈমানদার। খাঁটীভাবে ভয় ও ভক্তির সহিত বিশ্বাস করতঃ সেই বিশ্বাসানুপাতিক জীবন যাপনের আন্তরিক প্রস্তুতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করাকে ঈমান বলা হয়। ইহা কোনও বাহ্যিক অথবা দৃশ্য বস্তু বা ক্রিয়া নহে। ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রস্তুতি এ সবই অন্তরের অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণ বিশেষ—যাহা বাহ্যদৃষ্টির আওতাভুক্ত নহে। অতএব কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নিশ্চিতরূপে "মোমেন" বলার অধিকার অন্তর্য্যামী আল্লারই থাকিতে পারে। অন্য কেহই এই অধিকার পাইতে পারে না।

↑ কোনও ব্যক্তিকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী তাহার মন রক্ষা করিয়া চলাকে শরীয়তের পরিভাষায় "তালীফে-কুলুব" বলা হয়। শরীয়তে এরূপ মনস্তুষ্টি বিধান করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ঈমান-রত্নের বিকাশ সকলের অন্তরেই মাত্র এক-দুই দিনেই হইয়া যায় না। খাঁটি মোমেনদের সংশ্রবে থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে উহা হাসিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে জন্যই ঐরূপ ব্যক্তির সন্তুষ্টিবিধান করতঃ তাহাকে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দান করা বিধেয়।

"মোসলেম" অর্থ ইসলাম গ্রহণকারী। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকামের প্রতি স্বীকারোক্তি ও ঐগুলিকে বাহ্যতঃ পালন করার নাম "ইসলাম"। ইহা অবশ্যই কতকগুলি প্রকাশ্য ক্রিয়া-কলাপ এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি-বিশেষ। তাই ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পরস্পর একে অন্যকে দৃঢ়তার সহিতও "মোসলেম" বলিতে পারে।

সায়া'দ (রাঃ) তাঁহার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে শপথ করিয়া দৃঢ়তার সহিত "মোমেন" বলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা ছিল—কারণ, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে এরূপ দৃঢ়ভাবে মোমেন বলার অধিকার আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দ (রাঃ)কে বাধা দান করিয়া বলিলেন—অদৃশ্য ও অন্তকরণ সম্পর্কিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ এবং সাব্যস্ত-মূলক উক্তি করা বাঞ্ছনীয় নহে। হয়ত ঐ ব্যক্তি অন্তরে অন্য ভাব পোষণ করিয়া থাকিতে পারে। তবে হাঁ তাহার প্রতি তোমার ভাল ধারণা থাকিলে তুমি তাহাকে দৃঢ়ভাবেও মোসলেম বলিতে পার। কারণ, ইসলাম কোনও অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য বস্তু নহে, উহার অনুভূতি মানুষের প্রকাশ্য দৃষ্টির আওতাভুক্ত।

পাঠকবর্গ! এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন যে—"মোমেন" ও "মোসলেম" শব্দদ্বয়ের মূল "ঈমান" ও "ইসলামের" মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন এবং এই দুইটির ব্যবহারিক তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ উপলব্ধি করান—ইহাই ছিল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাধাদানের উদ্দেশ্য। নতুবা যে ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথা-বার্ত্তা হইতেছিল তিনি অতি বড় মর্ত্তবার ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—জোয়াইল (রাঃ)। অন্য স্থানে স্বয়ং নবী (দঃ) তাঁহার বহু ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দেখান হইল যে, আখাঁটী ইসলামের দ্বারা "মোমেন" আখ্যা লাভ করা ত দূরের কথা খাঁটি ইসলাম ক্ষেত্রেও "মোমেন" আখ্যার ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা সাপেক্ষ।

ব্যাপকভাবে সালাম জারী করা ঈমানের একটি শাখা

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) বলিয়াছেন—তিনটি স্বভাবকে যে আয়ত্ব করিতে পারিবে সে সর্ব্বাঙ্গীন ঈমানের অধিকারী হইবে। (১) নিজ হইতেই নিজের ইনসাফ করা, অর্থাৎ নিজের উপর আল্লার বা বান্দাদের মধ্যে যাহার যে হক আছে, প্রত্যেকটি হক কাহারও দাবী ব্যতিরেকেই পূর্ণরূপে আদায় করা। (২) পরিচিত অপরিচিত নির্ব্বিশেষে সকলকে সালাম* করা। (৩) গরীব হওয়া সত্বেও শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজে দান করা।

* মৌখিক সালামের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ সালাম তথা শান্তিও দান করা চাই।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য শিরোনামায় ১১নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

কুফরের শাখা-প্রশাখা পরস্পর ছোট-বড় হয়

অর্থাৎ ঃ—যেমন নেক কাজসমূহ ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং উহা পরস্পর ছোট-বড় হয়, তদ্রূপ গোনাহের কাজসমূহ কুফরের শাখা-প্রশাখা এবং উহাও পরস্পর ছোট-বড় হয়।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—যেমন আল্লার হক্ক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকে কুফরের শাখা বলা যায়, তেমনি কোন মানুষের হক্ক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকেও কুফরের শাখা বলা যাইবে।

২৫। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে দোযখ দেখানো হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি—দোযখীদের অধিকাংশই নারী। কারণ, তাহারা "কুফরী" বেশী করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল ; তাহারা কি আল্লার কুফরী করিয়া থাকে ? নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, স্বামীর কুফরী (অর্থাৎ না-শোকরী ও নেমক-হারামী) এবং এহ্সান ও উপকারের কুফরী করিয়া থাকে। নারী জাতির স্বভাব এই যে, যদিও তুমি তাহার প্রতি আজীবন এহ্সান সদ্ব্যবহার ও উপকার কর, কিন্তু তোমার কোনও একটি মাত্র ক্রটির দরুণ সে (সব কিছু ভুলিয়া গিয়া অস্বীকার করতঃ) বলিবে—আমি জীবনে কখনও তোমার নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইলাম না।

● এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ঐ হাদীছটি "ঋতু অবস্থায় রোযা রাখিতে পারিবে না" শিরোনামায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। সেই হাদীছে নারী জাতির আরও দুইটি মারাত্মক দোষের কথা উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এই যে—নারী জাতি স্বভাবতঃ কথায় কথায় অভিশাপ ও তিরস্কার অত্যন্ত বেশী করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়টি হইল এই যে, নারী স্বভাবতঃই অতি ছলনাময়ী হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন—নারী জাতি সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা তরলমতি ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্না হইয়াও শুধু ছলনার দ্বারা অতিশয় হুশিয়ার, চালাক চতুর পুরুষের বুদ্ধিকেও ঘোলাটে করিয়া দিতে সর্বাধিক পটু দেখা যায়।

পাঠকবর্গ ! আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নহে। বরং নারী জাতির ক্রটি সংশোধন ও চরিত্র গঠন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ জাতি গঠন ও জাতীয় চরিত্র সংশোধনে অতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। হযরত (দঃ) জাতির ক্ষুদ্রতম ছিদ্র

পথেও প্রবেশ করতঃ উহার গলদ দুর করার প্রতি তৎপর হইয়াছেন এবং জাতিকেও তদনুযায়ী শিক্ষাদান করিয়াছেন। নারী জাতির উপরই সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা সব কিছু নির্ভর করে। তাহাদের ছলনায়, তাহাদের অভিশাপ ও ভৎর্সনার দাপটে এবং তাহাদের না-শোকরগোজারীপূর্ণ কর্কশ ব্যবহারে বহু স্বামীর সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। এমনকি, অনেক সময় ইহার বিষময় ফলাফল ও বিধ্বংসী পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ ভয়াবহতার মূল কারণ—উপরোক্ত দোষগুলির প্রতি সংস্কারের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমনকি, ঐ দোষগুলিকে অত্যন্ত কঠোর শব্দ "কুফর" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অপরিসীম বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতারই পরিচায়ক।

প্রত্যেকটি গোনাহ কুফুরীর শাখা

অর্থাৎ গোনাহ যত ছোটই হউক না কেন, উহাকে মামুলী গণ্য করা চাই না এবং উহা হইতে দুরে থাকিবার প্রতি তৎপর হওয়া চাই। কারণ, উহা কুফুরীর একটি শাখা। যেরূপভাবে প্রত্যেকটি নেক আমলকে ঈমানের শাখা বলা হইয়াছে।

গোনাহ সমূহ কুফুরীর শাখা ও কুফুরী যুগের প্রথা হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কুফুরীর শাখা-প্রশাখা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন কোনও ব্যক্তিকে "কাফের"বলা যাইবে না—যে পর্য্যন্ত না সে আল্লার, আল্লার রসুলের বা আল্লার বাণীর প্রতি স্বীকারোক্তি হানিকর কোনও কাজ বা উক্তি করিবে। তবে হাঁ, সাধারণ গোনাহ সমুহের অনুষ্ঠানকারী কাফের সাব্যস্ত না হইলেও তাহার মধ্যে কুফুরীর শাখা আছে বলিতে হইবে। যেমন, বলা হয়—সে চোর না হইলেও চোরাই মাল তাহার ঘরে আছে।

কুফুরীর শাখা-প্রশাখা--গোনাহসমুহ মাফ হওয়ার উপযোগী। অর্থাৎ তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হয়। কিন্তু আসল কুফর ও শেরক আল্লাহ তায়ালা কখনও মাফ করিবেন না। উহা বর্জন পূর্ব্বক ইসলাম গ্রহণ করিলেই উহা মাফ হইতে পারে; উহা মাফ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে (৫ পাঃ ১৫ রুঃ)।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থঃ—আল্লার সঙ্গে শরীক করা (অংশীবাদিতা) এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই মাফ করিবেন না। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।

এই আয়াতে শুধু শেরেকেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু কুফরও তদ্রূপই অক্ষমার্হ। কারণ, বস্তুতঃ শেরেক ও কুফর পরস্পর বিজড়িত। "শেরক" অর্থ কাহাকেও আল্লার সঙ্গে শরীক করা, "কুফর" অর্থ আল্লাহকে, আল্লার রসুলকে বা আল্লার বাণীকে অস্বীকার করা। আল্লার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা হইলে সে ক্ষেত্রে আল্লাকে অস্বীকারই করা হয়, কারণ প্রকৃত পক্ষে যিনি আল্লাহ তিনি ত ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু—তিনি এক, অদ্বিতীয় তাঁহার কোন শরীক বা দোসর নাই। তদ্রূপ আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার বাণীকে অস্বীকার করিলেও নিশ্চয় অন্যকে আল্লার সঙ্গে শরীক করা হইয়া থাকে। কারণ, কোনও লোক যখন আল্লার অস্তিত্বকে বা রসুলের ও কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করে, তখন সে নিশ্চয়—হয়ত অন্য কাহারও অনুকরণে উহা করে কিম্বা স্বীয়-প্রবৃত্তির বশে উহা করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাও আল্লার সঙ্গে শরীক করারই নামান্তর। কেননা, মানুষ বিনাশর্তে আনুগত্য স্বীকার করিবে, ইহা একমাত্র আল্লারই সার্বভৌম অধিকার। অথচ ঐ ব্যক্তি আল্লার সেই অলঙ্ঘ্য অধিকার অন্য মানুষকে বা স্বীয় প্রবৃত্তিকে অর্পন করিয়াছে, তাই এক্ষেত্রেও শের্‌ক করা হইল।

এখানে ইহাও প্রকাশ পায় যে, প্রতিটি গোনাহ শের্‌কেরও শাখা, তাই গোনাহকে অন্ধকার যুগের কাজ বলা হইবে। কারণ, প্রতিটি গোনাহে স্বীয় প্রবৃত্তির বশ্যতা থাকে ; অথচ মানবের কর্ত্তব্য হইল--একমাত্র আল্লার বশ্যতায় চলা। ইহারই ইঙ্গিত এই আয়াতে রহিয়াছে--

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ - أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

"হে রসুল ! বলুন ত—যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে মাবুদ বানাইয়াছে ; আপনি লইতে পারেন কি তাহার সংশোধনের দায়িত্ব ?" (১৯ পাঃ ২ রুঃ)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া চলিয়াছে, তাহাও সৃষ্টিকর্ত্তা-পালনকর্ত্তার বিরুদ্ধাচরণে তাহার সংশোধন হইবে কিরূপে ?

২৬। হাদীছ ঃ- আবুযর গেফারী ছাহাবীর শাগেরদ মা'রুর (রঃ) বর্ণনা করেন—একদা আমি আবুযর গেফারীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পরিধানে একজোড়া কাপড় এবং তাঁহার ক্রীতদাসের পরিধানেও অবিকল ঐরূপ একজোড়া কাপড়। আমি তাঁহাকে ভৃত্যের সহিত এরূপ সমতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একদা আমি আমার ভৃত্যকে গালি দিতে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুনিয়া

বলিলেন, হে আবুযর! তাহাকে তাহার মাতার সঙ্গে জড়াইয়া গালি দিতেছ? তোমার মধ্যে কুফরী যুগের স্বভাব রহিয়াছে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"এই সব ক্রীতদাস (বা ভৃত্যগণ) তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। অতএব, যে কোনও মোসলমানের অধীনে তাহারই অন্য এক ভাই (তথা তাহারই মত একজন মানুষ ভৃত্য শ্রমিক বা ক্রীতদাস রূপে) থাকিবে; সেই মোসলমানের কর্ত্তব্য হইবে—ঐ ভাইকেও তদ্রূপই খাওয়ানো, পরানো যদ্রূপ সে নিজে খাইয়া ও পরিয়া থাকে। আর সাবধান! তোমরা কখনও ঐ ভাইএর উপর এতদুর গুরুভারের কাজ চাপাইয়া দিও না, যাহা তাহার সাধ্যয়ত্ত নহে। যদি কখনও এরূপ কোন কাজ তাহার দ্বারা করাইতে হয়, তবে তোমরা নিজেরাও ঐ কাজে তাহার সাহায্য করিবে।"

২৭। হাদীছ ঃ— عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ -

অর্থ ঃ—আবু বক্‌রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—দুই দল মোসলমান যখন তরবারি হাতে লইয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! হত্যাকারী ব্যক্তি দোযখের উপযুক্ত হইবে ইহা বোধ-গম্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি দোযখের উপযুক্ত হইবে কেন? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন—কারণ, নিহত ব্যক্তিও যখন তরবারি হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল, তখন তাহারও ইচ্ছা এই ছিল যে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবে, (সুতরাং সেও দোযখেরই উপযুক্ত)।

এই হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মোসলমানদের পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করা কুফরীর একটি শাখা, তাই এই কাজের পরিণাম ফল উভয়ের জন্যই দোযখ। অন্য এক হাদীছে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে-- سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলমান মুসলমানকে গালি দিলে গালিদাতা ফাছেক হইয়া যায় এবং মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করিলে তাহা কুফরী কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।"

তবে এখানেও সেই পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানটি প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে কুফরী অনুষ্ঠানকারী, কুফুরীর শাখা প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইবে। কাফের বলা যাইবে না। বোখারী (রঃ) ইহার প্রমাণে কোরআন শরীফের একটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا - فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيئَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ

অর্থঃ—যদি মোমেন মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইটি দল পরস্পর লড়াই—ঝগড়ায় ব্যপৃত হইতে উদ্যত হয়, তবে (হে মোসলেম জাতি! তোমাদের প্রতি আমার আদেশ এই যে—তদবস্থায় তোমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিও না বা গোপনে উস্কানি দিও না অথবা তাহাদের বিপদ দেখিয়া মনে মনে আত্মতুষ্টি লাভ করিও না, বরং) তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ছোলেহ (মিমাংসা) ও পুনর্মিলন সৃষ্টি করিয়া দাও। তোমাদের মিমাংসা-চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তন্মধ্যে একদল অন্য দলের উপর অত্যাচার করে, তবে তোমরা সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ও আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে আল্লার আদেশের (মীমাংসা ও পুনর্মিলনের) প্রতি মাথা নত করিতে বাধ্য কর। (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, দুই দল মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া কুফুরী কাজ এবং কুফুরীর শাখা হওয়া সত্ত্বেও ইহার দ্বারা ঈমান একেবারে বিনষ্ট হইবে না। খাঁটী তওবা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ থাকিবে এবং তাহাকে "কাফের" বলা যাইবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধরত উভয় দলকেই মোমেন বলিয়াছেন।

২৮। হাদীছঃ—ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাজিল হইল—

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কোন প্রকার অন্যায়-অত্যাচার করে নাই, একমাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাওয়ার উপযোগী (৭ পাঃ ১৫ রুঃ)। ছাহাবীগণ

ভাবিলেন--আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশী কিছু অন্যায়-অত্যাচার (অর্থাৎ গোনাহ) নিশ্চয়ই আছে ; তাহা হইলে এই আয়াতের মর্ম্মানুসারে দেখা যাইতেছে, আমরা কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারি না। এই ভাবিয়া তাঁহারা (ভীত ও চিন্তিত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট) আরজ করিলেন—আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটিও অন্যায়-অত্যাচার (গোনাহ) করে নাই ? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—এই আয়াতে (যুল্‌ম শব্দটির দ্বারা) সাধারণ অন্যায়-অত্যাচার বা সাধারণ গোনাহ উদ্দেশ্য করা হয় নাই, বরং সব চেয়ে বড় অন্যায়-অত্যাচার "শের্‌ক"কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে—ان الشرك لظلم عظيم "নিশ্চয় জানিও "শের্‌ক" সবচেয়ে বড় অন্যায়—বড় অত্যাচার।" (২১পাঃ ১১রুঃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—"যুল্‌ম" শব্দের অর্থ অন্যায়-অত্যাচার। গোনাহ মাত্রই আল্লার নাফরমানী হওয়ার কারণে অন্যায় এবং নিজের প্রতি অত্যাচার। ছাহাবীগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে—কোনও গোনাহ করে নাই এমন নিষ্পাপ আমাদের মধ্যে কে আছে ? অতএব, দেখা যায় আমাদের মধ্যে কেহই, পরিত্রাণ পাইবার যোগ্য নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উক্ত আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে—এই আয়াতে সাধারণ গোনাহের অর্থে যুল্‌ম শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, বরং এখানে "শেরক"কে যুল্‌ম বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শেরক করা হইলে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না ইহা ধ্রুব সত্য। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ "শের্‌ক"কে যুল্‌ম বা অত্যাচার মনে করে না, কিন্তু ইহা তাহাদের নিতান্ত মূর্খতা। বিশ্ব-প্রখ্যাত জ্ঞানী "লোকমান" স্বীয় পুত্রকে নছিহত ও উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যাহা কোরআন শরীফেও উল্লেখ আছে—

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"হে বৎস ! আল্লার সঙ্গে শরীক করিও না ; নিশ্চয় জানিও—শেরক অতি বড় যুল্‌ম।" আলোচ্য হাদীছে নবী (দঃ) উক্ত আয়াত দৃষ্টেই যুল্‌মের ব্যাখ্যা শেরকের দ্বারা করিয়াছেন।

মোনাফেকের নিদর্শন

২৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন.....(১) কথায় কথায় মিথ্যা বলিবে (২) ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করিবে, (৩) আমানতে খেয়ানত করিবে।

৩০। **হাদীছ :**—عن عبد الله بن عمر قال النبى صلى الله عليه وسلم

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন চারিটি চরিত্রদোষ আছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে উহার সমষ্টি পাওয়া গেলে সে পুরাপুরি মোনাফেক পরিগণিত হইবে এবং উহার কোনও একটি পাওয়া গেলে তাহার মধ্যে মোনাফেকির খাছলত ও স্বভাব আছে বলা হইবে। (১) আমানতে খেয়ানত করা (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলা (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৪) কাহারও সঙ্গে মতানৈক্য বা বিরোধ হইলে তাহাকে গালাগালি করা।

লাইলাতুল-ক্বদরে এবাদত করা ঈমানের শাখা

৩১। **হাদীছ :**—عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লার নিকট ছওয়াব পাইবার আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া লাইলাতুল-ক্বদরে এবাদত করিবে, ঐ ব্যক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী (ছগীরা) গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

জেহাদ করা ঈমানের শাখা

৩২। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কেবলমাত্র এই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে বাহির হইবে যে, একমাত্র আল্লার উপর ঈমান ও তাঁহার রসুলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ সমর্থনই তাহাকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে (অন্য কোনও মোহ নহে)। আল্লাহ

তায়ালা তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রাখিয়াছেন—হয় তাহাকে ছওয়াব ও গণীমতের↑ মাল-দৌলত দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বগৃহে ফিরাইবেন, নতুবা সোজা সোজা বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবেন। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) যদি আমি সকলের কষ্ট হইবে ইহা লক্ষ্য না করিতাম, তবে আমি প্রতিটি জেহাদকারী দলেই যোগদান করিতাম+। (জেহাদের প্রতি) আমার প্রাণের আকাঙ্খা এই—আল্লার রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হইয়া পুনরায় শহীদ হই এবং পুনরায় জীবিত হইয়া আবার শহীদ হই।

তারাবীর নামায (ফরয নয়, কিন্তু) ঈমানের শাখা

৩৩। হাদীছ :—عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم—
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লার নিকট ছওয়াব পাইবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমজানের নামায (তারাবীহ) আদায় করিবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

↑ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্মযুদ্ধে) জয়ী হইয়া শত্রু পক্ষ হইতে যে সকল মালামাল, অর্থ-সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি হস্তগত হইয়া থাকে, উহাকেই 'গণীমত' বলা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোনও নবীর শরীয়তে এই সকল মাল উপভোগ করার অনুমতি ছিল না; বরং উহা একত্রিত করা হইত এবং ঐ যুদ্ধ আল্লার দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আকাশ হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐগুলি ভস্ম করিয়া দিত।

কিন্তু আমাদের শরীয়তে ঐ সকল মালামাল এই বিধানমতে উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সকল বিজিত ও প্রাপ্ত সম্পূর্ণ মাল ঐ যুদ্ধে নিয়োজিত আমীর অথবা রাষ্ট্রের খলিফার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি ঐ মালের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার বাইতুল-মালে রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত মাল মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করিবেন।

\+ রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কোনও জেহাদে যোগদান করিলে সেই জেহাদে বিশেষভাবে সকলেই যোগদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অথচ সকলের জন্য সব সময় শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হইত না বিধায় তাহারা মর্ম্মাহত হইত। তাহাদের এই মনোবেদনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রয়োজন না হইলে স্বয়ং সর্ব্বদা জেহাদে শামিল হইতেন না।

রমযানের রোযা রাখা ঈমানের শাখা

৩৪। হাদীছ ঃ—عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমযানের রোযা রাখিবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী (ছগীরা) গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—লাইলাতুল-কদর, রমযানের রোযা ও তারাবীহ্ ইত্যাদির বিশেষত্ব ও মর্ত্তবা দৃশ্যও নহে বা ব্যবহারিক যুক্তি প্রমাণে সাব্যস্ত হওয়ার বস্তুও নহে। এ সবের বিশেষত্ব ও মর্ত্তবা একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ ও অকাট্য বিশ্বাস ও একীন স্থাপন করার উপরই নির্ভর করে। আল্লার ঘোষণা ঃ— ليلة القدر خير من الف شهر "লাইলাতুল-কদরের এক রাত্রির এবাদৎ হাজার মাসের এবাদৎ অপেক্ষা উত্তম।" যে ব্যক্তি এই ঘোষণা ও ৩১নম্বর হাদীছের প্রতি খাঁটী ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সেই বিশ্বাসই তাহাকে লাইলাতুল-কদরের এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট ও সক্রিয় করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাস অন্তরে জাগ্রত থাকাবস্থায় কেহই ঐ রাত্রিকে নিদ্রায় কাটিতে পারে না। তদ্রূপই যে ব্যক্তি আল্লার ঘোষণা— كتب عليكم الصيام "তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে" এবং ৩৪ নম্বর হদীছে পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে, সে কখনও রোযা ভঙ্গ করিবে না। ঐ সকল ঘোষণার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসই তাহাকে রোযা রাখায় আকৃষ্ট করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি ৩৩ নম্বর হাদীছে বিশ্বাসী; ঐ বিশ্বাসই তাহাকে তারাবীর নামাযের প্রতি অনুপ্রাণিত করিবে।

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছের মধ্যে যে—ايمانا و احتسابا "ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া" বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য ইহাই যে—যে ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারের মোহ বা ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া নহে, বরং কেবলমাত্র আল্লাহ ও রসুলের উপরোক্ত ঘোষণাসমূহের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং নিছক ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই সব এবাদৎ করিবে কেবলমাত্র তাহারই জন্য পূর্ব্ববর্ণিত সুসংবাদ।

প্রকাশ থাকে যে, আখেরাতের যাবতীয় আমলই তদ্রূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের আদেশ বা ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া

আমল করিবে কেবলমাত্র সে-ই উহার পুরস্কার পাইবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কোন মোহে বা অন্য কোনও সাময়িক কারণে যত বড় নেক আমলই করা হউক না কেন, আখেরাতে উহার কোন ছওয়াব পাওয়া যাইবে না।

ইসলাম ধর্ম্ম অতি সহজ

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ পছন্দনীয় দ্বীন ও ধর্ম্ম এই দ্বীনে-মোহাম্মদী, যাহার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নাই এবং যাহা অতিশয় পবিত্র ও অতি সহজ।

৩৫। হাদীছঃ—عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهٗ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا

وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—দ্বীন (অর্থাৎ দ্বীনের বিধি-বিধান ও উহার পন্থাসমূহ) অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু যে কোনও ব্যক্তি দ্বীনের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করিবে সে পরাজিত হইবে। তাই সকলের কর্ত্তব্য হইবে, ঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত ইসলামের নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি না করিয়া ধীরস্থির গতিতে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা এবং আল্লার রহমত ও করুণার আশা পোষণ করা এবং সকাল-বিকাল ও শেষ রাত্রে নফল এবাদৎ দ্বারা (অধিক নৈকট্য লাভ ও উন্নতির পথে) সাহায্য গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যাঃ— ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহ সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সমস্ত ধারা ও উপধারা সমূহের সম্মিলিত ফরমুলা দৃষ্টে এই দাবী অনস্বীকার্য্য যে, ইসলাম ধর্ম্মের বিধানাবলী ও পন্থাসমূহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। ইহার কোনও ধারা বা বিধান এরূপ কোনও নিয়ম বা ফরমুলায় গঠিত নয় যদ্দরুন কেহ কোন সময় কোন অবস্থায় অচল হইয়া পড়িতে পারে বা কোন বিধান মানুষের সাধ্যের উর্দ্ধে যাইতে পারে। যেমন "নামায"—ইহার সাধারণ পন্থা ও বিধান হইল দাঁড়াইয়া পড়া, কিন্তু কেহ দুর্ব্বল হইলে সে বসিয়া পড়িবে, আরও দুর্ব্বল হইলে শায়িত অবস্থায় পড়িবে, ইহা হইতে অধিক দুর্ব্বল হইলে কাজা করিবে। এই কাজা আদায় করার সুযোগ না পাইয়া মরিয়া গেলে মাল দ্বারা ফিদ্য়া আদায় করিবে। সেই ফিদ্য়া আদায় করার মধ্যেও এরূপ সুযোগ সুবিধার সূত্র আছে

যে, উহা ধনী-গরীব কাহারোও অসাধ্য হইবে না। নামাযের জন্য "অজু" করা অপরিহার্য্য, কিন্তু পানি ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মাটি, বালু বা পাথরের উপর তায়াম্মুম করিবে। সাধারণতঃ এই তিনটি বস্তু কোথাও দুর্ঘট হয় না। তাহাও যদি অপ্রাপ্তব্য হয়, তখন মাছআলাহ্ এই যে—নামাযের সময় অনুসারে বিনা অজুতেই নামাযের কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিবে, পরে পানি বা তায়াম্মুমের বস্তু পাওয়া গেলে তখনকার অবস্থানুসারে ব্যবস্থাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ নামায ক্বাজা পড়িবে। নামাযের জন্য সুরা-কেরাত পাঠ করা অপরিহার্য্য, কিন্তু উহা জানা না থাকিলে আপাততঃ শিক্ষা করা সাপেক্ষে শুধু "ছোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ" পড়িয়া নামায আদায় করিবে। এইভাবে প্রতিটি এবাদতের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই সামর্থানুযায়ী ও সহজ সাধ্য হইবার জন্য সুযোগ সুবিধার কোনই অনটন নাই, আছে শুধু আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আগ্রহের অভাব।

এবাদৎ ছাড়া "মোয়া'মালাত" অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি পার্থিব ও অর্থনৈতিক বিষয় সক্রান্ত ব্যবস্থা ও বিধি-নিষেধগুলিও তদ্রূপই। শরীয়তের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমুদয় নিয়ম-কানুন, ধারা-উপধারা সম্মিলিত ফরমুলা কোন ক্ষেত্রেই অসহজ বা উন্নতি ও প্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নহে।

অনেকে হয়ত এক্ষেত্রে ইসলামের অকাট্য বিধান "সুদ হারাম" বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিবেন যে, ইহা ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অন্তরায়। অথচ ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা একটি সুফলদায়ক, বরং বর্তমান যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য একটি অপরিহার্য্য মাধ্যম। তদ্রূপ "ইন্সিওরেন্স বা বীমা" ব্যবস্থা; উহাও ইসলাম ও শরীয়তের বিধানে নিষিদ্ধ ও হারাম; অথচ এই ব্যবস্থাও বিপদগ্রস্ত, অনাথ, এতিম-বিধবার জন্য এবং আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

এই শ্রেণীর সমালোচনা বস্তুতঃ ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রসূত। ব্যাঙ্কিং একটি আধুনিক ব্যবস্থা বটে, কিন্তু উহার জন্য সুদপন্থা ছাড়া শরীয়তে বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। তদ্রূপ বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার এবং উহার সুফল লাভেরও শরীয়ত সম্মত বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সুদপন্থার বিকল্প পন্থাটি সুদপন্থা অপেক্ষা এবং বীমা ব্যবস্থার বিকল্প পন্থাটি প্রচলিত হারাম পন্থা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনে অধিক সুফলদায়কও বটে। সংক্ষেপে একটি বিষয় অনুধাবন করুন।

দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে দেখা যায়, পুঁজিপতিত্ব তথা গরীবদেরকে দারিদ্র্যের যাতাকলে দাবাইয়া রাখিয়া তাহাদের শ্রম এবং মধ্যবিত্তদেরকে বিভিন্ন মারপেঁচের

চাপাকলে পেঁচাইয়া দিয়া তাহাদের ধন শোষণ করতঃ কতিপয় লোক ধনে সম্পদে বিরাটকায় হওয়ার নীতি ভূপৃষ্ঠে আস্তানা জমাইয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিপতিদের শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুঁজিপতিত্বের মূল মনে করিয়া উহাকে নির্বিবচারে খতম করিতে তাহারা মারমুখী হইয়া উঠে; ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে ধ্বংস ও বিপর্য্যয় নামিয়া আসে।

ইসলাম পূর্ব্ব যুগেও পুঁজিপতিত্বের অভিশাপ ও যাতাকল চালিত ছিল; তাই ইসলাম মানবীয় কল্যাণের স্বাভাবিক কারণে ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান এমনভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছে যাহাতে কোন পথেই পুঁজিপতিত্ব তথা ব্যক্তি বা গোষ্টি ও গ্রুপবিশেষ অন্যদের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া শুধু নিজেদের ভুরি ভরার সুযোগ না পায়। অর্থ বণ্টন বা লাভের ভাগী করার ক্ষেত্রে যত দুর সম্ভব বেশী সংখ্যায় জনগণকে সুযোগ দান করাই ইসলামের নীতি। পুঁজিপতিত্বের চেষ্টা হইল কায়দা-কানুন করিয়া অন্যদের টাকার লাভও সম্পুর্ণ বা উহার সিংহ ভাগ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ করা। ইসলামের বিধি-বিধান ইহার সম্পুর্ণ অন্তরায়। পবিত্র কোরআন পরিস্কার বলিয়াছে— كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ "ধন-সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যেই কুক্ষিগত না থাকে।" প্রকৃত শোষকগোষ্টি—ক্ষমতাধিকারী শাষকদের বেতন ভাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের বিধি-বিধানে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইসলাম উক্ত নীতিরই বিকাশ সাধন করিয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ সুদীর্ঘ; এখানে সেই নীতির দৃষ্টিতেই আলোচ্য বিষয়দ্বয়ের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ঃ—প্রচলিত পন্থায় এই ব্যবস্থাটি পুঁজিপতিত্বের একটি ফন্দি ও ফাঁদ। কতিপয় ধনী তাহাদের কিছু ধন একত্রিত করিয়া বা সিন্দুক এবং টেবিল-চেয়ার লইয়া বসে। মধ্যবিত্ত লোকদের কোটি কোটি টাকা একত্রিত হইলে নিজেদের টাকার শত গুণ বেশী টাকা লোন নিয়া ব্যক্তিগত বড় বড় ব্যবসা চালায়। তদুপরি ব্যাঙ্কেরও বড় বড় ব্যবসায় যে বিরাট লাভ হয় উহার মাত্র সামান্য অংশ সেভিংস এবং ফিক্স-ডিপোজিটারদেরকে দিয়া লাভের সর ও সিংহ ভাগ কতিপয় বিত্তবান ডাইরেক্টারই নিয়া যায় এবং তাহারা এক একজন লক্ষপতি ও কোটিপতি হয়, আর মূল টাকার মালিক যাহারা, তাহারা নিজেদের অবস্থার উপরই থাকে। ইহা সম্ভব হয় একমাত্র সূদীপন্থার মাধ্যমে।

শরীয়তের বিকল্প ব্যবস্থা হইল এই যে, ব্যাঙ্কের সমুদয় লোন বা লগ্নি মিল-কারখানায় ও ব্যবসা বাণিজ্যে সুদ ভিত্তিক না করিয়া সকলের ক্ষেত্রেই, এমনকি

ডাইরেক্টারদের লোনের ক্ষেত্রেও অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। তদ্রূপ ব্যাঙ্কের সকল সূত্রের আয়ের বণ্টন কাহারও জন্য সূদ ভিত্তিক না করিয়া অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। ডাইরেক্টারগণ, সেভিংস ও ফিক্স-ডিপোজিটারগণ সকলে এবং নির্দ্ধারিত ফরমুলার অধীনে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় কারেন্ট-একাউন্টারগণও কোম্পানী এবং লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অংশীদার গণ্য হইবে। কিন্তু প্রচলিত সাধারণ লিমিটেডের ন্যায় নয়—যে, ডাইরেক্টারগণ বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী ও জাকজমকের মাধ্যমে এবং কলে-কৌশলে সব সর খাইবে; আর শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ডাইরেক্টারদের ইচ্ছাধীন রিবিট ঘোষণা করিবে। বরং প্রাইভেট লিমিটেডের ন্যায় সকল অংশীদার সম সুযোগে লাভবান হইবে। ইহাকে শরীয়তের পরিভাষায় "মোজারাবা" বলা হয়।

এই পন্থায় ব্যঙ্কিং ব্যবস্থা জায়েয ও শুদ্ধও হয় এবং উহার লাভে অধিক সংখ্যক জনগণ লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়। এক ত ডাইরেক্টার বা বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকগণ সামান্য সূদে ব্যঙ্কের টাকা লগ্নি নিয়া নিজেরা অধিক লাভের অধিকারী হইতে পারে না; ব্যঙ্কের টাকার অংশকে নিজের টাকার অংশের ন্যায় লাভের অংশীদার বানাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ—ব্যঙ্কের টাকার সুযোগ-সুবিধা ও লাভের সিংহ ভাগ শুধু ২০।৫০ জন ডাইরেক্টারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না যে, তাহারা উহা দ্বারা ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিবে, বরং উহা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে সম অনুপাতে বণ্টিত হইয়া থাকে।

বীমা ব্যবস্থা ঃ—এই ব্যবস্থাটিও প্রচলিত পন্থায় পুঁজিপতিত্বের আর একটি কৌশল। জনগণের টাকা কুড়াইয়া উহার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ গুটি কয়েক ডাইরেক্টার ভোগ করিয়া থাকে। জনগণের টাকার লাভ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ বিলাস যোগাইবে ইহা অনুমোদন কেন করা হইবে? জনগণের টাকার লাভ সংগ্রহ করার সুযোগের অধিকারী হইল জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠান বাইতুল-মাল—যাহার তত্বাবধায়ক হইবে সরকার। সরকার সেই ব্যবসা ইত্যাদির শুধু পরিচালক হইয়া উহার লাভ বাইতুল-মালের মাধ্যমে সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিবে। সেই ব্যবস্থায় বাইতুল-মালের বীমা শাখা কিস্তি ও প্রিমিয়াম দাতাদের সাহায্য ত করিবেই এতদ্ভিন্ন বীমা ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত লাভ যাহার দ্বারা বর্ত্তমান পন্থায় গুটি কয়েক ডাইরেক্টার বিলাস বহুল গাড়ী-বাড়ী ভোগের সহিত লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার পুঁজি করিতেছে; বাইতুল-মাল সেই লাভের টাকা ঐসব অনাথ নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের সাহায্য খাতে ব্যয় করিবে যাহাদের অভিবাবক জীবিত থাকাকালেও বীমার প্রিমিয়াম দানে অসমর্থ ছিল। এই হিসাবে বীমা ব্যবসার বর্ত্তমান পন্থা অপেক্ষা

ইসলাম অনুমোদিত পন্থা জন-কল্যাণে কত অধিক উন্নত তাহা চিন্তাশীল মাত্রই ভাবিতে পারে। বর্ত্তমান পন্থায় অনাথ এতিম-বিধবাদের কল্যাণ অপেক্ষা পুঁজিপতি ডাইরেক্টারদের কল্যাণই অধিক। পক্ষান্তরে ইসলাম অনুমোদিত পন্থায় কল্যাণের সবটুকুই জনগণের মধ্যে বিতরিত, এমনকি প্রিমিয়ামদানে অসমর্থ গরীব-দুঃখী নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাও সেই কল্যাণের ভাগী হইয়া থাকে।

অনাথ নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের কল্যাণ ও সাহায্য-সহায়তায় ইসলামী বিধান এত অধিক অগ্রসর যে, উহাকে কোন কোম্পানীর উপর নির্ভরকারী রাখে নাই বা প্রিমিয়ামের টাকা জমা থাকার উপর সীমাবদ্ধ রাখে নাই। ইসলাম বিধানগত ভাবে এতিম-বিধবার রক্ষণাবেক্ষণ বাইতুল-মালের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَهُوَ إِلَيَّ

"কোনও ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহা তাহার উত্তরাধিকারীগণের জন্য; আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) উহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না। আর যদি কোনও ব্যক্তি অসহায়-নিরুপায় এতিম-বিধবা পরিবারবর্গ রাখিয়া মারা যায়, তবে আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) তাহার ঐ অসহায় পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিব"। ইহা কি ইসলামের অতুলনীয় সমাজ ব্যবস্থা নহে? বিধানগত বহুমুখী আয়ের ভাণ্ডার বাইতুল-মালের মাধ্যমে এই ঘোষণার সমাধান শুধু সম্ভবই নহে সহজও বটে। অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরেও মোসলেম কর্ণধারগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ইসলামের এই সকল মহতী পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহা শুধু কাগজ কলমের পরিকল্পনাই ছিল না!

মোসলেম সমাজ ইসলামী শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া অনৈসলামিক শিক্ষা ও ভাবধারায় নিমজ্জিত হইবার পর তাহাদের আত্মগৌরব ও আত্মনির্ভরশীলতা লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং নিজেদের সহজ ও হালাল পরিকল্পনা সমূহ কার্য্যক্ষেত্র হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিজাতীয় শোষণ নীতির অনুকরণে অসাধু উপায়ের হারাম পরিকল্পনা সমূহ প্রচলিত হইয়াছে। ইহা আমাদেরই কৃত কর্মের ফল। রসুলুল্লাহ (দঃ) সতর্কবাণী করিয়াছেন—যে ক্ষেত্রেই কোন সুন্নত (অর্থাৎ ইসলামিক রীতি) উঠিয়া যাইবে সে ক্ষেত্রে ঐ সুন্নতের পরিবর্ত্তে অন্য একটি বেদয়াৎ (অর্থাৎ অনৈসলামিক রীতি) উহার স্থলাভিষিক্ত হইবেই।

ইসলামের সামগ্রিক প্ল্যান-পরিকল্পনার সুদীর্ঘ ফরমুলা হইতে কোনও একটি মাত্র ধারাকে বাছিয়া লইয়া উহা কঠিন হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করা নিতান্তই মূর্খতা। কেননা, যেমন কোন বিশিষ্ট ফরমূলায় তৈরী মিকশ্চার বা টনিকের পূর্ণ ফরমুলা পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র উহার দুই একটি উপাদান লইয়া ব্যবহার করিলে সেই মিকশ্চার বা টনিকের ফল পাওয়া ত দূরের কথা, উহা অসার ও তিক্ত বোধ হওয়া এবং উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি ভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক উন্নতি ও কল্যাণ বিধায়ক পরিকল্পনার ফরমুলা হইতে শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া "সুদ, জুয়া হারাম" এই বিধানটি তিক্ত ও কঠিন বোধ হইলে তজ্জন্য ইসলাম দায়ী হইবে না এবং ৩৫ নম্বরে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ সমালোচনার সম্মুখীন হইবে না। সে জন্য দায়ী ও দোষী হইবে উহারাই যাহারা ইসলামের ঐ সকল মহতী পরিকল্পনা ও ফরমুলাকে নিজেদের ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে অকেজো ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

নামায ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ

৬৩। **হাদীছ** :—ছাহাবী বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিয়া ("কোবা" ত্যাগ করতঃ) প্রথম হইতেই স্বীয় (বংশের) মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে অবস্থান করিলেন এবং প্রথমাবস্থায় তিনি ১৬ বা ১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল-মোকাদ্দসের (কা'বা শরীফের বিপরীত) দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার প্রতি আকাঙ্খিত থাকিতেন। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করতঃ ষোল বা সতর মাস পর নূতন হুকুম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ুন।) এই হুকুমের পর নবী (দঃ) (স্বীয় মসজিদে) সর্ব্ব প্রথম আছরের নামায সকলকে লইয়া কা'বা শরীফের দিকে পড়িলেন। এক ব্যক্তি (নূতন প্রথায়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়া অন্য এক মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, ঐ মসজিদের মুছল্লিগণ পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়িতে ছিলেন। তাঁহারা রুকু অবস্থায় থাকাকালে ঐ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, আমি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, এইমাত্র আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মক্কামুখী হইয়া নামায পড়িয়া আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ঐ নামাযীগণ রুকু অবস্থায়ই মক্কা শরীফের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

মদীনার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইহুদী; তাহাদের কেবলা ছিল বাইতুল মোকাদ্দস। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়ায় এতদিন তাহারা গর্বিত ও সন্তুষ্ট ছিল। এখন যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কা'বামুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ হইল, ইহুদিয়া তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নানাপ্রকার অযথা প্রশ্নাবলীর অবতারণা আরম্ভ করিয়া দিল। (কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ঐ সকল প্রশ্নকারীদিগকে জ্ঞানশূন্য বোকা আখ্যায়িত করিয়া তাহাদের অযথা প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং উহার উত্তর দান করিয়াছিলেন *)।

ছাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন এই নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বেই বাইতুল-মোকাদ্দস মুখী হইয়া নামায পড়াকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ছাহাবীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল যে, তাঁহারা শুধু অস্থায়ী কেবলার দিকে মুখ করিয়াই নামায পড়িয়া গিয়াছেন, স্থায়ী কেবলা লাভের সুযোগ তাঁহারা পান নাই, সুতরাং তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে? তখন এই আয়াত নাযেল হয়—وما كان الله ليضيع ايمانكم "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিবেন না"। (২ পাঃ ১ রুঃ)

ব্যাখ্যা:—বাহ্যতঃ এই আয়াতে "ঈমান" শব্দটির উদ্দেশ্য নামায। কারণ নামায সম্পর্কীয় একটা ভাবনা খণ্ডনেই এই আয়াত নাযেল হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, নামায ঈমানের একটি এমনই অপরিহার্য্য অঙ্গ যে, কোরআন শরীফে নামাযকে সরাসরি ঈমান বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তবে প্রকাশ্যে নামায শব্দের পরিবর্ত্তে ঈমান শব্দ ব্যবহারেরও একটি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা এই যে, বাইতুল-

---

* কোরআন শরীফের দ্বিতীয় পারা ঐ বিষয়েই আরম্ভ হয়। আল্লাহ বলেন—"অচিরেই যখন কেবলা পরিবর্ত্তনের আদেশ আসিবে, তখন একদল নির্ব্বোধ লোক এই প্রশ্ন করিবে যে, কোন জিনিস মোসলমানদের কেবলার পরিবর্ত্তন সাধন করিল? আপনি বলিয়া দিন—(আল্লার আদেশই এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। ইহার উপর আর কোনও প্রশ্ন আসিতে পারে না। কারণ) সকল দিকের মালিকই একমাত্র আল্লাহ; (তিনি যখন যে দিক্‌কে ইচ্ছা কেবলা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ প্রশ্নের অধিকার নাই। এইভাবে কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা সূত্রের উত্তর দানের পর নিপুণ রহস্যময় উত্তর দিয়া) আল্লাহ আরও বলেন—"কেবলা পরিবর্ত্তন আদেশের মাধ্যমে আমি দেখিতে চাই, কোন্ ব্যক্তি রসুলের তথা আল্লার আদেশের অনুসরণ করে এবং কোন ব্যক্তি (স্বীয় পূর্ব্ব প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া) রসুলের (দঃ) অনুসরণ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইবে যে—কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) আদেশের অনুসারী এবং কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র রীতি ও প্রথার অনুরাগী"।

মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ থাকাকালীন যাঁহারা সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ঈমানের তাকিদে তথা আল্লার প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দরুনই তাঁহার আদেশানুযায়ী এইরূপ করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের ঐ নামাযকে যদি বরবাদ ও বিফল গণ্য করা হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে। কারণ, তাঁহারা ঐ সময় একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার আদেশের প্রতি ঈমানের অনুরাগেই বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়টি বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় যে— তাহাদের ঐ নামাযকে বিফল সাব্যস্ত করার অর্থ প্রকারান্তরে তাহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কখনও তোমাদের (মোসলমানদের) ঈমানকে বিফল ও নিরর্থক করিবেন না।

খাঁটী ইসলামের উপকারিতা

৩৭। হাদীছ:— عن ابو سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال—

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَّالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ

অর্থ:—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে এবং তাহার ইসলাম-গ্রহণ খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার পূর্ববর্ত্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। পূর্ব্বের হিসাব পরিষ্কার হওয়ার পরমুহূর্ত্ত (তথা ইসলাম গ্রহণের পর) হইতে তাহার জন্য কার্য্যানুপাতিক প্রতিফল এই হিসাবে দান করা হয় যে, নেক কার্য্যে এক-এর পরিবর্ত্তে দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত এবং গোনাহের কাজে সমান সমান (এক-এর পরিবর্ত্তে একই) প্রতিফল দান করা হয়। কিন্তু যদি আল্লাহ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন, (তবে কোনই প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে না)।

৩৮। হাদীছ:— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم—

إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَّكُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا ـ

অর্থ ঃ--আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তির ইসলাম-গ্রহণ খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, তাহার প্রতিটি নেক আমলের ছওয়াব দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত লেখা হইবে এবং গোনাহের কাজে সমান সমান গোনাহ লেখা হইবে।

আল্লার নিকট ঐ পরিমাণ আমল অধিক পছন্দনীয় যাহা সর্ব্বদা পালন করা যায়

৩৯। হাদীছ ঃ— একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে অন্য একটি মহিলা বসিয়া আছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটি কে? আয়েশা (রাঃ) তাহার পরিচয় বলার সঙ্গে ইহাও বলিলেন, এই মহিলাটি রাত্রিভর তাহাজ্জুদ নামায পড়েন—নিদ্রা যান না। ইহা শুনিয়া নবী (দঃ) বলিলেন—এরূপ করা ভাল নয়; তোমরা এই পরিমাণ আমল অবলম্বন করিবে, যাহা সদা সর্ববদা পালন করিতে পার। তিনি শপথ করিয়া ইহাও বলিলেন যে, (তোমরা বেশী পরিমাণ আমল করিলে) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা উহার ছওয়াব দান করিতে ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু (অবশেষে) তোমরাই ক্লান্ত হইয়া ঐ আমল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। যে পরিমাণ আমলকে সর্ব্বদা বজায় রাখিয়া চলা যায় উহাই আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, আল্লার জিক্‌র-তছবীহ, নফল নামায-রোযা ইত্যাদি কিছু আমল অজিফা তথা সর্ব্বদার অভ্যাসরূপে অবলম্বন করা আবশ্যক এবং উহা এই পরিমাণ অবলম্বন করা ভাল, যাহা যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায়—সব সময়েই বজায় রাখা সহজ হয়। অতি মাত্রার এবাদত স্বভাবতঃই ক্লান্তি বশতঃ কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং অধিক মাত্রায় অস্থায়ী এবাদৎ অপেক্ষা অল্প মাত্রায় স্থায়ী এবাদৎ অধিক পছন্দনীয়। কারণ, শেষফলে ইহারই পরিমাণ বেশী দাঁড়াইবে। কচ্ছপ ও খড়গোসের প্রতিযোগিতার গল্প লক্ষ্যণীয়।

আমলের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানের মাত্রা বেশী-কম হয়

৪০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—"মোওয়াহ্‌হেদ" বা মোমেনদের মধ্যে (যাহারা পাপী এবং পাপের শাস্তি ভোগে যাহাদিগকে দোযখে যাইতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে শাস্তি ভোগ করার পর) সর্ব্ব প্রথম ঐ ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে

গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে চীনার দানা পরিমাণ বা অণু পরিমাণ ঈমান মওজুদ থাকিবে।

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত বর্ণনার লোকেরা সকলেই একত্ববাদী মোমেন, অথচ তাহাদের ঈমানের পরিমাণ পরস্পর কম-বেশী দেখা যাইতেছে। ইহা শুধু তাহাদের আমলের কম-বেশীর দরুনই হইবে।

৪১। **হাদীছঃ**—একদা এক ইহুদী ব্যক্তি খলীফা ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনাদের কোরআনের মধ্যে (মোসলেম জাতির জন্য অতি বড় সুসংবাদের) একটি আয়াত রহিয়াছে। আমাদের ইহুদী জাতির জন্য যদি ঐরূপ একটি আয়াত নাযেল হইত তবে আমরা ঐ (সুসংবাদের) দিনটিকে (চিরস্মরণীয় করার জন্য) ঈদের দিন বানাইতাম। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? ইহুদী বলিল—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"হে মানব জাতি! আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন ও ধর্ম্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত* সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম, আর আমি তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীন ও ধর্ম্মরূপে পছন্দ ও মনোনীত করিলাম"। (৬ পারা ৫ রুকু)

ওমর (রাঃ) বলিলেন—কোন্ দিন কোন্ স্থানে এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক ঠিক রূপে জানিয়া রাখিয়াছি। (বিদায় হজ্জে) রসুলুল্লাহ (দঃ) আরাফার ময়দানে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় জুমআ'র দিন এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। (অর্থাৎ এই আয়াত নাযেল হওয়ার দিনটি আমাদের ধর্ম্মে পূর্ব্ব হইতেই দুই ঈদ-বিশিষ্ট ↑ দিনরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং নূতনভাবে ঐ দিনকে ঈদের দিনে পরিণত করার প্রয়োজন আমাদের নাই।)

---

* এখানে "নেয়ামত" শব্দ দ্বারা দ্বীন-ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপী ইসলামের সমস্ত আহকাম বিস্তারিতভাবে শিক্ষাদান করিয়া এবং মক্কা তথা সমগ্র আরব জাহানকে মোসলমানদের করতলগত করিয়া দিয়া বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা জাহেরী ও বাতেনী (ভিতর বাহির) দুইদিক দিয়াই তাঁহার একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে সম্পূর্ণতা দান করতঃ মোসলেম জাতির উপর অতি বড় কৃপাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

↑ শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদ আর ৯ই জিলহজ্জ দিনটি মহান হজ্জের আসল দিন এবং এই দিনটিই ঈদুল-আজহার প্রকৃত মূল যাহা পরবর্ত্তী দিনে উদযাপিত হয়।

● উল্লিখিত আয়াতটির দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে শরীয়তের হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধাবলী সম্পূর্ণ করাকেই দ্বীন সম্পূর্ণ করা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যাহার যতটুক ত্রুটী থাকিবে তাহার দ্বীনও ততটুকু অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং যাহার মধ্যে ঐ হুকুম আহকাম যে পরিমাণে পূর্ণ হইবে তাহার দ্বীনও সেই পরিমাণেই ঊর্দ্ধে উঠিবে ততটুকু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যাকাৎ দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ

৪২। **হাদীছ ঃ**—তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নজ্‌দবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। সুদুর প্রান্তর হইতে ছফর করিয়া আসায় তাঁহার মাথার চুল এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তিনি বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছিলেন। আমরা শুধু বিড় বিড় শব্দই শুনিতেছিলাম, কিন্তু কোন কিছুই বুঝিতেছিলাম না যে, তিনি কি বলিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইলে পর বুঝা গেল, তিনি ইসলামের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইসলামের অঙ্গ কি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাত্র-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলামের অঙ্গ হিসাবে আমার যিম্মায় এই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত আরও কোন ফরয নামায আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য ফরয না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত কিছু নামায পড়েন (তবে উহা ইসলামের অঙ্গই হইবে বটে, কিন্তু ফরয অঙ্গ নহে, বরং নফল অঙ্গ)। তৎপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—এবং পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখা (ইহাও ইসলামের একটি ফরয অঙ্গ)। আগন্তুক পুনরায় তদ্রূপই জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি ইচ্ছা করিয়া নিজ খুশিতে অতিরিক্ত কিছু রোযা রাখেন (তবে উহা ইসলামেরই নফল অঙ্গ হইবে)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে যাকাতের বিষয়ে বলিলেন। আগন্তুক এবারও ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, যাকাতের ব্যাপারে আমার উপর অন্য আর কিছু ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি নিজের খুশিতে ও আগ্রহভরে দান খয়রাত করেন (তবে উহা ইসলামের নফল অঙ্গ স্বরূপ হইবে।) অতঃপর ঐ ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন যে, কসম খোদার—আমি এ সবের মধ্যে একটুকুও বেশ-কম করিব না; (পূর্ণ মাত্রায় ঠিক ঠিক রূপে এই সকল আহকাম আদায় করিব।) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথার উপর অটল থাকে, তাহা হইলে তাহার নাজাত অনিবার্য্য এবং তাহার জীবন নিশ্চিতরূপে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

জানাযার সৎকারে* যোগদান করা ঈমানের একটি অঙ্গ

৪৩। হাদীছ ঃ—عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَّكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا

وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ

وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطٍ -

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ও ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও মোসলমানের জানাযার সহগামী হইবে এবং জানাযার নামায ও দাফন কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গেই থাকিবে, সে ব্যক্তি দুই "ক্বীরাত" ছওয়াব—প্রত্যেক "ক্বীরাত" ওহোদ পাহাড় সমান, হাসিল করিয়া বাড়ী ফিরিবে। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য্য সমাধার পুর্বেই শুধু নামায পড়িয়া চলিয়া আসিবে সে এক "ক্বীরাত" পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে।

এই হাদীছটি আয়েশা (রাঃ)ও নবী (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন। এই হাদীছ শ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, পূর্ব্বে আমি বহু সংখ্যক ক্বিরাত ছওয়াব হেলায় হারাইয়াছি। তিনি উক্ত হাদীছ জ্ঞাত হওয়ার পূর্ব্বে অনেক সময় দাফনে শামিল না থাকিয়া শুধু জানাযার নামায পড়িয়াই চলিয়া আসিতেন। (১৭৭ পৃষ্ঠা)

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সম্পর্কে ভুমিকা ঃ

ইসলাম ও ঈমানের উন্নতির দিক একটি হইল জাহেরী বা স্থুল উন্নতি, অপরটি হইল বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

স্থূল উন্নতিগুলি মোটামূটি এই—(১) দৈহিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত কতকগুলি আমল, (২) বাক্যে অনুষ্ঠিত বিভিদ স্বীকারোক্তি এবং (৩) অন্তরের কতিপয় বিশ্বাস।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানের এই স্থূল দিকটা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কারণ, মানুষের দেহ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং দৈহিক শক্তিসমূহ সবই আদি ও অন্ত উভয় দিক হইতেই সীমাবদ্ধ। তাই উহা দ্বারা সংঘটিত আমল সমূহও নেহাৎ সীমাবদ্ধ।

---

* মোসলমান মৃতের গোছল দেওয়া, কাফনের কার্য্য সমাধা করা এবং জানাযার নামায পড়িয়া শবদেহ বহন করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া তারপর দাফন কার্য্য সমাধা করা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে মানুষের নিরাকার আত্মা যদিও আদির দিক হইতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তের দিক হইতে উহা অসীম অক্ষয় অব্যয় এবং অমর। মানুষের এই অদৃশ্য নিরাকার অসীম ও অমর আত্মার ক্রিয়াও দুই প্রকার। সীমাবদ্ধ এবং সীমাহীন। সীমাবদ্ধ প্রকার ক্রিয়া হইল—কতিপয় প্রকৃত সত্যের প্রতি অকাট্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করা। ইসলাম মানুষকে কতিপয় প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়া সেই সত্যগুলিকে অবিচলিতরূপে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়াছে। যথা—(১) আল্লাহ একজন আছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, পানাহার দাতা, বিধানকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর সহিত আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে অটলরূপে বিশ্বাসী হইতে হইবে।

তদুপরি মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য নিষ্পাপ ফেরেশ্‌তার দ্বারা নির্ভুল কিতাব (কোরআন শরীফ) নিষ্পাপ রসুলের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নিষ্পাপ রসুল স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া নির্ভুল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তাই (২) আল্লার কিতাব, (৩) আল্লার ফেরেশ্‌তা এবং (৪) আল্লার রসুল ও তাঁহার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অক্ষম অচেতন জড়-পদার্থরূপে সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাহাকে পরিমাণ মত ইচ্ছাশক্তি এবং কর্ম্মশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, মানুষ তাহার লব্ধশক্তি সমূহের সদ্ব্যবহার করিয়াছে কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, ইহার হিসাব লওয়ার জন্য একটি সময়ও ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় আখেরাত বা পরকাল। সেই হিসাব পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে তাহাকে বেহেশত দান করিয়া পুরস্কৃত করা হইবে এবং অকৃতকার্য্য প্রমাণিত হইলে দোযখে শাস্তি দেওয়া হইবে। তাই (৫) আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং (৬) বেহেশ্‌ত দোযখের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যদিও মানুষের আত্মাসম্পর্কিত ক্রিয়া বটে, কিন্তু এসবই উহার প্রাথমিক ও সীমাবদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি ও বিশ্বাস সমূহের দ্বারা মানুষ তাহার জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে মাত্র। সুতরাং এই সকল বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা বা নড়চড় হইলে তাহার সামগ্রিক জীবন সৌধেরই ভিত্তিমূল নড়চড় হইয়া পড়িবে; ফলে সে তাহার ইসলামী জীবনের ইমারত রচনায় অগ্রসর হইতে কিম্বা উহার সাধন করিতে সক্ষম হইবে না।

এ পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃই দেখা গেল যে—ইসলাম ও ঈমানের স্থূল উন্নতির মোটামুটি যে তিনটি বিষয়বস্তু রহিয়াছে, উহার প্রথম ও দ্বিতীয়টি বাহ্যিক

অঙ্গ সম্পর্কিত ক্রিয়া হওয়া বিধায় যেমন সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ তৃতীয় বিষয়টি আত্মার ক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও উহা সীমাবদ্ধ এবং শুধু প্রাথমিক ক্রিয়া মাত্র।

ইহার পরেই আরম্ভ হয় মানুষের অসীম আত্মার সীমাহীন উন্নতির পর্য্যায় এবং উহাকেই বলা হয়, ইসলাম ও ঈমানের বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই পর্য্যায়ের উন্নতির দিকটা অতিশয় বিস্তীর্ণ ও বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীনও। এই আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম প্রধান বস্তু হইতেছে—আল্লার খাঁটী এশ্‌ক বা প্রেম। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে বলেন—و الذين امنوا اشد حبا لله অর্থাৎ—"প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার তাঁহারাই যাঁহারা খাঁটীভাবে আল্লার প্রেমিক হইয়াছেন" (১ পাঃ ৩ রুঃ)।

এরূপ প্রেমিক তাঁহারা যে, আল্লার প্রেমের সঙ্গে অন্য প্রেমের মিশ্রণ বা ভেজাল তাঁহাদের অন্তরে মোটেই নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রেমের একনিষ্ঠতা প্রমাণিত না হইবে ততক্ষণ প্রেমকে খাঁটী বলা যাইতে পারে না; একনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম আনুগত্যেরও বিশেষ দরকার। ঈমানের স্থূল উন্নতির বিষয়বস্তুগুলির ভিতর দিয়াই সেই একনিষ্ঠতা ও অকৃত্রিম আনুগত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যথা—নামায (ভজনা), রোযা (সংযম সাধনা), যাকাত (জন-সেবা), হজ্জ (আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্রে সকলে সমবেত ভাবে কেন্দ্রিভুত হইয়া আল্লার আনুগত্যের এবং প্রেমের পরিচয় দেওয়া), জেহাদ (আল্লার হুকুমত কায়েম করার জন্য জান-মাল কোরবান করা) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি এ সবের ভিতর দিয়া প্রেমিকের অন্তরে এরূপ আত্মতৃপ্তি, এতটা অহমিকতা আসিয়া যায় যে—সে স্বীয় কার্য্যকলাপের দ্বারা এরূপ নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে, তাহার অন্তরে প্রেমাস্পদের অসন্তোষের কোন ভয়ই আর উদিত হয় না, অথবা প্রেমাস্পদের তরফ হইতে তাঁহার সন্তুষ্টির নিদর্শন স্বরূপ পুরস্কারের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি ও অদম্য স্পৃহা জন্মে না, তবে সে প্রেম কখনও প্রকৃত একনিষ্ঠ খাঁটী প্রেম নহে, বরং উহা কৃত্রিম এবং নামে মাত্র প্রেম বলিয়াই গণ্য হইবে। খাঁটী প্রেমের অধিকারী এবং প্রকৃত প্রেমিক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে প্রেমাস্পদের সন্তোষ বিধানের জন্য অকাতরে সব কিছু করিয়াও এক পলকের তরেও তাঁহার অসন্তুষ্টির ভীতি হইতে নিশ্চিন্ত অথবা নির্লিপ্ত হইতে পারে না। কারণ, খাঁটী প্রেমের তেজস্ক্রিয়া এতই তীব্র যে, উহার গ্রাসে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। তাই প্রেমিকের মনে সদা সর্ব্বদা অসম্পূর্ণতাবোধ এবং যথোপযুক্তরূপে প্রেমাস্পদের জন্য হক্ক আদায় না করিতে পারার চিন্তাই অনুক্ষণ জাগরিত হইতে থাকে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ -

অর্থাৎ—খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের অবস্থা এই যে, তাঁহারা আল্লার কাজ করিয়া কখনই গর্ব্বিত হন না আত্মশ্লাঘাও অনুভব করেন না, বরং সর্ব্বদাই তাঁহারা বিনয় ও নম্রতায় জড়সড় এবং ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকেন এই ভাবিয়া যে, আল্লার কার্য্যের যথাযোগ্য হক্ব আমার দ্বারা আদায় হইল কি না! তাঁহারা আল্লার রাস্তায় যথাসাধ্য দান করেন, সাধ্যানুসারে আল্লার হুকুম-আহকাম পালন করেন এবং যথোচিতরূপে এবাদৎ-বন্দেগীও করিয়া থাকেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতে থাকে এই ভাবিয়া যে, তাঁহাদিগকে একদিন স্বীয় প্রভুর দরবারে হাজির হইতে হইবে ও স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জওয়াবদিহি করিতে হইবে। না-জানি সেখানে কোন বিষয়ে কোন গোপন সূক্ষ্ম ত্রুটীর কারণে বা কোন সূক্ষ্মতম উপধারা লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইতে হয় না কি! (১৮ পাঃ ৪রুঃ)

প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নতি লাভ করিয়া চলেন, তাঁহারা কখনই স্বীয় কৃতকার্য্যতার দিকে তথা পিছনপানে ফিরিয়া তাকাইবার ফুরছত বা সুযোগই পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা উন্নতির দিকে তথা ঊর্দ্ধ দিকে এবং সম্মুখ পানেই নিবদ্ধ থাকে। প্রেমাষ্পদের অসন্তুষ্টির ভীতি ও প্রেমপাত্রের সন্তুষ্টির কামনা, বাসনা ও স্পৃহা লইয়া তাঁহারা সর্ব্বদা উন্নতির ময়দানে সম্মুখপানে ধাবিত হইতে থাকেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে ছূরা আম্বিয়াতে তের জন পয়গাম্বরের সাধনাময় জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا -

وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

অর্থাৎ "তাঁহারা (পূর্ব্বোল্লিখিত নবীগণ) সকলেই নেক কার্যাবলীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ও উৎসাহী ছিলেন এবং সৎকার্যাদি যথাসাধ্য শীঘ্র সমাধা করার জন্য আজীবন অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহারা আমার ভয় অন্তরে পোষণ করিয়া ও আমার ছওয়াবের (পুরস্কার দানের) প্রতি লালায়িত থাকিয়া আমার এবাদৎ-বন্দেগীতে সদা নিরত থাকিতেন এবং আমার নিকট ভয়াতুর, সদাবিনয়ী, অহমবর্জ্জিত ও বিনম্র থাকিতেন।" (১৭ পাঃ ৪ রুঃ)

ইহাই হইতেছে খাঁটী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই উন্নতির ক্ষেত্র অতি বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীন; ইহার কুল-কিনারা

নাই। কারণ, ইহার মূল বস্তু হইল এশ্‌ক বা প্রেম। আর এশ্‌ক ও প্রেম সকল প্রকার রূপ-রেখা এবং ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে এমনই এক বস্তু, যাহার কোনই সীমা পরিসীমা নাই, কুল নাই কিনারাও নাই।

খাঁটী প্রেমিকদের উৎসাহ, উদ্যম, কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তাধারা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে, যাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ অনুভব ও অনুমান করিতে পারে না। তাঁহাদের অনুভূতি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও গভীর হইয়া থাকে। যেমন, একদা কোনও এক প্রেমিক ব্যক্তি রাত্রিকালে নিদ্রা উপভোগ করিতেছিল। গভীর রাত্রে একটি কপোতের ক্রন্দন স্বরে হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তখন সে ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপের স্বরে বলিল—

لقد هتفت في جنح ليل حمامة - على فنن وهنا واني لنائم
وازعم اني هائم ذو صبابة - بسعدى ولا ابكى وتبكى الحمائم
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا - لما سبقتني بالبكاء الحمائم

অর্থাৎ—"গভীর রাত্রে এই কপোতটি গাছের ডালে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ যাতনায় কাঁদিতেছে, আর আমি নিদ্রার কোলে অচেতন। আমি প্রেমিক বলিয়া দাবী করি, অথচ প্রেমাস্পদের জন্য আমার ক্রন্দন নাই। কিন্তু কপোত ক্রন্দন রত? খোদার কসম! নিশ্চয়ই আমি কপট ও কৃত্রিক, নতুবা কপোত আমার আগে কাঁদিতে সক্ষম হইত না।"

খাঁটী প্রেমিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীগণ সম্মুখে উন্নতির বিশাল সমুদ্র দৃষ্টে নিজেদের অকিঞ্চিৎকর সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ ধারণা পোষণ করিতে থাকে যে—আমিত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, কারণ বিশাল সমুদ্রের তুলনায় লক্ষ লক্ষ মণ পানিও বিন্দুবৎ নগণ্যই মনে হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা ভাবেন যে, আমিত এখনও বিন্দু পরিমিত উন্নতিও হাসিল করিতে পারি নাই। আমার কার্য্যক্রম অত্যন্ত নগণ্য, অথচ আমি মোমেন তথা আল্লার প্রেমিক বলিয়া দাবী করিয়া থাকি। দেখা যায়, আমার কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশী ও বড়। সুতরাং তাঁহারা অনেক সময় এরূপ বলিয়াও ফেলেন যে, আমি মোনাফেক (কপটচারী)-এর পর্য্যায়ভুক্ত বটে। এমনকি, এ-পর্য্যায়ের ভয়-ভীতির নিকট পরাজিত হইয়া অনেক কাঁচা বয়সের প্রেমিকগণ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসেন। কিন্তু পাকা বয়সের প্রেমিকগণ ঐ ভয়-ভীতির নিকট ঐরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন না, বরং তাঁহারা চেষ্টা ও সাধনার ময়দানে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা কোথাও থামেন না, তাঁহাদের জেহাদ মোজাহাদা ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সাধনা ক্ষান্ত হয় না, অবিরাম গতিতে চলিতেই থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রুহানী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাওলানা রুমী ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—

اے برادر بے نهایت در گهیست -

هرچه بروے می رسی بروے مایست

"হে ভ্রাতঃ! খাঁটী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির ময়দান অতি বিশাল ও সীমাহীন—উহার কুল কিনারা নাই। যতটুকু অগ্রসর হইতে পার, হইতে থাক, কোথাও ক্ষান্ত হইও না।"

ইমাম বোখারী (রঃ) প্রথমে ঈমানের অনেকগুলি ছোট বড় অঙ্গ বা শাখা প্রশাখা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ প্রভৃতি এবং লাইলাতুল-ক্বদরের এবাদৎ, তারাবীর নামায ও জানাযার সৎকারে যোগদান করা ইত্যাদি। এ সবই সীমা নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুন পর্য্যায়ের বিষয়াবলী। এ সবের দ্বারা প্রথম দিক—অর্থাৎ ঈমানের স্থূল বা যাহেরী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। নিম্নের পরিচ্ছেদ ও শিরোনামায় ইমাম বোখারী (রঃ) দ্বিতীয় দিক—অর্থাৎ ইসলাম ও ঈমানের আধ্যাত্মিক উন্নতির সন্ধান দিতেছেন এবং মহা মহা আল্লাহওয়ালা-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এখানে প্রমাণ করিতেছেন যে—তাঁহারা কত খাঁটী প্রেমিক ছিলেন। মাশুকে-হাকীকী বা প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লার প্রেম তাঁহাদের অন্তরে কত অধিক গাঢ় ছিল এবং একমাত্র সেই প্রেমের কারণেই তাঁহাদের মধ্য হইতে সকল প্রকারের গর্ব্ব ও অহমিকা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া তাঁহাদের অন্তরে আল্লার ভয়-ভীতি কত প্রবল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছিল।

আল্লার মহব্বৎ এবং তদ্দরুন আতঙ্ক যে, অজ্ঞাতে নেক আমল বরবাদ হইয়া যায় নাকি! ইহা ঈমানের অঙ্গঃ

ইব্রাহীম তাইমী (রঃ)* বলিয়াছেন—আমি যখনই আমার কথাকে (মোমেন হওয়ার দাবী) আমার আমলের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তখনই আমার মনে হয় যে, আমি মোনাফেক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাই নাকি! কারণ, আমি স্বীয় কথা ও কার্য্যের অসামঞ্জস্যের দ্বারা নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করিতেছি।

ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ)⁑ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ত্রিশজন ছাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহাদের

---

* ইব্রাহীম তাইমী (রঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের নিকটবর্ত্তী ৯২ হিজরীর একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

⁑ ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ) ১১৭ হিজরীর একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ বহু ছাহাবীর শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন।

প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, তাঁহারা সর্ব্বদা এই ভয়ে ভীত থাকিতেন যে, তাঁহারা মোনাফেক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান নাকি। (কেননা তাঁহারা ত মধ্যাহ্নের আলোকোজ্জল দীপ্তসূর্য্য অর্থাৎ রসুলুল্লার (দঃ) সময়ের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার তুলনায় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাও অন্ধকার বলিয়া মনে হয় ↑)। তাঁহাদের কাহাকেও ঈমানের, পরহেজগারীর গর্ব্ব ও বড়াই করতঃ এরূপ উক্তি করিতে শুনি নাই যে—আমার ঈমান জিব্রাইল অথবা মিকাঈল ফেরেশতার ঈমানের সমতুল্য।

হাসান বছরী (রঃ) + বলিতেন—(আমি যে আল্লার তৌহিদের কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইয়াছি সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যত মোমেন অতীত হইয়াছেন ও বর্ত্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন, সকলেই মোনাফেকীর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত*। পক্ষান্তরে যত মোনাফেক অতীতে হইয়াছে ও বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সকলেই মোনাফেকী হইতে শঙ্কাহীন ও নিশ্চিন্ত। অতএব) মোমেন মাত্রই মোনাফেকে পরিগণিত হওয়ার ভয়ে সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যক্তি মোনাফেক, কেবলমাত্র সে-ই মোনাফেকী হইতে নিঃশঙ্ক-চিত্ত থাকিতে পারে।

অতীত কাল হইতেই "মোরজেয়া" নামক একটি ফের্কা বা দলের আবির্ভাব হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতবাদ ও বিশ্বাস এই যে, "ঈমান অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস ঠিক থাকিলে অন্যান্য পাপ কার্য্যের দ্বারা ঈমানের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।" প্রথম দিকে যখন এই ফের্কার আবির্ভাব হয়, তখন কোন এক ব্যক্তি আবু ওয়ায়েল (রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ীকে ঐ প্রকার মতবাদের বিষয় জিজ্ঞাসা

↑ এইরূপ বিষয়েরই আরও কিছু বিশদ বিবরণ ৫নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

+ হাসান বছরী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মর্ত্তবার তাবেয়ী ছিলেন। ওমর (রাঃ)এর খেলাফতের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ১১০ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। বহু ছাহাবী হইতে তিনি এল্‌ম হাসিল করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির কেবলমাত্র শেষ অংশটুকু ইমাম বোখারী (রঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। অমূল্যরত্ন হিসাবে আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ কথাটির অনুবাদ দিয়াছি। অতিরিক্ত অংশের অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি।

* খাঁটী মোমেন মাত্রই তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই ভয় ও সংশয়ের উদয় হইবে যে, আমি মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছি, মোমেনের লেবাছ-পোষাক পরিধান করিতেছি, মোমেনের সুরত-আকৃতি অবলম্বন করিতেছি—অথচ আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্রকে ও আধ্যাত্মিক অন্তরাত্মাকে তদ্রূপ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। আমার ভিতরকে বাহির অনুযায়ী, স্বভাবকে সুরত অনুযায়ী, কার্য্যকে কথা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায় আমি মানুষকে প্রতারণাকারী মোনাফেক কপটাচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাই নাকি?

করিলেন যে, উহা ঠিক কিনা ? আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলিলেন, এরূপ মতবাদ ও উক্তি নিছক ভুল ও মিথ্যা। কারণ, আমার ওস্তাদ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি নিজ কানে শুনিয়াছি—

৪৪। **হাদীছ ঃ—** عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান অপর মোসলমানকে গালি দিলে, সে ফাসেকের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং কোন মোসলমান অন্য মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারী-কাটাকাটি করিলে সে কাফেরের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের (দঃ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বীয় অবাধ্যতা প্রকাশ করে তাহাকে ফাসেক বলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুল (দঃ)কে অস্বীকার করে তাহাকে কাফের বলা হয়। সাধারণ পাপের চেয়ে ফাসেকী কার্য্যের পাপ অপেক্ষাকৃত বড় এবং কুফুরী কার্য্যের পাপ তার চেয়েও বড়। এই হাদীছের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈমান শুধু দেলের বিশ্বাসের নামই নহে, বরং পাপের কাজ হইতে বিরত থাকাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অধুনা অনেকে বলিয়া থাকে, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত Private বস্তু ; সুতরাং সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাপ করিলে তাহাতে ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, ধর্ম্মের সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ ? এইরূপ ধারণা বস্তুতঃ অতীতের সেই "মোরজেয়া" ফের্কার ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। আলোচ্য হাদীছটির দ্বারা ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হইল। পাপ কার্য্য নিশ্চয় ঈমানের ও ধর্ম্মের ক্ষতি সাধন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। পাপের কাজ হইতে তওবা* না করিয়া মৃত্যু হইলে পরিণাম অত্যন্ত বিপদজ্জনক। এই কারণেই কোরআন শরীফে মোমেনদের পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে— ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ("যাঁহারা মোমেন) তাঁহারা সজ্ঞানে কখনও কৃত কুকর্ম্মের উপর হট করেন না।" অর্থাৎ—কোন সময় কোনও কুকথা কুকাজ তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া পড়িলে,

* পাপ কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পুনরায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকার নাম তওবা। স্বীয় কৃত পাপের জন্য মনে প্রাণে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া পুনরায় কদাপি ঐ পাপানুষ্ঠান না করার কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট সকাতরে ও আন্তরিকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে তওবা বলা হইবে।

উহার উপর একগুঁয়েমী বা জেদ না করিয়া যথাশীঘ্র উহা হইতে তওবা করিয়া উহা বর্জ্জন করেন এবং আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

৪৫। **হাদীছ ঃ**—ওবাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (রমজান মাসে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "লাইলাতুল-ক্বদর" সম্বন্ধে (নির্দ্দিষ্টরূপে উহার তারিখ) জ্ঞাত করাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ; পথিমধ্যে দুইজন মোসলমান বিবাদ করিতেছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি "লাইলাতুল-ক্বদর" সম্বন্ধে (উহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদির বিষয় সমূহের অহীপ্রাপ্ত হইয়া) তোমাদিগকে শুনাইবার ও জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়াতে আমার নিকট হইতে সেই অহীর দ্বারা প্রাপ্ত এল্‌ম উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। (এবং তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। এই কথা শুনিয়া ছাহাবীগণ অনুতপ্ত হইবেন, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—সেই এল্‌ম আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু (লাইলাতুল-ক্বদরের নির্দ্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদি) এই শুভ রত্ন ও বরকত হইতে বর্ত্তমানে বঞ্চিত হইতে হইলেও আগামীতে তোমরা সতর্ক হইয়া চলিলে (অর্থাৎ পরস্পর ঐরূপ ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি দ্বারা আল্লার রহমতের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিলে) আল্লার রহমত প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি ও উর্দ্ধগতির উপায় ও পথ পাইতে পারিবে। (এখন নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অলসরূপে বসিয়া না থাকিয়া) সকলে নিরলসভাবে ও সতর্ক চিত্তে রমজানের ২১শে, ২৭শে এবং ২৯শে রাত্রে লাইলাতুল-ক্বদর অন্বেষণ কর। (অর্থাৎ এই রাত্রিগুলিতে এবাদৎ বন্দেগী করতঃ আল্লার প্রতি রুজু ও ধাবিত হইয়া লাইলাতুল-ক্বদরের ফজিলত হাসিল করায় তৎপর হও। উহার মধ্য হইতেই কোনও একটি রাত্রি লাইলাতুল-ক্বদর হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে—জাতির ভিতরে সংঘর্ষ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সমাজের অভ্যন্তরে ঝগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ ও ফের্কা-বন্দী বা দলাদলি আরম্ভ হইয়া গেলে জাতির সীমাহীন উন্নতি ও অন্তহীন উর্দ্ধগতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। এমনকি ঐ অবস্থায় নেতৃস্থানীয় নবী বা নায়েবে-নবীগণ পর্য্যন্ত গায়েবী মদদ ও আল্লার এল্‌হামী পৃষ্ঠপোষকতা বা ঐশ্বরিক সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। যেমন আলোচ্য ঘটনায় দুইজন মোসলমানের কলহের দরুন রসুলুল্লার (দঃ) নিকট হইতে অহীপ্রাপ্ত বিশেষ ফলপ্রদ একটি বিষয়ের এল্‌ম ও তত্ত্ব উঠাইয়া নেওয়া হইল। এইরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও স্বীয় কোন অপকর্মের দরুন নেক আমলের তৌফিক ও উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়, অনেক সময় নেক আমল বরবাদও হয়।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মূল বিষয় ইহাই ছিল যে, মোমেনের সর্বদা সঙ্কিত থাকা চাই যে, জীবনের কৃত আমল বিনষ্ট হইয়া যায় না—কি, আল্লার পথে উন্নতির দ্বার আমার জন্য রুদ্ধ হইয়া যায় না—কি! প্রশ্ন হইতে পারে যে, নেক আমল কায়দা-কানুন মতে শুদ্ধরূপের হইলে উহা বিনষ্ট কিরূপে হয়? নেক আমল করিতে থাকিলে উন্নতির দ্বার কেন রুদ্ধ হইবে? এই পরিচ্ছেদের হাদীছদ্বয়ে ইহারই উত্তর রহিয়াছে যে, অনেক গোনাহ আছে যাহার অভিশাপে কৃত নেক আমল বিনষ্ট হয়। যেমন—মোসলমানের পরস্পর লড়াই করা কুফুরী তুল্য বড় গোনাহ; কুফুরী গোনাহের দ্বারা নেক আমল বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট তারিখ জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিত লাইলাতুল-ক্বদরের এবাদৎ দ্বারা উন্নতি লাভের পথ পরস্পর বিবাদের দরুন রুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপ অভিশাপময় আরও অনেক গোনাহই আছে, সুতরাং মোমেন বান্দার পথ সর্বদাই কন্টকাকীর্ণ, তাহার জীবন ভয়সঙ্কুল; সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ইহা হইল ভয়-ভীতির সাধারণ ও স্থূল সূত্র। আর এশ্‌ক ও প্রেম ত নিতান্তই সতন্ত্র জিনিষ; সে প্রেমাস্পদের ব্যাপারে ভয় ভীতির জন্য কোন যুক্তি বা কারণ চায় না।

ঈমান, ইসলাম, এহ্‌সান ও কেয়ামতের তারিখ সম্পর্কে জিব্রিল ফেরেশতার জিজ্ঞাসায় রসুলুল্লার (দঃ) ব্যাখ্যা দান

নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি "হাদীছে জিব্রিল" নামে পরিচিত। অধিকন্তু এই হাদীছটিকে "উম্মুছ-ছুন্নাহ্" (সমস্ত হাদীছের জননী) বলা হইয়া থাকে। নবী (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসরের নবী-জীবনে মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির সন্ধান দানে যাহা কিছু কার্য্যকরীভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহার সার-নির্য্যাস এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের শেষ সময়ে একদা জিব্রিল ফেরেশতা অপরিচিত ব্যক্তির বেশে আসিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বিষয় কয়টির মূল্যবান ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন।

বৃক্ষের যেমন প্রাথমিক স্তরে উহার মূল ও শিকড়, দ্বিতীয় স্তরে ডালপালা এবং তৃতীয় স্তরে উহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে—তদ্রূপ ইসলাম ধর্মেরও তিনটি স্তর বা পর্য্যায় রহিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়—অন্তরে সন্দেহাতীত অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন, ইহা মূল ও শিকড় স্বরূপ। দ্বিতীয় পর্য্যায়—কাজে ও কথায় ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যক্রম ও উহার অনুসরণ, ইহা ডালপালা স্বরূপ। তৃতীয় পর্য্যায়—সীমাহীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জ্জন, ইহা ফুল ও ফল স্বরূপ! নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) সংক্ষেপে উক্ত তিনটি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

৪৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

كان النبى صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال

ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن

بالبعث * قال ما الاسلام قال ان تعبد الله ولا تشرك به ↑ وتقيم

الصلوة وتؤدى الزكوة المفروضة وتصوم رمضان ⁑ قال ما الاحسان

قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى

الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل وساخبرك عن

اشراطها اذا ولدت الامة ربها + واذا تطاول رعاة الابل البهم فى

البنيان فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبى صلى الله عليه

وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه على فلم

يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم -

---

* মোসলেম শরীফে ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত এই ঘটনার হাদীছটির মধ্যে স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত আছে। অনুবাদের মধ্যে ঐ বিষয়গুলিও অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। নিম্নে ঐ সকল অতিরিক্ত বাক্যাংশগুলিও উদ্ধৃত হইল।

ঐ হাদীছে এই স্থানে ইহাও উল্লেখ আছে— وتؤمن بالقدر خيره وشره

↑ এখানে মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—

ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله -

⁑ মোসলেম শরীফে ইহাও আছে— وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا

× মোসলেম শরীফের হাদীছে ইহাও আছে—

كانت الحفاة العراة رؤوس الناس এবং ملوك الارض

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রকাশ্য দরবারে সকলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন (অপরিচিত) লোক তাঁহার দরবারে আসিলেন এবং (অতি সরলভাবে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈমান কাহাকে বলে? [অর্থাৎ ঈমানের হকিকত বা মূল তত্ত্ব কি? +] রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঈমান [তথা যে বিশ্বাস দ্বারা জীবন-সাধনার প্রারম্ভ হইবে উহা] এই যে—(১) প্রথমতঃ আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে*। (২) তারপর আল্লার যে সকল বিশেষ বার্তাবহ দুত আছেন তাঁহাদিগকে ফেরেশতা বলা হয়, সেই ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে **। (৩) আল্লার কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে [যে, উহা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং অবিংসবাদীতরূপে আল্লারই প্রেরিত কিতাব]। (৪) আল্লার পয়গাম্বরগণের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে হইবে [যে, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা আল্লার প্রেরিত সত্য নবী। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না এবং তাঁহারাই মানব জাতির আদর্শ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল আদর্শ]। (৫) তারপর ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে হইবে এবং স্বীয় কৃতকর্ম্মের হিসাব দেওয়ার জন্য ভাল-মন্দ কর্ম্মফল ভোগ করার নিমিত্ত আল্লার

+ ঈমান শব্দের অর্থ :—এমন অকাট্য আন্তরিক বিশ্বাস যাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা শিথিলতার অবকাশও না থাকে। সুতরাং মানব জাতির উন্নতি, শান্তি ও মুক্তি, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল—সেই বিশ্বাস যাহার তাহার উপর ন্যস্ত করা যায় না। কি কি বিষয়-বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতঃ কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন গঠন করিলে মানুষের সামগ্রিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাই জিজ্ঞাস্য এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহারই সন্ধান দিয়াছেন।

* আল্লার একত্বে বিশ্বাস করার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে যে, আল্লাহ একজন আছেন—মামুলীভাবে ইহা বিশ্বাস করা, বরং আল্লাহই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা এবং আল্লাহ-ই যে অনাদি-অনন্ত, চিরজীবন্ত, সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী তাহা বিশ্বাস করা। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা আরও যে সকল মহৎ গুণাবলীর অধিকারী, সেই গুণাবলীর সহিত আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে অটল বিশ্বাসী হইলেই প্রকৃত একত্ববাদী গণ্য হইবে।

** ফেরেশ্তাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। তাঁহারা আল্লার আদেশ যখন তখন পালনকারী ও আল্লার আদেশে দুনিয়ার সমুদয় কার্য্য পরিচালনাকারী। তাঁহারা আলোর তৈরী; তাঁহাদের মধ্যে অন্ধকার মোটেও নাই। পাপকার্য্য করার প্রবৃত্তি তাঁহাদের আদৌ নাই এবং তাঁহারা নির্ভুলভাবে আল্লার বাণী তাঁহার আদিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয়গুলির উপরও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে×। (৬) তারপর ইহাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন ও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে উহা আমাদের পছন্দনীয় হউক বা অপছন্দনীয়, এবং মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ভাল-মন্দ যাহা কিছু করিয়া থাকে—সবের মধ্যেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লার কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং আদিকাল হইতেই আলেমুল-গায়েব সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্ব্বাহ্নে ঐ সবের সঠিক তালিকাও প্রস্তুত রহিয়াছে৪। [উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম "ঈমান"। এই ছয়টি বিষয়ের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক মানুষের কর্ম্ম-জীবন বা জীবনসাধনা আরম্ভ করিবে]।

ঐ অপরিচিত আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশ্‌তা) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিলেন যে, ইসলাম কি বস্তু? ইসলাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে০? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, (১) খাঁটীভাবে আল্লাহকে এক বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা হয় সেই বিশ্বাসের প্রকাশ্য শপথ ও স্বীকারোক্তি সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ পূর্ব্বক এক আল্লার গোলামী অবলম্বন করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, বরং উহার বিপরীত সব কিছুকে বর্জ্জনের ও অস্বীকৃতির স্পষ্ট ঘোষণা দান পূর্ব্বক কার্য্যতঃও শেরেক তথা অংশীদারবাদকে এড়াইয়া চলিতে হইবে। মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রসুল বলিয়া অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঐ বিশ্বাসেরও তদ্রূপ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হইবে। [ইহাই কালেমা শাহাদতের সারমর্ম্ম;] "আশ্‌হাদু আল্ লা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা-লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু"। অর্থঃ—এক আল্লারই বন্দেগী ও দাসত্ব করিব; আল্লার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বিশিষ্ট বান্দা ও রসুল।" [অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে উহা ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে প্রমাণিত করাও

× হিসাব-নিকাশে যাঁহারা সৎকার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাঁহারা আল্লার সন্তুষ্টিভাজন হইয়া পুরস্কারের স্থান বেহেশতে চিরসুখময় অনন্ত জীবন-যাপন করিবেন এবং যাহারা মন্দ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে; তাহারা দোযখবাসী হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

৪ উপরোল্লিখিত ষষ্ঠ বিষয়টির নামই হইতেছে "তকদীর" অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি। ইহার বিবরণ মূল হাদীছটির পূর্ণ অনুবাদের শেষে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" আকারে দেওয়া হইবে।

০ "ইসলাম" শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে বা যে কোন বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম নহে। বরং একমাত্র আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আল্লার নির্দ্ধারিত বিষয়বস্তুকে কার্য্যক্ষেত্রে পালন করতঃ ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তি লাভের পথ ইসলাম। সেই সকল বিষয়বস্তুগুলি কি কি, এখানে তাহাই জিজ্ঞাস্য— রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

অপরিহার্য্য ; তাই] (২) দৈনিক পাঁচটি নির্দ্ধারিত সময়ে, আল্লার দরবারে হাজির হইয়া আল্লার নির্দ্ধারিত আদেশ ও রসূলের নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত [নামায আদায় করিতে হইবে।] (৩) স্বীয় অর্থের ও আত্মার পবিত্রতা সাধনের মানসে এবং আল্লার সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী] যাকাত দান করিতে হইবে। (৪) [সংযম অভ্যাস করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু দমনের জন্য] পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। (৫) [প্রত্যেক মোসলমানের আকাঙ্খা রাখিতে হইবে যে,] সামর্থ্যবান হইলেই হজ্জ ব্রত পালন করার জন্য আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্র—মক্কাস্থিত কা'বা গৃহে পৌঁছিতে হইবে।

সেই অপরিচিত আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশ্‌তা) তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন এই যে—"এহসান" কি ? [এখানে "এহসান" শব্দের অর্থ—ভালর চাইতে ভালরূপে এবং উত্তমের চাইতেও উত্তমরূপে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করা। অর্থাৎ মানুষের জীবন-সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে যেমন তাহাকে ছয়টি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং পাঁচটি সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করিয়া যাইতে হইবে, তদ্রূপ তাহার সীমাহীন আত্মার অসীম উন্নতি সাধন করতঃ ভালর চাইতে ভাল এবং তার চাইতে অধিক ভাল হইতে হইলে তাহার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্য* এবং আল্লার রসুল (দঃ) এখানে তাহারই পথ দেখাইতেছেন ও সে সন্ধানই দিতেছেন ।] রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন— "এহসান" তথা সেই অসীম উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে হইলে, তোমাকে আল্লার গোলামী করিয়া চলায় আজীবন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে, আর সে সাধনা হইবে এরূপ একনিষ্ঠ সাধনা যেন তুমি স্বয়ং খোদা তায়ালাকে দেখিতেছ। কেননা, যদিও তুমি খোদাকে দেখিতেছ না, কিন্তু খোদা ত তোমাকে দেখিতেছেন। [তাই তোমাকে বিরামহীনরূপে সেই একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। মনীবের সম্মুখে অন্ধ ভৃত্য—যদিও সে মনিবকে দেখিতে পায় না তবুও মনীবকে দেখা অবস্থার ন্যায়, বরং অধিক একাগ্রতার সহিত বিরামহীন সাধনা করিয়া চলে ; কারণ সে জানে যে, মনীব তাহাকে দেখিতেছেন—যাহা বিরামহীনরূপে ঐকান্তিক

---

* "মানুষ" শুধু রক্ত মাংস ও অস্থিমজ্জায় গঠিত জড়পিণ্ডের নাম নহে, বরং অসীম আত্মা ও সসীম দেহ এই দুই-এর প্রকৃত সমন্বয় সাধনের নাম মানুষ। মানুষের স্থূল দেহ ফুলিয়া ফাঁপিয়া মেদবহুল ও মোটা হইলে বা ৫।৭ গজ লম্বা হইলেই তাহাতে মানুষের উন্নতি লাভ হয় না। মানুষের উন্নতি হয় তাহার অসীম আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা। সেই উন্নতির উপায় ও পথকেই এখানে "এহসান" নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) উহারই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সাধনায় ব্রতি থাকার মূল কারণ। মানবের অবস্থা আল্লার সম্মুখে তদপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল নয় কি ? অতএব তাহার সাধনা বিরতি ও শৈথিল্য বিহীন হইবে না কেন ?

এই সাধনা কেবলমাত্র নামায বা মসজিদেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না ; এই সাধনার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র এবং তাৎপর্য্য হইবে এই যে—নামায, রোযা ইত্যাদি নেক আমল সমূহে, তদুপরি হাটে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে, কথায় বার্তায়, বক্তৃতায় লেখনী বা মস্তিষ্ক চালনায় ও চিন্তাধারায় অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্য্যায়ে, প্রতিটি স্তরে ও প্রত্যেক পদক্ষেপে এমনকি উঠা-বসা, চলা-ফেরা, পানাহার ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যসমূহে এরূপভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং এমনভাবে কর্ম্মজীবন যাপন ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তুমি একটা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ভট, স্বেচ্ছাচারী দানব-বিশেষ নহ। বরং তুমি আল্লার অনুগত, আল্লার গুণে গুণান্বিত আল্লারই একজন দাস, এমন দাস যে স্বীয় মনিবকে সম্মুখে চাক্ষুষ দেখিতেছ। বলা বাহুল্য—কোন ভৃত্য বা কৃতদাস যখন কর্ত্তব্যরত অবস্থায় স্বীয় মনিব ও মাওলাকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তখন তাহার অন্তরে কতই না ভয় ও ভক্তির ভাব জাগ্রত থাকে এবং সেই ভয় ও ভক্তির আড়ালে একাগ্রচিত্তে ও সুষ্ঠুরূপে কার্য্য সমাধা করার কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে। মানব তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে এই প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবে. ইহারই নাম "এহসান"+।]

ঐ আগন্তুক চতুর্থ প্রশ্ন এই করিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে আসিবে এবং উহার নিৰ্দ্দিষ্ট দিন-তারিখ কবে ? [অর্থাৎ—মানুষ যে সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পালন করিবে ও কঠোর সাধনা করিয়া কর্ম্মজীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য

+ সাধারণতঃ এই হাদীছের অর্থে যদিও নামাযের মধ্যে এহসানের মর্ত্তবা তথা উপরে বর্ণিত অবস্থা হাসিলের কথা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল তাহাই নহে, বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি করার নাম এহসান। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত تعبد الله শব্দের অর্থ—নিজেকে আল্লার দাসরূপে রূপায়িত করিয়া তদনুযায়ী সামগ্রিক জীবনকে সুগঠিত ও পরিচালিত করা। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই মর্ম্মই ব্যক্ত হইয়াছে— ان تخشى الله كانك تراه অর্থাৎ সর্ব্বদা তোমার অন্তরে আল্লার ভয়-ভক্তি এরূপ জাগ্রত রাখ, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ। (পরন্তু, যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ না, কিন্তু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন)।

উল্লিখিত এহসানের পর্য্যায়ে পৌঁছার পথকে সহজ করার জন্যই "তাছাওফ" বা তরীকতের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পর্য্যায় হাসিল করাই মানব জীবনের চরম পরম উদ্দেশ্য।

চেষ্টারত থাকিবে, উহার ফলাফল নিশ্চয় একদিন প্রকাশিত হইবেই এবং সেই ফলাফল ভোগ করিবার সুযোগও সে পাইবে, সেই দিন ও সময়টি কখন আসিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিতরূপে বলিয়া দিন।]

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমি আপনার চাইতে অধিক কিছু জানি না। কেননা কেয়ামত বা ইহজগতের প্রলয়ের নির্দ্দিষ্ট তারিখ সম্বন্ধে আপনি যেমন অজ্ঞ আমিও তদ্রূপই অজ্ঞ। অবশ্য ঐ সময় বা মহাপ্রলয়ের দিনটি নিকটবর্ত্তী হওয়ার কতক আলামত বা নিদর্শন আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি। যখন সন্তান-সন্ততিগণ মাতা-পিতার ঔরষজাত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অবাধ্য, তাহাদের নাফরমান, তাহাদের প্রতি চাকর-চাকরানীর ন্যায় ব্যবহারকারী হইবে এবং যখন চরিত্রহীন ও অতিশয় নিম্নস্তরের ইতর প্রকৃতির রাখাল মজুর শ্রেণীর লোকদের হাতে কর্ত্তৃত্ব ও রাজ্য শাসনের ভার চলিয়া যাইবে এবং ধন-দৌলত অর্থ সামর্থও ঐ শ্রেণীর লোকদের হাতেই চলিয়া যাইবে এবং তাহারা ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বড় বড় মহল—অট্টালিকাদি তৈয়ার করিবে এবং উহাতেই গৌরব বোধ করিবে। এ সবই হইবে কেয়ামত তথা জগৎ ধ্বংসের পূর্ব্ববর্ত্তী আলামত। [অর্থাৎ কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের নিকটবর্ত্তী জগতে ব্যাপক পরিবর্ত্তন ও ওলট-পালট দেখা দিবে। ছেলে-মেয়েরা মুরব্বিদের সঙ্গে, এমনকি জননী মাতার সহিত মেয়ে পর্য্যন্ত এরূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিবে যেন ছোটরাই মুরব্বি। চরিত্রহীন ইতর প্রকৃতির লোকেরাই তখন প্রবল হইয়া উঠিবে এবং সৎলোকের অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিবে। মূল প্রশ্ন কেয়ামত কবে আসিবে, উহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ কেহই বলিতে পারে না। কারণ,] ইহা ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটি, যাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্য আর কেহই জানে না! এই শেষ প্রশ্নের উত্তরের সমর্থনে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন—

ان الله عنده علم الساعة *

• রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কাফেররা পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহারই উত্তরে এই আয়াত নাযেল হয়।

আয়াতের অর্থঃ—(১) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্দ্দিষ্ট তারিখ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন; (তাই কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইবে এসব বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব সঠিকরূপে ও সরাসরি ভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন। মানুষ এই বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারে উহা শুধু আবহাওয়া সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঋতু পরিবর্ত্তনজনিত প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে বা যান্ত্রিক সাহায্যে সম্ভাব্যমূলক নিদর্শনাদি অনুভব করিয়া কেবল আনুমানিক ধারণা জন্মান মাত্র।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তরের পর ঐ আগন্তুক চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—তাঁহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন। কিন্তু আগন্তুক মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন, ছাহাবীগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ঐ আগন্তুক জিব্রিল ফেরেশতা ছিলেন। (প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া) তোমাদিগকে দ্বীন ও ধর্ম্মের প্রধান বিষয়সমূহ জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—("তকদীর" কি? উহার তাৎপর্য্য ও বিবরণ—) জাগতিক কার্য্যক্রম ও ঘটনা-প্রবাহ সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যাহা মানুষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে স্বভাবতঃই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে—যাহাকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যাহা মানুষের দ্বারা এবং তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে মানবিক কার্য্যক্রম বা মানুষের দ্বারা সম্পাদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত উভয় প্রকারের সমস্ত বিষয় ও ঘটনাসমূহ যত বড় বা যত ছোটই হউক না কেন, প্রতিটি কার্য্য ও ঘটনার মধ্যেই (১) সর্ব্বশক্তিমান আল্লার একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। তদুপরি আল্লাহ যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ, আলেমুল-গায়েব; তাই (২) অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে কোন প্রকারের যাহা কিছু ঘটিবে, বা যাহার দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, অনাদিকাল হইতেই আল্লাহ তায়ালা সে সব জানেন। এমনকি আল্লার সেই অভ্রান্ত জ্ঞান অনুযায়ী সুনির্দ্দিষ্ট টাইম-টেবল (Time table—রেল কোম্পানীর সময় নির্দ্ধারক তালিকা)-এর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই সব কিছুর পূর্ণ তালিকা পর্য্যন্ত তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (৩) যেহেতু আল্লার এল্‌ম (জ্ঞান) ও জানা কখনই ভ্রমাত্মক বা অপ্রকৃত—অবাস্তব হইতে পারে না, সুতরাং ঐ তালিকার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়ার কদাপি সম্ভব নহে। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নামই হইয়াছে "তকদীর" অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে—"তকদীর" বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র।

উহা কখনই সুনিশ্চিত বা সরাসরি অবগত হওয়া নহে)। (৩) মাতৃগর্ভে অবস্থিত সন্তান—ছেলে, কি মেয়ে তাহাও সঠিকভাবে এবং নির্দ্দিষ্টরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। (৪) ভবিষ্যতে কে কি করিবে এবং (৫) কোথায় কাহার মৃত্যু হইবে, তাহাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক অভ্রান্তরূপে অবগত আছেন। (বস্তুতঃ কেবলমাত্র এই পাঁচটি বিষয়েরই নহে, বরং পৃথিবী ও আকাশের সমুদয় বিষয়ের সুনির্দ্দিষ্ট গায়েবী-এল্‌ম বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা;) নিশ্চয় তিনি অন্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞানী। (২১ পারা, ছুরা লোকমান, শেষ রুকু)

উহার একটি হইতেছে "কুদরত" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সর্ব্বশক্তিমান হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে "এল্‌ম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনাদিকাল হইতেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হওয়া।

জাগতিক ঘটনা প্রবাহের প্রথম প্রকারের ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে তক্দীরের বিষয়ে বিশেষ কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের উদয় হয় না। এমনকি এই প্রকারের কোনও ঘটনা কোনরূপ বাহ্যিক কারণ ও হেতুর আবরণে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, যেহেতু কার্য্য কারণ পরম্পরায় শেষ পর্য্যন্ত ঐ কারণের কারণ তস্য কারণ হাতড়াইয়া পাওয়া যায় না কিম্বা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উহার রহস্যজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তাই বাধ্য হইয়া সেখানে তক্দীরকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং নিজেদের পরিভাষায় উহাকে "প্রাকৃতিক ঘটনা" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যক্রম সম্বন্ধে তক্দীরের বিষয়ে নানাপ্রকার সংশয়ের উদয় হইয়া থাকে। তাই এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষণীয় যে—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষম নির্জীব জড়-পদার্থরূপেও সৃষ্টি করেন নাই, কিম্বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সক্ষম, সর্বশক্তিমান করিয়াও সৃষ্টি করেন নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নেহাৎ স্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ সকল প্রদত্ত শক্তিসমূহকে আল্লাহ তায়ালা একান্তই স্বীয় কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বের বিধানে ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে—মানুষ তাহার শক্তিসমূহ কোন ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করিলে উহাতে আল্লার তরফ হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করার কোনও বাধ্যবাধকতা মোটেই থাকিবে না। অন্যথায় কর্ম্ম জগতের মূল রহস্য—"পরীক্ষা" অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

মানবকে উল্লিখিত শ্রেণীর শক্তিতে শক্তিমান করিয়া, ভাল-মন্দ চিনিবার জন্য শরীয়তকে মাপ-কাঠীরূপে প্রদান করতঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (মানবকে) কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন; لينظر كيف تعملون "পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য যে—হে মানব! তোমরা কে কোন্ পথ অবলম্বন কর।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, মানুষ নিশ্চিতরূপে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিবে না কেন? নিশ্চয় ভোগ করিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানবকে যে ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মক্ষমতাটুকু দান করিয়াছেন—যদ্দারা মানব জাতি অপরাপর অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন পরিগণিত হয়; ঐ শক্তি ও ক্ষমতাকে সৎ বা অসৎ—ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করার জন্য মানবই একমাত্র দায়ী। এতদ্দৃষ্টে তক্দীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে কোনও বাধার সৃষ্টি হইতে পারে কি?

তক্কদীর বলিতে আল্লার যে অসীম কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও শক্তিমত্বা বুঝায়, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা বহু সুফল প্রতিফলিত হইতে পারে। যথা—(১) কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ নিজকে বাহ্যতঃ যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতাবান দেখিতে পাইলেও সে নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ তথা অবিমিশ্র শক্তির অধিকারী বলিয়া ধারণা করিবে না। যেরূপভাবে ফেরাউন-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজেদের সম্পর্কে ঐ প্রকার ধারণা পোষণ করতঃ উহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া বহু অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। (২) আল্লাহ তায়ালা যে মহান ও সর্বশক্তিমান তাহা সর্বদা মনে জাগ্রত থাকিবে এবং নিজকে সর্বদাই তাঁহার মুখাপেক্ষী, সাহায্যপ্রার্থী ও দয়ার ভিখারীরূপে গণ্য করিয়া তদনুযায়ী জীবনের সকল কার্য্য পরিচালিত করিবে। (৩) কোনও কার্য্যে শত চেষ্টার পরেও অকৃতকার্য্য বা বিফল হইলে তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একেবারে মন ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবে না, বরং স্বীয় মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দান করিবে যে—সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেই এরূপ হইয়াছে এবং নিশ্চিতই ইহার অন্তরালে হয়ত আল্লাহ তায়ালার এমন কোনও সুফল প্রসূ ইঙ্গিত অথবা মঙ্গল-সূচক ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, যদ্দরুন ইহাই আমার জন্য তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাই ইহাতে আমাদের কিছুই করিবার নাই; আমারা ত তাঁহার গোলাম মাত্র। অতএব, মনিবের যাহা ইচ্ছা গোলামের প্রতি করিতে পারেন। মনের মধ্যে এই প্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। (৪) কোনও বিষয়ে বাহ্যতঃ স্বীয় চেষ্টা ও শক্তির দ্বারা কৃতকার্য্য ও সফলকাম হইলেও, তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি ফেরাউন প্রকৃতির না হইয়া বরং মনে মনে আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও শোকরগোজার হইবে এই ভাবিয়া যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার অপার করুণাবলে আমাকে এই সাফল্য লাভের তৌফিক ও সুযোগ দান করিয়াছেন; ফলে তাহার স্বভাবে নম্রতা আসিবে; উগ্রতা ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হইবে না, আল্লার বান্দাদের প্রতি সে বিনয়ী ও সদয় হইবে।

এসবই হইতেছে তক্কদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনিবার্য্য ও বাস্তব প্রতিক্রিয়ার সুফল। ইহার পরিবর্ত্তে কেহ যদি তক্কদীরের নামে স্বীয় কর্ম্মজীবনে দুর্বলতা টানিয়া আনে, অর্থাৎ অকর্ম্মন্য, নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন হইয়া পড়ে তবে তাহা ঐ ব্যক্তির নিজের ত্রুটি ও শয়তানের ধোকা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

তক্কদীরের যে সঙ্গা ও তাৎপর্য্য বর্ণিত হইল এবং তক্কদীরের উপর ঈমান স্থাপনের যে ফলাফল ব্যক্ত হইল—এই সব তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেই সংক্ষেপে ইশারা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا

تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ - وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

অর্থ ঃ—ভূপৃষ্ঠে যে কোন বিপদ-আপদ, দুর্য্যোগ-দুর্ভোগের আগমন হয় এবং উহার যে কোনটা কোন মানুষের উপর আসে উহার প্রত্যেকটাই কিতাবে তথা লৌহে-মাহ্‌ফুজে লিখিত আছে—উক্ত বিপদ ও দুর্য্যোগকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই, বরং ঐ মানুষটিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই। (তদ্রূপই জগতে যখন যে সুযোগ-সুদিন, সুখ-সমৃদ্ধির সঞ্চার হয় এবং উহা যে কাহারও জীবনে সমাগত হয় উহারও প্রত্যেকটাই কিতাবে লিখিত আছে—উহাকে সৃষ্টি করিরার পূর্বেই।) এইরূপে লিখিয়া রাখা (আমি) আল্লার পক্ষে নিতান্তই সহজ ব্যাপার। এই তথ্যটা তোমাদিগকে জ্ঞাত করান হইল শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা কেহ কোন মনোবাঞ্ছা হইতে বঞ্চিত বা উহা লাভে ব্যর্থ হইলে কিম্বা কোন ধন-জনহারা হইলে সে যেন ক্ষোভ বিহ্বল বা শোক-বিহ্বল হইয়া না পড়ে। (ধৈর্য্যধারণ করিয়া মনোবল অক্ষুন্ন রাখে) এবং কেহ আল্লার তরফ হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে যেন ঔদ্ধত্যে, দম্ভে ও খুশিতে উন্মত্ত না হয় ; (শুকুরগোজার—আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হয়।) কোন অহঙ্কারী দাম্ভিককে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (২৭ পারা ১১ রুকু)

তক্‌দীরের উপর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে অপরিহার্য্য, তাহা মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। হাদীছটি এই ঃ—

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমাদের দেশে নুতন মতবাদের একদল লোক আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা একদিকে বেশ কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে এবং জ্ঞান-চর্চ্চা তথা ধর্ম্মীয় গবেষণাদিও করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যদিকে তাহারা তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসী নহে, বরং তাহারা তক্‌দীরকে অস্বীকার করিয়া থাকে। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে বলিয়া দিও যে, আমাদের তথা খাঁটী মোসলেম জাতির সহিত তাহাদের কোনই সংশ্রব নাই ; তাহারা মোসলেম জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন। আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যত প্রকার ও যত বড় নেক আমলই করুক না কেন, এমনকি পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণও যদি তাহারা আল্লার রাস্তায় দান খয়রাত করে, তথাপি উহা আল্লার দরবারে কবুল হইবে না ; তাহারা উহার

কোন ছওয়াবই পাইবে না যাবৎ না তাহারা উক্ত ইসলাম বিরোধী ধারণা ও মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া তক্কদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপন করে।*

পাঠকবর্গ! এখানে তক্কদীরের যে ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই উক্তি অত্যন্ত সঙ্গত। তক্কদীরকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালার দুইটি বিশেষ ছেফৎ ও গুণকে বা উহার ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, তক্কদীর বলিতে যাহা কিছু বুঝায় বস্তুতঃ উহা আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র। বলা বাহুল্য, যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনও একটি ছেফৎ বা গুণকে অস্বীকার করিলে ঈমান ও ইসলাম বহাল থাকিতে পারে না।

সন্দেহজনক কাজ হইতে সংযমী হওয়ার ফজিলত ও সুফল

৪৭। হাদীছ— عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس

فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشتبهات

كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى

ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت

---

* আরও এক হাদীছে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না যাবৎ না সে (নিম্নে বর্ণিত) চারিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। (১) আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (২) আমি (আল্লার রসুল;) সত্য ও খাঁটী দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। (৩) মৃত্যু অনিবার্য্য এবং তৎপর হিসাব দিবার জন্য পুনরুজ্জীবিত হইতে হইবে। (৪) তক্কদীর বরহক্। (তিরমিজী শরীফ)

এই সব হাদীছ দৃষ্টে প্রত্যেক নাজাতকামী মোসলমানের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যে, "বুঝ ও যুক্তিতে আসে না" ইত্যাদি কোন অজুহাতে তক্কদীরকে অস্বীকার করা নাজাতের পরীপন্থী হইবে। কেহ আবশ্যক মনে করিলে যুক্তি-যুক্তরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে, আজীবন সেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অজুহাত দেখাইয়া উহাকে এনকার করার কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য তক্কদীরের কোন ভুল ব্যাখ্যা মনে গাঁথিয়া লইয়া কর্ম্মজীবনে হাত পা গুটাইয়া নিরুৎসাহ, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বা চেষ্টা ও তদবীরবিহীন হইয়া বসিয়া থাকাও সমর্থনীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে তক্কদীরের ভুল ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের প্রতি নানাপ্রকার দোষারোপ করিতেও শুনা যায়, উহার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ* -

অর্থ :—নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে—"হালাল" স্পষ্ট এবং হারাম" স্পষ্ট। আর এই দুইটির মধ্যস্থলে কতগুলি "সন্দেহ জনক" শ্রেণীর বিষয়বস্তুও রহিয়াছে। ঐগুলি কোন্ পর্য্যায়ভূক্ত তাহা অধিকাংশ লোকেরাই নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক বিষয়গুলি হইতে সংযমী হইবে (ঐগুলিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে) একমাত্র তাহারই দ্বীন ঈমান ও আবরু-ইজ্জত সুরক্ষিত ও কলুষমুক্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়বস্তু সমূহে লিপ্ত হইবে, তাহার অবস্থা এরূপ—যেমন কোন রাখাল তাহার পশুপালকে (সরকারী বা কাহারও) সংরক্ষিত স্থান (Protected area)-এর নিকটবর্ত্তী লইয়া যায় তদবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পশুগুলি ঐ সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকিয়া পড়িবে (এবং তদ্দরুন রাখাল বিপদগ্রস্ত হইবে। তদ্রূপ মধ্যস্থলীয় সন্দেহজনক বিষয়বস্তুগুলি হইতে যে ব্যক্তি সংযমী না হইবে এবং উহা হইতে দুরে না থাকিবে, অচিরেই অনিবার্যরূপে তাহার নফ্ছ বা প্রবৃত্তি স্পষ্ট হারামে লিপ্ত হইয়া পড়িবে, ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে অপদস্থ হইবে)। তোমরা শুনিয়া রাখ, প্রত্যেক বাদশারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে (যেখানে অন্য কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে)। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু সমূহই দুনিয়ার বুকে তাঁহার সংরক্ষিত স্থান তুল্য ; (সেখানে কাহারও প্রবেশ করিতে নাই, অধিকন্তু উহার নিকটবর্ত্তী হওয়া তথা সন্দেজনক বিষয়ে লিপ্ত হওয়াও উচিত নহে।

সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু হইতে স্বীয় দ্বীন-ধর্ম ও আবরু-ইজ্জতকে কলুষমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রাখিতে এবং মানবতার উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধগামী হইতে সহজে সক্ষম হওয়ার জন্য) আরও শুনিয়া রাখ, মানুষের অজুদের ভিতরে অর্থাৎ মানব দেহের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট অংশ আছে যে, সেই অংশটি যখন যথার্থরূপে ঠিক হইয়া যায়, তখন মানুষের পূর্ণ অজুদই ঠিক হইয়া যায়। (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানব দেহটিই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হইতে থাকে।) পক্ষান্তরে সেই অংশটি যখন খারাপ হইয়া পড়ে, তখন সমস্ত অজুদটিই খারাপ

* এই হাদীছটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছ। মানুষ কি উপায়ে স্বীয় দ্বীন ও ধর্মজীবনকে রক্ষা ও হেফাজত করিতে এবং মানবতার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহারই উপায় এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া এই হাদীছটির আরও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাই প্রথমতঃ সরল অনুবাদ তৎপর "বিশেষ দ্রষ্টব্য" আকারে ইহার একটি সুক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইবে।

হইয়া যায় (অর্থাৎ মানব দেহের কোন অংশ বা কোন অঙ্গই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না)। বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, সেই অংশটি হইতেছে আ'ক্বল বা বিবেক।*

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম (আদেশ-নিষেধাবলী) চারি প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। কোরআন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াছ। উহার যে কোনও একটি দ্বারা যে কোন বিষয় সুনির্দ্দিষ্টরূপে "হালাল" বৈধ ও গ্রহণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হালাল এবং যে কোন বিষয় সুস্পষ্টরূপে "হারাম" নিষিদ্ধ ও বর্জ্জনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হারাম। এতদ্দৃষ্টে হালাল ও হারাম অতি স্পষ্ট বস্তু এবং ঐসকল দলীল, প্রমাণ ও মাপকাঠি দ্বারা উভয়কে বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ। অধিকন্তু ইহাও স্পষ্ট যে, হালালকে গ্রহণ করা যাইবে এবং হারামকে বর্জ্জন করিতে হইবে—ইহাতে কোন প্রকার মতদ্বৈধতা বা কোন প্রকার দুর্ব্বলতা বশতঃ এদিক সেদিক বিন্দুমাত্রও নড়চড় করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু হালাল ও হারাম পর্য্যায়দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আরও কতিপয় বিভিন্ন পর্য্যায় রহিয়াছে। যথা—(১) মকরূহ, (২) খেলাফে-আওলা বা অবাঞ্ছনীয়, (৩) ইমাম ও খাঁটী ওলামাদের মতবিরোধমূলক বিষয়াদি। এতদ্ব্যতীত এমন আরও বহু বিষয়াদি আছে যাহা শরীয়তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহা ছাড়াও দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপের ভিতর দিয়া প্রায়সই এরূপ অনেক বিষয়াদি আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইতে থাকে যাহা নির্দ্দিষ্টভাবে হালাল বলিয়াও নিশ্চিত হওয়া যায় না, কিম্বা হারাম বলিয়াও স্থির করা যায় না—এই সকল অনিশ্চিত ও সন্দেহমূলক বিষয়গুলিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, এই সমস্ত সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকিলে এক দিকে জাগতিক ব্যাপারে যেমন লাভবান হওয়া যায়, কারণ সন্দেহের স্থানে পা রাখিলেই স্বীয় মান-মর্য্যাদা কলুষিত হওয়ার এবং নানা প্রকার কুৎসা রটিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। অন্য দিকে তেমনি দ্বীনের ব্যাপারেও লাভের সীমাই থাকে না, কারণ যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্‌ছ ও প্রবৃত্তিকে সন্দেহের স্থান হইতে বিরত রাখিতে অভ্যস্ত হইবে সে নিশ্চয়ই যাবতীয় কুপ্রলোভনের বস্তু হইতে, যাবতীয় কুকর্ম্ম হইতে এবং যাবতীয় হারাম কার্য্য হইতে স্বীয় নফছকে ফিরাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে।

---

*قلب "ক্বলব" শব্দের প্রকৃত অর্থ দেল বা হৃদয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হইল উহার মধ্যে নিহিত আ'ক্বল বা বিবেক, এমনকি কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে ক্বালব শব্দটি সরাসরি আ'ক্বল বা বিবেক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (ফতহুলবারী)

হারাম ও সন্দেহজনক কার্য্যাবলী হইতে বাঁচিতে চাহিলে সর্ব্বপ্রথম স্বীয় আ'ক্কল ও বিবেককে যথার্থরূপে সুষ্ঠু ও ঠিক করিতে হইবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর Electric motor স্বরূপ। মোটর ঠীকভাবে চালু থাকিলে কারখানার প্রতিটি শাখা, উহার প্রত্যেকটি অংশ ও সমস্ত কল-কব্জার চাকাগুলিই রীতিমত চলিতে থাকিবে। আর মোটরে গোলযোগ থাকিলে উহার সহিত সংযোগ রক্ষাকারী সমস্ত মেশিন ও উহার অংশগুলির মধ্যেও গোলমাল দেখা দিবে। অবশ্য মোটরের সহিত চাকাগুলির সক্রিয় সংযোগ রক্ষারপ্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা মেশিনের বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ বিহীন শুধু মোটর চালাইয়া বসিয়া থাকিলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না এবং ঐ প্রকার নিরর্থক ও অনিয়মিত পরিচালনার ফলে কারখানা ফেল Fail হইয়া যাইবে। অতএব মেশিনের সমস্ত কলকব্জা ও উহার বিভিন্ন অংশগুলিকেও রীতিমত চালু রাখিয়া মোটরের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ উহার ভাল-মন্দের প্রভাব সমস্ত কারখানার উপর পড়িয়া থাকে। তদ্রূপ মানবের কর্তব্য তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে সুষ্ঠু করিয়া তারপর সেই সুষ্ঠু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছটিকে হাদীছে-তাক্কওয়া, হাদীছে হালাল-হারাম, হাদীছে-এছ্‌লাহে ক্কাল্‌ব বা আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের হাদীছ বলা হয়। নবী (দঃ)এর হাদীছ সমূহের মধ্যে চারিটি হাদীছ এমন আছে যাহাকে সমস্ত শরীয়ত ও তরীকত বা তাছাওফের মূল উৎস বলা যাইতে পারে। হাদীছগুলি এই ঃ—

১ম—নিয়তের হাদীছ (সর্ব্বপ্রথমে—১ নম্বরে যে হাদীছটির অনুবাদ হইয়াছে)।

২য়—دَعْ مَا يُرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ "সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া নিঃসন্দেহকে অবলম্বন কর।"

৩য়—اِزْهَدْ فِيْمَا فِي اَيْدِى النَّاسِ "মানুষের হাতের কোন কিছুর আশা ও লিপ্সা রাখিও না।" ৪র্থ—উপরে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছটি।

এই হাদীছের শেষ অংশ ......الا ان فى الجسد مضغة "মানবদেহের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ আছে যাহার উন্নতি অবনতির উপর সম্পূর্ণ দেহের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে" এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাতে মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব ও দেহ-তত্ত্বের ইঙ্গিত দানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং সতর্ক করা হইয়াছে যে—স্থূল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সুক্ষ্ম আত্মার উন্নতির উপরই মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য উন্নতি নির্ভর করে। আত্মার উন্নতি সাধিত না হইলে মানব জীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

উপরোক্ত বাক্যটি পূর্ণরূপে অনুধাবন করার জন্য মানব দেহ-সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্যমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; যাহা অতিশয় উচ্চ পর্য্যায়ের ও গবেষণামূলক। তাই মনোযোগের সহিত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষের অজুদ বা অস্তিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—"স্থুলদেহ" যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে বা যান্ত্রিক সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, এবং "সুক্ষ আত্মা"* যাহা ঐরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। মানুষের স্থুলদেহ সৃষ্টির মূলে যেরূপ বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে, যথা—পানি, মাটি, বায়ু ও অগ্নি সেরূপ তাহার এই ভৌতিক দেহাভ্যন্তরে পাঁচ প্রকারের আত্মাও রহিয়াছে। ১ম—পশুর আত্মা; যদ্দারা খাওয়া-শোওয়া, কামরিপু চরিতার্থ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ২য়—হিংস্র জন্তুর আত্মা; যদ্দারা দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ও রাগের বশীভূত হইয়া মারামারি কাটাকাটি করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। ৩য়—শয়তানের আত্মা; যাহার প্ররোচনায় পাপাচার, অহঙ্কার, মিথ্যা ও সুক্ষ্ম কুট-কৌশলের দ্বারা মানুষকে ধোকা দেওয়া ইত্যাদির প্রবৃত্তি উদিত হয়। ৪র্থ—ফেরেশতা-আত্মা; যদ্দারা সদাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সত্যতা, পরোপকারিতা ও আল্লার বশ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদির আগ্রহ ও আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। ৫ম—মনুষ্যত্বের আত্মা; যাহার কর্তব্য হইতেছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মাকে বশ করতঃ উহাদিগকে কুপ্রবৃত্তির দিক হইতে ফিরাইয়া দিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে গুণান্বিত ও পরিচালিত করা এবং আল্লার মা'রেফাত ও মহব্বত হাসিল করতঃ দুনিয়াতে আল্লার খেলাফত তথা আল্লার হুকুম আহকাম জারীর পরিবেশ কায়েম করা।

প্রথমোক্ত তিনটি আত্মাকেই তাছাওফের পরিভাষায় "নফ্ছে-আম্মারা" বলা হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুইটিকে রুহ্, আ'কল বা লতিফা বলা হয় এবং এইটিই হইতেছে বিবেক, বুদ্ধি ও মানবাত্মা। এতদ্দৃষ্টে দেখা গেল যে—ঐ পাঁচ

---

* অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটি প্রাণী বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ কেবলমাত্র নিম্ন জগতের ভৌতিক পদার্থের দ্বারাই সৃষ্ট নয়। মানুষের দেহ ভৌতিক পদার্থে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ-মধ্যস্থ মাটী, পানি, আগুন ও বায়ু জাতীয় পদার্থ নিচয়ের সংমিশ্রণে যে বাষ্প বা বিদ্যুৎ জাতীয় সুক্ষ্ম ও শক্তিশালী পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই বাষ্পের দ্বারাই মানুষের নফছে-আম্মারা (প্রবৃত্তি) সৃষ্ট। ইহা অতি শক্তিশালী পদার্থ, এমনকি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। কিন্তু এই শক্তিটি ভালমন্দ বিবেচনা ও পরিণাম চিন্তা বিবর্জ্জিত। তদুপরি মানবদেহের সৃষ্টি মূলে উর্দ্ধ জগতের একটি জিনিষও মিশ্রিত রহিয়াছে। তাছাওফের পরিভাষায় সেই জিনিষটির নাম হইতেছে "রুহ"। উহাই মানবাত্মা এবং উহাই বিবেক ও আকলের আকর। "রুহ" উর্দ্ধ জগৎ হইতে আল্লার আদেশে মানুষের ভিতরে আবির্ভূত হয়।

প্রকারের আত্মাই তাছাওফের পরিভাষায় দুই নামে পরিচিত হইয়াছে। একটি হইল—নফ্‌ছে-আম্মারা ; ইহার তিনটি বিভাগ যথা—পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা ও শয়তানের আত্মা। দ্বিতীয় হইল—রূহ্‌ অর্থাৎ মানবাত্মা বা বিবেক ও আ'ক্বল ; ইহার দুইটি বিভাগ যথা—ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যত্বের আত্মা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) الا ان فى الجسد مضغة বলিয়া মানব দেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে অংশটিই হইতেছে এই রূহ্‌ বা আ'ক্বল ও বিবেক। ইহার উন্নতিতে পূর্ণ মানব দেহের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে সম্পূর্ণ মানব দেহের অবনতি ঘটিয়া থাকে ; তাহাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ

অর্থাৎ রূহ বা জ্ঞান-বিবেক রত্নটির উন্নতি সাধিত হইলে সমগ্র মানব দেহেরই উন্নতি হইবে এবং উহার অবনতিতে সমগ্র মানব দেহেরই অবনতি ঘটিবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ অংশটির উন্নতির অর্থ কি ? বস্তুতঃ প্রতিটি জিনিষের উন্নতি বা অবনতির বিচার করা হয় উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুষ্ঠুতার দ্বারা। তাই এখানে দেখিতে হইবে যে রূহ বা বিবেকের উপর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, রূহ্‌—মানবাত্মা বা বিবেক বলিয়া যে দুইটি আত্মার নামকরণ হইয়াছিল অর্থাৎ ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যত্বের আত্মা উহাদের কর্তব্য ছিল সদাচার, সততা, সত্যতা ও আল্লার বশবর্ত্তীতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নফ্‌ছের মধ্যে যে অপর তিনটি শক্তি বা আত্মা আছে উহাদিগকে বশে আনিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে পরিচালিত করা, অতএব রূহ্‌ বা বিবেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও তাহাই হইবে। এই মহান কর্তব্য পালনে রূহ্‌—মানবাত্মা বা বিবেক যতটুকু উন্নতি করিতে পারিবে, পূর্ণ মানব দেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করিবে। এমনকি অবশেষে ঐ রূহ্‌—মানবাত্মা যে উর্দ্ধ জগৎ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সে মানবদেহকে লইয়া সেই উর্দ্ধ জগতে অর্থাৎ—বেহেশতে যাইয়া পৌঁছিবে। পক্ষান্তরে রূহ্‌—মানবাত্মা নিজের ঐ কর্তব্যে ত্রুটি করতঃ সে নিজেই যদি নফ্‌ছ তথা ঐ তিন প্রকার আত্মার বশ্যতা স্বীকার করার অবনতিতে পতিত হয়, তাহা হইলে পূর্ণ মানবদেহই অবনতির তিমির গর্তে পতিত হইবে। অবশেষে ঐ রূহ্‌—মানবাত্মা মানবদেহকে লইয়া সর্ব নিম্ন জগতে তথা জাহান্নামে পৌঁছিবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিশারদগণ রূহ বা বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বেই ইঙ্গিত করা

হইয়াছিল যে, রুহ্—মানবাত্মা বা আ'ক্বল ও বিবেককে তাছাওফের পরিভাষায় "লতিফা" নামেও নামকরণ করা হইয়া থাকে। সেই অনুসারেই রুহের উন্নতির পাঁচটি স্তরের নিম্নলিখিতরূপে নামকরণ করা হইয়াছে। যথা—(১) লতিফায়ে-ক্বাল্‌ব ; মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লার নাম উচ্চারণ করতঃ জেকের করে তখন সে এই লতিফায়ে-ক্বল্‌বের কর্তব্য পালন করে। (২) লতিফায়ে-রুহ্ ; মানুষ যখন আল্লার মহৎ গুণাবলীর ধ্যান করে এবং ঐ ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যেও ঐ গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করে, যেমন—আল্লাহ দয়ালু, দয়াময় ইহার ধ্যান করতঃ এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যে, আমাকেও দয়ালু হইতে হইবে এবং দয়ালুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে ; তখন হয় লতিফায়ে রুহের কর্তব্য পালন। (৩) লতিফায়ে-সের্র ; মানুষ যখন আল্লার গুণাবলীর ধ্যান করতঃ গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে হাসিল করায় সচেষ্ট হয় তখন তাহার ছিনার অভ্যন্তরে আল্লার মা'রেফাতের তথা আল্লার গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় ; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-সের্র-এর কর্তব্য। (৪) লতিফায়ে-খফী ; মানুষের মধ্যে যখন আল্লার মা'রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় তখন মানুষ আল্লার গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া আল্লার আশেক ও প্রেমিকে পরিণত হইয়া যায় এবং নিজের নফ্‌ছের সব কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া যায় এবং সেগুলিকে ফানা ও বিলুপ্ত করিয়া দেয়—অর্থাৎ সেগুলিকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জ্জন করে ; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-খফীর কর্তব্য। (৫) লতিফায়ে-আখ্‌ফা ; মানুষ ফানা-ফিল্লাহ্ অর্থাৎ নফ্‌ছের সমুদয় কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দখল ও দমন করার সামর্থ্য লাভ করার পর, বকা-বিল্লাহ্ তথা আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্তবায় পৌঁছে, যাহাকে আল্লার খেলাফত লাভ করা বলে ; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-আখ্‌ফার মর্তবা ও মর্য্যাদা। এই অবস্থাতেই রুহ্ বা বিবেক ও আ'ক্বলের পূর্ণ শুদ্ধি হইয়া যায়। এই অবস্থার পরে আর বিবেক ও আ'ক্বলকে কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইতে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) মানবকে স্বীয় আ'ক্বল ও বিবেককে সঠিক করার যে প্রেরণা দান করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে পর্য্যায়ক্রমে উল্লিখিত ব্যবস্থা ও অবস্থা সমূহের সৃষ্টি করা এবং ইহাই হইতেছে মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির উচ্চ পর্য্যায়।*

---

* উল্লেখিত হাদীছের বিস্তারিত তথ্যাবলী মাওলানা শামছুল হক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত।

গণীমতের* পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটকে দেওয়া এবং উহা উসুল করা ইসলামের একটি অঙ্গ

পাঠকবৃন্দ। দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মমত ও তৎসম্পর্কিত মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহার কোনটিতেই মানুষের পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন বা জীবন যাপন প্রণালীর পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেখা যায় না। কোনটিতে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক এবাদৎ বন্দেগী অর্থাৎ পরলৌকিক জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু জাগতিক জিন্দেগী সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা নাই। আবার কোনটিতে শুধু পার্থিব জীবন অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন ব্যবস্থাই উহাতে নাই। ইসলাম যেহেতু কোনও মানুষের মনগড়া মতবাদ নয়, বরং ইহা সমস্ত জগতের মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণকর ও সম্যকরূপে মঙ্গল বিধায়ক এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যাহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আল্লার দরবার হইতে তাঁহারই নিয়োজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি রসুল (দঃ) কর্ত্তৃক আনীত ও প্রচারিত। তাই ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা সম্বলিত মানবধর্ম্ম। ইহাতে মানব জীবনে প্রয়োজনীয় কোন একটি ক্ষুদ্র দিকও বাদ পড়ে নাই বা কেবলমাত্র কোনও একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অন্য দিককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাই দেখা যায়—ইসলাম ধর্ম্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক চরম উন্নতি সাধনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক তথা—পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমন—প্রকৃত শান্তিদাতা আল্লার আইন জারী করতঃ দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য জেহাদকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী বা মজদুরী ইত্যাদি দ্বারা হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিবাহের দ্বারা শুদ্ধরূপে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতঃ দুনিয়া আবাদ রাখাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তদ্রূপ ইসলামী ষ্টেটের ব্যয়ভার বহনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার আয়ের পথকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে গণীমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটে জমা দেওয়া এবং উহা রাষ্ট্রীয় আয় রূপে উসুল করাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে তাহাই একটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

---

* গণীমতের মাল কাহাকে বলে—৩২নং হাদীছের ফুটনোট দেখুন।

৪৮। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—(তদানীন্তন আরবে) আবদুল কায়েস নামক একটি গোত্র ছিল (তাহারা বাহরাইন নামক স্থানে বসবাস করিত)। তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিল। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইবার পূর্বেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ*। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! মোহার্‌রম, ছফর রবিউল-আউয়াল ও রজব এই চারিটি বিশেষ সম্মানিত মাস ব্যতীত অন্য সময় আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইতে অক্ষম। কারণ, আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পথিমধ্যে "মোজার" গোত্রীয় কাফেরদের বাসস্থান, (তাই অন্য সময় যাতায়াত করা আমাদের জন্য সম্ভবপর ও নিরাপদ নহে ↑)। আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্টতর উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ বলিয়া দিন, যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে বেহেশত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত তাহারা (সেকালের) প্রচলিত পানীয় সমূহের (মধ্যে হালাল-হারামের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্ত্তব্যের আদেশ করিলেন—(১) এক আল্লার উপর ঈমান আনার আদেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক আল্লার উপর ঈমান" কাহাকে বলে জান কি? তাহারা আরজ করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই (দঃ) তাহা ভালরূপ বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন, উহার অর্থ এই—কায়মনোবাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রেরিত ও মনোনীত মতবাদ—ইসলামই একমাত্র গ্রহণীয়, আমি উহাকেই গ্রহণ করিতেছি।) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও মা'বুদ নাই (অর্থাৎ—অন্য সকল প্রকার মতবাদ বর্জ্জনীয়, সুতরাং সে সব আমি বর্জ্জন করিতেছি।) এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল + (অর্থাৎ—তাঁহার বর্ণিত

---

* অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার পূর্ব্বেই অনুগত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ। নতুবা লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে হইত, এবং এখন সাক্ষাতে উভয়েরই লজ্জা বোধও হইত।

↑ সে কালের কাফের মোশরেকরাও উক্ত চারিটি মাসকে সম্মানিত গণ্য করিত। এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি হত্যা-লুণ্ঠন হইতে সকলেই বিরত থাকিত।

\+ এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে আল্লার সাচ্চা রসুলরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লওয়াকে আল্লার উপর ঈমান আনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। কারণ "এক আল্লার উপর ঈমান" এর ব্যাখ্যা দুইটি বিষয়ের যুগপৎ সমন্বয়ের দ্বারা করা হইয়াছে অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সকল আদেশ-নিষেধ ও প্রদর্শিত আদর্শসমূহ আল্লার তরফ হইতেই প্রেরিত ও মানব জাতির জন্য নির্দ্ধারিত প্রকৃত সত্য আদর্শ; এতদ্ব্যতীত অন্য সকল প্রকার আদর্শই বাতিল ও বর্জ্জনীয়।) (২) উত্তমরূপে নামায আদায় করা। (৩) যাকাত দান করা (৪) রমজান মাসের রোযা রাখা এবং গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ (বাইতুল-মালে জমা) দেওয়া। ইহা ছাড়া রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (ব্যবহার করিতে) নিষেধ করিলেন × —(সেকালে আরব দেশে চারি প্রকার পাত্র প্রসিদ্ধ ছিল যাহাতে মদ্য তৈরী করা হইত। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ঐ সকল পাত্রে তৈরী পানীয় বস্তু এমনকি যে কোন কার্যে ঐ সমস্ত পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করিলেন; (যেন পাত্র দেখিয়া মদের কথা মনে পড়িয়া না যায় বা কেহ অন্য জিনিষের ছলনায় মদ্য তৈরী করিতে না পারে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন, এই সব আদেশ-নিষেধকে আপনারা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবেন।

ছওয়াবের নিয়্যতে কাজ করার উপরই আমলের ছওয়াব নির্ভর করিয়া থাকে

নেক কাজের নিয়্যতেও ছওয়াব হয়, যেমন হাদীছে আছে ولكن جهاد و نية মক্কা নগরী মোসলমানদের করতলগত হওয়ার পর যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করার মত অতিবড় একটি ছওয়াবের কাজের হুকুম রহিত হইল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—জেহাদ করিয়া ছওয়াব হাসিলের পথ এবং জেহাদের নিয়্যত ও প্রয়োজন হইলে হিজরত করিব এই নিয়্যত দ্বারা ছওয়াব হাছিলের পথ সর্বদাই খোলা থাকিবে।

স্বীকার করিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কেও সত্য রসুলরূপে মানিয়া লওয়া। সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ)কে রসুলরূপে মানিয়া লওয়া ব্যতিরেকে শুধু তাওহীদ অর্থাৎ এক আল্লাকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করাকে "আল্লার উপর ঈমান" গণ্য করা হইবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে।

× হাদীছের মধ্যে ঐ চারিটি পাত্রের নাম নিম্নলিখিতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা— حنتم এক প্রকার সবুজ রঙ্গের কলসী। نقير খেজুর গাছের গুড়ির মধ্যস্থল খোলা করিয়া মটকার ন্যায় তৈরী এক প্রকার পাত্র। دباء শুক্‌না কদুর খোলা বা বাওয়াস। مزفت বা مقير চতুষ্পার্শে বানিশ করা, চিনা মাটির তৈরী বোয়েম বিশেষ।

প্রাচীনকালে আরবদেশে এই সকল পাত্রে শরাব অর্থাৎ মদ্য তৈয়ার করা হইত, কারণ এগুলির মধ্যে পানীয় বস্তুতে দ্রুত মাদকতা সৃষ্টি হইত। মদ্যপান হারাম (নিষিদ্ধ) হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় ঐ সকল পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল, পরে অবশ্য শুধু মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণ কার্য্যে ঐ সব পাত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা মনছুখ বা রহিত হইয়াছে।

৪৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—যখন কেহ ছওয়াব হাসিলের নিয়্যতে স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য টাকা পয়সা খরচ করে, তখন তাহার ঐ খরচ ছদকারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৫০। **হাদীছ ঃ**—সা'দ ইবনে আবু আক্কাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যাহা কিছু খরচ করিবে উহার ছওয়াব নিশ্চয় পাইবে ; এমনকি স্ত্রীর (প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার) মুখে লোক্‌মা (খাদ্য-গ্রাস) তুলিয়া দেওয়াতেও ছওয়াব হইবে।

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে ছওয়াবের আমল গণ্য করা হয় না, কিন্তু সঠিক নিয়্যত দ্বারা উহাতেও, এমনকি শরীয়ত অনুমোদিত আনন্দ উপভোগের কাজেও ছওয়াব হাসিল হয়।

হিত ও মঙ্গল কামনা করা বড় ধর্ম্ম

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—হিত কামনা করা এবং মঙ্গল কামনা করাই ধর্ম্ম। আল্লার (দ্বীনের) মঙ্গল কামনা করা, রসুলুল্লার (দঃ) (আদর্শ ও মিশনের) মঙ্গল কামনা করা, (খাঁটী) মোসলমান শাসনকর্ত্তাদের মঙ্গল কামনা করা ও সর্বসাধারণ মোসলমানদের মঙ্গল কামনা করা।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লার দ্বীনের মঙ্গল কামনার অর্থ আল্লার দ্বীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতঃ জীবনের প্রতি স্তরে উহাকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিফলিত করা এবং উহার তবলীগ অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রচার ও বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া, প্রয়োজনে জেহাদ করিয়া উহার উপর যাবতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মঙ্গল কামনার অর্থ তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতঃ অবিচলিত ভাবে উহার অনুসরণ করিয়া যাওয়া ও সর্বদা তাঁহার অনুগত থাকা এবং তাঁহার আদর্শকে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করতঃ তাঁহার আদর্শ ও মিশনকে সারা বিশ্বে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় ব্রতী থাকা।

খাঁটী মোসলমান শাসনকর্ত্তার মঙ্গল কামনার অর্থ এই—ন্যায় বিচারক ও সদাচারী মোসলমান শাসনকর্ত্তার সর্বপ্রকার ন্যায় নীতি ও আইন কানুনের অনুগত থাকা এবং ন্যায় কাজে সহযোগীতা করিয়া যাওয়া, অন্যায়ভাবে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী না হওয়া।

মোসলমান জনসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ তাহাদের সর্বপ্রকার হক আদায় করা তাহাদের মধ্যে "আম্‌র-বিল-মারূফ, ও নিহি আনিল-মোনকার" অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও কুপথ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা সর্বদা করিয়া যাওয়া। সর্বাবস্থাতেই

সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলা। বিশেষতঃ স্বীয় গুণ বা পদমর্য্যাদা ও সাধ্যানুসারে সর্বসাধারণের উপকার ও উন্নতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। যেমন—কোন ব্যক্তি ডাক্তার হইয়াছে, সে ডাক্তারি করিয়া শুধু টাকা উপার্জ্জন করিলেই চলিবে না। বরং সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে এবং গরীব দুঃখীর উপকারার্থে সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হইবে। অথবা কোন ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়াছে, সে শুধু নিজের পেট ভরিলে এমনকি কেবলমাত্র যাকাৎ, ফেৎরা আদায়ে ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। তাহাকে সর্বসাধারণের উপকার ও গরীব কাঙ্গালের সাহায্য যথাসাধ্য করিয়া যাইতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও হক্ব রহিয়াছে। কোরআন শরীফে ২ পাঃ ৬ রুকুতে আছে—واتى المال على حبه ذوى القربى...... "খাটী মোমেন উহারাই, যাহারা নামাজ কায়েম করে, যাকাৎ দান করে এতদ্ভিন্ন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মীয়-স্বজন, এতিম মিছকিন, অসহায় পথিক ও যাচ্ঞাকারীকে দান করে।"

হাদীছে আছে—"মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও অনেক হক্ব আছে।" (তিরমিজী) হাদীছে আরও আছে—ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه

অর্থ :—"ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে—যে নিজে পেট ভরিয়া খায় ও তাহার প্রতিবেশী তাহার নিকটেই অনাহারে দিন কাটায়।" (মেশকাত শরীফ)

এইরূপে যে ব্যক্তি আলেম তাহার কর্ত্তব্য দ্বীনের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া যাওয়া এবং সর্বসাধারণকে সৎপথে পরিচালিত করায় আন্তরিক আগ্রহের সহিত লাগিয়া থাকা—যেমন রসুলুল্লাহ (দঃ) করিতেন। মানবজাতিকে সৎপথে আনয়নে তাঁহার কি অপরিসীম আগ্রহ ও বিরামহীন চেষ্টা-যত্নই না ছিল। যদ্দরুণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

"মনে হয় আপনি এই অনুতাপে প্রাণ দিয়া দিবেন যে, কাফেররা কেন ঈমান আনে না।" (১৫ পাঃ ১৩ রুঃ)

এইরূপে শারীরিক শক্তি সামর্থ্য দ্বারাও জনগণের বিপদ উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা করা চাই। এ সবই হইল সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও দুইটি শাখা আছে। যথা—

প্রথমতঃ এই যে, কোনও সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কার্য্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ সুচারু রূপে নির্বাহ করতঃ সর্বসাধারণের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, রাষ্ট্রিয় বা সামাজিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী হইলে সেই ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপব্যবহার না করিয়া স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুর্নীতি ত্যাগ করতঃ জনগণের একনিষ্ঠ খাদেমরূপে কাজ করিয়া যাওয়া।

৫১। **হাদীছ :**—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'ত ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে—নামায যথাসাধ্য উত্তমরূপে আদায় করিব, যাকাৎ দান করিব, প্রত্যেক মোসলমানের খায়েরখাহী বা হিত সাধন ও মঙ্গল কামনা করিব।

৫২। **হাদীছ :**—ছাহাবী মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) কুফার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, হঠাৎ তিনি এন্তেকাল করেন। তখন জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক ছাহাবী যাহাতে রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে এক শুভেচ্ছামূলক বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আল্লার প্রশংসা করিয়া তারপর বলিলেন—মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এক খোদার ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিবেন এবং সর্ব্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। যাবৎ নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া না আসেন আপনারা এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নূতন শাসনকর্ত্তা অতি সত্বরই নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। তারপর বলিলেন—আপনারা মৃত শাসনকর্ত্তার জন্য মাগফেরাতের (ক্ষমা প্রাপ্তির) দোয়া করুন। তিনি ক্ষমা করা ভাল বাসিতেন, আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি বলিলেন—আমার এই বক্তৃতা করার একমাত্র কারণ এই যে, আমি যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে বায়আ'ত করিয়াছিলাম, তখন নবী (দঃ) আমার উপর এই শর্ত্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, "সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে।" আমি সেই শর্তে বায়আ'ত করায় আপনাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতির যোগ্য মঙ্গল কামনা করিয়া এই বক্তৃতা করিলাম। এই বলিয়া তিনি নিজের ও সকলের জন্য এস্‌তেগফার—শুভ কামনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ বক্তৃতা মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিলেন।

● এই বক্তৃতায় মৃত শাসনকর্ত্তার মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাঁহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিজেও করিলেন অন্য সকলকেও উহার আহ্বান জানাইলেন। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাহাদিগকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির হাত হইতে **রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন।**

দ্বিতীয় অধ্যায়*

এ্‌লম

এ'লমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

কোরআন শরীফে আছে—

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

অর্থ :—যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং বিশেষতঃ এল্‌ম হাসিল করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অনেক উচ্চাসনের অধিকারী করিবেন (২৮ পাঃ ২রুঃ)।

এল্‌ম ব্যতীত মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এল্‌মের উন্নতি এবং জ্ঞান বর্দ্ধনের দোয়া শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং সেই দোয়া করার আদেশ করিয়াছেন। (১৬ পাঃ ১৫ রুঃ)

قل رب زدنى علما "আপনি বলুন—হে প্রভু! আমার এল্‌ম বর্দ্ধিত কবিয়া দিন।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন -انما يخشى الله من عباده العلماء "আল্লার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণের অন্তরেই খোদার ভয় থাকে।" +(২০ পাঃ ১৬ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন (২৩ পাঃ ১৫ রুঃ)—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"এল্‌মের অধিকারীগণ এবং এলমহীনগণ কখনও সম পর্য্যায়ের হইতে পারে কি ?"

আরও আছে—قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

---

* এই অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলির আসল বিষয় বস্তু ঠিক রাখিয়া পাঠকদের সুবিধার্থে উহার ধারাবাহিকতার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শিরোনামা একত্রিকরণও হইয়াছে।

+ এই আয়াতের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান ও খাটী এল্‌মের নিদর্শন বা আলামত এই-রূপে নির্দ্ধারিত হয় যে—যে জ্ঞান ও এল্‌ম আল্লার ভয়-ভক্তির বাহক ও অছিলা হয় এবং যদ্দারা মানুষের মনে আল্লার ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়, উহাকেই প্রকৃত জ্ঞান ও এল্‌ম বলা যাইতে পারে।

'দোযখবাসীরা এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে, হায়! (দুনিয়ায় থাকাকালে) যদি আমরা (দ্বীনের কথা) অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিক্ষা করিতাম বা অন্ততঃ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতাম, তবে (আজ) আমরা দোযখীদের দলভূক্ত হইতাম না।" (২৯ পাঃ ১ রুঃ)

হজরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন— (১৬ পৃঃ)

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ -

উপরোক্ত হাদীছটি একখানি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এইরূপ—দামেস্ক শহর মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে আবুদ-দরদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বাস করিতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবুদ-দরদা (রাঃ)! আমি মদীনা হইতে দীর্ঘ ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি, আপনি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে একখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসি নাই। তখন আবুদ-দরদা (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি—(১) যে ব্যক্তি এল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ তায়ালা সেই অছিলায় তাহার জন্য বেহেশতের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিবেন। (২) নিশ্চয় জানিও, দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণকারী তালেবে-এল্‌মকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফেরেশতাগণ তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় পাখা ও ডানা বিছাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ফেরেশতাগণ তালেবে-এল্‌মগণের খেদমতে রত থাকেন। (৩) সাত আসমান ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল জীব এমনকি পানির মধ্যে অবস্থানকারী মৎস্য জাতীয় জীবজন্তু পর্য্যন্ত আলেমের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে*। (৪) একজন শরীয়তের

---

* কারণ খাঁটী আলেমগণ দ্বারা দুনিয়াতে আল্লার দ্বীনের উন্নতি হওয়ায় তাঁহাদের অছিলায় দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হয়, যদ্দারা দুনিয়ায় অবস্থানকারী সকল প্রাণীই লাভবান হইয়া থাকে। যেমন সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বৃষ্টি-পাত না হইলে পশু পাখী, মৎস্য ইত্যাদি সকল জীবই নিস্তেজ ও অধীর হইয়া পড়ে এবং নববর্ষের বৃষ্টি বর্ষণে প্রাণী মাত্রই সতেজ, আনন্দমুখর ও পুলকিত হইয়া উঠে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পায়রবীকারী খাঁটী আলেম যিনি সর্বদা এল্‌ম চর্চ্চায় রত থাকার দরুন অন্য কোনও নফল এবাদৎ বা অজিফা ইত্যাদির জন্য সময় পান না, তাঁহার মর্য্যাদা ও ফজিলত একজন এলমহীন আবেদ—নফল এবাদৎ-বন্দেগীতে মশগুল ব্যক্তির তুলনায় এরূপ, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্য্যাদা সাধারণ নক্ষত্রের উপর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (৫) নিশ্চয় জানিও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। এই পৃথিবীতে নবীগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি একমাত্র এলম। যে ব্যক্তি উহা হাসিল করিয়াছে সে অতি মুল্যবান সম্পদ লাভ করিয়াছে (মেশকাত শরীফ)। বোখারী শরীফে শুধু ৫ নং ও ১নং বিষয় দুইটি উল্লেখ আছে।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু-জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমাকে কতল বা হত্যা করার জন্য যদি তোমরা আমার গর্দ্দানের উপর তরবারি রাখিয়া দাও এবং আমি বুঝিতে পারি যে, তরবারি চালিত করিয়া আমার কতল ক্রিয়া সম্পন্ন করার পূর্ব মুহূর্ত্তে আমি এতটুকু সময় ও সুযোগ পাইব যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মাত্র বাণী তাঁহার উম্মতগণকে শিক্ষাদান করিতে বা তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারিব, তবে তাহাও আমি অবশ্যই করিব, ততটুকু সুযোগও আমি কখনও হাতছাড়া হইতে দিব না।

ওমর (রাঃ) বলিতেন, تفقهوا قبل ان تسودوا "সর্দ্দার বা নেতা নির্বাচিত অথবা কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োজিত হইবার পূর্বে তোমাদের তাফাক্কোহ, হাসিল করিতে হইবে।" (১৭ পৃঃ)

এখানে 'তাফাক্কোহ' হাসিল করার অর্থ কেবলমাত্র এলম হাসিল করাই নহে, বরং কোরআন ও রসুলের (দঃ) সুন্নত তথা হাদীছের ভিতরে সমুদয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সহ জাগতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যে আলো দান করা হইয়াছে এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার যে সব সমাধান তাহাতে দেওয়া হইয়াছে এবং রসুলের (দঃ) পরবর্ত্তী যুগত্রয়ে অর্থাৎ ছাহাবাগণের যুগে, তাবেয়ীগণের যুগে ও তাবয়ে-তাবেয়ীগণের যুগে পরবর্ত্তী সমস্যা সমূহের যে সব সমাধান তাঁহারা কোরআন ও হাদীছের আলোতে দান করিয়া গিয়াছেন সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এক একটি করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। এবং ঐ সবকে জ্ঞানের মূলধনরূপে হাতে লইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; যাহাতে সেই মূলধনরূপী জ্ঞান-প্রদীপের

দুনিয়াতে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আল্লার রহমত খাঁটী আলেমগণের দ্বারা আল্লার দ্বীন জারী হওয়ার বদৌলতেই হইয়া থাকে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত অনুভূতির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীই আল্লার রহমতের সেই অছিলাকে উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়া তাহারা সেই অছিলা তথা আলেমগণের জন্য ক্ষমা ও মাগফেরাতের দোয়া করিয়া থাকে।

আলোতে সম্মুখবর্ত্তী প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুজিয়া পাওয়া যায় এবং সর্বস্তরেই ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা সৎ-অসৎএর বিচার বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। খলীফা ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক এই আদেশ জারীর পর হইতেই তাকাব্বোহ হাসিলের ট্রেনিং প্রথা চালু করা হইয়াছিল। নৈতিক ট্রেনিং এর সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা ছিল।

কথার মধ্যভাগে প্রশ্নের উত্তরদানে বিলম্ব করা

৫৩। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন মজলিসে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক আসিয়া (ঐ আলোচনারত অবস্থায়ই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে আসিবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) (ঐ প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া) স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ কেহ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হয়ত প্রশ্নটি শুনিয়াছেন, কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করা নাপছন্দ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মন্তব্য করিল যে, হয়ত তিনি প্রশ্নটি আদৌ শুনিতে পান নাই। কিন্তু বক্তব্য শেষ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রশ্নকারী কোথায়? সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমি উপস্থিত আছি ইয়া রসুলুল্লাহ।*

নবী (দঃ) বলিলেন—যখন আমানতের খেয়ানত করা হইতে থাকিবে (তথা দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত ও দায়িত্ব পালনের ত্রুটি হইতে থাকিবে) তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। (অর্থাৎ তখন মনে করিবে যে, কেয়ামত বা জগতের ধ্বংস ও প্রলয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমানতে খেয়ানতের রূপ কি হইবে? উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, বিশেষতঃ হুকুমত ও রাষ্ট্রিয় কার্য্য পরিচালনা বা শাসন ক্ষমতার ভার যখন অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হইবে, অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত লোকদিগকে যখন রাষ্ট্রিয় কার্য্যে ও ক্ষমতায় নির্বাচন বা নিযুক্ত করা হইবে, তখন কেয়ামতের তথা জগৎ ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যাঃ—সকল প্রকার আমানতের খেয়ানতই কেয়ামতের বা জগৎ ধ্বংস নিকটবর্ত্তী হওয়ার আলামত। বিশেষতঃ শাসকগোষ্ঠির দ্বারা জনসাধারণের অর্থের অপচয় এবং রাষ্ট্রিয় কার্য্যে দায়িত্ব পালনের প্রতি অবজ্ঞা ও শাসন ক্ষমতার অপ-ব্যবহার দ্বারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রক্ষকের নামে ভক্ষকের অভিনয় ইত্যাদি বিশেষ ভাবে কেয়ামতের আলামতরূপে পরিগণিত।

---

* কাহারও বক্তব্য শেষ করার পূর্ব্বে কথার মধ্যভাগে প্রশ্ন করা যদিও বে-আদবী বটে, কিন্তু যেহেতু ঐ ব্যক্তি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক ছিল, তাই হযরত তাহার এই প্রকার প্রশ্নে তাহাকে তিরস্কার করেন নাই। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বক্তব্য শেষে উত্তর দিয়াছেন।

এলমের কথা দরকার বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলা *

৫৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সফরে পথ চলিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের পেছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। আমরা আছর নামাযের প্রায় শেষ ওয়াক্তে এক স্থানে অজু আরম্ভ করিলে হযরত আমাদের নিকট পৌঁছিলেন। আমরা তাড়াহুড়া বশতঃ পূর্ণাঙ্গ পা না ধুইয়া কেবলমাত্র মুছিয়া ফেলার ন্যায় অসম্পূর্ণভাবে পা ধুইলাম, পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকিল ; উহাতে পানি পৌঁছিল না। নবী (দঃ) আমাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত পায়ের (শুষ্ক) গোড়ালী দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে ; দুই-তিনবার এইরূপ বলিলেন।

ওস্তাদ কর্ত্তৃক শাগের্দগণের পরীক্ষা করা

৫৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ খেজুর গাছের মাথি (গাছের মাথার অভ্যন্তরস্থ মিষ্ট কোমল অংশ) আনিয়াছিল। হযরত তাহা খাইতে লাগিলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এক প্রকার গাছ আছে যাহার পাতা কখনও ঝরিয়া পড়ে না। মোমেন ব্যক্তির সঙ্গে ঐ গাছের তুলনা হইতে পারে, (অর্থাৎ মোমেন ব্যক্তি যেমন সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে—সর্ব্বাবস্থায় স্বীয় প্রভুর ভক্ত ও অনুরক্ত থাকে এবং পরোপকারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ঐ গাছটিও সর্বাঙ্গীন পরোপোকারী এবং কোন ঋতুতেই তাহার মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন আসে না।) বল দেখি! সেই গাছটি কোন্ গাছ ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সকলেরই ধারণা জঙ্গলের বিভিন্ন প্রকার গাছের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। আমার মনে ধারণা হইল যে, উহা খেজুর গাছ হইবে ; কিন্তু ঐ মজলিসের মধ্যে আমি সকলের চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম, বড়দের সম্মুখে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। ছাহাবীগণ শেষ পর্য্যন্ত বলিতে অপারগ হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি বলিয়া দিন, উহা কি গাছ। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা খেজুর গাছ। তখন আমি আমার পিতা ওমর (রাঃ)কে আমার ঐ মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহা বলিয়া দিতে, তাহা হইলে আমি এতদুর সন্তুষ্ট হইতাম যে, দুনিয়ার কোনও শ্রেষ্ঠ ধন সম্পত্তি পাইলেও তদ্রূপ সন্তুষ্টিলাভ হইত না। (কারণ, তাঁহার মনের উত্তর সঠিক উত্তর ছিল। হযরত (দঃ) উহা শুনিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে তিনি তাঁহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইতেন।)

---

* নবী (দঃ) সাধারণতঃ নীচস্বরে কথা বলিতেন এবং ইহাই সুন্নত।

দ্বীনের কথা যোগ্য লোক দ্বারা যাচাই করিয়া লইবে

৫৬। হাদীছ ঃ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর দ্বারা কোন কোন লোক রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিয়া তুলিলে ঐ সম্পর্কে কোরআন শরীফের একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হয়; যদ্দারা ঐরূপ প্রশ্নাবলী হইতে বিরত থাকার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তাই ছাহাবীগণ রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং কোনও বুদ্ধিমান বিদেশী আগন্তুকের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। (কারণ নূতন আগন্তুক এই সকল বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার দরুন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করিবে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) উহার উত্তর দিবেন ও ছাহাবীগণ সেই উত্তর শুনিয়া তদ্দারা জ্ঞান ও এল্‌ম হাসিল করিবেন।)

একদা আমরা মসজিদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মজলিসে বসিয়া ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া আসিল এবং উট হইতে অবতরণ করিয়া উহাকে বাঁধিল; তারপর মসজিদের ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে? (আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ সময়) নবী (দঃ) হেলান দেওয়া অবস্থায় আমাদের মধ্যস্থলে বসিয়া ছিলেন। আমরা উত্তর করিলাম—এই যে হেলান দেওয়া উপবিষ্ট নূরানী চেহারাওয়ালা। অতঃপর সে নবী (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিব এবং কড়াকড়ির সহিত জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তজ্জন্য মনে ব্যথিত হইবেন না। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা—মন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন সে বলিল, আপনার প্রেরিত এক ব্যক্তি আমা-দিগকে বলিয়াছে, আপনি ইহা দাবী করিয়া থাকেন যে—আল্লাহ আপনাকে রস্থল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সে সত্য এবং ঠিকই বলিয়াছে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আসমান কে স্বষ্টি করিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে জিজ্ঞাসা করিল, ভূমণ্ডল এবং পাহাড় পর্বৎ কে স্বষ্টি করিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই সবের মধ্যে উপকারী বস্তুনিচয় কে স্বষ্টি করিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে বলিল, আমি আপনার ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী সকলের স্বষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা যিনি আসমান-জমিন স্বষ্টি করিয়াছেন, পাহাড়-পর্ব্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই সবের মধ্যে অসংখ্য উপকারী বস্তুনিচয় রাখিয়াছেন—তাঁহার কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি রস্থল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন—আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি তাঁহার রস্থল

নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর ঐ লোকটি বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন আমি আপনাকে সেই আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, দিবা-রাত্রে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন—আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহই দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার আদেশ করিয়াছেন। লোকটি ঐরূপেই বলিল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। লোকটি বলিল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের মালদারের নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, ধনীদের নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া গরীবদিকে দান করিতে হইবে। লোকটি এইরূপে হজ্জের বিষয়ও প্রশ্ন করিল এবং নবী (দঃ) পূর্ব্বোক্ত রূপেই উত্তর দিলেন।

তারপর লোকটি বলিল, আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছি। আমার নাম জেমাম-ইবনে ছা'লাবাহ। লোকটি প্রত্যাবর্ত্তনকালে শপথ করিয়া বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন, সেই মহান আল্লার কসম খাইয়া বলিতেছি, (আপনি যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,) আমি উহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিব না। লোকটির দৃঢ়তা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী প্রমাণিত হয় তবে নিশ্চয়ই সে বেহেশতবাসী হইবে।

অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু লিখিয়া বা বিশ্বস্তসূত্রে পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ যোগ্য

এই পরিচ্ছেদের মধ্যে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতেছে এই যে, একে অন্যের নিকট কোনও বিষয় ব্যক্ত করার তিনটি স্তর আছে, যথা—সাক্ষ্য, শিক্ষা ও সংবাদ। সাক্ষ্যের পর্য্যায়টি সকলের উপরে। কেননা সাক্ষ্যের দ্বারা অন্যের উপর একটি জিনিষ বাধ্যতামূলকরূপে চাপাইয়া দেওয়া হয়। সেই জন্যই সাক্ষ্য পর্য্যায়ের মধ্যে শুধু সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়াই যথেষ্ট নহে, বরং তৎসঙ্গে সংখ্যারও আবশ্যক হইবে। অন্ততঃপক্ষে বিশ্বস্ত

দুই জন পুরুষ বা এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদানকারী হইতে হইবে। ইহার কম হইলে সাক্ষ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। সাক্ষ্যের জন্য আরও একটি বিষয় অত্যাবশ্যক যে, সাক্ষীকে সাক্ষ্য গ্রহণকারীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হইবে, অসাক্ষাতে লিখিত পত্ররূপে বা টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি পন্থায় প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না* ! দ্বিতীয় পর্য্যায় হইল শিক্ষা; শিক্ষাদানকারী সত্যিকারের জ্ঞানী ও প্রকৃত জ্ঞানদানেচ্ছু খাঁটী ও বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, সে তাঁহার দান করা বিষয় সমূহকে পূর্ণ মর্য্যাদা সহকারে গ্রহণ করে কিনা, মনোযোগের সহিত শ্রবণ ও গ্রহণ করতঃ উহার অর্থ, মর্ম্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্যকরূপে অনুধাবন করতঃ (মুখস্থ করার বিষয়াবলী) যত্নের সহিত মুখস্থ করিয়া রাখে কি না। তৃতীয় পর্য্যায় হইল সংবাদ; ইহার জন্য আবশ্যক হইল সংবাদদাতা পূর্ণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হওয়া। শিক্ষা ও সংবাদ পর্য্যায়দ্বয়ের জন্য সংখ্যারও আবশ্যক হয় না, সাক্ষাতেরও প্রয়োজন হয় না।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বিশ্বস্ত সূত্রে লিখিত আকারে যদি কোন জ্ঞান দান করা হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা গ্রহণ যোগ্য ↑। কারণ, ইহা শিক্ষা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্মীয় বিষয়সমূহে বিশ্বস্ত হওয়ার প্রথম শর্ত্তই হইল. জ্ঞানদাতা আল্লার আইন মান্যকারী অর্থাৎ মোসলমান হওয়া; তারপর পরিচিত ও সত্যবাদী হওয়া।

উক্ত বিষয়টি প্রমাণ করনার্থে বোখারী (রঃ) কয়েকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দিতেছেন।

(১) রসুলুল্লাহ (দঃ) কোথাও সৈন্যদল প্রেরণ করিলে (গোপণীয়তা রক্ষার্থে) গন্তব্য স্থানের নাম প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতেন না, বরং সেনাপতির হাতে একটি

---

* সাক্ষ্যের জন্য এই দুইটি বিশেষ শর্ত্ত মোটামুটিরূপে লেখা হইল। এ বিষয়ে আরও বহু বিস্তারিত তথ্য আছে যাহার পূর্ণ বিবরণ ফেকার কিতাব সমূহে পাওয়া যাইবে।

↑ লিখিত আকারে এলম সাক্ষাতে দান করা বা প্রেরণ করা (যদি প্রেরকের লেখা চিনিতে পারে) বা লোক মারফৎ এলম প্রেরণ করা, এ সবই যদি খাঁটী বিশ্বস্তসূত্রে হয় তবে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে, কিন্তু যেহেতু হাদীছ শাস্ত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় সেজন্য উল্লিখিত কোনও সুত্রে প্রাপ্ত হাদীছকে আখ্‌বারানা "اخبرنا" "হাদ্দাছানা حدثنا" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা যাইবে না। কারণ এই শব্দ দুইটি একমাত্র সাক্ষাতে নিজ কানে শ্রবণ করা অর্থাৎ শিক্ষাদাতা ওস্তাদ স্বয়ং পড়িয়াছেন, শিক্ষার্থী শাগের্দ মনযোগের সহিত ওস্তাদের শব্দগুলি শ্রবণ করিয়াছেন বা ওস্তাদের সম্মুখে শাগের্দ পড়িয়াছে, ওস্তাদ পূর্ণ একাগ্রতার সহিত শুনিয়াছেন এবং স্বীয় কণ্ঠস্থ বা লিপির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে শাগের্দের ভুল ত্রুটির প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র এই সূত্রদ্বয়ে প্রাপ্ত হাদীছকেই "ছাদ্দাহানা বা আখ্‌বারানা" বলিয়া ব্যক্ত করা হয়।

লিপি দিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম বলিয়া দিতেন যে, ঐ স্থানে পৌঁছিয়া লিপি পাঠ করিবে, উক্ত লিপিতে সঠিকরূপে গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকিত এবং তদনুযায়ী সৈন্য পরিচালিত হইত এবং সকলেই উহা মানিয়া চলিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—বিশ্বস্তরূপে প্রাপ্ত লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য।

(২) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার খেলাফৎ আমলে ওমর ফারূক (রাঃ) এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহাদের সর্বসম্মত পরামর্শে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন আকারের লিখিত পবিত্র কোরআনের ছূরা ও আয়াত সমূহকে বিশেষ বিশেষ সতর্কতার সহিত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে এক জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়াছিলেন। উহা স্বয়ং খলীফার তত্ত্বাবধানে সরকারী হেফাজতে রাজধানী মদীনা শরীফে রক্ষিত ছিল। খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফত-কালে ঐ কোরআন শরীফের জেলদখানাকে সম্মুখে রাখিয়া তদুপরি পুনরায় বিশেষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতঃ সাত জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের নিকট এক এক জেলদ পাঠাইয়া ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যে—আমার প্রেরিত কোরআন শরীফ জেলদের কোনরূপ ব্যতিক্রমে কাহারও নিকট কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা অগ্নিদাহ পূর্বক নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) দেখাইতে চাহেন যে—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্ত্তৃক লিখিতরূপে প্রেরিত কোরআন শরীফ সমস্ত ছাহাবা ও তাবেয়ীগণই বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছিলেন, এমনকি তিনি "জামেউল-কোরআন" রূপে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বস্তসূত্রে লিখিতরূপে প্রাপ্ত বিষয়-বস্তু গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- সাধারণতঃ খলীফা ওসমান (রাঃ)কে "জামেউল-কোরআন" অর্থাৎ কোরআন সঙ্কলক বলা হয় এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রেরিত কোরআন শরীফের ব্যতিক্রমে কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা যেন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই দুইটি কথাকে মূলধন করিয়া ইসলামের শত্রু কুচক্রিরা নানা অবান্তর বিষ ছড়াইয়া থাকে এবং নানা প্রকার কল্পনার অবতারণা করিয়া প্রতারণার সূত্র যোগায়।

কোরআন সঙ্কলনের প্রকৃত ইতিহাস এই যে—কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় উপায়ে উহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইত। আয়াত নাযেল হওয়ার সাথে সাথে উহা রসুলুল্লার (দঃ) কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ হওয়ার ভার স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন ৪ নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর ছাহাবীগণ কর্ত্তৃক মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করা

হইত। তদুপরি রসুলুল্লাহ (দঃ) চারজন সুদক্ষ লেখক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কাহাকেও ডাকিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে উহা লেখাইয়া রাখিতেন* এবং অন্যান্য ছাহাবীগণও যথাসম্ভব লিখিয়া লইতেন। এইরূপে দীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল কোরআনের আয়াতসমূহ ধীরে ধীরে নাযেল হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা মুখস্থরূপে ও লিখিত আকারে সুরক্ষিত হইয়া রসুলুল্লার (দঃ) বর্ত্তমান থাকা কালেই হাজার হাজার ছাহাবীদের মুখে মুখে তেলাওয়াত হইতে থাকে। তদুপরি প্রতি বৎসর যতটুকু নাযেল হইত বৎসর শেষে রমজান মাসে ফেরেশতা জিব্রাইলের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সম্পূর্ণ অংশটুকু দওর করিতেন—একে অন্যকে শুনাইতেন, এমনকি ২৩শ বৎসর পূর্ণ কোরআন শরীফ ঐরূপে দুইবার দওর করেন, যেমন ৫নং হাদীছে এই বিষয়টি বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে হযরত রসুলুল্লার (দঃ) বর্ত্তমানেই যাবতীয় উপায় অবলম্বনের সহিত লিপিবদ্ধরূপে পূর্ণ কোরআন শরীফ সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু লিখিত আয়াত ও ছুরা সমুহ ধারাবাহিকভাবে একত্রিত বা গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্তরূপে ছিল না, বরং বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন বস্তুর উপর লিখিত ছিল। কারণ, প্রথমতঃ সে কালের সাধারণ রীতিই হয়ত এই ছিল। তা ছাড়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ) বর্ত্তমানে অহীর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিতেন তখন উহা বাদ দিতে হইত। আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে—কয়েকটি বিভিন্ন ছুরার আয়াত সমূহ এককালীন নাযেল হইতে থাকিত। যেমন এখন এক ছুরার একটি আয়াত নাযেল হইল আর একবার অন্য ছুরার অন্য একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অন্য ছুরার, আর একবার ঐ প্রথম ছুরার আর একটি আয়াত নাজেল হইল। এইরূপে বিভিন্ন ছুরার আয়াত এককালীন নাযেল হইত। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) লিখকদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন যে—এই আয়াতটি অমুক ছুরার অমুক স্থানে লিখিয়া রাখ। তদুপরি সময়, স্থান, শানে-নুযূল ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরের আয়াত আগে, আগের আয়াত পরে নাযেল হইত; কোরআন নাযেল হওয়ার সময় প্রকৃত ধারাবহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। এমতাবস্থায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে উহাকে সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে তৈরী করা সম্ভবই ছিল না।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি বিষয় ছিল, তাহা এই যে—বাংলা দেশেও যেমন সচরাচর দেখা যায়—পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে এক বাংলা ভাষার মধ্যেই উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বিভিন্নতা

---

* আবু দাউদ ও তিরমিজি শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে এই বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

ও ব্যবধান থাকে। যেমন—পানি, পানকে অঞ্চল বিশেষ হানি, হান এবং ঘোড়া, দড়িকে ঘোরা, দরি বলা হইয়া থাকে। একটি তরকারি গাছকেই পর্য্যায়ক্রমে ডাটা, ডাঙ্গা, মাইরা ইত্যাদি বলা হয়। পশ্চিম বঙ্গে "আমি যাব, সে যাবে" বলা হয়, পূর্ব বঙ্গে ঐ অর্থেই আমি যাইমু, সে যাইব; বলা হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক ভাষার মধ্যে এরূপ কিছু না কিছু আঞ্চলিক ব্যবধান থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা আসল অর্থে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটে না, শুধুমাত্র উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্যের রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের মাতৃভাষা একই আরবী ভাষার মধ্যেও উল্লিখিত রূপের ব্যবধান ও ব্যতিক্রম বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) কর্ত্তৃক হযরত রসুলুল্লার (দঃ) নিকট কোরআন শরীফ কেবলমাত্র কোরায়েশ গোত্রের ভাষার উচ্চারণ ও কায়দার উপরই নাযেল হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বৃদ্ধ-জওয়ান সব রকমের লোকই সবেমাত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে, এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যবস্থা সমীচীন ছিল না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগকে আরবী ভাষায়ই নিজ নিজ উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন শরীফ পড়িতে অনুমতি দিতেন। কারণ উহাতে অতি সামান্য ও নগন্য পরিবর্ত্তন হইত, তাও অর্থের পরির্ত্তন বিন্দুমাত্রও ঘটিত না—শুধু কোন কোন শব্দের উচ্চারণ, রূপ ও বাক্যের আকার পরিবর্ত্তন হইত মাত্র। আসল আরবী ভাষায় কোরআন অপরিবর্ত্তিতই থাকিত।

মোট কথা এই, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানেই কোরআন শরীফ যাবতীয় উপায়ে সুরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ—জেল্‌দ বা গ্রন্থাকারে একত্রিত ছিল না, দ্বিতীয়তঃ—আরবী ভাষারই বিভিন্ন আকারের উচ্চারণ ও কায়দায় পড়ার অনুমতি ছিল।

খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবী-গণের সর্ব্বসম্মত পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম দিকটি পূরণ করিলেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সতর্কতার সহিত কোরআন শরীফের সমস্ত আয়াত ও ছুরাসমূহকে একত্রিত-রূপে এক জেল্‌দ বা গ্রন্থ আকারে লেখাইলেন এবং ঐ কোরআন শরীফ জেল্‌দকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দিলেন। উহা রাজধানী মদীনায়ই রহিল; উহা বা উহার অনুলিপি বিভিন্ন দেশে পাঠান হইল না। তাছাড়া খলীফা আবুবকর (রাঃ) কোরআন শরীফকে পূর্ণরূপে একত্রিত করার প্রতিই অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলেন—যেন একটি অক্ষরও বাদ না থাকিয়া যায়। কিন্তু ছুরা সমূহের তরতীব ও স্থান নির্ণয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না।

কারণ কোরআনের প্রতিটি ছুরা এক একটি অধ্যায় বা প্রবন্ধের মত; কোন গ্রন্থের অধ্যায় বা প্রবন্ধ সমূহের তরতীব ও সংবিধানে ব্যবধান হইলে উহাতে অর্থ ও আসল বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আসে না। এই জন্যই কতিপয় ছাহাবীর নিকট ছুরাসমূহের স্থান নির্ণয় বা তরতীব বিভিন্ন রূপ ছিল। যথা—ছাহাবী আলী (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম ছুরা "এক্করা" তারপর "আল মোদ্দাছ্ছের" তারপর "আল-মোজাম্মেল" তারপর "তাব্বাত" তারপর ছুরা "তাকবীর"—এইরূপে কোরআন নাযেল হওয়া অবস্থার তরতীব রাখিয়াছিলেন। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে ছুরা "বাকারাহ" তারপর "নেছা" তারপর "আল-এমরান" এইরূপে রাখিয়াছিলেন। এই বিভিন্নতায় কোন ত্রুটি আসে না, অবশ্য বাহ্যিক একটু বিশৃঙ্খল দেখায়।

তাই খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে খলীফা আবু বকর (রাঃ) কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত কোরআন শরীফ জেল্‌দখানা সম্মুখে রাখিয়া সাত জেল্‌দ কোরআন শরীফ লেখাইলেন, উহাতে তিনি দুইটি বিষয়ের প্রতি তৎপর হইলেন। প্রথমতঃ—অধিকাংশ ছাহাবীগণের মতামত লইয়া যতদূর সম্ভব নানা প্রকার প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে ছুরাসমূহকে প্রকৃত তরতীব ও সংবিধান মতে রাখার চেষ্টা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—হযরত রসুলুল্লার (দঃ) যামানায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আরববাসী বিভিন্ন গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন পড়ার যে অনুমতি ছিল, সমস্ত ছাহাবীগণের এজ্‌মা' দ্বারা ঐ অনুমতিকে শুধুমাত্র সাময়িক সুযোগ গণ্য করতঃ আগামীর জন্য চিরতরে ঐ অনুমতি রহিত করিয়া দিলেন। আর কোরায়েশ গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দা তথা কোরআনের (নাযেল হওয়ার) আসলরূপে লিখিত সাত জেলদ কোরআন শরীফ বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া ইহাকে বাধ্যতামূলক করিয়া দিলেন! এবং অন্য কোন উচ্চারণ ও কায়দায় বা অন্য তরতীবে কাহারও নিকট কিছু লেখা থাকিলে উহা অগ্নিদাহ করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিলেন। যেন সর্ব্বত্র কোন রকম ব্যবধান ব্যতিরেকে অবিকল একই রকম কোরআন শরীফ প্রচলিত হয় এবং অজ্ঞতা প্রসূত কোন বিতর্কের দ্বারা বিভেদের সৃষ্টি না হয়। ইহা খলীফা ওসমানের মহান কীর্ত্তি ও অতি সুফল প্রসূ প্রচেষ্টা ছিল।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনের সঙ্কলন ও সংরক্ষণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। খলীফা আবুবকর উহাকে গ্রন্থরূপে একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থ আকারে সাধারণ্যে প্রচারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, বরং রাজধানী মদীনাতে স্বীয় তত্ত্বাবধানেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থাকারে সাধারণ্যে প্রচারের ব্যবস্থা

আরম্ভ করিলেন খলীফা ওসমান (রাঃ)। তাই তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট "জামেউল কোরআন" "কোরআনের একত্রিকরণকারী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৫৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পারস্য সম্রাট (পরবেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়াঁ) খুসরুর নিকট একখানা লিপি লিখিয়াছিলেন এবং লিপিখানা আবদুল্লাহ ইবনে হোজাফা ছাহাবীর হাতে অর্পণ করিয়া বাহরাইনের শাসনকর্ত্তা (মোনজের ইবনে ছাওয়ার) নিকট পৌঁছাইতে বলিয়া ছিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্ত্তা ঐ লিপিবাহক সহ লিপিখানাকে পারস্য সম্রাট খুসরুর নিকট পাঠাইলেন। খসরু লিপি পাঠ করিয়া (ক্রোধে) উহা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহা শুনিয়া বদ-দোয়া করিলেন, হে খোদা! তাহারা যেমন আমার পত্রকে টুক্‌রা করিয়াছে তাহারাও যেন অনুরূপ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ধ্বংস হয়।*

৫৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৎকালীন বড় বড় রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান জানাইয়া পত্র পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট আরজ করা হইল যে, রাজা-বাদশাহগণ শীলমোহরযুক্ত লিপি না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। তখন নবী (দঃ) রৌপ্যের একটি অঙ্গুরীবিশেষ শীলমোহর তৈরী করাইলেন, উহার উপর
الله
رسول "আল্লাহ, রসুল, মোহাম্মদ" এই শব্দ কয়টি তিন লাইনে অঙ্কিত ছিল।↑
محمد

(আনাছ (রাঃ) বলেন) উক্ত অঙ্গুরী আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অঙ্গুলিতে পরিহিত দেখিয়াছি; এখনও উহা আমার চোখে ভাসিতেছে।

এলমের মজলিসে ভিতরে স্থান পাইলে তথায় বসিবে নচেৎ পিছনেই বসিবে, ফিরিয়া যাইবে না।

৫৯। **হাদীছ ঃ**—আবু ওয়াকেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া মসজিদে বসিয়া (তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে) ছিলেন। এমন সময় তিন ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের দিকে আসিতেছিল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং দুই ব্যক্তি মজলিসে হাজির হইল।

---

* ইতিহাস সাক্ষী যে, রসুলুল্লার (দঃ) দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল; অচিরেই পারস্য জাতির সহস্র বৎসরের সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস হইয়া তথায় ইসলামী খেলাফত কায়েম হইয়াছিল।

↑ নীচের দিক হইতে পড়া হইলে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" হয়।

একজন ভিতরে সম্মুখভাগে জায়গা দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসিল এবং অপর ব্যক্তি (ভিতরে ঢুকিবার তৎপরতা দেখাইতে লজ্জা বোধ করিয়া) সকলের পেছনেই বসিয়া পড়িল। মজলিস খতম হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তিন ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিলেন—একজন (আল্লার রসুলের তথা) আল্লার নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য তৎপর হওয়ায় আল্লাহ তাহাকে নিকটেই স্থান লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (অপরকে কোনরূপ বিরক্ত করিতে) লজ্জা বোধ করিল ; আল্লাহ তায়ালাও (তাহাকে মাহরুম ও বঞ্চিত রাখিতে) লজ্জা বোধ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে সুতরাং আল্লাহও তাহাকে (এই মজলিসের শিক্ষা ও বরকত হইতে) মাহরুম করিয়া দিয়াছেন।

ওস্তাদ অপেক্ষা শাগের্দ অধিক জ্ঞানী বা সংরক্ষণকারী হইতে পারে ; তাই প্রত্যেকের একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৬০। হাদীছ :— عن ابى بكرة قال النبى صلى الله عليه وسلم —

.......فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ* عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى

مِنْ سَامِعٍ وَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থ :—আবুবকরা (রাঃ) অতি উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ছাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—বিদায় হজ্জে জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবাণীর দিনে মিনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া ভাষণ দিতেছিলেন ; আমি তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। (সেই ভাষণে যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আল্লার মনোনীত ধর্ম্ম ইসলাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ও মৌলিক দায়িত্বের একটি বিশেষ মূলনীতি বর্ণিত হইতেছিল ; তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য) প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিকার দিনটি কোন্ দিন ?

---

* বোখারী শরীফ ১০৪৮ পৃষ্ঠায় واعراضكم وابشاركم ও উল্লেখ আছে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রশ্ন শুনিয়া আমরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, (আজিকার দিনটি কোন দিন ইহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তবে এই প্রশ্নের অর্থ কি ?) বোধ হয় এই দিনটির প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ নাম "ইয়াওমুন-নহ'র" (কোরবাণীর দিন) বদলাইয়া দিয়া অন্য কোন নাম প্রবর্ত্তন করিবেন। তাই আমরা মূল প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকিয়া শুধু এতটুকু আরজ করিলাম যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্ব্বাধিক বেশী জানেন। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, এই দিনটি পবিত্র "ইয়ামুন-নহ'র নয় কি ? (যেই দিনটিকে অতি মহান পবিত্র দিন গণ্য করতঃ পূর্ব্বকাল হইতেই সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে এমনকি কাফের বর্ব্বরগণ পর্য্যন্ত কেহই কাহারও জান, মাল বা ইজ্জৎ-আবরু হরণ করাকে হালাল মনে করে না।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা পবিত্র ইয়াওমুন-ন'হর। তারপর নবী (দঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাসটি কোন মাস ? আমরা সকলেই পূর্ব্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ থাকিলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম বোধ হয় নবী (দঃ) এই মাসের প্রচলিত নাম বদলাইয়া দিবেন। তাই এবারেও আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্ব্বাধিক বেশী জ্ঞাত আছেন। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, এইটি পবিত্র জিলহজ্জ মাস নয় কি ? (যে মাসের সর্ব্ববাদীসম্মত পবিত্রতা রক্ষার্থে মানুষ তাহার জীবনঘাতী শত্রুকে পূর্ণ সুযোগে ও বাগে পাইয়াও তাহাকে নিরাপত্তা দান করিয়া থাকে।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র মহান জিলহজ্জ মাস। তৃতীয়বার নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটি কোন্ এলাকা ? এইবারও আমরা পূর্ব্বের ন্যায়ই ভাবিলাম এবং নীরবতা অবলম্বন করতঃ ঐ আরজই করিলাম। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, ইহা পবিত্র মহান "হেরেম শরীফ" এলাকা নয় কি ? (যে স্থানের সম্মান এত বড় যে, সেখানে কোন পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং গাছ-পালা বা ঘাস-পাতার পর্য্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা আদি কাল হইতেই হারাম গণ্য হইয়া আসিতেছে।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা।

এইরূপে শ্রোতৃবর্গের মনকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করিয়া এবং তাহাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া, নবী (দঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা সকলে একাগ্রচিত্তে শুনিয়া মানসপটে অঙ্কিতরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের (তথা প্রত্যেকটি মোসলমানের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকের) রক্ত—তোমাদের জান, তোমাদের মাল-সম্পত্তি, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের শরীরের চামড়া পর্য্যন্ত যেরূপে আজিকার মহান ইয়াওমুন-ন'হরের দিনে, এই পবিত্র জিলহজ্জ মাসে, এই পবিত্র হেরেম শরীফে হারাম—সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত; ঠিক

এইরূপেই সর্ব্বদিনে, সর্ব্বমাসে ও সর্ব্বস্থানে হারাম ও সুরক্ষিত গণ্য হইবে। (একে অন্যের জান, মাল ও ইজ্জতের উপর আঘাত করিতে পারিবে না।) অচিরেই তোমরা আল্লার দরবারে হাজির হইবে; আল্লাহ তোমাদের সমুদয় আমলের হিসাব লইবেন।

বক্তব্য শেষে নবী (দঃ) শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মহান মূলনীতিটি স্পষ্টরূপে তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলাম ত? এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিল—হাঁ, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, হে খোদা! এই স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকিও। নবী (দঃ) আরও বলিলেন—এই মহান মূলনীতি যাহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছে তাহারা অনুপস্থিতবর্গকে এবং অতঃপর একে অন্যকে কেয়ামত পর্য্যন্ত শুনাইয়া, জানাইয়া, শিক্ষা দিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হইবে যে, আমার বাণীর মূল শ্রোতা (যে অন্যকে শুনাইতে যাইয়া ওস্তাদ হইবে সে) অপেক্ষা তাহার শাগের্দ ঐ বাণীকে অধিক সংরক্ষণ ও কার্য্যকরী করিতে এবং অধিক স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইবে।

(অর্থাৎ—রসুলের (দঃ) এক একটি অমিয় বাণীর ভিতরে এমন সুক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত থাকে যাহা কেহ বেশী বুঝিতে পারে, কেহ কম বুঝে, আবার কেহ মোটেই বুঝে না। তাই এমন ব্যক্তি যিনি ঐ তত্ত্বজ্ঞান কম রাখেন, তিনি যদি অন্ততঃ অবিকল শব্দগুলি মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া উপযুক্ত শাগের্দকে শিক্ষা দিয়া দিতে পারেন, তবে সেই উপযুক্ত শাগের্দ রসুলের (দঃ) এক একটি বাণী হইতে শত শত মাছআলাহ-মাছায়েল, রাষ্ট্রের মূলনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী আইন-কানুন বুঝিয়া বাহির করতঃ উহা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে। তদুপরি একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা ঐ বিষয়টি অমর ও চিরস্থায়ী হওয়ার সুযোগ পাইবে। কারণ প্রথম শিক্ষা লাভকারী ব্যক্তি তাহার স্মৃতিশক্তি কম হওয়ায় সহজেই উহা ভুলিয়া যাইতে পারে। পরন্তু তাহার নিকট শিক্ষা লাভকারীর স্মৃতিশক্তি অধিক প্রখর হওয়ায় তাহার দ্বারা ঐ বিষয়টি বহুদিন স্থায়ী হইবে এবং প্রচার পরম্পরায় উহা অমর ও চিরস্থায়ী হইতে পারিবে।

হযরত (দঃ) মোসলেম জাতিকে বিশেষভাবে আরও বলিলেন, (আমি তোমাদিগকে অন্ধকার যুগের মারামারি কাটাকাটি হইতে মুক্ত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ রাখিয়া যাইতেছি।) খবরদার। তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফেরদের ন্যায় পরস্পর মারামারি, কাটাকাটিতে লিপ্ত হইও না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছটি বিশ্বমানবের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এমন একটি রক্ষাকবচ ও মূলনীতি যাহা বিশ্বের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কোথাও শোনা যায়

নাই। ইহা মানুষের কল্পিত বিষয় নহে, বরং ইহা বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত ও বিশ্বশান্তির অগ্রদুত আল্লার রসুল কর্ত্তৃক প্রচারিত। পরবর্ত্তী যুগে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রই ইহাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রনায়কদের মৌলিক দায়িত্বরূপে এবং রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

উল্লেখিত নিরাপত্তা-বিধান ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের মৌলিক দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার; যাহারা মোসলেম জাতিভূক্ত তাহাদের এই অধিকার ইসলাম ধর্ম্ম সূত্রে প্রাপ্য এবং যাহারা মোসলমান নয় তাহাদের এই অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের বাধ্যতা ও আনুগত্য সূত্রে প্রাপ্য। অতএব, এই অধিকার সে পর্য্যন্তই অক্ষুন্ন থাকিবে যাবৎ কোন মোসলমান স্বীয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করতঃ "মোরতাদ" প্রমাণিত না হইবে এবং যাবৎ কোন অমোসলেম নাগরিক স্বীয় আনুগত্যের শপথ লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রমাণিত না হইবে।

এই মূলনীতির মধ্যে তিনটি বস্তুর নিরাপত্তা দান তথা এই তিনটি বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্বভার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে—একটি হইল নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার, ইহা রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাপ্য হক্ব ও ন্যায্য দাবী। আর একটি হইল নিরাপত্তার দায়িত্বভার, ইহা রাষ্ট্রনায়কদের জিম্মাদারী ও তাহাদের ঘাড়ে চাপানো বোঝা। আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তথা কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী রাষ্ট্রনীতির মূল বস্তু হইবে "দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বজ্ঞান"। অর্থাৎ—রাষ্ট্রনায়কদের এই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি নাগরিকের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত যেন নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। এমন কি প্রতিটি নাগরিকের শরীরের চামড়াটুকুও যেন নিরাপদে থাকে এবং অন্যায়রূপে উহার উপর সামান্যতম আঁচও যেন আসিতে না পারে। এই দায়িত্বভার সুষ্ঠুরূপে বহন করাই হইল ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল বস্তু। যাহারা এই দায়িত্বভার বহন করিয়া কার্য্যতঃ স্বীয় যোগ্যতা দেখাইতে সক্ষম হইবে, একমাত্র তাহারাই রাষ্ট্রনায়কত্বের কুরছিতে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। অন্যথায় কেহ কুরছি আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

বর্ত্তমান জগতের মনগড়া রাষ্ট্রনীতির মূলবস্তু সাব্যস্ত করা হয় অধিকারের দাবীকে। এমনকি শাসনতন্ত্রকে পর্য্যন্ত অধিকারের দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করা হইয়া থাকে। এইরূপে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ও দাবী-দাওয়ার আধিক্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে দুনিয়া হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব, শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী দায়িত্বজ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি সচেষ্ট হইতে হইবে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে অধিকার প্রাপ্তি আপনা আপনিই আসিতে বাধ্য।

এই হাদীছে তিনটি নিরাপত্তার উল্লেখ হইয়াছে—(১) জান, (২) মাল, (৩) ইজ্জত। ইসলামী আইন ও ধারা-উপধারার ভিত্তি এই মূলনীতির উপরই স্থাপিত।

জানের নিরাপত্তা ঃ

পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে—ইচ্ছাকৃত ঘটনায় খুনের বদলা খুন, কানের বদলা কান, নাকের বদলা নাক, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত, এবং জখমের বদলা সমপরিমাণ জখম। ভুল বা অসতর্কতা বশতঃ এরূপ কিছু ঘটিলে তাহার শাস্তিও নির্দ্ধারিত আছে। আলোচ্য হাদীছে دماءكم তোমাদের রক্ত ও ابشاركم তোমাদের চামড়া বলিয়া ঐ নিরাপত্তাকেই বুঝাইয়াছে। ফেকাহ তথা ইসলামী আইন-শাস্ত্রে কিতাবুল কেছাছ, কিতাবুদ-দিয়াত, কিতাবুল জেনায়াত ও কিতাবুত-তা'যীরের কতক অংশে এই নিরাপত্তার ধারা-উপধারাই বর্ণিত হইয়াছে।

মালের নিরাপত্তা ঃ

প্রথমতঃ ইসলাম ধন-সম্পত্তি মাল-দৌলতের উপর মালিকের স্বত্বাধিকার ও ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দান করে। পবিত্র কোরআনের শত শত বিধান ও আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। যথা—এতিমের মালসম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার কঠোর আদেশ এবং উহা আত্মসাৎ করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা, তদুপরি আত্মসাৎকারীর উপর ভীষণ আজাব ও শাস্তির সংবাদবাহী অনেক আয়াত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃত খরিদ-বিক্রি (ইত্যাদি) সূত্র ভিন্ন কাহারও ধন-সম্পত্তি গ্রাস করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত আছে। উত্তরাধিকারের বিধান, যাকাত ও হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধান কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এইরূপ আরও বহু বিধান কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের স্বীকৃতির স্পষ্টতর প্রমাণ। শত শত হাদীছও এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে اموالكم "তোমাদের ধন-সম্পত্তি" বলিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের সনদ দান করতঃ উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব ও অধিকার বুঝান হইয়াছে। সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত চোরের হাত কাটার শাস্তি বিধান ও ডাকাতের হাত-পা উভয়কে কাটার শাস্তি বিধান এবং ফেকাহ শাস্ত্রের "বাবুছ ছারাকাহ" ও বাবু-কাতয়েত তরীক, "কিতাবুল গছব" ইত্যাদির মধ্যে বর্ণিত ধারা ও উপধারা সমূহ এই মালের নিরাপত্তার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অবশ্য অসদুপায়ে অবৈধরূপে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত ধনের মালিক ঐ উপার্জ্জনকারী কখনও হইতে পারিবে না। বরং ঐ মাল আসল মালিককে ফেরৎ দিতে হইবে; ফেরৎ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার শত তওবাও কবুল হইবে না এবং আখেরাতে দ্বিগুণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।

ইজ্জতের নিরাপত্তা :

আলোচ্য হাদীছে اعراضكم "তোমাদের আবরু-ইজ্জত" এই শব্দটির দ্বারা উক্ত নিরাপত্তাকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত "হদ্দে-ক্বজফ্"—মিথ্যা যেনার তোহমতের দরুন ৮০টি বেত্রাঘাত এবং "হদ্দে-যেনা—অবিবাহিত পুরুষ বা মেয়ের যেনার শাস্তি ১০০টি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের যেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা, তদুপরি ফেকাহ শাস্ত্রের কিতাবুল-হুদুদ ও কিতাবুত্‌তাযীরে বর্ণিত ধারা ও উপধারাসমূহ উক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপই প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

ইপলামী ism বা নীতি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে উল্লিখিত তিনটি নিরাপত্তা সমানভাবে দান করিয়া থাকে। ইতর-ভদ্র, ধনী দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মোসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, রাজা-প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই সমানভাবে এই তিনটি নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা কোরায়েশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন একটি মহিলার দ্বারা চুরি প্রমাণিত হইলে পর তাহার পক্ষে সমুদয় সুপারিশকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক তাহার হাত কাটিয়া দিলেন এবং সুপারিশকারীর প্রতি ভর্ৎসনা করতঃ ক্রোদ্ধস্বরে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন—(খোদা, না করুন—) মোহাম্মদের (দঃ) মেয়ে ফাতেমাও যদি এইরূপ অপরাধ করে, তবে তাহারও হাত কাটিয়া দেওয়া হইবে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সকলের জন্য সমান নিরপেক্ষ ইনসাফ ছিল না। গরীব অপরাধ করিলে তাহার বিচার ও পুরাপুরি শাস্তি হইত, কিন্তু বড় লোকেরা অপরাধ করিলে উহার কোনও বিচার অথবা শাস্তি হইত না কিম্বা হইলেও মনগড়া মতে হইত। যে জাতির মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক ইনসাফ হয় উহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

জ্ঞান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, মানুষের কথা ও কাজের পূর্ব্বে এলম—জ্ঞান ও শিক্ষা আবশ্যক। মানুষ যে বিষয় বলিবে বা যে কাজ করিবে সে বিষয় প্রথমে তাহার এলম - জ্ঞান ও শিক্ষা থাকিতে হইবে। অতএব মানুষের জন্য এলম—জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

অতঃপর বোখারী (রঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন যে انما العلم بالتعلم এলম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য যাহা অধ্যয়নলব্ধ হয়। স্বয়ম্ভু জ্ঞানী ও আলেম দ্বারা অসংখ্য ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতিই সাধিত হয়। যেরূপ স্বয়ম্ভু ডাক্তার মানুষের জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ।

দ্বীন ও ধর্ম্মীয় বিষয়ে আলোচ্য তথ্যটি অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, দ্বীন ও ধর্ম্ম আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রেরিত, তাই উহা রসুলের পরিত্যাজ্য সম্পদ ↑। উম্মতগণ সেই সম্পদ রসুল (দঃ) হইতে পরম্পরায় লাভ করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে। সুতরাং উহার এলম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য গণ্য হইবে যাহা পরম্পরা সূত্রে রসুল (দঃ) পর্য্যন্ত সংযুক্ত হয় এবং তাহা একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই হইতে পারে। দ্বীন ও ধর্ম্মে যাহারা সেই অধ্যয়ন ছাড়া স্বয়ম্ভু জ্ঞানীরূপে গজাইয়া উঠে তাহারা বস্তুতঃ মানুষের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। একটি সুন্দর প্রবাদ—স্বয়ম্ভু ডাক্তার জানের পক্ষে বিপদ, আর স্বয়ম্ভু ধর্ম্ম-জ্ঞানী ঈমানের পক্ষে বিপদ। অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান সম্পর্কেও একটি উত্তম কথা বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন ৩ পাঃ ১৬ রুকুতে ধর্ম্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আদেশ রহিয়াছে, كُونُوا رَبَّانِيِّينَ "তোমরা রব্বানী হও"।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "রব্বানী" অর্থ দ্বীন ও ধর্ম্মে জ্ঞানী, আলেম, প্রজ্ঞাশীল; অর্থাৎ "রব্বানী" আখ্যার শ্রেণী ভুক্তির জন্য দ্বীন ও ধর্ম্ম সম্পর্কে তিনটি গুণের প্রয়োজন—জ্ঞানী হইতে হইবে, আলেম হইতে হইবে এবং প্রজ্ঞাশীল হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বোখারী (রঃ) একটি চতুর্থ গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা "রব্বানী" শব্দের সহিত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রব্বানী শব্দের মূল "রব্ব"; "রব্ব" অর্থ পোষক ও প্রতিপালক। শিশুদের লালন-পালনে তাহাদের পানাহার দানে ধাপে ধাপে ছোট হইতে বড় ও নরম হইতে শক্তের প্রতি অগ্রসর হইয়া আদর যত্ন ও কৌশলের সহিত তাহাকে আহার্য্য গলাধঃ করাইতে হয়। সেমতে "রব্বানী" আখ্যার যোগ্য শুধুমাত্র ঐ আলেম যিনি আল্লার বান্দাদিগকে দ্বীনের এলম ও শিক্ষা ঐরূপ সুকৌশল ও আদর যত্নের সহিত গ্রহণ করাইতে সদা সচেষ্ট থাকেন। আলেম সম্প্রদায় এই চারিটি গুণধারী হইবেন ইহাই উক্ত আয়াতের নির্দ্দেশ।

জ্ঞান ও নছিহতের কথা এত বর্ণনা করিবে না যে, শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তি আসে

৬১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমাদের বাসনা—আপনি প্রতি দিনই আমাদিগকে ওয়াজ শুনান। তিনি বলিলেন, প্রতিদিন ওয়াজ

↑ এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে একটি হাদীছের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছটির বিবরণ "এলমের ফজিলত" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

শুনাইতে এই জন্য বিরত থাকি যে, আমি পছন্দ করি না—তোমাদের মধ্যে ইহার দ্বারা কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা বিরক্তি উপস্থিত হউক। আমি তোমাদিগকে কয়েকদিন পর পর নছিহত করি; কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই ভাবেই ওয়াজ-নছিহত করিতেন যেন আমরা বিরক্ত হইয়া না পড়ি।

এই হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও বয়ান করিয়াছেন যে, দ্বীন শিক্ষা দানে লোকদের সুবিধার্থে সময় ও দিন নির্দ্দিষ্ট করা জায়েয আছে; বেদাত নহে।

৬২। হাদীছঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا -

অর্থঃ--আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা (আল্লার বান্দাদের জন্য) সহজ পন্থা অবলম্বন কর? কঠিন পন্থা অবলম্বন করিও না। তাহাদিগকে খোশ-খবরী শুনাইয়া আহ্বান জানাও, ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাড়াইবার পন্থা অবলম্বন করিও না।

ব্যাখ্যাঃ—অনেক ক্ষেত্রে কথার মূল উদ্দেশ্য ও স্থান বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করায় শুধু বাক্য ও শব্দের ব্যাপকতার দ্বারা নিছক ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই আলোচ্য হাদীছটি অনুধাবন করার জন্য প্রথমতঃ ইহার দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং ইহার স্থান বিশেষ কি ছিল তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দেশ-বিদেশে ছাহাবীগণকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ মোবাল্লেগ--দ্বীন প্রচারক, মোয়াল্লেম—দ্বীন শিক্ষাদাতা, আমেল—শাসনকর্ত্তা বানাইয়া পাঠাইতেন। ঐ সমস্ত প্রতিনিধিবর্গকে হযরত (দঃ) বিশেষ বিশেষ অমৃত উপদেশ দান পূর্ব্বক বিদায় করিতেন। আলোচ্য হাদীছটি ঐ বিশেষ অমৃতময় উপদেশাবলীর অন্যতম একটি উপদেশ। এই উপদেশ দ্বারা হযরত (দঃ) স্বীয় প্রতিনিধিবর্গকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে দ্বীন প্রচার, সর্ব্বসাধারণকে দ্বীন শিক্ষাদান, সর্ব্বসাধারণের উপর শান্তি-শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনার (Administration) ক্ষেত্রে সর্ব্বাধিক জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন।

অনেক সময় দেখা যায়—কোন একটি উত্তম সুন্দর বিষয়কে প্রচার করা হয়, কিন্তু অনভিজ্ঞ প্রচারকের অনভিজ্ঞতা প্রসূত ত্রুটিপূর্ণ কর্কশ ও কঠোর ভাবধারা এবং অশোভন অরুচিকর প্রচার পদ্ধতি ও তিক্ত ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদির দরুন মানুষ ঐ বিষয়টিকে আদৌ গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। উহাকে কঠিন বোঝা মনে করতঃ

উহা হইতে ভাগিয়া থাকে, বরং উহার প্রকৃত স্বাদ ও সৌন্দর্য্য প্রচারকের তিক্ত উক্তি সমূহের অন্তরালে ঢাকিয়া যাওয়ায় মানুষের মধ্যে বিষয়টির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। অথচ অভিজ্ঞ প্রচারক হইলে সে তাহার ভাব-ভঙ্গিমা, হৃদয়গ্রাহী প্রচার-পদ্ধতি রুচিময় দৃষ্টান্ত ও উপমা সমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত—একটি অতি কঠিন ও কঠোর বিষয়কেও মানুষের প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। শিক্ষা দানের বেলায়ও তদ্রূপই—অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক সহজ শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন বিষয়কেও সহজ হইতে সহজতর করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ অযোগ্য শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরুন বোধগম্য বিষয়ও বিপরীত রূপ ধারণ করিয়া বসে, ফলে শিক্ষার্থীগণ উহাকে কঠিন মনে করিয়া উহা হইতে ভাগিয়া পলায়ন করে। এইরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন ক্ষেত্রেও ভাল ও সহজ সাধ্য আইন-কানুন বিধি-নিষেধ অনভিজ্ঞ অযোগ্য পরিচালকের অনভিজ্ঞতার ত্রুটীপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার দরুন মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, আইনের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জন্মিয়া উঠে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। অথচ অভিজ্ঞ ও যোগ্য পরিচালক হইলে সে মানুষকে নিমের বড়িও চিনির ন্যায় খাওয়াইয়া তাহাদিগকে আইনের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয়।

ঈমান অধ্যায়ে ৩৫ নম্বর হাদীছে হযরত (দঃ) দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন ان الدين يسر। "দ্বীন-ইসলাম অতি সহজ"। আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতিনিধিবর্গকে সতর্ক করিয়াছেন—দ্বীন-ইসলাম প্রচারের ও শিক্ষাদানের সময় উহাকে মানুষের সম্মুখে এরূপভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে যেন উহার প্রকৃত রূপ "সহজ হওয়া" স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, মানুষ উহাকে সহজে বুঝিয়া নিতে সক্ষম হয়, মানুষ উহার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। খবরদার! তোমার ভাব-ভঙ্গিমা, তোমার বর্ণনার দরুন আল্লার সেই সহজ মনোমুগ্ধকর দ্বীন-ইসলাম যেন আল্লার বান্দাদের নিকট কঠিন অবোধগম্য বিস্বাদ তিক্ত ও ঘৃণারযোগ্য পরিগণিত না হয়। তেমনি ভাবে ঐ দ্বীন-ইসলামের সহজ সুলভ বিধি-নিষেধগুলি পরিচালনা ও প্রয়োগ করিতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাহাতে মানুষ উহাকে রহমত মনে করিয়া উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান লাভে সচেষ্ট হয়। খবরদার! তোমার পরিচালন দোষে এবং প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটিতে আল্লার সহজ দ্বীনকে যেন কেহ কঠিন মনে না করে এবং উহার প্রতি আল্লার বান্দাগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া না উঠে।

সারকথা এই যে—আলোচ্য হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা একমাত্র-এতটুকু যে, দ্বীন তথা শরীয়তের আদর্শ ও আদেশ-নিষেধাবলীর প্রচার ও

শিক্ষাদান এবং উহা জনগণের উপর পরিচালন ও প্রয়োগ করিতে যথাসম্ভব সহজ মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কাট-ছাট করার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

ভালরূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে--"শরীয়ত" একটি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের নির্দ্ধারিত নির্দ্দেশিত সমষ্টিগত বস্তু। উহাকে পূর্ণমাত্রায় সকলের গ্রহণীয় করাইবার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কারণেই শরীয়তের নির্দ্ধারিত কোন একটি সামান্যতম বিষয়ের উপর আঘাত হানিলে নিছক বোকামী বই আর কি হইবে ? যেমন—কোন একটি মিক্শ্চার ঔষধ রোগীকে সহজে খাওয়াইবার জন্য উহার নির্দ্ধারিত প্রেস্ক্রিপ্শনের মধ্যে কোন প্রকার ছাট-কাট বা রদবদল করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ই হইবে। কোন ডাক্তার বরং কোন বুদ্ধিমান লোকই ঐরূপ করিতে অনুমতি দিবে না। হাঁ; প্রেস্ক্রিপ্শন অবিকলরূপে ঠিক রাখিয়া যে কোন উপায়ে সহজভাবে উহাকে রোগীর গলাধঃকরণ করাই হইল বুদ্ধিমানের কাজ। এই পরামর্শই আলোচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান আল্লার বিশেষ নেয়ামত

৬৩। হাদীছঃ— عن معاوية رضى الله تعالى عنه يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وانما انا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله -

অর্থঃ—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা যাহাকে (দুনিয়া-আখেরাতের) উন্নতি, সাফল্য ও মঙ্গল দানের ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের এলম ও ধর্ম্মজ্ঞান দান করেন। নবী (দঃ) আরও বলেন, আমি বিতরণকারী বই নহি; জ্ঞান ও এল্মদাতা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, এই উম্মতের একদল লোক কেয়ামত পর্য্যন্ত দ্বীন ও হকের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিবে, কোন প্রকার বাধা বিপত্তিই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ—"আমি বিতরণকারী" বাক্যটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য এই যে, এল্ম ও ধর্ম্মজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করেন, কিন্তু যে কোন জ্ঞান ও এল্ম

প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লার তরফ হইতে কি-না, তাহা প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য তখনই হইবে, যখন উহা নবীর (দঃ) মাধ্যমে আসিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। তাই কেবলমাত্র নবীর (দঃ) নিকট হইতে উপযুক্ত ওস্তাদ মাধ্যমে বিশ্বস্ত সূত্র-পরম্পরা অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিকরূপে শিক্ষা গ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটী এল্‌ম অর্জিত হইতে পারে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার চিরাচরিত নিয়ম ও বিধানই এই যে, নবী এবং নায়েবী-নবী—ওস্তাদ ও খাঁটী পীরের মাধ্যমেই তিনি জ্ঞান, এল্‌ম ও ফয়েজ দান করিয়া থাকেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নবীকেই একমাত্র বিতরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং নবীর তরফ হইতেই উহা হাসিল করিতে হইবে, অন্য কোথাও উহা পাওয়া যাইবে না। যেমন—সরকারী কণ্ট্রোলের মাল সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডিলার ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে না।

দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম হাসিলে প্রতিযোগী হওয়া

قد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও এলম হাসিল করিতেন।"

৬৪। হাদীছ ঃ—عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم—

قال لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في

الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها -

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানব জগতে প্রতিযোগীতা করিয়া হাসিল করার উপযোগী গুণ মাত্র দুইটি—(একটি সাখাওয়াত বা দানশীলতা, দ্বিতীয়টি হেকমত বা সত্যিকারের ধর্ম্মজ্ঞান। অর্থাৎ) (১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে উহা জমা করিয়া রাখে না, বরং আল্লার রাস্তায় খরচ করার কাজে আজীবন লিপ্ত থাকে। (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের এল্‌ম তথা সত্যিকারের ধর্ম্মজ্ঞান দান করিয়াছেন, সে ঐ এল্‌মের দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান করে এবং লোকদিগকে অবৈতনিকভাবে উহা শিক্ষাদান করিতে থাকে এবং লোকদের মধ্যে উহা অযাচিতভাবে অনবরত বিতরণ করিতে থাকে এই ব্যক্তিদ্বয়ের গুণদ্বয় বিশেষ প্রতিযোগিতার সহিত অর্জনযোগ্য।

এলম লাভের জন্য খিজিরের নিকট হযরত মূসার সমুদ্রপথে গমন

এই পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এল্‌ম হাসিলের গুরুত্ব দেখাইয়াছেন যে, মূসা (আঃ) বড় মর্ত্তবার হইয়াও তাঁহার অপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তি খাজা খিজিরের নিকট সঙ্কটময় সমুদ্রপথে গমন করিয়াছিলেন এল্‌ম হাসিলের জন্য ; যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। ৯৭ নম্বরে অনুদিত সুদীর্ঘ হাদীছ খানা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে।

কোরআনের এল্‌ম দানের দোয়া কর

৬৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের স্থানে গমন করিলেন; আমি তাঁহার জন্য পানি উপস্থিত করিয়া রাখিলাম। হযরত (দঃ) উহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি কে রাখিয়াছে ? উত্তরে আমার নাম বলা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ا للّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○

"হে আল্লাহ! তাহাকে কোরআনের এল্‌ম দান কর, পরিপক্ক জ্ঞান দান কর এবং দ্বীন-ইসলামের সঠিক বুঝশক্তি দান কর।"

কোরআনের এল্‌ম এবং দ্বীনের এল্‌ম ও জ্ঞান যে কত বড় অমূল্য রত্ন এবং উহা যে কত বড় ফজিলতের বস্তু তাহা এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পায়। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় প্রিয়পাত্র স্নেহের ভ্রাতা (চাচার ছেলে) ইবনে আব্বাসের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার খেদমতের প্রতিদান স্বরূপ আল্লার দরবারে এল্‌ম-দ্বীনের জন্যই দরখাস্ত করিলেন। যদি ইহা অমুল্য ধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৌলত না হইত তবে এই ক্ষেত্রে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার নিকট এই জিনিষের প্রত্যাশী হইতেন না।

কি বয়সে জ্ঞাত ঘটনার হাদীছ গ্রহণযোগ্য ?

৬৬। হাদীছ ঃ—মাহমুদ ইবনে রবী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার স্মরণ আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কূপের পানি ভরা ডোল হইতে পানি

○ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দোয়া পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোফাচ্ছের (কোরআন ব্যাখ্যাকারী) ও দ্বীনের জ্ঞানভাণ্ডার বানাইয়াছিলেন। বোখারী শরীফের কয়েক স্থানে হাদীছটি উল্লেখ আছে। অনুবাদে ৫৩১ ও ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দোয়ার শব্দ একত্র করা হইল।

মুখে লইয়া (কৌতুক স্বরূপ) আমার চেহারার উপর কুল্লি করিয়াছিলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক। +

ব্যাখ্যা :—এখানে প্রমাণিত হইল যে, অপরিণত বয়সে এমনকি পাঁচ বৎসরের বালকও যদি তাহার স্মরণীয় বিষয় বর্ণনা করে যাহা তাহার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব, তবে উহা গ্রহণীয়।

এল্‌ম হাসিল করিতে বিদেশে যাওয়া

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ(রাঃ) দীর্ঘ এক মাসের পথ ছফর করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়া ছিলেন ; একটি হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যা :—ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার "আদাবুল-মোফ্‌রাদ" নামক কেতাবে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা এই—

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই সংবাদ জ্ঞাত হইলাম যে, (সিরিয়ায় অবস্থানরত) একজন ছাহাবী একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যাহা তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন (আমি উহা শুনি নাই)। তাই আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং সমুদয় প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করিয়া সিরিয়ায় পৌঁছিলাম ; ঐ ছাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওনাসই (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দারোওয়ানকে বলিলাম, সংবাদ দাও যে, জাবের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রশ্ন আসিল, আবদুল্লার পুত্র ! আমি বলিলাম, হাঁ। তৎক্ষণাৎ ঐ ছাহাবী ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম, একটি হাদীছ সম্পর্কে আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি উহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন ; আমার আশঙ্কা হইল—উহা শুনিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু আসিয়া যায় না কি ! অর্থাৎ উক্ত হাদীছখানা শুনিবার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং এক মাসের পথ ভ্রমণ করিয়া আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি।

যে হাদীছটি সম্পর্কে এই ঘটনা উহা বোখারী শরীফ ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهٗ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهٗ مَنْ قَرُبَ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الدَّيَّانُ

+ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সেই কুল্লির বরকতে অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও মাহমুদ ইবনে রবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চেহারার লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য কিশোরের ন্যায় ছিল।

অর্থ :—জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমাইস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হয়—তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সকল মানুষকে হাশর-মাঠে একত্রিত করিবেন। অতঃপর সকলকে সম্বোধন করিবেন। সেই সম্বোধনের ধ্বনি নিকটবর্ত্তী ও দুরবর্ত্তী সকলেই সমভাবে শুনিতে পাইবে ×। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—একমাত্র আমিই সর্ব্বাধিপতি, কর্ম্মফল দানের ক্ষমতাবান একমাত্র আমিই।

পাঠকবৃন্দ! হাদীছ লাভের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করার আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। "এলমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়" পরিচ্ছেদে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—এক ব্যক্তি একটি মাত্র হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল ভ্রমণ করিয়া দামেস্ক শহরে পৌঁছিয়া ছিলেন।

শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান করার ফজিলত

৬৭। হাদীছ :—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও এল্‌ম দান করিয়া পাঠাইয়াছেন উহার দৃষ্টান্ত—(চৈত্র-বৈশাখ মাসের) প্রবল মৌসুমী বৃষ্টি। যখন উহা ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, তখন নরম ও উর্ব্বর জমিগুলি শস্য-শ্যামল এবং সবুজ তরুলতা ও ঘাস পাতায় পরিপূর্ণ হয়, (যদ্দ্বারা ঐ জমি নিজেও সৌন্দর্য্য লাভে উপকৃত হয়, অপরকেও খাদ্য দান করিয়া উপকৃত করে।) আর যে জমিগুলি নীচু অথচ শক্ত, ঐ গুলিতে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকে, (ঐ জমির মধ্যে উর্ব্বরাশক্তি না থাকায় সবুজ ঘাস যা শস্য-শ্যামলতার সৌন্দর্য্য হইতে

× বোখারী শরীফ ৪৭০ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে—

يجمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد فيبصرهم الناظر
ويسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس

"কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের দিন আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বাপর সকলকে একত্রিত করিবেন এক বিশাল ময়দানে, এরূপ ময়দান যেখানে প্রত্যেক দর্শক উপস্থিত সকলকে দেখিতে পাইবে (কারণ উক্ত ময়দানে কোন প্রকার উচ-নীচ বা আড়াল থাকিবে না।) এবং প্রত্যেক আহ্বানকারী উপস্থিত সকলকে তাহার কথা শুনাইতে সক্ষম হইবে এবং সূর্য্য অতি নিকটবর্ত্তী হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক কালাম বা বাণী প্রদানকালে যাহাকে বা যাহাদিগকে বাণী দান করেন তাহাদের জন্য উহা শ্রবনে নিকটবর্ত্তী ও দুরবর্ত্তীর ব্যবধান হয় না।

নিজে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু অন্যে উহা হইতে উপকৃত হয়—) সকলে ঐ পানি পান করে পশুপালকে পান করায় এবং ঐ পানির দ্বারা অন্যান্য জমিতে চাষাবাদ করে। আর যে জমিগুলি ঊষর, পাথরের ন্যায় শক্ত ও সমতল ; ঐগুলি (সমতল হওয়ার দরুন পানি জমাইয়া রাখিতে অক্ষম ; সুতরাং কেহ উহা) হইতে কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারে না (এবং অনুর্ব্বর শক্ত পাথরের ন্যায় হওয়ার দরুন উহাতে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না, তাই) নিজেও সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত থাকে।

উল্লেখিত প্রথম দৃষ্টান্তটি ঐ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য যে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে—আল্লাহ তায়ালা যে এল্‌ম ও হেদায়েতের বাহকরূপে হযরত (দঃ)কে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিয়া নিজেও উপকৃত হইয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়া উপকৃত করিয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে সেই এল্‌ম ও হেদায়েতের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় নাই, উহা গ্রহণ করে নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত প্রথম প্রকারের জমি ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে নিজে হেদায়েত ও এল্‌মকে গ্রহণ করিয়া অপরকেও শিক্ষা দেয় ; তৃতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ বদনছীব, যে সেই রত্নকে গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। হাদীছের মধ্যে স্পষ্টতঃ এই দুই শ্রেণীরই উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ আলেম-বে-আমল যে নিজে আমল করে না, অপরকে শিক্ষা দেয়। ঘৃণা প্রদর্শনার্থে হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করেন নাই।

দ্বীনের এল্‌ম উঠিয়া অজ্ঞতার প্রাবল্যের আশঙ্কা

রবীয়া (রঃ) নামক একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী * বলিয়াছেন—যাহার নিকট এল্‌ম আছে তাহার নিজকে ধ্বংস করা উচিত নয়। অর্থাৎ আলেম হইয়া এল্‌ম বিতরণ না করা এবং দুনিয়া লাভে ব্যাপৃত থাকা এবং উহার লালায়িত হওয়া আলেম হিসাবে নিজকে ধ্বংস করারই শামিল।

৬৮। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا -

---

* "রবীয়া" মদীনাবাসী একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ইমাম মোজতাহেদ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রসার এত বেশী ছিল যে, তিনি সেকালে "মহাজ্ঞানী রবীয়া" নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৩৬ হিঃ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের আলামত—এল্‌ম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, মগ্ন পান আরম্ভ হইবে, যেনা বা ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি উহা আর লুক্কায়িত বস্তু থাকিবে না।

৬৯। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) একদা বলিলেন, আমি এমন একটি হাদীছ বয়ান করিব যাহা আমার পরে (হযরত (দঃ) হইতে সরাসরি শ্রবণকারী) অন্য কেহ বয়ান করিবে না। আমি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের কতিপয় আলামত এই—এল্‌ম দুর্লভ হইয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, প্রকাশ্যে ব্যাভিচার হইবে, নারীর সংখ্যা অধিক হইবে, পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এমনকি এক একটি পুরুষের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশটি নারী আশ্রিতা হইবে।

৭০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী) এল্‌ম উঠিয়া যাইবে অজ্ঞতা ও ফেৎনা-ফাসাদ তথা বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার আধিক্য হইবে, অতি মাত্রায় কাটাকাটি মারামারি হইবে।

কিভাবে এল্‌ম উঠিবে ?

খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে লিখিত নির্দ্দেশ পাঠাইলেন—রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহকে অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ কর ; আমার আশঙ্কা হইতেছে, এল্‌ম বিলীন হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার বুক হইতে আলেমগণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন। তবে ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি লক্ষ্য করা উচিৎ নয়। (আর এল্‌মের প্রসারে তৎপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।) অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষা দানের জন্য বসিতে হইবে। এল্‌ম যখন মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে, তখন এল্‌মের ধ্বংস অনিবার্য্য।

৭১। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা এল্‌মকে তাঁহার বান্দাদের নিকট হইতে জবরদস্তি ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইবেন না, কিন্তু আলেমদিগকে উঠাইয়া নিয়া এল্‌ম উঠাইবেন। যখন দুনিয়ার বুকে আলেম থাকিবে না তখন জনগণ জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে সরদার নিযুক্ত করিবে এবং সেই সমস্ত জাহেল সরদারদের নিকটই সবকিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে। এবং উহারা কিছুই না জানা সত্ত্বেও ফৎওয়া (—ধর্ম্মীয় বিধানাবলীর রায় ও ফয়ছালাহ) দিবে ; যদ্দ্বারা তাহারা নিজেও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইবে, অপরকেও গোমরাহ করিবে। (২০ পৃঃ)

অতিরিক্ত এল্‌ম হাসিল করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের উপর যে সব ফরজ-ওয়াজেব রহিয়াছে, ঐ সবের এল্‌ম এবং সে যে কাজ করিবে উহা সম্পর্কে হালাল হারামের এল্‌ম হাসিল করা ত ফরজে আঈন ; অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরই উহা ফরজ। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত এলমেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলে এইরূপ অন্ততঃ একজন আলেম থাকিতে হইবে যাহার নিকট তদঞ্চলীয় মোসলমানগণ নিত্যনৈমিত্তের প্রয়োজনীয় মছলা-মছায়েল জ্ঞাত হইতে পারে। ইহা ফরজে কেফায়া—প্রত্যেক অঞ্চলের সকলের উপর সমষ্টিগতভাবে ফরজ।

পশুর উপর থাকিয়া মছআলা বর্ণনা করা*

৭২। **হাদীছ ঃ**—আমর ইবনে আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় মিনার ময়দানে জমরা-আক্কাবার নিকটে (উটের উপর) সওয়ার ছিলেন। চতুষ্পার্শ হইতে সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নিকট মাছআলা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি লক্ষ্য করি নাই—কোরবাণীর পূর্ব্বেই চুল কামাইয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তজ্জন্য কোন গোনাহ হইবে না, এখন কোরবাণী কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি লক্ষ্য করি নাই—কঙ্কর মারিবার পূর্ব্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাতে গোনাহ হইবে না, এখন কঙ্কর মার। ঐ সময় যত লোকই কার্য্যাদি অগ্র-পশ্চাৎ করিবার মাছআলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রত্যেককেই হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন—গোনাহ হইবে না, এখন করিয়া লও।+

মাথা বা হাতের ইশারায় মছআলার উত্তর দেওয়া

৭৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—কঙ্কর মারার পূর্ব্বে কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে কোনও গোনাহ হইবে না। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—কোরবাণীর পূর্ব্বেই চুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিলেন—তজ্জন্য কোনও গোনাহ হইবে না।

---

* কোন কোন হাদীছে আছে—"কোন পশুকে বক্তৃতা মঞ্চ বানাইও না।" তাই বোখারী (রঃ) এখানে দেখাইতেছেন যে, উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, কোন পশুকে অধিক কষ্টে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া বক্তৃতা দিবে না, সেই অশঙ্কা না হইলে ঐরূপ করা যায়।

+ হজ্জের আহকাম সমূহে ভুল বশতঃ উলট-পালট করিয়া ফেলিলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু দম (জানোয়ার জবেহ করিয়া কাফ্‌ফারা) আদায় করিতে হইবে।

নবী (দঃ) একটি প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও কতিপয় বিষয়ের এল্‌ম শিক্ষা দিয়া তাহাদের দেশবাসীকে উহা শিক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য—প্রত্যেক মোসলমান দ্বীনের এল্‌ম যতটুকু শিখিতে পারে উহা অপরকে শিখাইতে সচেষ্ট হওয়ার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা। এখানে ৪৮নং হাদীছের উল্লেখ হইয়াছে।

একটি মছআলার প্রয়োজনেও ছফর করা

৭৪। হাদীছ :—ওক্‌বা (রাঃ) নামক ছাহাবী একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন। কিছু দিন পর অন্য একটি মহিলা আসিয়া বলিল, আমি ওক্‌বা ও তাহার স্ত্রী উভয়কে দুধ পান করাইয়া ছিলাম। (অর্থাৎ তাহারা দুধ ভাই বোন, তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে না।) ওক্‌বা বলিলেন, আমি এই ঘটনা জানি না এতদিন তুমি আমাকে এই খবর দেও নাই। (শ্বশুরালয়েও খবর পাঠাইলেন; তাহারাও বলিল, আমাদের মেয়েকে সে দুধ পান করাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।) তখন ওক্‌বা (রাঃ) (মক্কা হইতে প্রায় ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া) মদীনায় পৌঁছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উক্ত ঘটনা আরজ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর তুমি কিভাবে তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? এই কথার উপর ওক্‌বা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন; পরে অন্য স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

পরস্পর পালাক্রমের ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করা

৭৫। হাদীছ :—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার এক প্রতিবেশী আনছারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে হাজির থাকার জন্য পালাক্রমের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। একদিন আমি হযরতের (দঃ) দরবারে হাজির থাকিতাম (সে আমার ও তাহার সাংসারিক কাজকর্ম্ম দেখিত;) আর একদিন সে রসুলুল্লার (দঃ) দরবারে উপস্থিত থাকিত আমি তাহার ও আমার সংসার দেখিতাম। যে দিন আমি উপস্থিত থাকিতাম সে দিন অহী ইত্যাদির সমুদয় খবর তাহাকে বাড়ী আসিয়া শুনাইতাম ও শিক্ষাদান করিতাম এবং যে দিন সে উপস্থিত থাকিত সে দিন সে আমাকে শিক্ষা দিত।

এক দিন ঐ ব্যক্তি তাহার পালার দিনে এশার (নামাযের) সময় এক ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়া দৌড়িয়া আমার বাড়ী উপস্থিত হইল এবং দরওয়াজায় প্রবল করাঘাত

পূর্ব্বক আমাকে ডাকিতে লাগিল। আমি হতভম্ব হইয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া আসিলাম; সে বলিল, এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। (ওমর (রাঃ) বলেন—) সে সময় আমাদের নিকট এরূপ সংবাদ আসিতেছিল যে, গাস্‌সান গোত্রীয় কাফের রাষ্ট্র মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনার উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি করিতেছে; আমরা সর্ব্বদা ঐ বিষয়ে শঙ্কিত ও জল্পনা কল্পনারত থাকিতাম। তাই আমি ঐ প্রতিবেশীর আতঙ্কাবস্থা দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, গাস্‌সানী শত্রু চড়াও করিয়াছে কি? সে বলিল, না—তারচেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া দিয়াছেন। তখন আমি (আমার মেয়ে হযরতের এক স্ত্রী হাফছার নাম লইয়া) বলিলাম—হাফছার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, সে সর্ব্বহারা ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, এরূপ কিছু একটা ঘটা আসন্ন*। অতঃপর আমি প্রস্তুত হইলাম এবং রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ফজরের নামায পড়িলাম। নামাযান্তে তিনি একটি (কাঁচা) দ্বিতল কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি হাফ্‌ছার নিকট যাইয়া দেখি, সে কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম, এখন কাঁদ কেন? আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সতর্ক করিয়াছিলাম↑। রসুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন কি? সে বলিল, তালাক দেওয়ার বিষয় কিছু জ্ঞাত নহি, কিন্তু হযরত (দঃ) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া ঐ দ্বিতল কোঠায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পুনরায় মসজিদে আসিলাম; দেখিলাম, মিম্বরের চতুষ্পার্শ্বে কিছু লোক বসিয়া কাঁদিতেছে; আমিও সেখানেই তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তালাক দানের বিষয় স্থিরকৃতরূপে অবগতির স্পৃহা আমার ভিতর প্রবল হইয়া উঠিল; তাই আমি হযরতের (দঃ) অবস্থানস্থল ঐ দ্বিতল কক্ষের নিকটবর্ত্তী আসিলাম। সিড়ির নিকট একটি হাবশী গোলাম বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলাম—হযরতের (দঃ) খেদমতে আমার প্রবেশের অনুমতি-প্রার্থনা জানাও। সে ভিতরে যাইয়া কথা বলিল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি রসুলুল্লার (দঃ) খেদমতে আপনার আগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় মসজিদের মিম্বরের নিকটে লোকদের সঙ্গে আসিয়া বসিলাম। কিন্তু পুনরায় ঐ স্পৃহা আমার ভিতর অধিক প্রবল হইয়া উঠিল, আমি আবার ঐ কক্ষের নিকটবর্ত্তী আসিয়া দারওয়ানকে

---

* এই আশঙ্কার হেতু ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে।

↑ যে বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন এবং যাহা কিছু বলিয়াছিলেন—বিস্তারিত বিবরণ ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরবর্ত্তী বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

ঐরূপ বলিলাম। এবারেও সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। আমি মসজিদে আসিয়া বসিলাম এবং তৃতীয়বার পুনরায় ঐরূপই করিলাম, দারওয়ান এইবারও ঐ কথাই শুনাইল। এইবার যখন আমি কক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে ছিলাম, কিছু দুর আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দারওয়ান আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিয়াছেন।

আমি ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখি—হযরত (দঃ) একটি খালি চাটাই এর উপর খেজুর গাছের ছোব্‌রা ভরা একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়া শায়িত অবস্থায় আছেন। চাটাই এর উপর কোন বিছানা বা চাদর না থাকায় তাঁহার শরীরে উহার বুনটের রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বসিবার পূর্ব্বেই সালাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর আপনি স্বীয় বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন কি ? হযরত (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিলেন, না—তালাক দেই নাই। এতদশ্রবণে আমি উল্লাসিত হইয়া আল্লাহু-আকবার বলিয়া হর্ষধ্বনি দিলাম। তারপর আমি তাঁহার মন আকর্ষণের জন্য দাঁড়ান অবস্থায়ই একটি ঘটনার বিবরণ দান করিতে আরম্ভ করিলাম যে—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দেখুন! আমরা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয়গণ এইরূপ অভ্যস্ত যে, পুরুষগণ সর্ব্বদাই নারীদিগকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়া থাকি, নারীদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিউত্তর কখনও বরদাশ্‌ত করা হয় না। কিন্তু মদীনার অবস্থা ইহার সম্পুর্ণ বিপরীত এবং আমরা যখন হইতে মদীনায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন হইতেই ধীরে ধীরে আমাদের নারীগণ মদীনাবাসী নারীদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে শুরু করিয়াছে। ইহা শ্রবণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর বলিলাম, এমন কি একদিন আমার স্ত্রীকে আমি কোন একটি বিষয়ে ধমক দিলে সে আমাকে প্রতিউত্তর করিয়া উঠিল, তাহাতে আমি ভীষণ চটিয়া গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল, আমার একটি মাত্র প্রতিউত্তরেই আপনি এরূপ চটিয়া উঠিলেন। অথচ রসুলুল্লার (দঃ) স্ত্রীগণও ত তাঁহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়া থাকেন, এমনকি কখনও কখনও তাঁহাদের কেহ কেহ (গৃহের মধ্যে) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে পৃথক ও দুরে দুরে থাকিয়া দিন কাটাইয়া দেন। আমি আমার স্ত্রীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, যে আল্লার রসুলের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে তাহার কপালপোড়া সর্ব্বহারা হওয়া অনিবার্য্য। এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইয়া হাফছার

নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাক ? সে উহা স্বীকার করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি কপালপোড়া সর্ব্বহারা হইয়াছ ; তোমার কি ভয় হয় না যে, আল্লার রসুলের (দঃ) অসন্তুষ্টির দরুন তুমি আল্লার অসন্তুষ্টি ও অভিশাপে পতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে ? আমি তোমাকে রসুলুল্লার (দঃ) অসন্তুষ্টি তথা আল্লার অসন্তুষ্টি ও গজব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। খবরদার! কখনও তুমি রসুলুল্লার (দঃ) নিকট খোর-পোষ ইত্যাদি বৃদ্ধির দাবী করিবে না, তাঁহার কোন কথার প্রতিউত্তর করিবে না, সর্ব্বদা তাঁহার চরণতলে থাকিয়া জীবন কাটাইবে। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তুমি আমার নিকট দাবী জানাইবে। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ সন্তুষ্টি-ভাজন ও প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুন ঐরূপ কোন কিছু করেও তথাপি তাহার দেখাদেখি তুমি কিন্তু খবরদার—কখনও ঐরূপ কিছু করিবে না। (এই বাক্যটি দ্বারা বিবি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছিল ;) এখানেও হযরত (দঃ) মৃদুহাসি হাসিলেন।

(ওমর (রাঃ) বলিতেছেন,) তারপর আমি বিবি উম্মে-সাল্‌মার (রসুলুল্লার (দঃ) এক স্ত্রী, ওমর (রাঃ)-এর দূরসম্পর্কীয়া খালা) নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ নছীহত শুনাইতে লাগিলাম। তিনি আমার এই ধরণের কার্য্যকে অনধিকার চর্চ্চা আখ্যায়িত করিয়া বলিলেন—আপনি সর্ব্বস্থানেই স্বীয় অধিকার দেখাইতে চান! এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার স্ত্রীবর্গের ব্যাপার সমূহের মধ্যেও অধিকার খাটাইতেছেন!* তাঁহার এই উত্তরে আমি আমার অভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমার ধারণা, ইচ্ছা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিবি উম্মে-সাল্‌মার এই ঘটনা শ্রবণে হযরত (দঃ) পুনরায় মৃদুহাসি হাসিলেন! ↑

ওমর (রাঃ) বলেন—পুনঃ পুনঃ হযরতের (দঃ) হাসিমুখ দেখিয়া আমার মনে সাহসের সঞ্চার হইল, তখন আমি বসিয়া পড়িলাম। (তাঁহাকে আমি যে অবস্থায়

---

* আল্লার রসুল (দঃ)কে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট করার বিষময় কুফল ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন তারচেয়ে অধিক বলিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু বিবি উম্মে-সালমা (রাঃ) যে সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন তাহাও একটি বাস্তব সত্য। স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের সুমধুর সম্পর্ক ও দাম্পত্য সুত্রের প্রবণতা দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধকে অপরাধ গণ্য করা হয় না বা বড় অপরাধকেও অতিশয় মামুলী বিষয়রূপে দেখা হয় এবং উহার দ্বারা সংঘটিত অসন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরণের অসন্তুষ্টি হইয়া থাকে ; যাহা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে মছআলাহও ভিন্ন ধরণেরই।

↑ হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত (দঃ) মৃদুহাসি অপেক্ষা বড় বা অধিক হাসিতেন না।

শায়িত দেখিয়া ছিলাম তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে,) এখন আমি তাঁহার কক্ষের চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সেখানে তিনটি মাত্র কাঁচা চামড়া এবং চামড়া পাকা করার জন্য বাবলা গাছের পাতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় দরিদ্রবেশে থাকিতে দেখিয়া আমি আমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না—কাঁদিয়া ফেলিলাম; দর দর করিয়া আমার চোখের পানি বহিতে লাগিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ওমর! কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! পারস্য সম্রাট "কেস্‌রা" ও রোম সম্রাট "কায়ছর" তাহারা আল্লার উপাসক নয়, আল্লার একত্ববাদীও নয়; তথাপি তাহারা কত রকম আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে রহিয়াছে! আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার সব কিছু দান করিয়াছেন। আর আপনি আল্লার রসুল, অথচ—দরিদ্রবেশী নিঃসম্বল! (ওমর (রাঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে—নিঃসম্বলতা ও দরিদ্রবেশ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইচ্ছাকৃত ছিল+; তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই বেশী কিছু বলিতে সাহসী না হইয়া ওমর (রাঃ) এই বলিলেন,) আপনি দোয়া করুন—আল্লাহ আপনার উম্মৎকে অধিক স্বচ্ছলতা দান করুন।

এযাবৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় শায়িত ছিলেন; ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটি শুনিয়া উহার উত্তরে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ওমরের এই উক্তির প্রতি অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক তেজোদ্দৃপ্ত ভাষায় বলিলেন—

أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ - أُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

হে খাত্তাবের পুত্র (ওমর)! তুমি এখনও (কি এহেন হীন ধারণার বশবর্ত্তী রহিয়াছ যে—মোসলমানগণ আল্লার প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাহারা দুনিয়ার ভোগ-

---

+ তিরমিজি শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইলেন যে—আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার জন্য তিনি মক্কা নগরীর কঙ্করময় ভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিতে চান। আমি আরজ করিলাম—হে আমার পালনকর্ত্তা! আমি উহার আকাঙ্খা রাখি না, আমি ভালবাসি এই যে—একদিন আহার করিব, আর একদিন অনাহারে কাটাইব; অনাহারে থাকিয়া আপনাকে স্মরণ করিব, আপনার প্রত্যাশীরূপে আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিব এবং আহার করিয়া আপনার শোকর আদায় করিব।

বিলাসের অধিকারী হওয়া চাই? এবং তুমি) এই বিষয়টির প্রতি সন্দেহাতীত-রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই কি? যে—রোমীয়, পারসিক ইত্যাদি জাতিগণ যাহারা দুনিয়ার জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে যাহা কিছু সুখ শান্তি দিবার, তাহা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই দান করতঃ সুখ ভোগের অংশ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। (কারণ চিরস্থায়ী জীবনের বেলায় তাহাদের পক্ষে সুখ-শান্তির বিষয়ে কোন বিবেচনাই করা হইবে না।) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ

"তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও? যে, অমোসলমানদের জন্য সুখ-শান্তি (পাওয়া ভাগ্যে থাকিলে) উহার স্থান হইল একমাত্র ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়; চিরস্থায়ী আখেরাতে সুখ-শান্তির লেশমাত্র তাহারা পাইবে না। পক্ষান্তরে মোসলমানদের জন্য সুখ-শান্তির আসল স্থান হইল আখেরাত; (আর দুনিয়ার অবস্থা তাহাদের বেলায় সাময়িক ব্যবস্থাধীন থাকে।)"

(ওমর (রাঃ) বলেন—হযরতের (দঃ) এই উত্তর শুনিয়া) আমি স্বীয় দুর্বল মনোবৃত্তিসূচক ও হীন ধারণাব্যঞ্জক উক্তির জন্য আল্লার নিকট আমার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ জানাইলাম।

● আলোচ্য হাদীছের মুল ঘটনার আসল তত্ত্ব এই ছিল যে—রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীবর্গের প্রতি কতিপয় পারিবারিক বিষয়ের দরুন রাগান্বিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পরিবারবর্গকে শায়েস্তা করার মানসে দীর্ঘ একমাস কাল তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকা অবলম্বন করিয়া ঐ দ্বিতল গৃহে একাকী অবস্থানরত হইয়াছিলেন; ইহা হইতেই "তালাক দান" খবরের সুত্রপাত হয়। এই ঘটনার পরবর্ত্তী অবস্থার বিবরণ তালাকের অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত আছে। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেখানে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটির উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত একটি অমূল্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধ্রুবসত্য বাস্তব তথ্যটি পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এবং আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত আছে। অধুনা এই বিষয়টির প্রতি মোসলমানদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসায় অনেক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সংশয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই এই বাস্তব তথ্যটিকে ভালরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে এই তত্ত্ব সম্বলিত আয়াত এবং আরও কতিপয় হাদীছ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

কোরআন শরীফের ২৫ পারায় একটি ছুরা আছে—"ছুরা যুখ্‌রুফ্‌"। যুখ্‌রুফ শব্দের অর্থ—জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাস। সেই ছুরার দ্বিতীয় রুকুর শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون - ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون - وزخرفا ط وان كل ذلك لما متاع الحيوة الدنيا ط والاخرة عند ربك للمتقين -

অর্থাৎ—যদি এরূপ আশঙ্কা না হইত যে, (লালসার কবলে পতিত হইয়া) জনসাধারণ একই ধরণের (কাফের দলভুক্ত) হইয়া যাইবে, তবে আমি (নানা-প্রকার নিগূঢ় তত্ত্বময় রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে) কাফেরদিগকে ইহজগতের ধন-দৌলত আরও বেশী দান করিতাম যে, তাহাদের গগণচুম্বী অট্টালিকা সমুহের ছাদ, সিঁড়ি ও দরজা-কপাট এবং খাট-পালঙ্গ সব কিছু রৌপ্য এবং স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। তাছাড়া আরও কত কত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী তাহাদিগকে দান করিতাম। কিন্তু (হে মানব! স্মরণ রাখিও,) এই সবই শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবনের সামগ্রী মাত্র। পক্ষান্তরে আখেরাতের চিরস্থায়ী অফুরন্ত সুখ-শান্তি (মোসলমান তথা) মোত্তাকীনদের জন্য পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে স্বীয় গৃহ গণ্য করিবে ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য চিরস্থায়ী আখেরাতে শান্তির স্থান নাই। দুনিয়ার ধন-সম্পত্তিকে ধন-সম্পত্তি গণ্য করিবে ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য আখেরাতে কোন ধন-সম্পত্তি নাই। দুনিয়াতে ধন সম্পত্তি জমা করায় ব্যাপৃত হইবে ঐ ব্যক্তি যাহার বুদ্ধি নাই। (মেশকাত শরীফ)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে ভোগ বিলাসের মধ্যে দেখিয়া উহার প্রতি তুমি লালায়িত হইও না; তুমি জান না সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভীষণ কষ্টে পতিত হইবে! মৃত্যুতুল্য কষ্ট যাতনা ভোগ করিয়া যাইবে কিন্তু মৃত্যু ঘটিবে না। (মেশকাত শরীফ)

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য রাখিবেন, এ ধরণের আয়াত ও হাদীছ সমুহের তাৎপর্য্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য—মোসলমানদের অন্তর হইতে দুনিয়ার লালসা এবং ব্যক্তিগত

ভোগ-বিলাস ও উহার আকাঙ্খা স্পৃহার বিলুপ্তি সাধন পূর্ব্বক প্রতিটি মোসলমানের অন্তরে এই ভাব সৃষ্টি করা যে, সে যেন আখেরাতের কামিয়াবি তথা আল্লার সন্তুষ্টিকে তাহার প্রকৃত উন্নতি ও একমাত্র লক্ষ্য-বস্তু গণ্য করে। এই উদ্দেশ্যটি মানব কল্যাণের জন্য অমৃত তুল্য, পক্ষান্তরে দুনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা মানুষের জন্য বিষতুল্য—ইহা একটি বাস্তব সত্য। তদুপরি হাদীছ শরীফেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে—حب الدنيا راس كل خطيئة "দুনিয়ার লালসা তথা ভোগ-বিলাসের আকাঙ্খা-স্পৃহা সমস্ত অপরাধের মূল।" যত রকম অসৎকর্ম্ম পাপাচার দুষ্কার্য্য ও দুর্নীতি আছে ঐ সবের মূলেই দুনিয়ার লালসা তথা টাকা-পয়সা, নাম-ধাম, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করিয়া প্রিয় উম্মতকে দুনিয়ার লালসা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তদুপরি আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহ অন্য আরও এক দিক দিয়া বিশেষ সুফল দায়ক। যে ব্যক্তি এসব বর্ণনা ও তথ্যের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হইবে সে দারিদ্র বা যে কোন কষ্ট-ক্লেশে, আপদ-বিপদে বিচলিত হইয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে না বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টের আক্রমণে সে আখেরাতের পথচ্যুত হইবে না। বরং নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় বিশাল তরঙ্গমালার সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল তীরপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ইহাই হইল এই ধরণের আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য। কর্ম্মজীবনে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বা আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও প্রগতির ময়দানে অগ্রসর না হওয়া এসব আয়াত ও হাদীছের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধুনা মোসলমান সমাজের একদল লোক যাহারা কোরআন-হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধা কম রাখে। যাহারা কোরআন হাদীছ বুঝে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করে না। তাহারা না বুঝিয়া বা ইসলামের শত্রু কুচক্রিদের প্ররোচনায় লোকচক্ষে কোরআন-হাদীছকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ ধরণের আয়াত ও হাদীছের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে যে—এ সব আয়াত ও হাদীছ মোসলমানদের উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা দান করিয়া থাকে। তাহারা যদি মোসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস হইতে অজ্ঞ না হইত তবে কখনও এরূপ কুউক্তি করিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা ইহার বিপরীত, কারণ এসব আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রথম শ্রোতা ছাহাবায়ে-কেরামগণ অনাহারে থাকিয়া, পেটে পাথর বাঁধিয়া বা বাবলা গাছের পাতা খাইয়া, নগ্নপদে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ ক্ষতবিক্ষত হইয়া, শত শত

দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়াও দুনিয়া-আখেরাতের যে বিরাট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন আমরা উহার স্বপ্নও দেখিতে পারিব না। এসব কাল্পনিক কাহিনী বা ভাবাবেগের প্রবণতা নহে, বরং বাস্তব সত্য ঘটনা। খন্দকের জেহাদ, যাতুর রেক্কার জেহাদ, জায়শুল খাবাতের জেহাদ, তবুকের জেহাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ খুঁজিয়া দেখুন। ছাহাবা-কেরামদের মধ্যে এই প্রেরণা এবং এত কর্ম্মক্ষমতা কিরূপে যোগাইয়াছিল ? একমাত্র এই সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারাই ছাহাবীগণ দুনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা হইতে আত্মশুদ্ধি হাসিল করায় তাঁহাদের অন্তরে যে অপরাজেয় মনোবল এবং অদম্য জযবা ও অনুপ্রেরণা হাসিল হয় তদ্দারাই তাঁহারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও কামিয়াবি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ফলকথা এই যে, এখানে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি হইল, দুনিয়ার লালসা ও ভোগ বিলাসের আকাঙ্খা-স্পৃহা। আর দ্বিতীয়টি হইল কর্ম্মজীবনে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টার ময়দানে অগ্রসর হওয়া। আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল প্রথমটির বিলুপ্তি সাধন করা দ্বিতীয়টির নহে। বরং যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে প্রথমটি হইতে পবিত্র ও শুদ্ধ করতঃ রসুলুল্লার (দঃ) বর্ণিত তথ্যকে পূর্ণ অনুধাবন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, দুনিয়ার ধন দৌলত, টাকা-পয়সা তাঁহাদের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে নাই। কারণ তাঁহারা যেহেতু আখেরাত তথা আল্লার সন্তুষ্টিকে স্বীয় লক্ষ্যস্থল রূপে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাই যেমন কোনও আপদ-বিপদ তাঁহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না তেমনিভাবে ধন-দৌলত সুখ-সম্ভোগও তাঁহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না। বরং তাঁহারা সমস্ত ধন-দৌলত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদকেও ঐ রাস্তায়ই নিয়োগ করিবেন। কোন এক কবি বলিয়াছেন—

نه مردست آن که دنیا دوست دارد۔
اگر دارد برائے دوست دارد۔

"ঐ ব্যক্তি মানুষ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নয়, যে দুনিয়া তথা ধন-দৌলতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ ঐ ব্যক্তি যে ধন-দৌলত পাইয়া সর্ব্বোপরি বন্ধু যে আল্লাহ সেই আল্লার রাস্তায় উহাকে নিয়োগ করিয়াছে।" মাওলানা রুমী বলিয়াছেন—

آب در کشتی هلاك کشتی است۔
آب اندر زیر کشتی پشتی است۔

"নৌকার ভিতরে পানি প্রবেশ করিলে সেই পানি নৌকার ধ্বংস টানিয়া আনিবে। কিন্তু নৌকার তলার নীচে থাকিলে উহা নৌকার জন্য সাহায্যকারী হইবে"

ধন-দৌলতের সহিত মানবের সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপই। হৃদয়ের বাহিরে (হাত পায়ের দ্বারা অর্জিত ও সঞ্চিত হইয়া সৎকাজে ব্যয়িত হইতে) থাকিলে উহার দ্বারা ইহজীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের উন্নতি সাধন কার্য্যে সাহায্য পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে হৃদয়ের ভিতরে অর্থের মায়া প্রবেশ করিয়া কারুনের ধনের মত কেবল পুঁজি হইয়া থাকিলে তদ্দ্বারা মানব জীবনের ধ্বংস সাধনই হইবে।

শিক্ষা বা নছীহত দান কালে রাগ করা

৭৬। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অভিযোগ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি জমাতে সামিল হইতে পারি না, কারণ সে নামায অত্যধিক লম্বা করিয়া পড়ে। এই কথা শুনিয়া নবী (দঃ) এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহাকে তদ্রূপ রাগান্বিত হইতে আর কখনও দেখি নাই। তিনি রাগতঃস্বরে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের অনেকে এরূপ কাজ করিয়া থাকে, যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে দ্বীনের কাজ হইতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এরূপ কার্য্য হইতে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নামায যেন অত্যধিক লম্বা হইয়া না পড়ে।* কারণ জমাতের মধ্যে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও কর্ম্মব্যস্ত ব্যক্তিগণও থাকিতে পারে।

৭৭ হাদীছঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পথে পাওয়া বস্তুর বিষয় মছআলা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, (প্রকৃত মালিকের পরিচয় লাভের জন্য) থলিয়া ও উহার বন্ধনের দড়ি ইত্যাদি (নিদর্শন সমূহ) ভালরূপে দেখিয়া লও, তৎপর এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার জন্য ঢোল-শোহরত দ্বারা খবর করিতে

---

* দ্বীনের কাজের প্রতি অলসতা ও অবহেলার বর্ত্তমান যুগে অনেকে এইরূপ হাদীছের দ্বারা ভুল ধারণা জন্মাইয়া লয় যে, "ইন্না আ'তাইয়া", "কুলহু-আল্লাহু" ইত্যাদি ছোট ছোট ছুরা দিয়াই নামায পড়াইতে হইবে। কিন্তু এরূপ হাদীছের পূর্ণ ঘটনা উপলব্ধি করিলেই ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়। এশার নামাযের মধ্যে আড়াই ছিপারা ব্যাপী ছুরা বাকারার মত লম্বা কেরাতের বিরুদ্ধে এই সতর্ক বাণী ছিল এবং এই সতর্ক বাণীর সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) নিজেই এশার নামাজের জন্য ১১, ১৫, ১৯, ২১ আয়াত বিশিষ্ট ছুরা সমূহের নাম বলিয়া উহা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য কেরাতের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সুন্নতরূপে নির্দ্ধারিত আছে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে নামায আদায় করা ইমামের কর্ত্তব্য।

থাক। অগত্যা মালিকের সন্ধান না পাইলে (নিজে গরীব হইলে বা অন্য কোন গরীবের প্রতি) উহা খরচ করিতে পার। কিন্তু খরচ করার পর যদি মালিক আসে তবে তাহাকে উহা আদায় করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি হারানো উট পাওয়া যায়? এই প্রশ্ন শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, উটের (মত এক বড় জানোয়ারের) বিষয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? উহা কখনও তোমার প্রত্যাশী নয়; উহার ভিতরে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, হাঁটিয়া চলিবার ক্ষমতা উহার আছে, এবং সে নির্বিঘ্নে মাঠে-ঘাটে চড়িয়া বেড়াইতে পারে। তুমি উহাকে আটকাইয়া রাখিও না, অমনিতেই উহার মালিক উহার সন্ধান পাইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হারান বকরীর বিষয়ে কি বলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, (উহার হেফাযত করা চাই;) কারণ, হয় তুমি বা অন্য কেহ উহার হেফাযতকারী হইবে, নচেৎ উহা বাঘের খোরাক হইবে।

মুরব্বী ও ওস্তাদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা

৭৮। **হাদীছঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অনাবশ্যক অতিরিক্ত প্রশ্নাবলীতে বিরক্ত হইয়া রাগান্বিতভাবে বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন, তোমার পিতা হোজাফাহ।× অপর এক ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার পিতা ছালেম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্রোধান্বিত হইয়া বারবার বলিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা কর। (আর সরল-মনা লোকগণ রসুলুল্লার (দঃ) ক্রোধাবস্থা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিল।) এমতাবস্থায় ওমর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারার উপর রাগের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমরা (আল্লাহ ও রসুলের অসন্তুষ্টির কাজ হইতে) তওবা করিতেছি; আমরা আল্লার প্রতি রব্ব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ

× এই প্রশ্নকারীদের অবস্থা ছিল এই যে, তাহাদের চেহারার সাদৃশ্য পিতার ন্যায় না হওয়ায় ব্যঙ্গ করিয়া উপহাস স্বরূপ তাহাদিগকে অন্যের ঔরষজাত বলিয়া ইঙ্গিত করা হইত। সেই জন্যই তাহারা এইরূপ প্রশ্ন করিল যেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফরমান অনুযায়ী সকলে ঐরূপ কথা হইতে বিরত থাকে।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পয়গাম্বর হিসাবে পূর্ণ তুষ্টি লাভ করিতেছি। (তাঁহাদের আদেশ-নিষেধ সরল সঠিকভাবে পালন করিয়া যাইব, অনাবশ্যক প্রশ্নাদি করিব না।) এইরূপ বলিতে থাকায় রসূলুল্লাহ (দঃ) শান্ত ও ক্ষান্ত হইলেন।

প্রয়োজন বোধে কোন কথা পুনঃ পুনঃ বলা

৭৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন কিছু বয়ান করিতেন, তখন (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতাগণ যাহাতে উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া লইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া) পুনঃ পুনঃ তিনবার বর্ণনা করিতেন। আর কোন লোকদের নিকট আসিলে (ক্ষেত্র বিশেষে) তিনবার সালাম করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ— তিনবার সালাম করা প্রসঙ্গটি বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য ; নিম্নে বর্ণিত স্থানসমূহ উহার উপযোগী গণ্য হইতে পারে। যথা—(১) কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করার পূর্ব্বে দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া সালামের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করা শরীয়তের বিধান। সেস্থলে প্রথমবারে উত্তর না পাইলে দ্বিতীয়বার সালাম করিবে, তখনও উত্তর না পাইলে তৃতীয়বারও সালাম করা চাই। প্রথমবারেই ফিরিয়া আসা কিম্বা তৃতীয়বারের পরেও অনর্থক অপেক্ষা করা উচিত নয়। (২) আভ্যন্তরিস্থিত ব্যক্তির নিকট যাওয়াকালীন প্রথমে অনুমতি প্রার্থনার সালাম, সাক্ষাতে দ্বিতীয় সালাম এবং কার্য্য সমাপ্তে বিদায়কালে তৃতীয় সালাম করিবে। (৩) কোন বড় মজলিসে বা জনসভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে থাকাকালে সভার প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ এবং শেষভাগের প্রতি সালাম করিতে পারে। (৪) অনেক বড় সভায় দাঁড়াইয়া আবশ্যক বোধে ডাইনে বামে সম্মুখে সালাম করা যায়। (চতুর্থটি শরহে তারাজেম—শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর কেতাবে এই হাদীছেরই ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে।)

পরিবারবর্গকে এবং ভৃত্যকেও দ্বীন শিক্ষা দিবে

৮০। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। (১) যে ব্যক্তি ইহুদী বা নাছরানী ছিল, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিয়া সে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান আনিয়াছে। (২) ঐ ক্রীতদাস গোলাম যে আল্লার হকও আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হকও আদায় করে। (৩) যাহার নিকট কোন ক্রীতদাসী ছিল (যাহাকে সে এমনিতেই ব্যবহার করিতে পারিত, কিন্তু) সে তাহাকে ভালরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছে,

উত্তমরূপে দ্বীনের এল্‌ম শিক্ষা দিয়াছে, তারপর তাহাকে আজাদ করিয়া বিবাহ করতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দান করিয়াছে ঐ ব্যক্তিও দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'মের শা'বী (রঃ) তাঁহার ছাত্রদিগকে বলিতেন, তোমরা বিনা ক্লেশে এত বড় হাদীছ পাইলে; পূর্ব্বের যমানায় এর চাইতে ছোট একটি হাদীছের জন্যও মানুষ বহু দুর দেশ হইতে পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় আসিত।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম ব্যক্তি ঈমান ও দ্বীন ইসলাম গ্রহণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লার প্রতিটি হক্ক তথা প্রতিটি ফরজ-ওয়াজেব ও শরীয়তের হুকুম পালনে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে। তৃতীয় ব্যক্তি ক্রীতদাসী আজাদ করার দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে।

নারীদেরে দ্বীন শিক্ষা দানে বিশেষ তৎপরতা

৮১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ঈদের জামাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। অবশ্য হযরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ আমার না থাকিলে আমার ভাগ্যে তাহা জুটিত না, কারণ আমি ছোট ছিলাম। এক ঈদের দিন আমি হযরতের সঙ্গেই বাহির হইলাম। যে স্থানে নিশান বা পতাকা উড্ডীন ছিল—নবী (দঃ) ঐ স্থানে আসিলেন এবং নামায আদায় করিলেন, তারপর খোৎবা (তথা ইসলামী ভাষণ) প্রদান করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, পেছনে উপবিষ্টা মহিলাগণ হয়ত তাঁহার ভাষণ শুনিতে পায় নাই; এই ভাবিয়া তিনি বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে নছীহত করিলেন ও আল্লার রাস্তায় খরচ করার আহ্বান জানাইলেন। নবী (দঃ) মহিলাদিগকে দানের প্রতি পুনঃ উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমাদের কল্যাণে উৎসর্গ। মহিলারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদের অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিতে লাগিল, আর বেলাল (রাঃ) ঐগুলিকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

নারীদের শিক্ষার জন্য ভিন্ন সময় নির্দ্ধারিত করা

৮২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা মহিলাগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, পুরুষদের জন্য আমরা আপনার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি না। অতএব আপনি কেবলমাত্র আমাদের জন্য একটি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। সেমতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে তাহাদের নিকট একদিনের ওয়াদা করিলেন। তিনি সেই দিন তাহাদের নিকট

যাইয়া ওয়াজ নছীহত করিলেন এবং শরীয়তের নির্দ্দেশাবলী শুনাইলেন। তাহাদিগকে তিনি যে সব নছীহত শুনাইলেন তন্মধ্যে ছিল—তোমাদের মধ্যে যে কেহ তিনটি শিশু সন্তানকে কেয়ামতের দিনের জন্য পাঠাইয়া দিবে (অর্থাৎ শৈশবাবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হইলে যে মাতা ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিবে) তাহার জন্য ঐ শিশু সন্তানগুলি দোযখের অগ্নি হইতে ঢাল স্বরূপ রক্ষাকবচ হইয়া দাঁড়াইবে। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, দুইটি সন্তান হইলে? রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন, হাঁ—দুইটি সন্তান হইলেও এইরূপ হইবে।*

শ্রোতা কোন কথা না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে

৮৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে কোন বিষয় শুনিয়া অনুধাবন করিতে না পারিলে, পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন—(কেয়ামতে) যাহার হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিতেছেন—"যাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব অতি সহজ হইবে এবং সে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে হিসাবের ময়দান হইতে বেহেশতের দিকে চলিয়া আসিবে।" (এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হিসাব-নিকাশ হওয়া সত্ত্বেও একদল লোক বেহেশতে যাইবে, কোনও শাস্তি ভোগ করিবে না)। নবী (দঃ) বলিলেন, এই আয়াতে যে বিষয়কে হিসাব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে হিসাব নহে, বরং উহা শুধু জ্ঞাত করানোর জন্য কৃত আমল-নামা উপস্থিত করা মাত্র। উহার উপর জিজ্ঞাসাবাদ বা কৈফিয়ত তলব করা হইবে না। (সে জন্যই উহাকে "সহজ হিসাব" আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কারণ উহা নামে মাত্র হিসাব। আসলে হিসাব লওয়া হইবে না।) কিন্তু (প্রকৃত প্রস্তাবে "হিসাব লওয়া" বলা হয়) হিসাবদাতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ত তলব করা হইলে; (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন) সে পরিত্রাণ পাইবে না। (কারণ আল্লাহ তায়ালার নিকট এরূপ কড়াকড়িভাবের হিসাব দিয়া কে বাঁচিতে পারে?)

---

* তিরমিজী শরীফে আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন; যাহার দুইটি শিশু সন্তানের মৃত্যু হইবে আল্লাহ তাহাকে ঐ মছিবতে ধৈর্য্য ধারণের প্রতিদানে বেহেশতে দাখেল করিবেন। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, একটা সন্তান মরিলে? তিনি বলিলেন, একটি সন্তান মরিলেও তদ্রূপই হইবে।

আলেমের নিকট কোন এল্‌ম লাভের সুযোগ পাইলে অনুপস্থিতকে তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য

দ্বীনের শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সক্রিয় হওয়ার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই পরিচ্ছেদের মূল বাক্য— ليبلغ الشاهد الغائب "উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌঁছাইয়া দিবে"। স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) বিদায় হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উপলক্ষে বলিয়াছিলেন। উক্ত ভাষণের হাদীছখানা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছখানা দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায়-হজ্জ পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। এতদ্ভিন্ন আবু বকরা (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন যাহার অনুবাদ ৬০নং হাদীছরূপে হইয়াছে।

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণেও হযরত (দঃ) এই বাক্যটি বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭ নম্বরে উহা অনুদিত হইবে।

হযরত রসুলুল্লার (দঃ) নামে মিথ্যা বলা মহাপাপ

৮৪। হাদীছঃ— سمعت عليا قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ -

অর্থ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার নামে মিথ্যা বলিও না, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলিবে সে নিশ্চয় দোযখে যাইবে।

৮৫। হাদীছঃ— যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আব্বা! আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে হাদীছ বর্ণনা করেন না কেন—যেমন অমুক অমুক ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি সর্ব্বদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্যে থাকিতাম বটে, কিন্তু (আমি সতর্কতা স্বরূপ তাঁহার নামে হাদীছ কম বর্ণনা করিয়া থাকি। কারণ,) আমি শুনিয়াছি, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৬। হাদীছঃ—আনাছ(রাঃ) বলেন, আমি (সতর্কতা স্বরূপ) বেশী হাদীছ বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকি। কারণ, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৭। হাদীছঃ—عن سلمة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال

مَنْ يَّقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—ছালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যারূপে কোন কিছু আমার সম্পৃক্ত করিবে সে যেন জানিয়া রাখে, নিশ্চয় তাহার ঠিকানা দোযখে হইবে।

এল্‌মের বিষয় লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষণ করা*

৮৯। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণের মধ্যে কাহারও নিকট আমার চাইতে বেশী হাদীছ থাকিতে পারে না, তবে হাঁ—আবদুল্লাহ ইবনে আমরের নিকট হয়ত থাকিতে পারে। কারণ, তিনি লিখিয়া রাখিতেন; আমি তাহা করি নাই।

৯০। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগকালীন অসুস্থতা যখন অধিক বাড়িয়া চলিল তখন তিনি বলিলেন—কাগজ কলম আন; আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়া দেই যদ্দারা তোমরা পথভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে। (হযরতের যাতনা লক্ষ্য করিয়া) ওমর (রাঃ) (ভাবিলেন, রসুলুল্লার (দঃ) রোগ যন্ত্রণা এই সময়ে চরমে পৌঁছিয়াছে, এমতাবস্থায় তিনি উম্মতের মহব্বতেই এরূপ বলিতেছেন; তবে আমাদিগকে তাঁহার কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তাই তিনি) বলিলেন, আমাদের নিকট আল্লার কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে। (অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাখ্যা ও কর্ম্ম-পদ্ধতির বিবরণ সহ যাহা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন) সেই কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাপারে ছাহাবীগণের মতানৈক্য দেখা দিল এবং কথা কাটাকাটি বাড়িয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু

---

* এই পরিচ্ছেদে একটি সন্দেহ দুর হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এরূপ প্রমাণ পওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক এবং বিশেষ কারণাধীন ও ব্যাপক আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রতি ছিল। বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

আলাইহে অসাল্লাম সকলকে বলিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও—আমার সম্মুখে বসিয়া বিবাদ করিও না। তোমাদের বিবাদের মীমাংসা অপেক্ষা উত্তম বিষয়ে তথা আল্লার সাক্ষাৎ-ধ্যানে আমি মগ্ন আছি; আমাকে এই অবস্থায়ই থাকিতে দাও।

তারপর ইহজগৎ ত্যাগের পূর্ব্বে নবী (দঃ) তিনটি বিষয়ের বিশেষ আদেশ করিলেন— (১) মোশরেক পৌত্তলিকদিগকে আরব ভূখণ্ড হইতে বহিষ্কার করিয়া দিও। (২) বহির্দেশ হইতে আগত প্রতিনিধি দলের অতিথীবৃন্দকে উপহার দিও যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম। তৃতীয়টি স্মরণ নাই।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশেষ অনুতাপের সহিত বলিলেন—বড়ই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল যদ্দরুণ আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালীন লিপি হইতে মাহরুম থাকিয়া গেলাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ঘটনার পরও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৩।৪ দিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু কিছু লিখিয়া দিবার অভিপ্রায় পরে আর প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কোনও নূতন বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। নতুবা কোন বাধাই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে উহা হইতে বিরত রাখিতে পারিত না। ওমর (রাঃ) ঠিক এইরূপ ভাবিয়াই রসুলুল্লার (দঃ) কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করাকে অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার পর এই দিনই (আছাহ্‌হুছ-ছিয়ার দ্রষ্টব্য) অথবা শনি কিম্বা রবিবার জোহর নামাযান্তে হযরত (দঃ) মাথায় পট্টি বাঁধিয়া অতিকষ্টে স্বীয় মসজিদে বিশেষ ভাষণও দান করিয়া ছিলেন যাহা হযরতের শেষ ভাষণ ছিল। ঐ ভাষণে হযরত (দঃ) অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন; হয়ত যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সেই ভাষণেই হযরত বলিয়া দিয়াছেন। ভাষণটির বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্ব্বে" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত আছে।

এতদ্ভিন্ন বিবাদের ঘটনার পর নবী (দঃ) তিনটি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হাদীছেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; আরও কিছু বলিবার থাকিলে তাহা নিশ্চয় বয়ান করিতেন।

মোসলেম শরীফে আছে—এই অসুস্থতার মধ্যেই একদিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিবি আয়েশা (রাঃ)কে আদেশ করিলেন, তোমার বাপ-ভাইকে ডাকিয়া আন; আমি (খেলাফতের বিষয়) লিখিয়া দিয়া যাই, কিন্তু পরে তিনি নিজেই বিরত থাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং মোসলমানগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও (খলীফারূপে) গ্রহণ করিবেন না।

এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়টির প্রমাণে আরও দুইটি হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে শরীয়তের কয়েকটি মহআলাহ

লিখিত দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে আছে—আবু শাহ নামক ব্যক্তিকে হযরত (দঃ) তাঁহার ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণ লিখিয়া দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৩ নম্বরে প্রথম হাদীছটি এবং তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয়ের ভাষণে দ্বিতীয়টি অনুদিত হইবে।

জ্ঞানের কথা বা নছীহত রাত্রিকালে শিক্ষা দেওয়া

৯১। **হাদীছ ঃ**—উম্মল-মোমেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রিবেলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিদ্রা হইতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ! এই রাত্রিকালে কত বিপদাপদ ও বিপর্য্যয়ের ঘনঘটা দুনিয়ার উপর নামিয়া আসিতেছে এবং কত প্রকার রহমতের ভাণ্ডারও খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। (অর্থাৎ—এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা ও রহমত লুটিবার প্রতি অগ্রসর হওয়া কত জরুরী! কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় যে, মানুষ নির্ব্বোধ বেখেয়ালের ন্যায় এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উপেক্ষা করিয়া সারা রাত্রি নিদ্রায় কাটাইতেছে।) ঘরে যাহারা শুইয়া আছে তাহাদিগকে (তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য) জাগাইয়া দাও। (অর্থাৎ—তোমরা সকলে এই সময় আল্লার প্রতি ধাবিত হইয়া এই সব বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা পাইবার ও আল্লার রহমত লুটিয়া আনিবার প্রতি সচেষ্ট হও।) বহু লোক এই দুনিয়াতে সাজ শয্যা ও বেশ-ভুসায় আবৃত আছে, কিন্তু (তাহাদের নিকট নেক আমল না থাকায়) আখেরাতে তাহারা উলঙ্গ (অর্থাৎ একেবারে নিঃসম্বল) অবস্থায় উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি-নীতিতে দেখা যায়, রাত্রিকালে আগামী দিনের সমুদয় কার্য্যাবলীর প্রোগ্রাম তৈরী করা হয় এবং দিনের বেলা ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ-কর্ম্মের ব্যস্ততায় কাটে। সৃষ্টির স্বভাবও তদ্রূপই ; সেই জন্যই বোধ হয় শরীয়তে প্রত্যেক রাত্রিকে উহার পরের দিনের সহিত গণনা করা হয়। আগামী দিনে দুনিয়ার বুকে যত প্রকার বিপর্য্যয় বা উন্নতি, আপদ-বিপদ বা সুখ-শান্তির ঘটনা ঘটিবে সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাকারী ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্দেশ অনুযায়ী উহার প্রোগ্রাম রাত্রিকালেই তৈয়ার করেন।

স্বাভাবিক কার্য্যপদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়, যখন যে উপলক্ষ্য দেখা যায় ঠিক তখনই সে উপলক্ষের কাজ-কর্ম্মের উপযুক্ত সময় বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং রাত্রিকালে যখন আগামী দিনের ভাল-মন্দের প্রোগ্রাম তৈয়ার হইতে থাকে, তখন নিদ্রায় বিভোর না থাকিয়া আগামী জীবনের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও উন্নতি লাভের চিন্তা-সাধনায় মগ্ন হওয়া উচিত।

আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ায় যত সাধক, আওলিয়া-দরবেশ আধ্যাত্মিক দৌলত লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকেই এই রাত্রিকালের সাধনা ও আরাধনার দ্বারাই সবকিছুর সন্ধান পাইয়াছেন।* মুসলমানদের সোনালী যুগে ক্ষমতা বা ধন-সম্পদের অধিকারীগণও উন্নতির জন্য রাত্রিকালের ঐ মধুর সময়ে স্বীয় পালনকর্ত্তার প্রতি একাগ্রচিত্তে মগ্নতা অবলম্বনে সাধনা করিতেন। আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কোরআনে খাঁটী মোমেনদের স্বভাব বর্ণনায় বলেন—

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا -

"মধুর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আরাম-আয়েশের বিছানা ত্যাগ করতঃ তাহারা ভয়ের আতঙ্ক ও আশার আলো লইয়া পালনকর্ত্তাকে ডাকিতে থাকে।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

খোলাফায়ে-রাশেদীনের যুগ পর্য্যন্ত ধন-সম্পদের অধিকারী, ক্ষমতা ও পদের অধিকারী, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ এই নীতি অবলম্বনেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

শয়তান অতিশয় চতুর ও দুরদর্শী; আল্লাহ ও আল্লার রসুল (দঃ) যে পথ দেখাইয়া মানবকে উন্নতির দিকে নিয়া যাইতে চান, শয়তান ঠিক সেই পথটির মুখেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর আমরাও শয়তানের সেই বেড়াজালসমূহকে ছিন্ন করতঃ ঐ রাস্তায় অগ্রসর না হইয়া নির্ব্বোধের মত ধ্বংসের পথেই পরিচালিত হইয়া থাকি। আজ আমরা সামান্য ধন-সম্পদ লাভ করিলেই বা কোন প্রকার ক্ষমতা ও পদের অধিকারী হইলেই উন্নতির উৎস ঐ রাত্রিকালের সময়কে ক্লাবে ও বেশ্যালয়ে মদ্যপান, গান-বাজনা ও রং-তামাসা ইত্যাদিতে কাটাইয়া থাকি; এই অবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লার গজব নামিয়া আসিবে না কেন? কালক্রমে মুসলিম জাতির অধঃপতন এই পথেই ঘটিয়াছে।

---

* গওছে-আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)কে "সাঞ্জার" নামক দেশের বাদশাহ এই মর্ম্মে এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—আমি আমার রাজ্যের "নিমরুজ" নামক বিরাট এলাকাকে আপনার খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ আপনার খানকার জন্য ওয়াকফ্ করিয়া দিতে চাই। গওছে আজম (রঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না, বরং উহার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ উত্তরে ইহাও লিখিলেন যে—

زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب -

من ملک نیم روز را بیک جو نمی خرم

"যখন হইতে আমি গভীর রাত্রির মধুর রাজত্বের খোঁজ পাইয়াছি, তখন হইতে আপনার নিমরুজের ন্যায় রাজত্বকে একদানা যবের মূল্যও দান করি না।"

রাত্রিবেলায় এল্‌ম চর্চ্চা করা*

৯২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ জীবনে একদা এশার নামাযান্তে আমাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ ? এই রাত্রে দুনিয়ার বুকে যত মানুষ আছে (এমনকি এইমাত্র যে জন্মগ্রহণ করিল) আজ হইতে একশত বৎসরের মাথায় উহাদের একটি প্রাণীও জীবিত থাকিবে না !

ব্যাখ্যা ঃ—মানুষের জন্য এই দুনিয়া যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সরল ও বাস্তব সত্যটির প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অন্য এক হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের বয়স "ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে।" সাধারণ বয়সের মাত্রা ইহাই, উর্দ্ধে উঠিলে একশতের মধ্যে ; ইহার চাইতে অধিক অতিশয় নগন্য।

এল্‌ম কণ্ঠস্থ করায় তৎপরতা

৯৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সকলেই বলে—আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বেশী বর্ণনা করে। মাহাজের ও আনছার ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে ঐ পরিমাণ হাদীছ বর্ণনা করেন না যে পরিমাণ আবু হোরায়রা বর্ণনা করে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লার নিকট সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে ; কোরআন শরীফের দুইটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য না করিলে আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করিতাম না। তারপর তিনি ان الذين يكتمون ما انزلنا আয়াতদ্বয় ↑ তেলাওয়াত করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আমাদের মোহাজের ভাইগণ বাজারে বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকিতেন, আনছার ভাইগণ কৃষিকর্ম্ম ও গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আর আমি (আবু হোরায়রা) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিতাম। অন্যেরা যখন

---

* এক হাদীছে এশার পর রাত্রি জাগরণ নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা ইহাতে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইয়াছেন যে, এলম চর্চ্চায় এশার পরেও রাত্রি জাগরণ দোষণীয় নহে। এলম চর্চ্চাকারীগণ ফজর নামাযের লক্ষ্য নিশ্চয় রাখিবে।

↑ আয়াতদ্বয়ের অর্থ ঃ—মানব জাতির জন্য আমার প্রেরিত হেদায়েতের সরল ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে যাহারা লুকাইয়া রাখিবে, তাহাদের প্রতি আল্লার এবং সকলের লা'নত ও অভিশাপ। অবশ্য যাহারা ঐ স্বভাব হইতে তওবা করিয়া সংশোধিত হইবে এবং ঐ সব প্রকাশ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিবেন। (২য় পারা ২য় রুকু)

অনুপস্থিত তখনও আমি উপস্থিত এবং অন্য কেহ যাহা স্মরণ না রাখিত আমি উহা (বিশেষ যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া) স্মরণ রাখিতাম।

৯৪। **হাদীছ ঃ—** আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি আপনার অনেক হাদীছ শুনি, কিন্তু স্মরণ রাখিতে পারি না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন— তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদরখানা বিছাইলাম, তিনি উহার উপর হাতের অঞ্জলি ভরিয়া কিছু দান (করার ন্যায় হস্ত চালনা) করিলেন এবং ঐ চাদরখানা আমার সীনার সঙ্গে মিলাইতে আদেশ করিলেন; আমি তাহাই করিলাম। এই ঘটনার পর আর আমি হযরতের কোন হাদীছ ভুলি নাই।

আরও একটি ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিশেষ একটি বক্তব্য প্রকাশ উপলক্ষে বলিলেন, আমার বক্তব্য শেষ করা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় কাপড় বিছাইয়া রাখিবে, তারপর নিজ বক্ষে সেই কাপড়টি আলিঙ্গন করিবে সে আমার বক্তব্য কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ আমি গায়ের কম্বলটা বিছাইয়া রাখিলাম; বক্তব্য শেষে কম্বলটি বক্ষে আলিঙ্গন করিলাম; সত্য সত্যই হযরতের বক্তব্যের কিঞ্চিৎও আর আমি ভুলি নাই (২৭৪পৃঃ)।

(প্রথম ঘটনাটি ত স্পষ্টতই ব্যাপকরূপে হাদীছ স্মরণ রাখার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঐরূপই ছিল, কিম্বা শুধু ঐ বিশেষ বক্তব্যটি স্মরণ রাখার জন্য ছিল।)

৯৫। **হাদীছ ঃ—** আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এল্‌মের দুইটি থলিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। একটি থলিয়া (দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধীয়, উহা) বিতরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় থলিয়াটি (এমন এল্‌ম যাহা প্রচার করিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করেন নাই; প্রকাশ করিলে সাধারণের বিশেষ কোন ফলও হইবে না, বরং উহা) প্রকাশ করিলে (এক শ্রেণীর লোকের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে, ফল কিছু হইবে না, বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া) আমার গলা কাটা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দ্বিতীয় থলিয়ায় কি প্রকারের এল্‌ম ছিল তাহার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইতে হইবে না। স্বয়ং ছাহাবী আবু হোরায়রার নানাপ্রকার ইঙ্গিতেই উহা প্রকাশ পায়। রসুলুল্লার ছাহাবী খোলাফা বা শাসনকর্ত্তাদের পর হইতে যে সমস্ত বিপথগামী ও অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব হইবে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সে সকলের নাম, ঠিকানা ও সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ঐ সকল নাম ঠিকানা আবু হোরায়রার কণ্ঠস্থ ছিল। ছাহাবী শাসনকর্ত্তাদের সময় অতিক্রান্ত হইয়া পরে ঐ সমস্ত বিপথগামী শাসকদের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে আবু

হোরায়রার মনে সব কিছু জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহা প্রকাশে ফল হইবে না, বরং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হইবে, তাই তিনি ঐ সবের বর্ণনা হইতে বিরত থাকেন।

আলেমগণের বক্তব্য চুপ করিয়া শুনা উচিত

৯৬। হাদীছ:—জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, সকলকে চুপ থাকিতে বল। তারপর হযরত (দঃ) ফরমাইলেন হে মোসলমানগণ। আমার (দুনিয়া ত্যাগের) পরে তোমরা কাফেরদের কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করিতে আরম্ভ কর।

কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—কে বেশী এল্‌ম রাখে? তবে কি উত্তর দিবেন?

৯৭। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—এক দিন মুসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইলেন। (তাঁহার ওয়াজে মুগ্ধ হইয়া) এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি অপেক্ষা বড় আলেম আর কেহ আছেন কি? এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? মুসা (আঃ) বলিলেন, সবচেয়ে বড় আলেম আমি নিজকেই মনে করি। (প্রশ্নের উত্তর ঠিকই ছিল, কারণ মুসা (আঃ) নবী ছিলেন এবং দ্বীনের এলম নবীর সমান কাহারও হয় না। কিন্তু সরাসরি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিলেন না।) ঐ প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বজ্ঞ আল্লার প্রতি হাওয়ালা ও ন্যস্ত করতঃ الله اعلم অর্থাৎ এ বিষয়ে আল্লাহই বেশী এবং ভাল জানেন; এরূপ উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু মুসা (আঃ) তাহা করেন নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা মুসার (আঃ) প্রতি অহী পাঠাইলেন, হে মুসা! আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছেন; দুই সমুদ্রের মিলনস্থানে তাঁহার দেখা পাইবে। তিনি তোমার চাইতে অধিক এল্‌ম রাখেন। মুসা (আঃ) আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! কি করিয়া আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (তাঁহার তালাশে বাহির হও,) সঙ্গে থলিয়ার মধ্যে একটি ভাজা মৎস্য লইয়া লও। যে স্থানে যাইয়া ঐ মৎস্যটি জীবিত হইবে এবং তোমার নিকট হইতে নিখোঁজ হইয়া যাইবে ঠিক উহারই আশে পাশে আমার ঐ বান্দাকে পাইবে। মুসা (আঃ) তাঁহার খাদেম "ইউশা"কে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া থলিতে একটি ভাজা মৎস্য লইলেন। মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিয়া দিলেন, মৎস্যটি

নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সংবাদ দেওয়া তোমার বড় কাজ। খাদেম বলিল, আপনি আমাকে বেশী কাজের চাপ প্রয়োগ করেন নাই।

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় চলিতে চলিতে এমন একস্থানে পৌঁছিলেন যথায় একটি বিরাট পাথর ছিল। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা উভয়েই পাথরের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। (মূসা (আঃ) নিদ্রিতই ছিলেন, ইত্যবসরে ইউশা জাগিয়া দেখিতে পাইলেন,) মৎস্য জীবিত হইয়া থলি হইতে সমুদ্র বক্ষে লাফাইয়া পড়িল। আল্লার কুদরত—এই মৎস্য সমুদ্রের পানিতে যতদুর চলিল পানির মধ্যে একটি ছিদ্র রহিয়া গেল। খাদেম ভাবিলেন, মূছার (আঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিব না। (তিনি জাগ্রত হইলেই তাঁহাকে জ্ঞাত করিব। খোদার শান—এমন একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু মূসা নিদ্রোত্থিত হইলে পর তাঁহার নিকট উহা বলিতে ইউশা ভুলিয়া গেলেন।) আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রি চলিয়া যখন ভোর হইল তখন মূসা (আঃ) খাদেমকে বলিলেন, এবার চলিতে চলিতে খুব ক্লান্তি বোধ করিতেছি, নাশ্‌তা আন। মূসা (আঃ) মৎস্যের ঐ ঘটনার পূর্ব্বে কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নাই। যেহেতু মৎস্যের ঘটনার স্থানটি তাঁহার নির্দ্দেশিত গন্তব্যস্থল ছিল, উহা অতিক্রম করার পরই তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। খাদেম বলিল—হায়! আপনি ত জানেন না—আমরা যখন পাথরের নিকট শুইয়া ছিলাম তখন মৎস্যের এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; শয়তানই তাহা উল্লেখ করা হইতে আমাকে ভুলাইয়াছে। ইউশা মৎস্যের পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। মৎস্যের চলন-পথে পানির মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মূসা (আঃ) বলিলেন, উহাই ত সেইস্থান, যে স্থানের খোঁজে আমরা বাহির হইয়াছি। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পুনরায় চলিত পথে ফিরিলেন এবং সেই পাথরের বরাবর আসিয়া দেখিলেন, গভীর সমুদ্রে পানির উপর সবুজ রং মখ্‌মলের বিছানায় আল্লার এক বন্দা আপদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন।* তিনি ছিলেন খাযের (আঃ) (সাধারণতঃ যাঁহাকে খিযির বলা হয়)। মূসা (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই দেশে সালাম কোথা হইতে? তখন ঐ দেশ কাফেরের মুলুক ছিল।) মূসা (আঃ) বলিলেন, (আমি এদেশীয় নই) আমি মূসা। জিজ্ঞাসা করিলেন,

---

* আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফে ১২ জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে। ৬৮৯ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত রেওয়ায়েত হইতে আরও তথ্য অনুবাদে শামিল করা হইয়াছে।

বনী-ইস্রায়ীলের নবী মূসা ? মূসা (আঃ) বলিলেন—হাঁ। তারপর মূসা (আঃ) বলিলেন, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকিতে পারি ? এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আপনার আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবেন না। কারণ, আল্লাহ আমাকে এক প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহার রহস্য আপনি অবগত নহেন এবং আপনাকে আল্লাহ অন্য প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহা আমি আপনার মত জানি না।*

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমি আপনার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই থাকিব, আপনার কোন আদেশের ব্যতিক্রম করিব না। তখন খিযির (আঃ) মূসা (আঃ)কে বলিয়া দিলেন, আপনি আমার নিকট কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না, যে পর্য্যন্ত না আমি নিজে উহা ব্যক্ত করি। এই বলিয়া তাঁহারা সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পার হওয়ার জন্য নৌকার সন্ধান পাইতে ছিলেন না, এমন সময় একটি নৌকা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া যাইতে ছিল, তাঁহারা নৌকা

---

* খিযির (আঃ)-এর নিকট যে বিষয়ের এল্‌ম ছিল, উহা ছিল সৃষ্টি-রহস্যের এল্‌ম। উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক তথা আখেরাতের কোনও উন্নতি ত হয়ই না, দুনিয়াতেও মানব কল্যাণ সম্পর্কীয় কোন উন্নতি, যথা—চরিত্র গঠন, নৈতিক চরিত্র সংশোধন বা দুনিয়াতে শান্তিরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিচালনার কোন উন্নতি সাধিত হয় না। তাই উহার গুরুত্ব কম এবং উহার সঙ্গে নবীগণের বিশেষ সম্পর্কের কোন আবশ্যকও হয় না। হযরত মূসার (আঃ) নিকট ছিল শরীয়ত তথা আল্লার আদেশ-নিষেধ এবং আল্লাহকে রাজী ও সন্তুষ্ট করার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, চরিত্র গঠন ও সংশোধন ইত্যাদির এল্‌ম—যাহার উপর মানবের সর্ব্বাধিক কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে; উহার গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তায়ালা এই এল্‌ম প্রচারের জন্য বিশেষরূপে নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই এল্‌ম দুনিয়াতে নবী ও রসুলের নিকট অনেক বেশী থাকে এবং সেই হিসাবেই মূল ঘটনার প্রশ্নের উত্তরে মূসা (আঃ) বলিয়াছেন, সব চাইতে বড় আলেম আমি নিজেকেই মনে করি; আমার চাইতে বেশী এলমওয়ালা কেহ নাই। যেহেতু উত্তরটা আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয় নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার এক বন্দা আছে যাহার নিকট তোমার চাইতে বেশী এল্‌ম রহিয়াছে। যদিও উহা বিশেষ এক বিভাগের; যে বিভাগ হযরত মূছার সম্পর্কীয় নহে এবং হযরত মূসার সম্পর্কীয় বিভাগ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। হযরত মূছার উল্লেখিত উত্তরে কোন বিভাগের উল্লেখ ছিল না, বরং উত্তরটা সামগ্রিক ও ব্যাপক আকারের ছিল, সুতরাং যে কোন বিভাগের এল্‌ম দ্বারা উহার খণ্ডন যুক্তিযুক্ত। অবশ্য হযরত মূছার উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের ছিল না, কিন্তু উত্তরের বাহ্যিক আকার ও রূপটাই আপত্তিকর ছিল। এতটুকু বিচ্যুতি সাধারণতঃ আপত্তিজনক না হইলেও নবীর পক্ষে উহাকে আল্লাহ তায়ালা নাপছন্দ করিয়াছেন।

চালকের সঙ্গে আলাপ করিলেন। নৌকাচালক খিযির (আঃ)কে চিনিতে পারিয়া বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়া লইল। নৌকাচলাকীন একটি চড়ুই পাখী নৌকার বাতায় বসিয়া সমুদ্রের মধ্যে একবার কি দুইবার ঠোঁট মারিল। খিযির (আঃ) বলিলেন, হে মূসা! এই চড়ুই পাখীটির ঠোঁটে লাগিয়া সমুদ্রের যতটুকু অংশ আসিয়াছে আমার ও আপনার সমস্ত এল্‌ম আল্লাহ তায়ালার অসীম এল্‌মের তুলনায় ততটুকু অংশও হইবে না। তারপর খিযির (আঃ) নৌকার একখানা তখ্‌তা খুলিয়া ফেলিলেন। (ভাঙ্গার পর অবশ্য পুনরায় গড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তখন) মূসা (আঃ) বলিলেন, ইহারা আমাদিগকে বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়াছিল, আর আপনি তাহাদের নৌকা ভাঙ্গিয়া নৌকারোহী সকলকে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! ইহা ভাল করেন নাই। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না। মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়া গিয়াছে; আশা করি এই জন্য আপনি আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না এবং আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। মূসা (আঃ) এইবার প্রকৃত পক্ষেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। এক স্থানে যাইয়া দেখেন, একটি ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করিতেছে। খিযির (আঃ) সেই ছেলেটির মাথার খুলি উঠাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনি একটি নির্দ্দোষ ছেলেকে মারিয়া ফেলিলেন? অথচ সে কাহাকেও মারে নাই। আপনি বড়ই অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছেন। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, আপনি ধৈর্য্যহারা হইবেন; এইবার একটু শক্তভাবেই বলিলেন। মূসা (আঃ) বলিলেন, তৃতীয়বার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না, তখন আমারও আর কোন ওজর-আপত্তি থাকিবে না। এই বলিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং গ্রামবাসীগণকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা রাজী হইল না। তাঁহারা ঐ গ্রামে দেখিতে পাইলেন, একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। খিযির (আঃ) ঐ দেওয়ালটিকে হাতে ধরিয়া সিধা করিবার ন্যায় ইশারা করিলেন—আল্লার কুদরতে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটি সিধা হইয়া গেল। এইবার মূসা (আঃ) বলিয়া উঠিলেন, গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করিল না; সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে এই কার্য্যের জন্য তাহাদের হইতে পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। তখন খিযির (আঃ) পরিস্কার বলিয়া দিলেন—এইবার আপনার ও আমার সঙ্গ ভঙ্গ হইল। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং যাহা দেখিয়া আপনি ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন প্রত্যেকটির রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি শুনুন!

ঐ নৌকার ব্যাপার হইল এই যে, ঐ দেশে এক স্বৈরাচারী জালেম বাদশাহ আছে সে কোনও ভাল এবং নিখুঁত নৌকা দেখিলেই ছিনাইয়া লয়। উক্ত নৌকার মালিকগণ অত্যন্ত গরীব, তাই আমি ঐ নৌকাটিকে খুতযুক্ত দোষী করিয়া উহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছি। তারপর ছেলে হত্যার রহস্য হইতেছে এই যে, ছেলেটি অনিবার্য্যরূপে কাফের হইতে চলিতেছিল, অথচ তাহার মাতা-পিতা মোমেন। আমার আশঙ্কা হইল যে, এই ছেলের মমতার বন্ধন হয়ত মাতা-পিতাকেও কুফুরীর মধ্যে জড়িত করিয়া ফেলিবে। তাই আমার ইচ্ছা হইল—আল্লাহ তায়ালা এই ছেলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে স্নেহের যোগ্য কোনও সুসন্তান দান করেন। আর দেওয়ালের ঘটনার রহস্য এই যে, দেওয়ালটির মালিক দুইটি এতিম ছেলে; তাহাদের পিতা অতি নেককার ছিলেন। তিনি ঐ শিশু দুইটির জন্য কিছু ধন-দৌলত ঐ দেওয়ালের নীচে পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল, এই সমস্তের হেফাজত করা, যেন এই এতিমদ্বয় বড় হইয়া তাহাদের ঐ প্রোথিত ধন বাহির করিতে পারে। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালারই ইঙ্গিত ছিল; আমার ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। ইহাই হইল উক্ত ঘটনাগুলির রহস্য, যাহার জন্য আপনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ মূসাকে রহম করুন! তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল হইত; তাঁহাদের আরও বহু ঘটনা আমরা শুনিতে পারিতাম!

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের শিক্ষা এই যে, কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—"অধিক এল্‌ম কে রাখেন"? তবে বলিবে, "আল্লাহই তাহা ভাল জানেন।" আরও শিক্ষা এই যে, এল্‌ম হাসিল করার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদেশ সফরে বাহির হইতেও কুণ্ঠিত হইবে না। যেমন মূসা (আঃ) করিয়াছিলেন, এমনকি সঙ্কটপূর্ণ সামুদ্রিক ভ্রমণ পর্য্যন্ত সাগ্রহে কবুল করিয়াছিলেন।

আলোচ্য ঘটনায় উল্লেখিত দুই সমুদ্রের মিলনস্থলটি হইল লোহিৎ সাগর যে, সিনাই উপত্যকার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি উপসাগর শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—সুয়েজ উপসাগর এবং আকবা উপসাগর; উক্ত উপসাগরদ্বয়েরই মিলনস্থল—লোহিৎ সাগরের অংশ বিশেষ; এই ঘটনা তথায়ই ঘটিয়াছে।

বসা আলেমকে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করা

৯৮। হাদীছ ঃ—আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লার রাস্তায় জেহাদ কি প্রকারে হয়? আমাদের কেহ যুদ্ধ করে রাগের বশীভূত হইয়া,

কেহবা জেদের বশীভূত হইয়া। ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, আর রসুলুল্লাহ (দঃ) বসিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহার প্রতি মাথা উঠাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, আল্লার দ্বীনকে বোলন্দ ও উন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা—একমাত্র উহাই আল্লার রাস্তায় জেহাদ গণ্য হইবে।

মছআলাহ্ঃ—যদি কেহ কোন এমন এবাদতে রত থাকে যে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে সে ঐ এবাদতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না, এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যায়। (২৩ পৃঃ ৭২ হাঃ)

মানুষকে এল্‌ম অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে

৯৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার এক জনশূন্য স্থানে চলিতেছিলাম; হযরতের হাতে লাঠি স্বরূপ একখানা খেজুরের ডালা ছিল। এমতাবস্থায় তিনি একদল ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন; তখন তাহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিল, রূহ্ বা আত্মা কি বস্তু সে বিষয় তাঁহাকে প্রশ্ন কর। এক ব্যক্তি বলিল, তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করিও না; হয়ত তিনি ঐ উত্তরই দিয়া দিবেন যাহা তোমরা পছন্দ কর না। (অর্থাৎ এমন উত্তর দিতে পারেন যদ্দারা তিনি সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, অথচ ইহা তোমরা পছন্দ কর না।) অন্য এক ব্যক্তি বলিল, প্রশ্ন করিবই। এই বলিয়া এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলিল, হে আবুল কাসেম (দঃ)! রূহ্ কি বস্তু? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ থাকিলেন। আমি ভাবিলাম, এখন অহী আসিবে, এই ভাবিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বস্তুতঃ তখন অহী নাযেল হইল। অহী নাযেল হওয়ার পর হযরত (দঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ

مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا -

অর্থঃ—তাহারা আপনাকে রূহের বিষয় প্রশ্ন করে। আপনি বলিয়া দিন—রূহ্ (কোন উপকরণ-উপাদান ব্যতিরেকে শুধু) আল্লার হুকুমে সৃষ্ট একটি বিশেষ বস্তু; (বিষদ ব্যাখ্যা তোমরা অনুধাবন করিতে পারিবে না, কারণ) মানবকে এল্‌ম বা জ্ঞান অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে। (যদ্দারা উহার রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে)।

কোন মোস্তাহাব কার্য্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কায় উহা বর্জ্জন করা

১০০। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তোমাদের বংশধর অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরায়েশগণ যদি সবেমাত্র নব মোসলেম না হইত, তবে আমি কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে তৈয়ার করিতাম । (উত্তর দিকে হাতীমরূপে) যে অংশ পরিত্যক্ত রহিয়াছে উহা সমেত তৈরী করিতাম এবং কা'বা ঘরের পোতা (বর্ত্তমানের ন্যায় উচু না করিয়া) জমিন সমান করিয়া দিতাম এবং উহাতে দুইটি দরওয়াজা রাখিতাম; একটি ঢুকিবার একটি বাহির হইবার। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের সময় এই অনুযায়ীই কা'বা-ঘরকে বানাইয়াছিলেন। (কিন্তু তিনি হাজ্জাজের হাতে শহীদ হইলে পর হাজ্জাজ আবার উহাকে ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কোরায়েশদের নির্ম্মাণ আকারে বানাইয়া দেয়; এখন পর্য্যন্ত ঐরূপই আছে।)

ব্যাখ্যা ঃ—কা'বা-ঘর ভাঙ্গিয়া উহার সংস্কারের অভিপ্রায় হযরতের জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি উহা কার্য্যকরী করিতে বিরত থাকেন। কারণ, কোরায়েশগণ তখন সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল; হযরতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আস্থা তখনও পর্য্যন্ত তত দৃঢ় হয় নাই। এমতাবস্থায় যদি তিনি খোদার ঘর ভাঙ্গা আরম্ভ করেন তবে তাহারা হয়ত বিরূপ ভাব পোষণ করিবে। এই আশঙ্কায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, কারণ উহা কোন ফরজ বা ওয়াজেব কাজ ছিল না। এই হাদীছের বিষয়-বস্তুর আরও বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড "বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা" পরিচ্ছেদে রহিয়াছে।

শ্রোতার জ্ঞান অনুপাতে কথা বলিবে

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যাহারা যতটুকু বুঝিতে পারে তাহাদের নিকট সেরূপ কথাই বর্ণনা কর। তোমরা কি ভাল মনে কর যে, মানুষের মনে আল্লাহ ও রসুলের প্রতি মিথ্যার ধারণা সৃষ্টি হউক। অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহ ও রসুল হইতে এরূপ কথা বর্ণনা কর যাহা শ্রোতা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে মিথ্যা মনে করে, তবে বস্তুতঃ সেই মিথ্যাটি আল্লাহ ও রসুলের উপর পড়ে।

১০১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উটের উপর সওয়ার ছিলেন; মোয়া'জ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন—হে মোয়া'জ। মোয়া'জ উত্তর করিলেন—নতশিরে হাজির, ইয়া রসুলাল্লাহ! এইভাবে তিনবার ডাকিয়া তৃতীয়বারে নবী (দঃ) বলিলেন, যে কোন ব্যক্তি খাঁটীভাবে আন্তরিকতার সহিত

এই স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করিবে যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত মতবাদ—ইসলামই গ্রহণীয়; আমি উহা গ্রহণ করিতেছি)। অন্য কোন মা'বুদ নাই, (অর্থাৎ ইসলাম ব্যতীত সকল প্রকার মতবাদ বর্জ্জনীয়, আমি তাহা বর্জ্জন করিতেছি) এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিশ্চয়ই আল্লার রসুল; (অর্থাৎ তাঁহার বর্ণিত সকল হুকুম-আহকাম আল্লার পক্ষ হইতেই।) সেই ব্যক্তির উপর দোযখ হারাম হইয়া যাইবে। মোয়া'জ আরজ করিলেন, এই ঘোষণা ও সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেই? যেন সকলেই সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে। নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করিলে সর্ব্বসাধারণ ভরসা জন্মাইয়া বসিবে। (ভুল বুঝের বশীভূত হইয়া আমল করা ছাড়িয়া দিবে।) মোয়া'জ (রাঃ) জীবনভর এই হাদীছটি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর সময় (কয়েকজন বিজ্ঞ লোককে ডাকিয়া) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যেন হাদীছকে লুকাইয়া রাখার গোনাহ না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ— রসুলুল্লাহ (দঃ) এই হাদীছ সর্ব্ব-সাধারণকে শুনাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—যাহারা ইহার সঠিক মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবে না। কিন্তু কাহাকেও এই হাদীছ শুনাইবে না এই উদ্দেশ্য হযরতের ছিল না; নতুবা হযরত (দঃ) নিজে মোয়া'জ (রাঃ)কে শুনাইতেন না।

এলম শিক্ষায় লজ্জা-শরম বাধা না হওয়া

মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণে লজ্জা বোধ করিবে অথবা অহঙ্কার বা তাকাব্বুরী করিবে সে এলম হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, মদীনার মহিলাগণ অত্যন্ত ভাল; দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ তাহাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

১০২। হাদীছ ঃ—উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উম্মে-ছোলায়েম নামক জনৈক মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আল্লাহ তায়ালা হক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না; (অর্থাৎ সেরূপ আমিও লজ্জা বোধ না করিয়া একটি মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছি—) স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হইলে গোছল ফরজ হইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, (শুধু স্বপ্ন দেখিলেই হইবে না, বরং) বীর্য্য (বাহির হইয়াছে) দেখিলে গোছল করা ফরজ হইবে! উম্মে-ছালামা (রাঃ) তখন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! স্ত্রীলোকদের কি স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে?* হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়; নচেৎ সন্তান মায়ের

---

* পূর্ব্বে তাঁহার স্বপ্নদোষ হয় নাই; পরে ত তিনি হযরতের বিবি, যাঁহারা উহা হইতে সুরক্ষিত।

আকৃতি পায় কিরূপে ? (অর্থাৎ সন্তান কোন সময় মায়ের আকৃতি পাইয়া থাকে ; তদ্বারা বুঝা যায় যে, মাতৃজাতির বীর্য্যস্খলিত হওয়া স্বাভাবিক ; স্বপ্নদোষ তাহাই হয়।)

লজ্জা-ক্ষেত্রে মছআলাহ অন্যের দ্বারা জানা

১০৩। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমার অত্যধিক মজি* নির্গত হইত । রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সেই বিষয় মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিতে আমি লজ্জা বোধ করিলাম ; কেননা তিনি আমার শ্বশুর। আমি মেকদাদ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল ; তখন হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন—পুরুষাঙ্গ ধুইয়া ফেল এবং অজু করিয়া লও, গোসল করিতে হইবে না। (৪১ পৃষ্ঠা)

মসজিদে এলমের চর্চ্চা করা

১০৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। আমরা কোন্ স্থান হইতে এহরাম বাঁধিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, মদীনা দিকের বাসীন্দাগণ "জুল-হোলায়ফা" হইতে ; সিরিয়া এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "জোহ্ফা" হইতে ; নজদ এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "ক্বরণ" হইতে ; ইয়ামান এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "ইয়ালামলাম" হইতে।

জিজ্ঞাসিত বিষয়ের অধিক উত্তর দেওয়া

১০৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল—এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করিব ? নবী (দঃ) বলিলেন, জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপী ব্যবহার করিতে পারিবে না ; এবং কুসুম ফুলের বা জাফরানের রঙ্গীন কাপড়ও ব্যবহার করিবে না। (মোজাও ব্যবহার করিবে না, তবে) জুতা না থাকা বশতঃ চামড়ার মোজা ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উচু স্থান এবং গোছের নিম্ন ভাগে উভয় দিকের গিঁটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের সম্পূর্ণ অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

---

* কাম-স্পৃহার উত্তেজনায় লিঙ্গ দ্বারে বীর্য্য ছাড়া লালার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়—উহাই 'মজি'।

তৃতীয় অধ্যায়

অজু

অজুর বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

অর্থ ঃ—তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও, তখন সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত এবং দুই পা গিঁটদ্বয় পর্য্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মছেহ কর।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন—উক্ত অঙ্গগুলি ধৌত করার মাত্রা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক এক বার (সর্ব্বনিম্ন) ; দুই দুই বার (উত্তম); তিন তিন বার (অতি উত্তম) দেখাইয়াছেন ; তিন বারের বেশী তিনি কখনও করেন নাই। আলেমগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত এই সীমাকে লঙ্ঘন করা মকরূহ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অজু ব্যতিরেকে নামায হইবে না

১০৬। হাদীছ ঃ— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যাহার অজু নাই, অজু না করা পর্যন্ত তাহার নামায হইবে না।

অজুর ফজিলত

১০৭। হাদীছ ঃ— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا

مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—আমার উম্মতগণ তাহাদের হাত-পা, মুখমণ্ডল উজ্জল ও নূরানী-অবস্থায় কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। অজুর ক্রিয়ায় তাহাদের ঐ অঙ্গগুলি নূরানী হইবে। যে ব্যক্তি পুর্ণাঙ্গ নূরানী হওয়ার আকাঙ্খী তাহার কর্ত্তব্য—ঐ সকল অঙ্গগুলিকে পূর্ণরূপে ধৌত করা।

নিশ্চিত অনুভূতি ছাড়া শুধু সন্দেহে অজু ভাঙ্গে না

১০৮। হাদীছ :—আব্বাস ইবনে তমীম (রঃ) তাঁহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলা হইল—কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে এরূপ অছওয়াছা (অমূলক সন্দেহ) অনুভব করে যেন তাহার অজু ভাঙ্গিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাবৎ শব্দ না শুনিবে বা দুর্গন্ধ অনুভব না করিবে (অর্থাৎ যাবৎ অজু ভঙ্গের দৃঢ় অনুভূতি না হইবে) নানায ছাড়িবে না।

ব্যাখ্যা :—এক হাদীছে আছে—অজুর মধ্যে নানাপ্রকার অছওয়াছা বা সন্দেহ সৃষ্টিকারী এক (দল) শয়তান আছে উহার (সদস্যদের) নাম "অলাহান"।

মানুষ যে পথের পথিক হয় শয়তান ঐ পথের পথিক সাজিয়া নানাপ্রকার কুপ্ররোচনা দ্বারা তাহাকে দ্বীন হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি পরহেজগার নামাযী তাহাকে সরাসরি নামাযে বাধা দিলে সে উহা হইতে ক্ষান্ত হইবে না। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকে। অজুর মধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহ একটার পর আর একটা সৃষ্টি করিতে থাকে, এইরূপে তাহাকে অজুর মধ্যে দীর্ঘ সুত্রিতার বেড়াজালে ফেলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই জমাত হইতে মাহরুম করিয়া দেয়। তারপর কিছু দিনের মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইতে বঞ্চিত করে। যদি সে কোন রূপে অজু করিয়া নামায আরম্ভ করিয়া দেয় তথাপিও ঐ শয়তান তাহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় না। এই বুঝি অজু ভাঙ্গিয়া গেল—ইত্যাকার নানা সন্দেহ সৃষ্টি করিতে থাকে, যদ্দরুন সে বার বার নামায ছাড়িতে থাকে ও বার বার অজু করিতে থাকে, অজুর মধ্যে ত দীর্ঘ সুত্রিতা আছেই। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি নামাযকে একটি বড় জঞ্জাল মনে করিতে বাধ্য হয়, আরও যে কি হয় তাহা বলা যায় না। তাই এরূপ অছওয়াছা একটি মারাত্মক রোগবিশেষ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন যে, স্পষ্ট নিদর্শন ও সুনিশ্চিত অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু মনের অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইবে না।

আবুবকর ছিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পৌত্র প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—নামাযের মধ্যে আমার

নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইতে থাকে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? তিনি বলিলেন, তুমি কোনরূপ সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নামায পড়িতে থাক। যাবৎ তুমি শয়তানকে এই বলিয়া তাড়াইয়া না দিবে যে, আমি অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ নামাযই পড়িব, তাবৎ শয়তান কিছুতেই তোমাকে ছাড়িবে না। (নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করিতেই থাকিবে, যদ্দারা জামাত, ওয়াক্ত এমনকি নামায হইতে তোমাকে মাহ্রুম ও বঞ্চিত করিয়া দিবে।)

কারণ বশতঃ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অজু করা

১০৯। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায দেখার জন্য তাঁহার বিবি—আমার খালা মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এক রাত্রে শুইয়া রহিলাম। (ইবনে আব্বাস তখন বালক ছিলেন এবং মায়মুনা (রাঃ) ঋতু অবস্থায় ছিলেন।) আমি বালিশের চওড়া দিকে শুইলাম এবং নবী (দঃ) ও তাঁহার বিবি লম্বা দিকে শুইলেন। আমি ঘুমের ভান করিয়া রহিলাম, কিন্তু ঘুমাইলাম না। নবী (দঃ) এশার নামায পড়িয়া ঘরে আসিলেন এবং চার রাকাত নফল নামায পড়িলেন অতঃপর বিবির সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি অর্দ্ধেক বা তার চেয়ে একটু বেশী বা কম হইল, তখন তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং বসিয়া নিদ্রিতভাবে চোখ-মুখ মুচিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আ'ল-এম্‌রান ছুরার শেষ দিকের দশটি আয়াত পাঠ করিলেন। তারপর তিনি একটা লটকানো পুরানা মশক হইতে পানি লইলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ও উত্তমরূপে অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়াইলেন। (ইবনে আব্বাস এ সব চুপি চুপি দেখিলেন,) তিনি বলেন, যখন দেখিলাম—নবী (দঃ) নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তখন আমিও উঠিলাম এবং নবী (দঃ) যেরূপ করিয়াছিলেন আমিও সেরূপ করিলাম এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নবী (দঃ) ডান হাতে আমার ডান কান ধরিয়া পেছন দিক দিয়া টানিয়া আনিয়া আমাকে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন, কানে একটু মোচড়ও দিলেন। নবী (দঃ) দুই দুই রাকাত করিয়া ছয়বার নামায পড়িলেন এবং পরে এক রাকাত দ্বারা বেতের পড়িলেন।*

---

* মোসলেম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে ثم اوتر بثلاث "তারপর তিন রাকাত বেতের পড়িলেন" স্পষ্ট উল্লেখ আছে; সেই অনুসারে আলোচ্য হাদীছের অস্পষ্ট বাক্যটির অর্থ এইরূপ হইবে—(ষষ্ঠ দুই রাকাতের) পরে এক রাকাত (কে ঐ দুই রাকাতের সঙ্গে মিলাইয়া) তিন রাকাত বেতের পড়িলেন।

তারপর তিনি শুইয়া রহিলেন ; নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার নাকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ফজরের ওয়াক্ত হইয়া গেল, মোয়াজ্জেন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, তিনি উঠিয়া ছোট কেরাতে দুই রাকাত (ফজরের ছুন্নত) পড়িলেন, তারপর মসজিদে যাইয়া (ফজরের) নামাজ পড়িলেন নূতন অজু করিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে একটি সন্দেহ দুর করিয়াছেন যে, নিদ্রার দরুন নবীগণের অজু ভঙ্গ হয় না। যেহেতু তাঁহাদের কাল্‌ব নিদ্রাবস্থায়ও জাগ্রত থাকে, কারণ তাঁহাদের প্রতি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নাকারে বস্তুতঃ অহী আসিয়া থাকে। যেমন ইব্রাহীম (আঃ)এর ঘটনায় আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইসমাঈল (আঃ)কে কোরবানী করিতে দেখিয়া উহাকেই আল্লার নির্দ্দেশ রূপে গ্রহণ করতঃ নিজের ছেলেকে কোরবানী করিতে উদ্যত হন। তাঁহার স্বপ্ন যদি অহী পর্য্যায়ের অকাট্য প্রমাণ পরিগণিত না হইত তবে তিনি এরূপ করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখিয়া কোন একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হওয়া যায় না।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত ছুরা আল-এমরানের দশটি আয়াত এই—

[১] إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلًا - سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ [২] رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ
تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ - وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٥ [৩] رَبَّنَا إِنَّنَا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا - رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ٥ [৪] رَبَّنَا وَآتِنَا مَا
وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٥
[৫] فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ - فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ

سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

[৬] لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۝ [৭] مَتَاعٌ قَلِيْلٌ - ثُمَّ

مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ [৮] لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ - وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ

خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝ [৯] وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ

اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا -

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ [১০] يٰۤاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থ :—[১] (এই বিশাল) ভূমণ্ডল ও (বিস্তীর্ণ) আকাশ সমূহের সৃষ্টি ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মধ্যে এবং রাত্র ও দিনের গমনাগমন ও ছোট-বড় হওয়ার মধ্যে (আল্লার মা'রেফাত তথা তাঁহার একত্ব, তাঁহার অসীম কুদরত ও গুণাবলীর তথ্য-জ্ঞান লাভের) বহু নিদর্শন ও প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে; খাঁটি জ্ঞানীগণ উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। (প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানী তাহারা) যাহারা উঠা, বসা, শোয়া (ইত্যাদি) সর্ব্বাবস্থায় (তথা জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, ও পালনকর্ত্তা) আল্লাহকে স্মরণ করিয়া চলে। (অর্থাৎ সে যে, প্রতিটি মুহূর্ত্তেই আল্লার দৃষ্টি-গোচরে আছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। যে অবস্থাকে ৪৬ নং হাদীছে "এহ্সান" নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং এই অবস্থা সাধন ও স্বীয় কর্ত্তব্য বোধ তথা ঈমানের পরিপক্কতার উন্নতি সাধনের মানসে) জমীন ও আসমান সমূহের সৃষ্টি-রহস্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া এই সত্যকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি পূর্ব্বক স্বীকার

করিয়া লয় যে, হে আমাদের পালনকর্ত্তা! এই বিরাট ভূ-খণ্ড ও বিস্তৃত আকাশ সমূহ তথা সমগ্র বিশ্ব জগতকে তুমি অযথা সৃষ্টি কর নাই। (তোমার আজ্ঞাবহ দাস বানাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ;) অযথা কাজ করা হইতে তুমি পাক-পবিত্র, মহান—অতিমহান। অতএব আমাদিগকে (তোমার দাস বানাইয়া) দোযখের আজাব হইতে পরিত্রাণ দান কর। [২] যাহাকে তুমি দোযখ হইতে রক্ষা না করিবে সে চিরতরে লাঞ্ছিত হইতে বাধ্য; (যে লাঞ্ছনাকে মানুষ পাপ করিয়া নিজেই নিজের উপর টানিয়া আনে) এবং (এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা) যাহারা নিজেই নিজের উপর অত্যাচারী তাহাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী হইবে না।

[৩] হে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা! ঈমানের প্রতি আহ্বানকারীর (তথা আপনার কোরআন, আপনার রসুল ও নায়েবে-রসুলগণের) উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনিতে পাইলাম যে, "হে বিশ্ববাসীরা! তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তার উপর ঈমান আন" আমরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছি এবং আপনার প্রতি ঈমানকে সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। হে পালনকর্ত্তা! আপনি আমাদের সমুদয় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন সৎলোকদের দলভুক্ত থাকিতে পারি এইরূপ তৌফিক দান করুন। [৪] হে আমাদের পালনকর্ত্তা! আপনি আমাদিগকে ঐ জিনিষ দান করুন—পয়গাম্বরগণের মারফতে আপনি যে জিনিষের আশা দিয়াছেন (অর্থাৎ চির সুখময় বেহেশত) এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনি স্বীয় ওয়াদা অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না। (কিন্তু আমাদের নিজেরই ভরসা নাই যে, আমরা আপনার ওয়াদার বস্তু বেহেশত লাভের উপযুক্ত মোমেন হইতে পারিব কি—না। তাই মনে সংশয়ের উদয় হয়, আশঙ্কা আসে এবং আপনার নিকট ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হই।)

[৫] (এইরূপে সাচ্চা দেলে যাহারা স্বীয় পালনকর্ত্তার নিকট দোয়া করিয়া থাকে তাহাদের সেই দোয়া তিনি কবুল করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ বলেন—) আমি কোনও কর্ম্মীর কোন কর্ম্ম ও আমলকেই বিফল যাইতে দেই না; এ বিষয়ে প্রত্যেক নর-নারীই সমান। কারণ উভয়ই (আল্লার বন্দা হিসাবে) সম পর্য্যায়ভুক্ত। তাই যাহারা আমার রাস্তায় নানাপ্রকার কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, দেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া হিজরত বরণ করে এবং জেহাদ করে ও শাহাদত বরণ করে তাহাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা আমি নিশ্চয় মাফ করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে বেহেশতে স্থান দান করিব, যাহার মহল সমূহের সংলগ্নে সুশীতল নদী-নহর বহিতে থাকিবে! এসব সামগ্রী কর্ম্ম-ফল স্বরূপ আল্লার নিকট পাওয়া যাইবে; আল্লাহ প্রদত্ত কর্ম্ম-ফল অতি উত্তম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

[৬] তোমরা কাফেরদিগকে জ াকজমকের সহিত শহরে শহরে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইও না (যে, তাহারা আল্লার প্রিয়পাত্র—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপযুক্ত। তাহা কখনই নহে) [৭] এসব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী জ াকজমক মাত্র; এই জীবনের পরই তাহাদের একমাত্র বাসস্থান হইবে দোযখ বা নরক এবং উহা অতিশয় কষ্ট-ক্লেশের স্থান। [৮] কিন্তু যাহারা স্বীয় পালনকর্ত্তার ভয়-ভক্তির অধীনে জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে তাহাদিগকে বেহেশত দান করা হইবে যাহার মহল সমূহের সংলগ্নে নদী-নহর প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সে বেহেশতে তাহারা আল্লার মেহমানরূপে চিরকাল বসবাস করিতে থাকিবে। নেক বান্দাদের জন্য আল্লার নিকট রক্ষিত সামগ্রী অতি উত্তম।

[৯] পুর্ব্বের আসমানী কেতাবধারী লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা আল্লার উপর ঈমান রাখে এবং স্বীয় কেতাবের সঙ্গে মোসলমানদের প্রতি অবতারিত কেতাবের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখে এবং অন্তরে খোদার ভয়-ভীতি রাখিয়া থাকে। হীন স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া আল্লার (কেতাবের) আয়াতসমূহকে বিকৃত করে না; তাহারা স্বীয় পালনকর্ত্তার নিকট তাহাদের কার্য্যের প্রতিদান লাভ করিবে। আল্লাহ অতি সত্বরই এই সব হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিবেন।

[১০] হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্যধারণকারী হও, প্রতিযোগিতার সহিত অটল ও স্থির থাকিতে অভ্যস্ত হও, (বাহ্যিক ও আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষা কর* এবং আল্লার প্রতি ভয়-ভক্তি রাখ; তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।

উত্তমরূপে অজু করা উচিৎ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, অজুর সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ময়লা ইত্যাদি হইতে পরিষ্কার করা উত্তম ও ভালরূপে অজু করার মধ্যে শামিল।

---

* বাহ্যিক সীমান্ত রক্ষার অর্থ হইতেছে—ইসলামী রাষ্ট্র ও মোসলমানদিগকে হেফাজত ও কাফেরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য মোজাহেদরূপে সীমান্ত রক্ষাকার্য্যে যোগদান করা। ইহার বহু বহু ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে।

আন্তরিক সীমান্ত রক্ষা করার অর্থ হইতেছে—স্বীয় অন্তরকে নফ্‌ছ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে এবং কর্ম্মজীবনকে নফ্‌ছ ও শয়তানের দখল হইতে রক্ষা করা। ইহার সহজ উপায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক হাদীছে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বিস্বাদময় তিক্ততার কারণসমূহ বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও পূর্ণ ও উত্তমরূপে অজু করায় অভ্যস্ত হওয়া, এক নামায পড়ার পর পরবর্ত্তী নামাযের প্রতি আকৃষ্ট ও অপেক্ষারত অবস্থায় থাকা এবং বাসস্থান হইতে মসজিদ দুরে হইলেও সর্ব্বদা মসজিদের জমাতে শরীক হওয়া (—এইভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে নিজকে আল্লার গোলামীতে নিয়োজিত রাখা) ইহাই হইল (আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্তরক্ষা, ইহাই হইল সীমান্তরক্ষা। (তিরমিজী) (ইহা দ্বারা শয়তানের আক্রমণ হইতে অন্তর সুরক্ষিত থাকিয়া দেহ-রাজ্য শয়তানের তাবেদারী মুক্ত থাকিবে।)

১১০। **হাদীছ ঃ**—উছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হজ্জের দিন) আরাফার ময়দান হইতে যখন রওয়ানা হইলেন, রাস্তায় এক স্থানে সওয়ারী হইতে নামিয়া পাহাড়ের এক বাঁকে যাইয়া প্রস্রাব করিলেন এবং তাড়াতাড়ি অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। আমি তাঁহাকে অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। আমি আরজ করিলাম, হুজুর নামায পড়িবেন কি? তিনি বলিলেন, নামাযের স্থান সম্মুখে↑। এই বলিয়া পুনরায় সওয়ার হইয়া চলিলেন। মোজদালেফার ময়দানে পৌঁছিয়া খুব ভালরূপে অজু করিলেন, তারপর এক্বামত বলা হইলে মাগরেবের নামায আদায় করিলেন। তারপর সকলে নিজ নিজ উট বাঁধিয়া আসিলে পুনরায় এক্বামত বলা হইল এবং এশার নামায পড়িলেন; মধ্যভাগে কোনও নামায পড়েন নাই।

অজুর সময় উভয় হাতে মুখ ধৌত করিবে

১১১। **হাদীছ ঃ**— একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) অজু করিতে বসিলেন। এক হাতের অঞ্জলীতে পানি লইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর আবার পানি লইয়া উহার সঙ্গে দ্বিতীয় হাত মিলাইয়া দুই হাত দ্বারা মুখ ধুইলেন। তারপর এক হাতের অঞ্জলীতে পানি লইয়া ডান হাত (কনুই পর্য্যন্ত) ধৌত করিলেন এবং বাম হাতও এইভাবে ধুইলেন। তারপর মাথা মছেহ করিয়া এক আঁজল পানি লইয়া ডান পায়ের উপর ঢালিয়া দিয়া ধৌত করিলেন এবং ঐরূপে বাম পাও ধুইলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন, "আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপে অজু করিতে দেখিয়াছি।"

প্রত্যেক কাজে এমন কি স্ত্রীসহবাসের পূর্ব্বেও বিছমিল্লাহ বলা

১১২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পূর্ব্বে—*

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

↑ কারণ হজ্জের সময় আরাফার ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া এশার নামাযের ওয়াক্তে মোজদালেফায় পৌঁছিয়া সেখানেই মাগরেব এবং এশা উভয় নামাযই এশার ওয়াক্তে পড়িতে হয়। পথিমধ্যে মাগরেবের নামায আদায় করিলে সেই নামায শুদ্ধ হইবে না।

* দোয়াটির উচ্চারণ এই—বিছমিল্লাহে, আল্লাহুম্মা জান্নেব্‌ নাশ্‌-শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্‌-শায়তানা মা-রাজাক্‌তানা।

অর্থ—আল্লার নামে আরম্ভ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদিগকে যাহা দান কর উহাকেও শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

এই দোয়াটি পড়িয়া লয় এবং ঐ মিলনের দ্বারা কোনও সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে শয়তান (দ্বীন ও দুনিয়ার) কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

পায়খানায় যাইতে কি দোয়া পড়িবে?

১১৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পায়খানায় যাইতে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ↑

মল-মুত্র ত্যাগের সময় কেবলামুখী বসিবে না অবশ্য সম্মুখে আড়াল থাকিলে

১১৪। হাদীছ ঃ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মল-মুত্র ত্যাগের সময় কেহ কেবলামুখী বসিবে না। কেবলা দিকে পিঠও দিবে না, পূর্ব্ব বা পশ্চিমমুখী হইয়া বসিবে।×

এই হাদীছ বর্ণনাকারী আবু-আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা কয়েকজন মোসলমান এক সময় সিরিয়া দেশে গেলাম, (সিরিয়া তখন মোসলমান অধিকৃত দেশ ছিল না।) সেখানে দেখিলাম, সমুদয় পায়খানাগুলিই কেবলামুখী করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। আমরা অপারগ অবস্থায় ঐ পায়খানায় প্রবেশ করিতাম, কিন্তু সাধ্যানুযায়ী কেবলা দিক হইতে মোড় দিয়া বসিতাম এবং (যেহেতু পূর্ণ-মাত্রায় কেবলা দিক হইতে ফিরিয়া বসা সম্ভব হইত না, তাই) আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।*

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী স্বয়ং এবং তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ত যে, আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম ও অর্থ অনুযায়ী কোন প্রকার আড়াল থাকা অবস্থায়ও, এমনকি তৈরী পায়খানার ভিতরেও কেবলামখী হইয়া মল-মুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফার মজহাব ইহাই। আড়াল সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন উহার সূত্র হইল পরবর্ত্তী হাদীছ—যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

↑ দোয়াটির উচ্চারণ এই—আল্লাহুম্মা ইন্নী-আ'উজু-বিকা মিনাল্ খুব্ ছে ওয়াল্ খাবায়েছে। অর্থ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সমস্ত দুষ্কৃতিকার (ভূত-প্রেত ইত্যাদি) হইতে এবং সমস্ত রকমের অশ্লীল অভ্যাস ও দুষ্কৃতি হইতে।

× পূর্ব-পশ্চিমমুখী বসিবার আদেশ মদীনাবাসীর জন্য। যাহাদের কেবলা দক্ষিণ।

* হাদীছ বর্ণনাকারী নিজ ঘটনার অংশটুকু বোখারী শরীফের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

পা-দানির উপর বসিয়া মল ত্যাগ করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য – মল ত্যাগের জন্য পা-দানি বিশিষ্ট পায়খানা তৈরী করা উত্তম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

১১৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন, লোকেরা বলে, মল-মুত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী বা কেবলার দিকে পিঠ করিয়া বসিবে না। অথচ আমি একদা আমার ভগ্নি—হযরতের বিবি হাফ্ছাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ-ছাদে উঠিয়া ছিলাম ; তথা হইতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পায়খানার ভিতর) পা-দানির উপর বসিয়া আছেন ; হযরতের পিঠ কেবলার দিকে ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ--এই হাদীছ দৃষ্টেই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী এবং কোন কোন ইমামের মজহাব এই যে, পায়খানার ভিতর এমনকি সম্মুখে বা পেছনে কোন আড়াল থাকিলেই মল-মুত্র ত্যাগে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা দোষণীয় নহে। ইমাম আবু হানিফার মজহাব প্রথমোক্ত হাদীছটির উপর স্থাপিত। তাঁহার মজহাবে কোন অবস্থাতেই মল-মুত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী হওয়া বা কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া জায়েয নহে। তিনি বলেন, ১১৪ নং হাদীছটি অতি সুস্পষ্ট এবং বিধানগত ঘোষণা স্বরূপ ব্যাপক আকারের মৌখিক উক্তি। পক্ষান্তরে ১১৫নং হাদীছের বিষয়টি হযরতের উক্তি নহে, অধিকন্তু উহা ধীর-স্থিরবিহীন অতি ক্ষীণ ও দ্রুত অপসারিত দৃষ্টির মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার একজনের এক নজরে অনুভূত বিষয় ; ইহাতে প্রকৃত রূপের দ্বিধাহীন অবগতি হয় না। এত দুর্ব্বল বিষয় দ্বারা ১১৪নং হাদীছে বর্ণিত সুস্পষ্ট মৌখিক উক্তি ও বিধানগত ব্যাপক আকারের ঘোষণার মধ্যে কোন প্রকার রদ-বদল করা যায় না।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বাড়ীর ভিতরে মল ত্যাগের জন্য বিশেষ স্থান তৈরী করার বাস্তবতা সম্পর্কেও একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন।

মল ত্যাগে নারীদের অরণ্যে-প্রান্তরে যাওয়া

উপরের পরিচ্ছেদে তৈরী পায়খানায় মল ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, উহার পরে স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা না থাকিলে জনশূন্য মাঠে-জঙ্গলে, পাথারে-প্রান্তরে মল ত্যাগের জন্য যাইতে পারে। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমটি হইল—লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন মানুষের

দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার স্থল না হয়। নৌকা চলাচলের নদী-খালের কূলে যেভাবে মল ত্যাগের জন্য বসা হয় উহা হারাম; ঐরূপ ব্যক্তিদের প্রতি হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক লা'নৎ ও অভিশাপের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল— মালিকের আপত্তির জায়গা বা যেস্থানে মল ত্যাগ করিলে লোকদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা; যেমন—পথে, ঘাটে, ছায়ায় বা ফলের গাছের নিকটবর্ত্তী ইত্যাদি স্থানেও মল ত্যাগ করিবে না। এই সব বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনে নারীগণও বিশেষ পর্দ্দার সহিত বাহিরে মল ত্যাগের জন্য যাইতে পারে। অবশ্য নারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে শুধু রাত্রে যাওয়ার অভ্যস্ত হওয়া চাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে মদীনা শরীফে পরবর্ত্তী সময়ে মোসলমানগণ নিজ গৃহে পায়খানা তৈরী করিয়া নিতেন; হযরতের গৃহে তৈরী পায়খানা ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে অন্ধকার যুগের ব্যবস্থাই চলিত যে, বাড়ীতে মল ত্যাগের ব্যবস্থা থাকিত না। মল ত্যাগের জন্য বাহিরে যাওয়া হইত—তখন নারীগণ রাত্রেই বাহিরে যাইতেন।

১১৬। হাদীছ ঃ— আশেয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও মদীনার একটি বৃহৎ প্রান্তরে মল ত্যাগের জন্য যাইয়া থাকিতেন; তাঁহারা শুধু কেবল রাত্রেই বাহির হইতেন; সাধারণভাবে তাঁহারা অভ্যাস করিয়া নিয়া ছিলেন—রাত্রের পর আবার রাত্রেই মল ত্যাগে বাহির হইতেন। ওমর (রাঃ) হযরতের বিবিগণের (পর্দ্দার সহিতও) বাহিরে যাওয়া বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) সেইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করিতেন না। একদা হযরতের বিবি সওদা (রাঃ) শরীয়তী পর্দ্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর গভীর রাত্রে পর্দ্দার সহিতই মল ত্যাগে বাহির হইলেন। ওমর (রাঃ) কোথাও বসিয়াছিলেন তথা হইতে তিনি সওদা (রাঃ)কে যাইতে দেখিলেন। সওদা (রাঃ) মোটা ও দীর্ঘ কায়া বিশিষ্টা ছিলেন, তিনি পরিচিত লোকদের ঠাহরে আসিয়া যাইতেন; তাই ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ঠাহর করিয়া নিতে পারিলেন। ওমর (রাঃ) উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতর্ক হউন— হে সওদা! আপনি আমাদের জন্য অপরিচিত থাকিতে পারেন না, আমরা আপনাকে চিনিয়া ফেলিলাম। সুতরাং চিন্তা করুন! কি ভাবে আপনি বাহির হইতে পারেন? ওমর (রাঃ) ঐ অভিলাসই প্রকাশ করিতে ছিলেন যে, হযরতের বিবিদের জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া সম্পুর্ণরূপে নিষেধ করা হউক।

সওদা (রাঃ) ফেরার পথে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন যে, ওমর আমাকে এই এই বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার গৃহে রাত্রের আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরতের হাতে তখন একখানা আহার্য্য গোশতের হাড় ছিল; এমতাবস্থায়ই হযরতের প্রতি আল্লাহ

তায়ালা অহী অবতীর্ণ করিলেন। কিছু সময়ের মধ্যে অহী অবতরণের সমাপ্তি হইল—তখনও ঐ হাড়খানা হযরতের হাতেই ছিল। হযরত (দঃ) তখন বলিতে-ছিলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন ; তোমরা প্রয়োজনে (বিশেষ পর্দ্দার সহিত) বাহির হইতে পারিবে। এই ব্যাপারে বিশেষ পর্দ্দার বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নাযেল হইয়াছে।*

ব্যাখ্যা ঃ—এস্থানে উদ্দেশ্য বিশেষ পর্দ্দার আয়াতটি এই—

يَاۤ أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ -

"হে নবী! আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মোমেনগণের বউ-ঝি নারীদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন (প্রয়োজনে পর্দ্দার সহিত বাহির হইলে অতিরিক্ত পর্দ্দারূপে) ঘোমটা অধিক নিচ তথা লম্বা করিয়া দিয়া নেয়। (যাহাতে মাথার সহিত চেহারাও পূর্ণ পর্দ্দায় থাকে।) (২২ পাঃ ৫ রুঃ)

পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা

১১৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই মল-মূত্র ত্যাগের জন্য বাহির হইতেন, আমি এবং আমার সঙ্গী আর একটি ছেলে হযরতের এস্তেঞ্জার জন্য পানি লইয়া আসিতাম এবং সরু মাথার লোহা লাগান একখানা লাঠিও নিয়া আসিতাম।

(কারণ, রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ মল-মূত্র ত্যাগের পর অজু করিয়া থাকিতেন এবং অজু করার পরে তিনি নামাযও পড়িতেন, এবং বাহিরে নামায পড়াকালীন তিনি ঐ লাঠিখানাকে সম্মুখে ছোত্‌রা বা আড়াল স্বরূপ গাড়িয়া লইতেন।)

ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ

১১৮। হাদীছ ঃ— আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কিছু পান করিবার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিবে না, মল-মূত্র ত্যাগের সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ছুঁইবে না এবং ডান হাত দিয়া এস্তেঞ্জা করিবে না।

---

* হাদীছখানা ২৮, ৭০৮, ৭৮৮, এবং ৯২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ; অনুবাদে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ঢিলা দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করা দরকার

১১৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল ত্যাগের জন্য বাহির হইলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে রওয়ানা হইলাম। নবী (দঃ) পথ চলাকালীন এদিক ওদিক দেখিতেন না, কাজেই আমি তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলাম (যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া দরকারী কোন ফরমায়েশ দিতে পারেন।) নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, এস্তেঞ্জার জন্য কয়েকটি পাথরের টুক্‌রা আন; হাড্ডি বা লিদ্ (পশুর শুষ্ক মল) আনিও না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করিয়া কয়েকটি পাথরের টুক্‌রা তাঁহার নিকটবর্ত্তী রাখিয়া দূরে সরিয়া পড়িলাম। তিনি মল ত্যাগের পর উহা ব্যবহার করিলেন।

লিদ্ দ্বারা কুলুখ ব্যবহার নিষিদ্ধ

১২০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের জন্য বাহির হইলেন এবং আমাকে তিনটি প্রস্তরখণ্ড আনিতে বলিলেন। আমি প্রস্তরখণ্ড দুইটি পাইলাম; আর না পাইয়া একটি শুষ্ক গোবরখণ্ড লইয়া আসিলাম। নবী (দঃ) প্রস্তরখণ্ড দুইটী গ্রহণ করিলেন, গোবরখণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এইটা নাপাক বস্তু।

প্রত্যেক অঙ্গ এক দুই বা তিনবার ধুইয়া অজু করা

১২১। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (দরকার বশতঃ) এক একবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কোন সময়) দুই দুইবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২৩। হাদীছ ঃ— একদিন ছাহাবী ওছমান (রাঃ) পানির পাত্র আনাইলেন এবং দুই হাতের উপর তিনবার পানি ঢালিয়া ধৌত করিলেন, তারপর ডান হাত দ্বারা পাত্র হইতে পানি উঠাইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখমণ্ডলকে তিনবার ধৌত করিলেন এবং দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, তারপর মছেহ করিলেন, তারপর দুই পা টাখ্‌নার উপর পর্য্যন্ত তিন তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত পড়িবে; অর্থাৎ—নামায পড়া কালীন দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি ধ্যান না করিবে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, ওসমান (রাঃ) অজু করার পর বলিলেন, আমি একটি হাদীছ বয়ান করিব ; যদি কোরআন শরীফের একটি আয়াত না থাকিত তবে আমি উহা বয়ান করিতাম না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িবে ; নামায শেষ করা পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বের সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত হাদীছটি বয়ান করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছেন এই জন্য যে, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিয়া হাদীছটির পূর্ণ তথ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে যে, শুধু অজু ও নামায দ্বারা সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে ; অথচ কবিরা গোনাহ খাঁটি তওবা ছাড়া মাফ হয় না—ইহাই শরীয়তের বিধান।

প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হাদীছের মর্ম্ম ইহা নয় যে, কবিরা গোনাহও তওবা ব্যতিরেকেই মাফ হইয়া যাইবে। কারণ হাদীছটির মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য রহিয়াছে যে, "উত্তমরূপে অজু করিয়া" ; অজু উত্তম হওয়ার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কবিরা গোনাহ সংঘটিত হইয়া থাকিলে উহা হইতে তওবা করিয়া অজু করিবে। উত্তমরূপে অজু করার অর্থে বাহ্যিক অপবিত্রতা পানি দ্বারা ধুইয়া দুর করার ন্যায় আত্মিক অপবিত্রতা তওবা দ্বারা ধুইয়া দূর করাও নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই অজুর শেষে এইরূপ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"হে আল্লাহ! আমার তওবা কবুল কর এবং আমার পবিত্রতা কবুল কর।" তদুপরি পানি দ্বারা অঙ্গসমূহ ধোয়া শেষে তওবার পুনরোক্তি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ

لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান করি। তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। তুমি এক—তোমার শরীক নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করিতেছি।" এই দোয়াটি অজু সমাপ্তে পড়িতে হয়।

ওসমান (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীছেও একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা আছে যে, "নিয়মিত অজু করিয়া আল্লার প্রতি এরূপ একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে যে, নামায পড়াকালীন দুনিয়ার কোন খেয়াল যেন অন্তরে স্থান না পায়।" এই অবস্থা হাসিল করার চেষ্টা করিলেই বুঝে আসিবে, ইহা হাসিল

করা কত কঠিন এবং কত সাধনা সাপেক্ষ। আর সাধনার আরম্ভই হইল—কবিরা গোনাহ হইতে সম্পূর্ণ বাঁচিয়া থাকা এবং কবিরা গোনাহ হইয়া থাকিলে উহা হইতে খাঁটী তওবা করা। কবিরা গোনাহের আবিলতাময় অন্তর কখনও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঐরূপ নিবেদিত হইতে পারে না।

এস্থলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা পদ্ধতির নৈপূণ্য উপলব্ধি করা যায়। নবী (দঃ) মানুষকে কোন আমলের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আমলের করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্য্যায়টা উহ্য রাখিয়া শুধু প্রাথমিক পর্য্যায়ের বাহ্যিক উল্লেখ করিতেন ; আর উক্ত আমলের ফজিলতটা বর্ণনা করিতেন উহার সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের। ইহাতে মানুষের মনোবল ও সাহস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আশার আলোতে সে অগ্রসর হওয়ায় আকৃষ্ট হয় ; অধিকন্তু সে আশায় বুক বাঁধিয়া ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে পৌঁছিতেও সক্ষম হইবে। অবশ্য বর্ণনার মধ্যে করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের প্রতিও ইঙ্গিত থাকে যেন কুটিল স্বভাবের লোকেরা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার অবকাশ না পায়।

● যেই আয়াতটির দরুন ওসমান (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ বর্ণনায় বাধ্য হইয়াছেন ; হাদীছ বর্ণণাকারী বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى......

"অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত হেদায়েতবাণী গোপন রাখে তাহাদের প্রতি আল্লার লানৎ ও অভিশাপ......।" (২ পারা ২ রুকু)

ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপদেশ লাভ হয়। যথা—

১। কোরআন হাদীছের জ্ঞান ও এলম আল্লাহ তায়ালা যাহাকে দান করিয়াছেন তাহার কর্ত্তব্য হইবে নিজ দায়িত্ব বোধে উহা অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

২। কোরআন-হাদীছ শিক্ষাদানে নিজকে শিক্ষার্থীদের প্রতি উপকারক গণ্য করিবে না, বরং স্বীয় কাঁধের বোঝা নামাইবার সুযোগস্থল গণ্য করিবে।

৩। আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া নিজ হইতেই কোরআন-হাদীছ শিক্ষা দানে উদগ্রিব হইয়া উঠিতে হইবে।

অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়া

১২৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—অজু করিলে নাকে পানি দিবে এবং কুলুখ বা ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে।

১২৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—অজুর মধ্যে নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে। ঢিলা বেজোর সংখ্যায় ব্যবহার করিবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি-পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে হাত ধৌত করিয়া লইবে। কারণ, নিদ্রাবস্থায় হাত কোথায় লাগিয়াছে তাহা জানা নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইবলিসের বয়ানে আরও একটি হাদীছ আসিবে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করাকালে বিশেষভাবে তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে ; মানুষের নিদ্রা সময় তাহার নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে শয়তান অবস্থান করিয়া থাকে।

বিঃ দ্রঃ—অজুর মধ্যে কুল্লিও করিতে হয়; ১২৩নং হাদীছে উহার প্রমাণ রহিয়াছে।

অজুর সময় পায়ের গোড়ালী ভালরূপে ধৌত করিবে

১২৬। হাদীছ ঃ—একদা আবু হোরায়রা (রাঃ) কোথাও যাইতেছিলেন, কয়েকজন লোক একটি পাত্র হইতে অজু করিতেছিল ; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—পূর্ণ ও উত্তমরূপে অজু কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—যে সমস্ত গোড়ালী শুষ্ক থাকিবে উহা দোযখে পুড়িবে।

(৫৪ নম্বর হাদীছ দ্বারা এস্থলে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অজুর মধ্যে উভয় পা পূর্ণরূপে ধৌত করা আবশ্যক। ভিজা হাতে সুধু মুছিয়া নিলে চলিবে না।)

ইবনে ছীরীন (রঃ) আংটির স্থানও ভালরূপে ধৌত করিতেন।

চাপ্পলে পা রাখিয়া পা ধৌত করা যায়, কিন্তু মছেহ করা যায় না

১২৭। হাদীছ ঃ—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনি চারিটি কাজ করেন যাহা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করিতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি কি ? সে বলিল—(১) হজ্জের তাওয়াফ করার সময় কাবা শরীফের শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ দুইটিকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অন্য কোণকে নয়। (২) পশমহীন চামড়ার চাপ্পল পায়ে দিয়া থাকেন। (৩) আপনি জরদ (কমলা) রং ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) মক্কায় থাকাকালীন আপনি ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকেন অথচ সকলে প্রথম তারিখেই এহ্‌রাম বাঁধে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ দুই কোণ ব্যতীত অন্য কোণকে আলিঙ্গন করিতে দেখি নাই। পশমহীন চামড়ার চাপ্পল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

ব্যবহার করিতেন এবং উহা পায়ে রাখিয়া অজু করিতেন, তাই আমি উহাকে পছন্দ করি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জরদ রং ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি; সে জন্য আমিও উহা ব্যবহার করি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (মিকাৎ-স্থান হইতে) যাত্রা আরম্ভের পূর্ব্বে এহ্‌রাম বাঁধিতে দেখি নাই। (মক্কায় অবস্থান কালে হজ্জ করিলে হজ্জের জন্য যাত্রা ৮ তারিখেই আরম্ভ হয়—মিনার দিকে; তাই ৮ তারিখের পুর্ব্বে এহ্‌রাম বাঁধি না।)

অজু ও গোসলে ডান দিকের কাজ প্রথমে করিবে

১২৮। হাদীছ ঃ—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী-কন্যা জয়নাব (রাঃ) মারা গেলে পর তাঁহার গোসলদানকারিণীদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিলেন—ডান পার্শ্ব এবং অজুর অঙ্গ সমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিও।

১২৯। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেক কার্য্যেই ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভাল বাসিতেন—জুতা পায়ে দেওয়া, মাথা আঁচড়ান, অজু করা গোসল করা ইত্যাদি।

নামাযের সময় হইলে পানি তালাশ করিবে

১৩০। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘটনা দেখিয়াছি। একদা আছরের নামায উপস্থিত হইল, সকলেই পানি তালাশ করিয়া হয়রান, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে সামান্য একটু অজুর পানি হাজির করা হইল; তিনি স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে অজু করিতে আদেশ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের তালুর নীচ হইতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছিল এবং উপস্থিত সকলে উহা দ্বারা অজু করিতে সমর্থ হইল।

মানুষের চুল ভিজান পানি পাক

১৩১। হাদীছ ঃ—ইবনে ছীরীন (রঃ) আবীদাহ্ নামক অতি প্রাচীন একজন তাবেয়ীকে বলিলেন, আমার নিকট নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক আছে, আমি উহা আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। আবীদাহ্ বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক হাসিল করিতে পারিলে সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন-দৌলত পাওয়ার চেয়েও অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

১৩২। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সময়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মাথা কামাইয়াছিলেন, তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ) (আনাছের মাতার ২য় স্বামী) সর্ব্বাগ্রে হযরতের চুল মোবারক হাসিল করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—ইমাম বোখারী (রঃ) এই দুইটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মানুষের চুল পাক, সুতরাং উহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হয় না।

যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে উহা সাতবার ধুইবে

১৩৩। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কুকুর যদি কোন পাত্রে মুখ দেয় তবে উহাকে সাতবার ধুইবে।*

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, কুকুরের মুখ দেওয়া পানি ব্যতীত অন্য আর কোনও পানি না পাইলে ঐ পানি দ্বারাই অজু করিবে।

ইমাম ছুফ্‌ইয়ান বলেন, এই মছআলাটি ঠিক, কারণ পানি থাকাকালীন অজু করিতেই হইবে, কিন্তু কুকুরে মুখ দেওয়া পানি পাক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয় বলিয়া ঐ পানি দ্বারা অজু করিয়া পরে তায়াম্মুমও করিবে।+

১৩৪। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পূর্ব্বকালের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—সে কোথাও যাইতে ছিল; পথিমধ্যে সে পিপাসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িল। একটি কুপ দেখিতে পাইল; (কিন্তু তথায় পানি উঠাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না;) সে কুপে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। কুপ হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইল, একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাইতেছে এবং কাঁদা চাটিতেছে। ঐ ব্যক্তি ভাবিল, কুকুরটিরও ঐরূপ কষ্ট হইতেছে যেরূপ আমার হইতেছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কুপে অবতরণ করিল, এবং তাহার চামড়ার মোজা ভরিয়া পানি লইল। কুপ হইতে উঠিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; উভয় হাতের সাহায্যে উঠিতে হয়; তাই পানি ভরা মোজা মুখে কামড় দিয়া উঠাইতে হইল। এইরূপ কষ্টে পানি কুপ হইতে উঠাইয়া তৃষ্ণাতুর কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির এই পরিশ্রম ও কার্য্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, পশুর প্রতি সদ্ব্যবহারে ছওয়াব হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, فى كل كبد رطبة اجر "প্রত্যেক জীবের সেবায়ই ছওয়াব আছে।"

---

* মোসলেম শরীফে আরও আছে—অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ধুইবে।

\+ ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমামগণের মতে কুকুরের মুখ দেওয়া পানি বড় নাপাক। উহা দ্বারা অজু কি হইবে? ঐপানি যথায় লাগিবে তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়ত দৃষ্টে কুকুর অতিশয় ঘৃণিত জীব, উহার সংশ্রব দোষণীয় ও ক্ষতিকারক। বোখারী ও মোসলেম শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা যায় না।" আরও আছে, "যে ব্যক্তি কুকুর পালিয়া রাখিবে প্রত্যহ তাহার নেকীর এক বিরাট অংশ বরবাদ হইতে থাকিবে।" কিন্তু সে জন্য কুকুরের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করাতে ছওয়াব না হইবার কোন কারণ নাই। দয়াল প্রভু আল্লাহ তায়ালা পরোপকার এবং দয়া ও করুণাকে অতি ভালবাসেন; এমনকি ঘৃণার পাত্রেও উহার বিকাশ পছন্দ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধিহীন জীব কুকুর কোন ক্ষতি করিয়া ফেলিলেও উহার উপর নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করা চাই না, যদিও উহা ঘৃণিত বস্তু। নিম্নের হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করুন।

১৩৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (প্রথম অবস্থায় যখন মোসলমানদের দরিদ্রতার দরুন মসজিদ সমূহে দরওয়াজা ইত্যাদি লাগাইয়া হেফাজত করার সামর্থ ছিল না; তখন) মসজিদের ভিতর কুকুর আসা-যাওয়া করিত এবং সে জন্য মসজিদ ধৌত করার কোন ব্যবস্থা করা হইত না। (কারণ, মসজিদের জমি পাকা পোক্তা ছিল না, উহাতে কোন বিছানাপত্রের ব্যবস্থা ছিল না; উহাতে ছিল শুধু মরুভূমির বালু বা কাঁকর যাহা শুষ্ক হইলেই পাক গণ্য হয়।)

মল-মুত্রের দ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে ?

আ'তা (রঃ) তাবেয়ী বলিয়াছেন—মল বা মূত্র দ্বার দিয়া পোকা ইত্যাদি বাহির হইলে পুনঃ অজু করিতে হইবে। জাবের (রাঃ) ছাহাবী বলিয়াছেন—নামাযের মধ্যে হাসিলে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে, অজু পুনঃ করিতে হইবে না।*

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, চুল অথবা নখ কাটিলে অজু নষ্ট হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সব সময়ই (যুদ্ধের ময়দানে) যখম ইত্যাদি নিয়া নামায পড়িতেন। বহু আলেমগণ বলিয়া থাকেন, রক্ত বাহির হইলে অজু নষ্ট হয় না।↑ একজন আলেম, তাঁহার থুথুর সহিত রক্ত দেখা গেল, তিনি নামায পড়িয়া লইলেন।× শিঙ্গা লাগাইলে ক্ষতস্থান ধুইলেই চলিবে, (গোসল করিতে হইবে না।)

---

* কিন্তু সশব্দে জোরে হাসিলে ইমাম আবু হানিফার মতে অজুও ভঙ্গ হইবে।

↑ যদি শুধু রক্ত দেখা যায় এবং উহা ক্ষতস্থান হইতে বহিয়া পড়ার মত না হয় তবে উহা দ্বারা অজু নষ্ট হইবে না, নতুবা ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

× থুথুর সহিত অতি সামান্য রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু থুথু লালবর্ণ ধারণ করে নাই তবে অজু নষ্ট হইবে না, নচেৎ ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

১৩৬। **হাদীছঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া নামাযের অপেক্ষা করিতে থাকে ঐ সময়টুকু তাহার জন্য নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যাবৎ সে অজু ভঙ্গ না করে। এক ব্যক্তি আবু হোরায়রা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, অজু ভঙ্গকারী কি জিনিষ? তিনি বলিলেন, (যেমন) বায়ু বাহির হওয়া।

অজুর সময় অন্যে পানি ঢালিয়া দেওয়া

১৩৭। **হাদীছঃ**—মুগীরা (রাঃ) এক ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) মল ত্যাগ করিয়া আসিয়া অজু করিলেন, মুগীরা (রাঃ) তাঁহাকে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন, মাথা মছেহ করিলেন এবং চামড়ার মোজা পায়ে ছিল, উহার উপর মছেহ করিলেন।

অজু ছাড়া কোরআন শরীফ পড়া যায়

ইব্রাহীম নাখয়ী নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন, গোসলখানায় কোরআনের আয়াত পড়া যায় এবং বিনা অজুতে কোরআন শরীফের আয়াত সম্মিলিত বিষয় লিখিতে পারা যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, গোসলখানার ভিতর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিলে তাহাকে সালাম করা যায়; অন্যথায় সালাম করা চাই না।

উল্লিখিত পরিচ্ছেদের মুল মছআলাটি ১০৯নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করার পূর্ব্বেই কোরআন শরীফের ১০টি আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছিলেন।

বেহুশ না হইয়া মাথায় চক্র আসায় অজু নষ্ট হইবে না

১৩৮। **হাদীছঃ**—আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, আমি আমার ভগ্নি আয়েশার নিকট আসিয়া দেখিলাম—সকলেই নামায পড়িতেছেন। ঐ সঙ্গে আয়েশা (রাঃ)ও শরীক হইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? তিনি سبحان الله পড়িলেন এবং হাত দ্বারা আকাশের প্রতি ইশারা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লার কুদরতের বড় নিদর্শন (প্রকাশের কারণে এই নামায)? তিনি ইশারায় বলিলেন, হাঁ। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়াইতেছিলেন; আমিও নামাযে শরীক হইলাম। হযরত (দঃ) অত্যধিক লম্বা নামায পড়াইলেন। (দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে) আমার মাথায় চক্র আসিয়া গেল, এমন কি আমি আমার নিকটবর্ত্তী একটি মশক হইতে মাথায় পানি দিতে লাগিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামায শেষ করিলেন তখন সূর্য্যগ্রহণ ছাড়িয়া গিয়াছিল। নামাযান্তে তিনি ওয়াজ করিলেন—আল্লার প্রশংসা ইত্যাদি করার পর বলিলেন, আল্লার সৃষ্টি যত কিছু

আছে এই সময়ে সব কিছু আমাকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি বেহেশত-দোযখও দেখান হইয়াছে এবং আমাকে অহী দ্বারা খবর দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে কবরের মধ্যে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রত্যেককে কবরের মধ্যে (আমার প্রতি ইশারা করিয়া) প্রশ্নও করা হইবে—এই ব্যক্তির বিষয় কি জান? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, তিনি আল্লার রসুল, তিনি মোহাম্মদ (দঃ); দুনিয়াতে আমাদের নিকট আল্লার হুকুম-আহকাম ও হেদায়েত নিয়া পৌছিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে, আরামে শুইয়া থাকুন; প্রকৃত পক্ষেই আপনি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। আর যে মৃত ব্যক্তি মোনাফেক হইবে তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইলে সে বলিবে, আমি কিছুই বুঝি নাই, অন্যান্য লোকদিগকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমিও সেরূপ বলিয়াছিলাম। তখন ঐ মোনাফেকের উপর ভীষণ আজাব আরম্ভ হইয়া যাইবে।

অজুর মধ্যে পূর্ণ মাথা একবার মছেহ করা এবং টাখ্‌না পর্য্যন্ত পা ধোয়া

বিশিষ্ট তাবেয়ী সায়ীদ এবনুল-মোছাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকও পুরুষের ন্যায় মাথা (একবারই) মছেহ করিবে।

১৩৯। **হাদীছ:**—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে বলিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু কিরূপে করিতেন তাহা আপনি দেখাইতে পারেন কি? তিনি বলিলেন হাঁ, এই বলিয়া পানি আনাইলেন এবং হাতের উপর পানি ঢালিয়া দুইবার হাত ধৌত করিলেন, তারপর তিনি কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন, দুই হাত দুইবার কনুই পর্য্যন্ত ধুইলেন, তারপর দুই হাত দ্বারা একবার মছেহ করিলেন—সম্মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পেছনের দিকে গর্দ্দান পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং পিছন হইতে সম্মুখ দিকে ঐস্থান পর্য্যন্ত আনিলেন যেস্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর দুই পা টাখ্‌না পর্য্যন্ত ধৌত করিলেন।

মছআলাহ:— নারী-পুরুষ সকলের জন্যই অজুর মধ্যে মাথা মছেহ শুধু একবারই করা চাই; বিভিন্ন হাদীছে শুধু একবার মছেহ করাই উল্লেখ আছে। সুতরাং একবারের বেশী করিবে না।

● **জরীর ইবনে-আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার মেছওয়াক ভিজান পানি দ্বারা অজু করিতে দিতেন।**

অজুর ব্যবহৃত পানি অন্য কাজে ব্যবহার করা

১৪০। হাদীছঃ—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে একদা দ্বিপ্রহরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন। তাঁহার জন্য অজুর পানি আনা হইল; তিনি অজু আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইয়া শরীরে মলিতে লাগিল। নবী (দঃ) জোহরের নামায দুই রাকাত পড়িলেন, আছরের নামাযও (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন; নামাযের সময় তাঁহার সম্মুখে একটি লাঠি খাড়া করা হইয়াছিল।

১৪১। হাদীছঃ—আবু মূসা (রাঃ) বলেন, যেয়েররানা নামক স্থানে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, বেলাল (রাঃ)ও সঙ্গে ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরতের (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে দান করিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, এখনই উহা পূরণ করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, (সত্বরই উহা পাইবার) "সুসংবাদ গ্রহণ কর", সে উত্তর করিল, "সুসংবাদ গ্রহণ কর" একথা আপনি বহুবার বলিয়াছেন। এই উত্তরে নবী (দঃ) রাগান্বিত অবস্থায় আবু মূসা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সে সুসংবাদ ফেরত দিয়াছে, তোমরা গ্রহণ কর। আমরা আরজ করিলাম, নিশ্চয় আমরা গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি একটি পাত্র ভরিয়া পানি আনিতে বলিলেন; আমরা তৎক্ষণাৎ আনিলাম। তিনি (অজু করিতে) ঐ পাত্রের মধ্যেই দু-হাত ও মুখ ধুইলেন এবং উহার মধ্যেই কুল্লিও ফেলিলেন, (পানি বেশী ছিল।) তারপর বলিলেন, তোমরা দুইজন এই পানি পান কর এবং মুখ ও সীনার উপর ঢাল; আর (ইহ-পরকালের সুখ শান্তির) সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমরা ঐরূপ করিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-ছালমা (রাঃ) পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন, তোমাদের মাতার (আমার) জন্য এই পানি একটু রাখিও; আমরা রাখিয়া দিলাম।

এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু করাকালে ছাহাবীগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইবার জন্য ভীষণ ভীড় করিতেন।

১৪২। হাদীছঃ—ছায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আমাকে নিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! এ আমার ভাগিনা, অসুস্থ। নবী (দঃ) আমার মাথার উপর হাত বুলাইলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। তারপর তিনি অজু করিলেন, আমি তাঁহার অজুর পানি পান করিলাম এবং তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এমতাবস্থায় তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে-নবুওত দেখিতে পাইলাম, পাখীর ডীম্বের সমান।

স্ত্রীর সঙ্গে এক পাত্রে বা কোন মহিলার ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা

ওমর ফারুক (রাঃ) গরম পানির দ্বারা অজু করিয়াছেন এবং তিনি দরকার বশতঃ এক নাছরানী মেয়েলোকের ঘর হইতে পানি লইয়া অজু করিয়াছিলেন।

১৪৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে অজু করিয়া থাকিত। (অর্থাৎ স্ত্রীলোক কোন পাত্রের পানি দ্বারা অজু করিল অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য অজুর অনুপযোগী বিবেচিত হইবে না।)

অজুর ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে

১৪৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বলেন, আমি অসুস্থ হইয়া বেহুশ অবস্থায় ছিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং অজু করিয়া ব্যবহৃত পানি আমার উপর ঢালিয়া দিলেন; আমার হুশ ফিরিয়া আসিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মীরাস কে পাইবে? আমার বাপ-দাদা বা কোন ছেলেমেয়ে নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না; ঐ সময়ই মীরাসের আয়াত নাযিল হইল।

পাথরের, কাঠের বা পিতলের পাত্রে অজু করা

১৪৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের মজলিস সময়ে) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল; যাহাদের বাড়ী নিকটবর্ত্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্য বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু লোক বাকী থাকিল, তাহাদের অজুর ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পাথরের একটি ছোট পাত্রে পানি হাজির করা হইল। পাত্রটি এতই ছোট ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার ভিতরে হাত ঢুকাইলেন, কিন্তু হাত মেলিতে পারিলেন না; তাঁহার অঙ্গুলির নীচ হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতে লাগিল; সকলেই ঐ পানি দ্বারা অজু করিল। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, আমরা আশি জন কিংবা আরও অধিক ছিলাম।

১৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে তশরীফ আনিলেন, আমরা একটি পিতলের পাত্রে পানি হাজির করিলাম। হযরত (দঃ) ঐ পানি দ্বারা অজু করিলেন। মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করিলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত দুই দুইবার ধুইলেন এবং মাথা সম্মুখ হইতে পিছনের দিক, পিছন হইতে সম্মুখের দিক মছেহ করিলেন, তারপর পা ধৌত করিলেন।

এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা

১৪৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রায় চারি সের বা সোয়া চারি সের পানি দ্বারা গোসল করিতেন এবং প্রায় এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করিতেন।

১৪৮। হাদীছ ঃ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই ; সায়াদ (রাঃ) যাহা বর্ণনা করেন তাহা অন্য কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না।

চামড়ার মোজার উপর মছেহ করা*

১৪৯। হাদীছ ঃ— আমর ইবনে উমাইয়া(রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে চামড়ার মোজার উপর এবং পাগড়ীর উপর মছেহ করিতে দেখিয়াছি।+

১৫০। হাদীছ ঃ—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক ছফরে ছিলাম, তাঁহাকে অজু করাইবার সময় আমি তাঁহার চামড়ার মোজা খুলিবার জন্য উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন, মোজা খুলিতে হইবে না, আমি অজু অবস্থায় ইহা পায়ে দিয়াছিলাম, এই বলিয়া হযরত (দঃ) মোজার উপর মছেহ করিলেন।

গোশত ইত্যাদি খাইলে অজু নষ্ট হয় না

আবু বকর, ওমর এবং ওসমান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ গোশত খাইয়া নূতন অজু করিতেন না। (গোশত খাওয়ার পূর্ব্বের অজুতেই নামায পড়িতেন।)

১৫১। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন বকরীর গোশত খাইলেন এবং নূতন অজু না করিয়াই নামায পড়িলেন।

১৫২। হাদীছ ঃ— আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বকরীর একটি ভুনা করা আস্তা রান হইতে ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইতেছিলেন, তাঁহাকে নামাযের জন্য খবর দেওয়া হইলে তিনি উহা ফেলিয়া নামাযের জন্য চলিয়া গেলেন, নূতন অজু করিলেন না।

---

* আমাদের দেশীয় সূতি বা পশমী মোজার উপর মছেহ করা কোন প্রকারেই জায়েয নহে ; তাহা করা হইলে অজু হইবে না এবং নামাযও হইবে না। চামড়ার মোজার উপর মছেহ করাও অনেকগুলি শর্ত্ত সাপেক্ষে জায়েয হয়।

+ মাথার যে এক চতুর্থাংশ মছেহ করা ফরজ তাহা মাথার উপর অবশ্যই করিতে হইবে, বাকী সম্পূর্ণ মাথা মছেহ করা যাহা মোস্তাহাব তাহা পাগড়ীর উপর হইতে পারে।

১৫৩। হাদীছ :— মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বকরীর রানের গোশত খাইয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করেন নাই।

ছাতু, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইয়া কুল্লি করা আবশ্যক, পুনরায় অজু করিতে হইবে না।↑

১৫৪। হাদীছ :— সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধে যাইবার সময় উহার নিকটবর্ত্তী ছাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িলেন। নামাযান্তে প্রত্যককেই নিজ নিজ খাবার বস্তু বাহির করিতে বলিলেন। সকলেই ছাতু আনিল এবং সব এক সঙ্গে পানি দ্বারা গোলা হইল; রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খাইলেন এবং সকলেই খাইল। তারপর হযরত (দঃ) মাগরিবের নামাযের জন্য তৈয়ার হইলেন এবং শুধু কুল্লি করিয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুগ্ধ পান করিয়া কুল্লি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, ইহা তৈলাক্ত বস্তু। (সেই জন্য উহা পান করিয়া কুল্লি করা আবশ্যক)।

নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয়, তন্দ্রায় অজু নষ্ট হয় না

১৫৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও যদি নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে তবে নামায স্থগিত রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিৎ। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় নামায পড়িলে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এমনকি এস্তেগফার করিতে অর্থাৎ গোনাহ মাফ চাহিতে যাইয়া হয় ত বদ-দোয়ার শব্দ মুখে আসিয়া যাইবে। (কারণ তন্দ্রাবস্থায় পূর্ণ হুশ-জ্ঞান বহাল থাকে না।)

১৫৭। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও তন্দ্রা আসিলে শুইয়া পড়া উচিৎ। (পূর্ণ হুশ ফিরিয়া আসে এবং কি বলিতেছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে— এইরূপ অবস্থা লইয়া নামায পড়া চাই)।

মছআলাহ :—যদি বসা বা দাঁড়ান অবস্থায় তন্দ্রা আসিয়া শুধু মাথা নড়াচড়া করে কিম্বা নামাযে রুকু-সেজদা অবস্থায় তন্দ্রা আসে, কিন্তু হাত-পা ঢিলা হইয়া রুকু-সেজদার ছুন্নত আকার ভাঙ্গিয়া না পড়ে তবে অজু নষ্ট হইবে না।

↑ উক্ত দুইটি শিরোনামা এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে, অগ্নিস্পর্শিত বস্তু খাইলে বা পান করিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়; সুতরাং এইখানে দেখানো হইল যে, প্রকৃত পক্ষে অজু ভঙ্গ হয় না, তবে পুনরায় অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব।

শোয়া অবস্থায় তন্দ্রা আসিলে অজু ভঙ্গ হইবে। অবশ্য যদি এত হাল্কা তন্দ্রা হয় যে, নিকটের কথাবার্ত্তা অধিকাংশই শুনিয়া ও বুঝিয়া থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে না। কিন্তু অনেক সময় শোয়া অবস্থায় মানুষ তাহার তন্দ্রাকে হাল্কা মনে করে, অথচ তাহার উপর এমন মুহূর্ত্তও গিয়াছে যখন তাহার তন্দ্রা গাঢ় হইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময় ঐরূপ ছিল বলিয়া উহা তাহার লক্ষ্যে আসে নাই—এরূপ ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গ হইবে; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। (শামী, ১—১৩২)

অজু ভঙ্গ না হইলেও পুনঃ নূতন অজু করা*

১৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের সময়ই অজু করিতেন। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা (ছাহাবীগণ) কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা সাধারণতঃ এক অজু ভঙ্গ হইলেই নূতন অজু করিতাম।

প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা হইতে সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ

১৫৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি বাগানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় তিনি দুইটি কবরের মধ্য হইতে কবরবাসীদের বিকট চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন; তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ঐ কবর-বাসীদিগকে আজাব করা হইতেছে; তাহা যদিও কোন বড় মুস্কিল কাজের জন্য নয়, তবে গোনাহ অত্যন্ত বড় ছিল। এক ব্যক্তি প্রস্রাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না।** দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখোরী (গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে লাগানো) করিত। এই বলিয়া তিনি একটি খেজুর ডালা দুই খণ্ড করিয়া দুই কবরে গাড়িয়া দিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, এরূপ কেন করিলেন? হযরত (দঃ)

---

* এক অজু দ্বারা কোনও এবাদত না করিয়া নূতন অজু করায় বাধা আছে, তবে হাঁ—কোন এবাদত করার পর ঐ অজু নষ্ট না হইলেও নূতন অজু করা যায়, বরং নূতন নূতন অজু দ্বারা প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পড়া উত্তম। তবে নূতন অজু না করিয়া পুরাতন অজু দ্বারাও নামায পড়া যায়; ১৫৪ নং হাদীছে উহার প্রমাণ রহিয়াছে।

** প্রস্রাবের পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার সরাসরিরূপে যদিও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তথাপি বর্ত্তমানে নানাপ্রকার দৈহিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতার যুগে এই হাদীছের সতর্কবাণীর দ্বারাই উহা ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

বলিলেন, আমি আশা করি, ডালা দুইটি শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের আজাব আল্লার তরফ হইতে লাঘব করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রস্রাবের পরে পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। (৩৫পৃঃ ১১৭হাঃ)

মধ্যভাগে কাহারও প্রস্রাব বন্ধ করাইবে না

১৬০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বেদুইনকে দেখিলেন, মসজিদের কিনারায় প্রস্রাব করিতেছে ; লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে এবং তাহার প্রতি ছুটিয়া যাইতেছে। নবী (দঃ) তাহাদিকে বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না, তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়। সে প্রস্রাব শেষ করিলে পর নবী (দঃ) এক ডোল পানি আনাইয়া উহার উপর বহাইয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হঠাৎ মধ্যভাগে প্রস্রাব বন্ধ করাইলে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব বন্ধের রোগ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সে ঐ অবস্থায় উঠিয়া দৌড়িলে মসজিদের অধিক স্থান নাপাক হইবে।

মসজিদের খালি মাটিতে প্রস্রাব করা হইলে

১৬১। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক বদ্দু (বেদুইন) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আসিয়া এক কোণে প্রস্রাব করিতে লাগিল ; ইহাতে সকলেই তাহাকে ধমক দিতে আরম্ভ করিল। নবী (দঃ) তাহাদিগকে এরূপ করা হইতে বিরত রাখিলেন এবং বলিলেন, এই অবস্থায় তাহাকে বাধা দিও না। প্রস্রাব শেষ করার পর তিনি বেদুইনটিকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মসজিদসমূহ আল্লার জেকের, নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের স্থান ; ইহাতে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করার অবকাশ নাই এবং ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, এক ডোল পানি আনিয়া এই স্থানে ঢালিয়া দাও। তোমরা (মুসলিম জাতি) জগদ্বাসীর প্রতি উদারতার আদর্শরূপে আবির্ভূত হইয়াছ ; কর্কশ ব্যবহারের জন্য নয়। তারপর এক ডোল পানি ঐ স্থানে বহাইয়া দেওয়া হইল।

শিশুর প্রস্রাবও ধৌত করিতে হইবে

১৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি একটি কচি শিশু লইয়া হাজির হইল। (হযরত (দঃ) শিশুটিকে কোলে লইলেন) সে হযরতের কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া দিল। হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং প্রস্রাবের স্থানটুকুতে পানি ঢালিয়া দিলেন।

১৬৩। হাদীছ :—উম্মে-কায়স নাম্নী মহিলা দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। তিনি শিশুটিকে কোলে বসাইলেন, সে তাঁহার কাপড়ে প্রস্রাব করিল। তিনি পানি আনাইয়া মামুলীভাবে উহা ধুইলেন; অধিক তৎপরতার সহিত ধুইলেন না।

প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে নিকটে রাখিয়া প্রস্রাব করা

১৬৪। হাদীছ :—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। তিনি মহল্লার আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানের নিকটে আসিয়া একটি দেওয়ালমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন। আমি দুরে সরিয়া যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে ইশারা করিয়া ডাকিলেন; আমি নিকটে হাজির হইয়া তাঁহার (পিঠের প্রতি পিঠ দিয়া বিপরীত-মুখী) পায়ের নিকটবর্ত্তী দাঁড়াইয়া রহিলাম। (সম্মুখ দিকের পর্দ্দা ছিল দেওয়াল এবং পিছন দিকে হোযায়ফা (রাঃ)কে দাঁড় করাইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্দ্দার ব্যবস্থা করিলেন; দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার দরুণ কাপড় একটু বেশী উঠিবে।)

(ওজর বশতঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা

১৬৫। হাদীছ :—আবু মূসা (রাঃ) প্রস্রাবের সময় অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। (এমনকি প্রস্রাবের সুক্ষ্ম ছিটা হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি বোতলে প্রস্রাব করিতেন।) হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, সতর্কতা অবলম্বনের সীমা অতিক্রম না করাই উত্তম। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি, লোকদের আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন।

(উপরের হাদীছ এবং এই হাদীছ উভয় হাদীছে হযরতের ঘটনা একটিই।)

ব্যাখ্যা :—ঐ একবারই মাত্র হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন বিশেষ ওজর বশতঃ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি সর্ব্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও নাছায়ী শরীফের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ এরূপ বলে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেন, তবে সে মিথ্যাবাদী। রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্ব্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও ইবনে মাজা শরীফের আর একটি হাদীছে আছে—ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছিলাম, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—হে ওমর! দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিও না। অতঃপর আমি আর দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি নাই। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা ইসলামী রীতি ও সভ্যতার পরিপন্থী।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই ১৬৫ নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, অন্যের জায়গায় বিনা অনুমতিতে প্রস্রাব করা যায় যদি এইরূপ জায়গা হয় যেখানে প্রস্রাব করায় সাধারণতঃ আপত্তি হয় না।

কোন স্থানে রক্ত লাগিলে উহা ধুইতে হইবে

১৬৬। হাদীছ ঃ—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি নারী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হায়েজের রক্ত কাপড়ে লাগিলে কি করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথম উহাকে নখ দ্বারা আচড়াইয়া ফেলিবে, তারপর ঐ স্থানটি পানি দ্বারা মর্দন করিয়া ধৌত করিবে; এরূপ করিলে ঐ কাপড় দ্বারা নামায পড়িতে পারিবে।

কাপড়ে বীর্য্য লাগার স্থান ধুইয়া শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বে নামায পড়া

১৬৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাপড় হইতে বীর্য্য ধুইয়া ফেলিতাম এবং ঐ ভিজা স্থান শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই নবী (দঃ) ঐ কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িতে যাইতেন।

উট, বকরী ইত্যাদি হালাল জানোয়ারের প্রস্রাব*

মছআলাহ ঃ—অধিকাংশ ইমামগণের মতে হালাল পশুর মুত্রও উহার মলের ন্যায় নাপাকই বটে, অতএব উহা হারাম পরিগণিত; খাদ্যে বা পানীয়ে উহার কিঞ্চিৎও যদি মিশ্রিত হয় তবে সেই খাদ্য ও পানীয় হারাম নাপাক হইয়া যাইবে। অবশ্য উহা ঔষধরূপে ব্যবহার সম্পর্কে বিধান উহাই যাহা হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্য শরীয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঐ মল-মুত্র যদি মাটিতে পড়ে এবং সেই মল-মুত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া মাটি শুষ্ক হইয়া যায়, মল মুত্রের রং বা গন্ধ মাটির মধ্যে মোটেই না থাকে তবে সেই মাটির উপর কোন বিছানা ছাড়াও নামায শুদ্ধ হইবে। আর যদি মল-মুত্রের অস্তিত্ব বা রং-গন্ধ মাটিতে বিদ্যমান থাকে তবে সেই মাটি নাপাক; উহার উপর বিছানা ছাড়া নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য উহার উপর পাক বিছানা বিছাইয়া নিলে বিছানার উপর নামায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু নাপাক সমাবেশিতে স্থানে নামায

---

* এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীছ সমূহের দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় না যে, হালাল জানোয়ারের মল মুত্র পাক। এতদ্ভিন্ন হাদীছে এরূপ বিবরণও আছে, যদ্বারা হালাল ও হারাম সমস্ত রকম জানোয়ারেরই মল ও মুত্র উভয়ই নাপাক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

পড়া মকরূহ (শামী, ১—৩৫৩ দ্রষ্টব্য)। অতএব অতি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এইরূপ স্থানে নামায না পড়িয়া অন্যস্থানে নামায পড়াই শ্রেয় ও কর্ত্তব্য।

উট-বকরি ইত্যাদি হালাল পশু এবং ঘোড়ার শুধু মূত্র সম্পর্কে এবং তাহাও কেবল কাপড়ে বা শরীরে লাগিবার ব্যাপারে একটি বিশেষ বিবরণ আছে যে—উহা এমন নাপাক যাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় নাজাছাত-খফিফা বলা হয়। এই নাপাক শরীরের যেই অঙ্গে লাগে ; যেমন—হাতে, পায়ে, মাথায় বা পিঠে। কিম্বা কাপড়ের যেই অংশে লাগে ; যেমন—হাতায় বা সম্মুখের বা পেছনের অংশে ; সেই অঙ্গের বা অংশের চতুর্থাংশের কম পরিমাণের হইলে উহা না ধুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে। অবশ্য উহাকে না ধুইয়া নামায পড়িতে থাকিলে নামায মকরূহ হইবে (বেহেশতী জেওর, ২—২)। উহা ধুইয়া ফেলা উত্তম (শামী, ১—২৯২)।

ছাহাবী আবু মূসা (রাঃ) একবার ছফরের সময় রাস্তায় ডাক বিভাগের বাংলায় নামায পড়িলেন ; তথায় ডাকবাহী ঘোড়া বাঁধা হইত ; (সেখানে উহার মল-মূত্র থাকা সম্ভব ছিল ; এতদসত্বেও তিনি ঐস্থানে নামায পড়িলেন।) নিকটেই খোলা ময়দান ছিল, তথায় যাওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না ; বলিলেন, এখানে কিম্বা ওখানে নামায পড়া একই বরাবর।

১৬৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া প্রথম প্রথম মসজিদ তৈয়ারীর পূর্ব্বে (দরকার বশতঃ সময় সময়) বকরী রাখিবার ঘরেও নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আজকাল রেলগাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণ করার সময় অনেক লোককে দেখা যায় যে, কোনও উত্তম উপযুক্ত স্থান না পাওয়ার অজুহাতে নামায কাজা করিয়া ফেলে ; ইহা শয়তানী ধোকা মাত্র। কারণ, উক্ত হাদীছ ও ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবস্থা ভেদে যখন যেরূপ স্থান পাওয়া সম্ভব হয় তখন সেখানেই নামায পড়িতে দ্বিধা করা উচিত নহে, যাবৎ নাপাক প্রমাণিত না হয়।

পানি, ঘৃত ইত্যাদিতে নাপাক পড়িলে ?

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, নাপাক বস্তুর দ্বারা পানির স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্ত্তিত না হইলে পানি নাপাক হইবে না।* তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি বহু আলেমকে

* এ বিষয়ে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, পানি কম হইলে সামান্যতম নাপাকির দরুনও উহা নাপাক হইয়া যাইবে, যদিও নাপাক বস্তুর কোন নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া থাকে। অবশ্য পানি বেশী বা প্রবাহমান হইলে সে স্থলে নাপাক বস্তুর নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত পানি নাপাক হইবে না।

দেখিয়াছি—তাঁহারা মৃত হাতী প্রভৃতির হাড্ডি দ্বারা চিরুণী, তৈলের বাটি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতেন।

ইবনে ছীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, মৃত হাতীর দাঁতের ব্যবসা করা দোষণীয় নয়। ইমাম হাম্মাদ বলিয়াছেন, মৃত জানোয়ারের পশম পাক।

১৬৯। হাদীছ ঃ—মায়মুনা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঘৃতের মধ্যে ইঁদুর পড়িলে কি করিতে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, ইঁদুরটি ফেলিয়া দিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের ঘৃত ফেলিয়া দাও, বাকী ঘৃত খাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা জমাট ঘৃতের মছআলাহ্; উক্ত মাছআলা কেবলমাত্র জমাট ঘৃতের বেলায়ই প্রযোয্য। কেননা, তরল ঘৃতের চারি পার্শ্ব হইতে ঘৃত ফেলিবার উপায় নাই।

অপ্রবাহিত বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা

১৭০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বদ্ধ পানিতে কেহ প্রস্রাব করিও না। কেননা, উহাতে গোসল ইত্যাদি করিতে হইবে।

নামাযরত অবস্থায় শরীরে নাপাক বস্তু পতিত হইলে†

১৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কাবা শরীফের নিকট নামায পড়িতেছিলেন। দুষ্ট আবু জাহ্‌ল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা নিকটেই বসিয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, অমুক মহল্লায় আজ উট জবেহ করা হইয়াছে; ঐ উটের নাড়িভুঁড়িগুলি আনিয়া মোহাম্মদ যখন সেজদায় যায়, তখন তাহার পিঠের উপর কে রাখিয়া দিতে পারিবে? তাহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় হতভাগা ও দুষ্ট প্রকৃতির যে লোকটি ছিল, সে ঐ অপকর্ম্মের জন্য অগ্রণী ও উদ্যত হইয়া অবিলম্বে উটের নাড়িভুঁড়ি লইয়া আসিল এবং যখন দেখিল, রসুলুল্লাহ (দঃ)

† আবু হানিফা, শাফেয়ী আহমদ, মালেক প্রমুখ ইমামগণের সকলের মতই এই যে, নামাযের সময় নাপাকির সংস্পর্শ ন ঘটিলেই নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে, ঐ নাপাকি দূর করিয়া পুনরায় নামায পড়িতে হইবে। কারণ হাদীছের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে—"পাক হওয়া ব্যতীত নামায হইতে পারে না।" কিন্তু এখানে উল্লেখিত হাদীছে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে উহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ইহার পর শরীয়তের হুকুম আহকামে অনেক রদ-বদল হইয়াছে, যেমন—প্রথমে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল, পরে উহা মনছুখ (রহিত) হইয়াছে।

সেজদায় গিয়াছেন, তখন উহা তাঁহার পিঠের উপর রাখিয়া দিল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিতেছিলাম, কিন্তু উহাতে বাধাদানের কোন শক্তি ও সুযোগ আমার ছিল না। হতভাগারা ঐ দুষ্কর্ম্ম করিয়া হাসিয়া একে অন্যের উপর লুটোপুটি খাইয়া পড়িতেছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখনও সেজদাতেই ছিলেন, (জুলুমের স্মৃতি এত বড় ভারী বোঝা হইতে তিনি) মাথা উঠাইতে ছিলেন না। ফাতেমা যাহরা (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং আঁতুড়ীটা হযরতের পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! কোরায়েশদিগকে ধ্বংস কর; এইরূপে তিনবার অভিশাপ দিয়া কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! আবু জাহলকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, শায়বা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, ওলীদ ইবনে ওৎবাকে ধ্বংস কর, উমাইয়া ইবনে খালাফকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে আবি মোয়াইতকে ধ্বংস কর, (ওমারাহ্ ইবনে ওলীদকে ধ্বংস কর। এই) সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন।* আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহাদের নামে অভিশাপ করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে তাহাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংসাবস্থায় একটি গর্ত্তে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি, যেখানে অন্যান্য কাফেরদেরও লাশ স্তূপীকৃত ছিল।

থুথু ও কফ লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে না

১৭২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখস্থ দেওয়ালের মধ্যে কফ দেখিতে পাইয়া অত্যধিক রাগান্বিত হইলেন এবং স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি নামায অবস্থায় স্বীয় পালনকর্ত্তার সহিত মোনাজাত ও কথাবার্ত্তায় রত হয় এবং তাহার প্রভু-পওয়ারদেগার যেন সম্মুখে রহিয়াছেন। অতএব কেবলার দিকে কখনও থুথু ফেলিবে না। থুথু ফেলার বিশেষ প্রয়োজন হইলে বাম দিকে বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে** কিম্বা (চাদর ইত্যাদি) কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া মলিয়া দিবে। (৫৮ পৃঃ)

---

* ঐ সকল ব্যক্তি ইসলামের প্রধান শত্রু ও উক্ত ঘটনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু নামাযের মধ্যে বাধাদান ও বিরক্ত করায় তিনি প্রাণে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। নতুবা সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎপীড়ন করা হইত; কিন্তু তিনি এত কঠোর আর কখনও হন নাই।

** যেই মসজিদের জমিন পাকা নয় এবং বিছানা ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই সেইরূপ স্থানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

কোন প্রকার মাদকীয় বস্তু দ্বারা অজু হইবে না

১৭৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত পানীয় বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকিবে উহা সবই হারাম।

প্রয়োজনে নারী স্বীয় পিতার শরীর স্পর্শ করিতে পারে

আবুল আলীয়া নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী তাঁহার পায়ে ব্যথা হইলে তিনি স্বীয় পুত্র-কন্যাগণকে আদেশ করিলেন, আমার পা মালিশ কর, ব্যথা হইতেছে।

১৭৪। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী ছাহ্‌ল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—(ওহোদ রণাঙ্গণে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আহত হইবার পর তাঁহাকে কি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল ? তিনি বলিলেন, এবিষয়ে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এখন আর কেহ নাই। আলী (রাঃ) ঢালের মধ্যে করিয়া পানি আনিতেছিলেন এবং ফাতেমা যাহরা (রাঃ) রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, রক্ত বন্ধ হইতেছে না, তখন চাটাই পোড়াইয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে ভরিয়া দেওয়া হইল।

মেসওয়াক করা

১৭৫। **হাদীছ ঃ**—আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি মেছওয়াক করিতেছিলেন এবং (জিহ্বা পরিষ্কার করিতে মেছওয়াক জিহ্বার উপর চালানোর দরুণ) "ওঃ ওঃ"—শব্দ করিতেছিলেন.।

১৭৬। **হাদীছ ঃ**— হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া মেছওয়াক দ্বারা মুখ ভালরূপে পরিষ্কার করিতেন।

১৭৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মেছওয়াক করিতেছি ; এমন সময় দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন অধিক বয়স্ক ও অপর জন অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক। আমার মেছওয়াকখানা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিকে দিলাম। আমাকে আদেশ করা হইল মেছওয়াকটি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে দান করুন। (সে মুরব্বি, তাই মেছওরাকের ন্যায় সম্মানিত বস্তু তাহারই প্রাপ্য। নবীর স্বপ্ন অহী ; যদ্দারা মেছওয়াক সম্মানিত বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইল।)

অজু অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত

১৭৮। হাদীছ ঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তুমি শয়নের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিয়া লও, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়া পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ *

এইরূপ শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার জন্য সুসংবাদ যে, পয়গাম্বরগণের সুন্নত তরীকার উপর তাহার মৃত্যু হইল, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, উক্ত দোয়াটি নিদ্রা-পূর্ব্বের শেষ বাক্য হওয়া চাই। (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর দুনিয়াদারীর কোন কথা নিদ্রার পূর্ব্বে বলিবে না।) বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—এই দোয়াটি শিক্ষা করিয়া আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইতেছিলাম এবং بِنَبِيِّكَ এর স্থলে আমি بِرَسُوْلِكَ পড়িলাম। নবী (দঃ) বাধা দিয়া বলিলেন—بِنَبِيِّكَ বল (৯৩৪পৃঃ)।

দোয়াটির অর্থ ঃ—হে আল্লাহ! আমার জীবনকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, আমার গতি ও লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিলাম, আমার সর্ব্বস্ব তোমার নিকট সোপর্দ্দ করিলাম এবং তোমার নেয়ামতের প্রতি আকাঙ্খিত ও তোমার আজাবের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া তোমারই উপর ভরসা স্থাপন করিলাম; তোমার আজাব হইতে নাজাত ও রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থল তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রেরিত কিতাব এবং তোমার নিয়োজিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

---

* দোয়াটির উচ্চারণ এই—আল্লাহুম্মা আছলাম্‌তু নফ্‌ছী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা, ওয়া-ফাওয়াযতু আম্‌রী ইলাইকা, ওয়া আল্‌জা'তু জাহ্‌রী ইলাইকা, রাগবাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা ; লা-মাল্‌জাআ ওয়ালা-মানজাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমান্‌তু বে-কিতাবেকাল্লাজী আনযাল্‌তা ওয়া বেনাবীয়্যেকাল্লাজী আরছাল্‌তা।

চতুর্থ অধ্যায়

গোসল

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে তুই স্থানে জানাবাতের গোছলের আদেশ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ছুরা নেছায় এবং ছুরা মায়েদায়। বোখারী (দঃ) প্রথমে ছুরা মায়েদার (৬ পারা ৬ রুকু) আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.........

(নিম্নস্তরের অপবিত্রতা দুর করার জন্য মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মছেহ করা, এইরূপে অজুর বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মোমেনগণ!) "আর যদি তোমরা জানাবাত (শুক্রস্খলনে অপবিত্রতা) যুক্ত হইয়া পড় তবে তোমরা (সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতঃ গোসল করিয়া) বিশেষরূপে তাহারাত ও পবিত্রতা হাসিল কর। অবশ্য যদি তোমরা রুগ্ন হও বা পথিক হও এবং তদস্থায় অজু বা গোসলের আবশ্যকতার সম্মুখীন হও অথচ পানি ব্যবহারে বা সংগ্রহে অক্ষম হইয়া পড়, তবে মুখ ও হাত মছেহ করতঃ তায়াম্মুম করার জন্য মাটি ব্যবহার কর।" তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

অর্থাৎ :—(এ সমস্ত—অজু, গোসল ও তায়াম্মুম ইত্যাদির আদেশ জারি করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কষ্ট-ক্লেশের বোঝা চাপাইতে চান না, বরং তোমাদিগকে পাক-পবিত্র করার ইচ্ছা করেন এবং (তুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) নেয়ামত (তথা দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণ করিতে চান, যেন তোমরা (ঐ নেয়ামত উপভোগ করিয়া মৌখিক ও কার্য্যতঃ) তাঁহার শোক্‌রিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক। ছুরা নেছার (৫ পাঃ ৪ রুঃ) আয়াতটি এই—

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا -

"জানাবাত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্ত্তীও হইবে না যাবৎ গোসল না কর।"

গোসলের পূর্ব্বে অজু করা

১৭৯। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল করিতে প্রথমে দুই হাত ধৌত করিতেন, তারপর নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিতেন, তারপর হাত পানিতে ভিজাইয়া উহা দ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করিতেন। যখন মনে করিতেন যে, চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজিয়াছে তখন তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন।

এস্থানে ১৮৬ নং হাদীছখানাও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল করা

১৮০। হাদীছ :—উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে গোসল করিতাম; আমরা একের পর অন্যে উহাতে হাত প্রবেশ করিয়া পানি উঠাইতাম। পাত্রটি কাঠের তৈরী ছিল যাহার মধ্যে প্রায় ১২ সের পানি সঙ্কুলান হইত।

১৮১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) এক সঙ্গে একই পাত্র হইতে গোসল করিতেন।

গোসলের পানির পরিমাণ

১৮২। হাদীছ :—আবু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক দুধ-ভাই, আয়েশা(রাঃ)র নিকট উপস্থিত হইলাম। দুধ-ভাই আয়েশা (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। আয়েশা (রাঃ) প্রায় চার সের পরিমাণের একটি পাত্র আনিলেন এবং পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া গোসল করিলেন। মাথার উপর হইতে পানি ঢালিলেন।

১৮৩। হাদীছ :—জাবের (রাঃ)কে গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন, প্রায় চার সের পানি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বলিল, আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলিলেন, অতি মহান ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল যিনি তোমার চেয়ে বহু উর্দ্ধে ছিলেন, তাঁহার মাথার চুলও তোমার চেয়ে বেশী ছিল (অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। অতঃপর জাবের (রাঃ) একটি চাদরে আবৃত হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন।

গোসলের সময় তিনবার মাথায় পানি ঢালা

১৮৪। হাদীছ :—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই হাত দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইতেন; "আমি এইভাবে মাথার উপর তিনবার পানি ঢালিয়া থাকি।"

১৮৫। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বলেন, হাসান নামক ব্যক্তি তাঁহাকে ফরজ গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমার মাথায় চুল অধিক। তিনি বলিলেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চুল তোমার চেয়েও বেশী ছিল।

সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢালিয়া গোসল করা

১৮৬। হাদীছঃ— মায়মুনা (রাঃ) বলেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য পানি রাখিলাম এবং পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম; নবী (দঃ) ফরজ গোসল করিলেন। প্রথমে তিনি উভয় হাতে পানি ঢালিয়া দুই বা তিনবার উভয় হাত ধুইলেন, তারপর ডান হাতে পানি উঠাইয়া উহা বাম হাতে লইয়া গুপ্তস্থান এবং যে স্থানে নাপাকি লাগিয়াছে উহা পরিষ্কার করিলেন। তারপর ঐ হাত মাটির সঙ্গে ঘষিয়া ধৌত করিলেন, তারপর কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করিলেন—তথা নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিলেন; পা ধোয়া বাকী রাখিলেন।* অতঃপর তিন বার মাথা ধৌত করিলেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিলেন এবং ঐ স্থান হইতে সরিয়া দুই পা ধুইলেন! তাঁহাকে একটি রুমাল দেওয়া হইল, কিন্তু উহার দ্বারা তিনি শরীর মুছিলেন না, হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলিয়া গেলেন। (৩৯ ও ৪২ পৃঃ)

দুধের হাঁড়ি ইত্যাদি পাত্রে পানি লইয়া গোসল করা

অর্থাৎ—যদি কোন পাত্র পাক জিনিষের গন্ধযুক্ত হয়, যেমন দুধের হাঁড়ি; উহাতে পানি লইয়া গোসল করা যায়।

১৮৭। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করিতেন তখন দুধের হাঁড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন পাত্রে পানি লইয়া ঐ পানি হাতে উঠাইয়া প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে দ্বিতীয়বার মাথার বাম পার্শ্বে তৃতীয়বার দুই হাতে পানি উঠাইয়া মাথার মধ্যভাগে ঢালিতেন।

হাতে নাপাকি না থাকিলে ধুইবার পূর্ব্বে পানির পাত্রে হাত দেওয়া যায়; সন্দেহ হইলে হাত ধুইবে

ইবনে ওমর (রাঃ) ও বরা (রাঃ) নামক ছাহাবীদ্বয় হাত ধোয়া ব্যতিরেকে পানির পাত্রের ভিতরে হাত দিয়া পানি উঠাইয়া অজু করিয়াছেন।

ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ফরজ গোসলের পানির ছিটাকে দোষণীয় মনে করিতেন না।

---

* গোসলের স্থানটি সুব্যবস্থার ছিল না, তাই গোসল শেষে সেখান হইতে সরিয়া পা ধুইলেন।

১৮৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসলের সময় (হাতে নাপাকির সন্দেহ হইলে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্ব্বে) ভালরূপে হাত ধৌত করিয়া লইতেন।

১৮৯। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে একই পাত্র হইতে (হাত দ্বারা পানি উঠাইয়া) জানাবাতের গোসল করিতেন।

একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সঙ্গমের পর গোসল করা

১৯০। হাদীছ ঃ—কাতাদাহ (রঃ) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) (কোন কোন সময়) একই রাত্রে বা দিনে পর পর এগার বিবির সহিত সঙ্গম করিতেন (নয় জন বিবাহ সূত্রের, দুই জন শরীয়তী স্বত্বাধিকার সূত্রের)।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত ছিলেন।

ফরজ গোসলের পূর্ব্বেকার সুগন্ধির নিদর্শন বাকি থাকায় ক্ষতি নাই

১৯১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সফরে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি; তিনি স্ত্রীগণের সহবাসে গোসল করিয়া এহরাম বাঁধিয়াছেন—ঐসময়ও শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল।

১৯২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (গোসলের পূর্ব্বে ব্যবহৃত) সুগন্ধির নিদর্শন (গোসলের পর) এহ্রাম অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথায় এখনও আমার নজরে ভাসে।

ফরয গোসল ভুলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে স্মরণ হওয়া মাত্রই বাহির হইয়া আসিবে

১৯৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নামাযের একামত বলা হইল, সকলে দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিয়া বাঁধিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িবার জন্য আসিলেন। তিনি যখন মোছাল্লার (জায়নামাযের) উপর দাঁড়াইলেন (নামায আরম্ভের পূর্ব্বক্ষণে) হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ফরজ গোসল করেন নাই। তিনি সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোসল করিয়া আসিলেন। তাঁহার মাথার পানি তখনও ফোটায় ফোটায় ঝরিতেছিল। এমতাবস্থায়ই তিনি নামায আরম্ভ করিলেন এবং আমরা সকলেই তাঁহার সহিত নামায পড়িলাম।

প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধৌত করিবে

১৯৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ফরজ গোসল করিতে মাথায় তিনবার পানি ঢালিয়া প্রথমে ডান হাত দ্বারা মাথার ডান পার্শ্ব এবং তারপর বাম হাত দ্বারা বাম পার্শ্ব ধৌত করিতাম।

নির্জ্জনে গোসলে উলঙ্গ হওয়া যায় ; তাহা না করাই শ্রেয়ঃ

নবী (রঃ) বলিয়াছেন, মানবের জন্য আল্লার প্রতি লজ্জা শরমে তৎপর হওয়া লোকদের হইতে লজ্জা শরম করা অপেক্ষা অধিক বড় কর্ত্তব্য।

১৯৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলরা একে অন্যের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত, মূসা (আঃ) কখনও ঐরূপ করিতেন না। তিনি গোপনে নির্জ্জনে গোসল করিতেন। বনী-ইস্রাঈলরা কুৎসা রটাইল যে, মূসা (আঃ) অণ্ডকোষ বৃদ্ধির Hybrocel রোগী, তাই তিনি আমাদের সহিত উলঙ্গ হইয়া গোসল করেন না।

একদা মূসা (আঃ) নির্জ্জনে কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে ছিলেন, হঠাৎ ঐ পাথর আশ্চর্য্যজনক ভাবে কাপড় লইয়া দৌড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মূসা (আঃ) হে পাথর! আমার কাপড় ; হে পাথর! আমার কাপড় ; বলিতে বলিতে (বিবস্ত্র হওয়ার খেয়াল-শূন্য অবস্থায়) উহার পিছু দৌড়াইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাথরটি একদল বনী-ইস্রাঈলের জনসমাবেশে আসিয়া পৌঁছিল ; তখন সকলেই মূসা (আঃ)কে নিরোগ দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের খণ্ডন হইয়া গেল। মূসা (আঃ) তাড়াতাড়ি পাথর হইতে কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন এবং পাথরে আঘাত করিতে লাগিলেন ; পাথরের উপর ছয় বা সাতটি দণ্ডাঘাতের রেখা পড়িয়া গেল।

১৯৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, একদা আইয়ুব (আঃ) কাপড় খুলিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল ; তিনি ঐগুলিকে কুড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন! আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে বিপুল ধন-দৌলত দান করতঃ এ সমস্ত হইতে পরিতৃপ্ত করি নাই? তিনি আরজ করিলেন, হে খোদা! তোমার তরফ হইতে বর্ষিত বরকতের বস্তু হইতে আমি কখনই অপ্রত্যাশী বা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না।

নির্জ্জন না হইলে অবশ্যই পর্দ্দাবস্থায় গোসল করিবে

১৯৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম।

তিনি গোসল করিতে ছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাঁহাকে কাপড় দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি সালাম করিলাম; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আসিয়াছে ? আমি উত্তর করিলাম, উম্মে-হানী। হযরত (দঃ) আমাকে "মারহাবা" বলিলেন এবং গোসলান্তে একটি চাদরে আবৃত হইয়া আট রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের পর আমি বলিলাম, এক ব্যক্তিকে আমি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়াছি; আমার ভাই আলী তাহাকে হত্যা করিতে চায়। হযরত বলিলেন, তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম। ঘটনাটি বেলা পূর্ব্বাহ্নে ছিল।

(মায়মূনা (রাঃ) বর্ণিত ১৮৬ নং হাদীছও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াচে।)

নাপাক অবস্থার ঘাম এবং ঐ অবস্থায় চলাফেলা করা

১৯৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন. একদা রাস্তার মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার হাত ধরিলেন; আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কিছু দুর এক সঙ্গে চলার পর তিনি এক স্থানে বসিলেন, আমি গোপনভাবে পেছন হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং বাড়ী হইতে গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) সে স্থানেই বসিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলে ? আমি আরজ করিলাম, আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম ; ঐ অবস্থায় আপনার সঙ্গে উঠা-বসা ভাল নয় মনে করিয়া গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, মোমেন ব্যক্তি (ঐরূপ) নাপাক হয় না। (যে, তাহার সঙ্গে উঠা-বসা করা বা তাহাকে ছোঁয়া যায় না।)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা বলিয়াছেন, নাপাক অবস্থায় নখ কাটা ও চুল ছাটা যায়।

নাপাক অবস্থায় গৃহে অবস্থান বা শয়ন করিতে অজু করিবে

১৯৯। হাদীছ ঃ— আবু সালামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি কোন সময় ফরজ গোসলের পূর্ব্বে ঘুমাইতেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ—কোন সময় ঐরূপ ঘুমাইতেন, কিন্তু অজু করিয়া ঘুমাইতেন।

২০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল না করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিলে গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া নামাযের জন্য অজুর ন্যায় অজু করিয়া লইতেন।

২০১। হাদীছ ঃ— ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া যায় কি ? নবী (দঃ) বলিলেন হাঁ, যদি অজু করিয়া নেয়।

২০২। **হাদীছ**:— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ওমর (রাঃ) এই আলোচনা করিলেন যে, রাত্রে গোসল ফরজ হইলে (যখন তখন গোসল না করিয়া) শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে কি করিতে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া অজু কর, তারপর ঘুমাইতে পার।

স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গদ্বয়ের গ্রথনেই গোসল ফরজ হইবে

২০৩। **হাদীছ**:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পুরুষ স্ত্রীর মুখোমুখী হইয়া লিঙ্গদ্বয়ের গ্রথনেই গোসল ফরজ হইয়া যাইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, এই হাদীছে বর্ণিত বিধানই অগ্রগণ্য।

২০৪। **হাদীছ**:—উবাই-ইবনে-কা'আব (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিল, কিন্তু বীর্য্য বাহির হইল না তখন কি করিতে হইবে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর গুপ্ত অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে উহা ধৌত করতঃ অজু করিয়া নামায পড়িতে পারে।

২০৫। **হাদীছ**:—যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কেহ স্ত্রী-সহবাস করে কিন্তু বীর্য্য বাহির হয় নাই; এমতাবস্থায় গোসল করিতে হইবে কি? তিনি বলিলেন, গুপ্তস্থান ধুইয়া ফেলিবে এবং নামাযের ন্যায় অজু করিবে; আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি বলেন, আমি এই মছআলাহ আলী (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), তালহা (রাঃ) এবং উহাই-বেন কা আব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও ঐরূপ বলিলেন।

২০৬। **হাদীছ**:—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক আনছারী ব্যক্তিকে লোক পাঠাইয়া ডাকিলেন। (ঐ ব্যক্তি তখন স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত ছিল, তখনও বীর্য্য বাহির হইয়া তাহার চরম পুলক-লাভ ঘটে নাই, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ডাকিতেছেন শুনা মাত্রই এত বড় কঠিন মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি গোসল করিল এবং) তৎক্ষণাৎ সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তাহার মাথার পানি ঝরিতেছিল; হযরত (দঃ) (তাহার অবস্থা অনুভব করিতে পারিয়া) বলিলেন, বোধ হয়—আমি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? সে আরজ করিল—হাঁ, হুজুর! হযরত (দঃ) বলিলেন, যখন (স্ত্রী-সহবাস ক্রিয়া) অসম্পূর্ণতার মধ্যে পরিত্যক্ত হয় তখন অজু করিলেই চলে। (৩০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছত্রয়ে বীর্য্য বাহির না হওয়া অবস্থায় অজুর আদেশ রহিয়াছে, গোসলের উল্লেখ নাই। ২০৩ নং হাদীছে এবং আরও হাদীছে নির্দ্দেশ আছে যে, পুরুষাঙ্গের শুধু অগ্রভাগ স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করাইলেই বীর্য্য বাহির না হইলেও গোসল ফরজ হইবে।

খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে ছাহাবীগণকে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে এই মছআলাহ পর্য্যালোচনায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির করিলেন যে, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোসল ফরজ হইবে ; এই সিদ্ধান্তের উপর ছাহাবীগণের "এজমা" হইয়া গেল। এমনকি খলীফা ওমর (রাঃ) এই সিদ্ধান্তের বিপরীত মতামত প্রকাশের উপর শাস্তির ঘোষণা করিলেন। অতএব এমতাবস্থায় গোসল করা ফরজ হইবেই এবং উহার বিরোধী হাদীছ সমূহ মনছুখ বা রহিত বলিয়া গণ্য। ইমাম বোখারী (রঃ)ও ১০৩নং হাদীছ বর্ণনা করতঃ ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ফরজ গোসলের মধ্যে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ফরজ (৪০পৃঃ ১৮৬ হাঃ)। নাপাকী ও গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্কার করার পর হাত মাটি বা দেওয়ালে ঘষিয়া ধোয়া (ঐ)। ● নাপাকী পরিষ্কার করিতে বাম হাতে পানি লইবে (ঐ)। ● অজু এবং গোসলে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার মধ্যে লাগালাগি না হইয়া বিলম্বতা ঘটিলেও অজু-গোসল শুদ্ধ হইবে।

একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অজু করিতে বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার পর পা ধুইতে এত বিলম্ব কলিলেন যে, তাঁহার ধোয়া অঙ্গগুলি শুষ্ক হইয়া গেল (ঐ)। ● মজি বাহির হইলে গোসল করিতে হইবে না, কিন্তু অজু ভঙ্গ হইবে এবং শরীর হইতে মজি ধৌত করিতে হইবে (৪১ পৃঃ ১০৩ হাঃ)। ● ফরজ গোসল করিতে মাথায় পানি ঢালিবার পূর্ব্বে চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজাইয়া লইবে (৪১ পৃঃ ১৭৯ হাঃ)। ● ফরজ গোসলের জন্য প্রথম অজু করিয়াছে ; পূর্ণ গোসলের সময় অজুর অঙ্গ সমূহে পুনরায় পানি ব্যবহার না করিলেও চলে (ঐ)। ● ফরজ গোসলের পর হাত ঝাড়া জায়েয। অর্থাৎ হাত ঝাড়ার পানি নাপাক নহে। ফরজ গোসলের সময় যেই অঙ্গে নাপাকী নাই সেই অঙ্গ ধৌতের পানির ছিটা নাপাক নহে। ● মহিলাদের স্বপ্নদোষে বীর্য্য নির্গত হইলে তাহাদের জন্যও গোসল করা ফরজ (৪২ পৃঃ)।

——(০)——

পঞ্চম অধ্যায়

হায়েজ বা ঋতু

হায়েজের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ - فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
اَمَرَكُمُ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থ :—তাহারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে ঋতুকালীন (স্ত্রী-সহবাসের) বিষয়। আপনি বলিয়া দিন, ঋতু অতিশয় ঘৃণিত ও অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঐ সময় স্ত্রী-সহবাসে বিরত থাক, যাবৎ স্ত্রী পবিত্র না হয়। পবিত্র হওয়ার পর আল্লার আদেশ-নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীকে ব্যবহার কর। আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকে পছন্দ করেন। (২ পা: ১২ রুঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হায়েজ একটি এমন বস্তু যাহা আল্লাহ আয়ালা আদমজাত মহিলাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলে, ইহা প্রথমে বনী-ইস্রায়ীলদের উপর চাপান হইয়াছিল। বোখারী (রঃ) বলেন, এই দুই মতবাদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত মতবাদই অগ্রগণ্য ও গ্রহণীয় যে, হায়েজ আদম জাতের প্রথম হইতেই আরম্ভ।

● যেই হাদীছের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল উহা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আমিও হযরতের সঙ্গে ছিলাম। মিকাত তথা এহরাম বাঁধার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে আমি ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ছিলাম। মক্কার অতি নিকটবর্ত্তী আসিয়া আমার হায়েজ আরম্ভ হইয়া গেল। মক্কায় পৌঁছিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসান্তে কাঁদার কারণ জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা দানে আমাকে বলিলেন—ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم

“ইহা এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত নারীদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন, (ইহাতে কুন্ঠিত হইও না)। হাদীছটির অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ডে হজ্জের অধ্যায় “হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় এহরাম বাধা” পরিচ্ছেদে আসিবে।

ঋতুবতী স্ত্রী স্বামীর মাথা ধুইয়া ও আঁচড়াইয়া দিতে পারে

২০৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায় থাকাকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছি।

২০৮। **হাদীছ ঃ**—ওর্‌ওয়া (রাঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হায়েজ অবস্থায় নারী আমার খেদমত করিতে পারিবে কি? কিম্বা নাপাক অবস্থায় স্ত্রী আমার নিকট আসিতে পারিবে কি? তিনি উত্তর করিলেন—এর প্রত্যেকটিকেই আমি সহজ মনে করি, প্রত্যেকেই আমার খেদমত করিতে পারিবে; এজন্য কাহারও উপর দোষারোপ করা চলিবে না। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ'তেকাফে থাকিয়া স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন, আয়েশা (রাঃ) হায়েজ অবস্থায় উহা আঁচড়াইয়া দিতেন।

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সংস্পর্শনে কোরআন তেলাওয়াত করা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল (রঃ) স্বীয় ক্রীতদাসীকে হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফ নিয়া আসার জন্য পাঠাইতেন, সে কোরআন শরীফের গেলাফের রশি ধরিয়া নিয়া আসিত।

২০৯। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হায়েজ অবস্থায়ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার কোলে হেলান নিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতেন।

ঋতু অবস্থার নারীদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করা

২১০। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মো'মেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদরের ভিতর শায়িত ছিলাম, হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। আমি নিঃশব্দে চাদরের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং ঋতুকালীন বিশেষ কাপড় পরিধান করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হায়েজ আরম্ভ হইয়াছে? আমি আরজ করিলাম হাঁ। তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিলেন, আমি তাঁহার সহিত এক চাদরের নীচে শয়ন করিলাম।

২১১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে পানি লইয়া জানাবাতের গোসল করিতাম। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) আমাকে হায়েজ অবস্থায় রীতিমত ইজার পরিধানের আদেশ করিতেন ও আমার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন এবং তিনি এ'তেকাফে থাকিয়া মসজিদ হইতে মাথা বাহির করিয়া দিতেন; আমি হায়েজ অবস্থায় তাহার মাথা ধুইয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে "মোবাশারাহ্" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা একটি আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ—একত্রে আহার-নিদ্রা করা, খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা উঠা-বসা ও শয়ন ইত্যাদি একত্রে এক সঙ্গে করা। ইহুদীদের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন নারীর হায়েজ আরম্ভ হইলে বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাহাকে ভিন্ন কুঁড়ে ঘরে, ভিন্ন পেয়ালা-বাসনে, ভিন্ন গ্লাসে একেবারে অস্পৃশ্য ভাবে রাখিয়া দিত। কেহই তাহার সঙ্গে একত্রে আহার-বিহার ও উঠা-বসা করিত না, এমনকি স্বামীকেও এক বিছানায় শয়ন করিতে দিত না। পক্ষান্তরে নাছারাদের প্রচলিত প্রথা ছিল, ইহুদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য কিম্বা বাছ-বিচার করিত না, এমনকি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিতেও বিরত থাকিত না। অথচ ঋতু অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার-স্থানটি ঘৃণা উদ্রেককারী অপবিত্র ও নাপাকির স্থান হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় সঙ্গম করাতে নানা প্রকার কঠিন দুরারোগ্য ব্যধি জন্মিয়া উভয়েরই স্বাস্থ্যের অপকার ও ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ইসলাম সনাতন ধর্ম্ম। উহার বিধি-ব্যবস্থাদি মধ্য পন্থীয়। নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা বর্ব্বরতা এবং কুৎসিত, ঘৃণার্হতা ও কদর্যতা—এ সবকেই ইসলাম এড়াইয়া চলে। তাই এক দিকে ইহুদীবাদের অভিশপ্ত ব্যবস্থা ও অত্যাচারের প্রথা হইতে নারী জাতিকে রক্ষা করিতে ইসলামের বিধানে এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, ঋতু অবস্থায় একত্রে বসবাস, একত্রে আহার-নিদ্রা এমনকি রীতিমত ইজার পরিধানে স্বামীর সহিত এক বিছানায় শয়ন করা যাইবে ; কোন প্রকার অস্পৃশ্যতার ভাব মনে আনিবে না। অন্যদিকে নাছারাবাদের কুৎসিত ঘৃণিত সীমা লঙ্ঘনকারী নীতির বিপরীত ঋতু অবস্থায় সঙ্গম করা পরিষ্কাররূপে হারাম করিয়া দিয়াছে।

২১২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতুর প্রারম্ভিক তীব্রতার মুখে বিশেষভাবে ইজার পরিধান করার জন্য তিনি আদেশ করিতেন এবং ইজার পরিধান অবস্থায় এক বিছানায় শয়ন করিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় দৃঢ় সংযমী আর কেহ হইতে পারে না, (তাই সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হইবে।)

২১৩। হাদীছ ঃ— মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্ত্রীর সঙ্গে ঋতু অবস্থায় এক বিছানায় শয়নের ইচ্ছা করিলে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী তিনি রীতিমত ইজার পরিধান করিয়া লইতেন।

ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ

২১৪। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রোযার বা কোরবাণীর ঈদের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদগাহে উপস্থিত হইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মহিলাদের স্থানে যাইয়া তাহাদিগকে বিশেষ-ভাবে বলিলেন—হে মহিলাগণ! তোমরা দান-খয়রাত কর, কারণ দোযখবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ তোমাদেরকে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি কারণে ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বলিলেন, তোমরা লান-তান অভিশাপ অত্যধিক করিয়া থাক এবং স্বামীর না-শোকরি ও নিমকহারামি করিয়া থাক। নারী জাতির স্বভাব এই যে, তাহাদের প্রতি আজীবন এহ্ছান ও সদ্ব্যবহার করার পর একটি ত্রুটি দেখা মাত্র বলিয়া ফেলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও আমি ভাল ব্যবহার পাই নাই। এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও একটি দোষ এই যে, নারী জাতি অত্যধিক ছলনাময়ী হইয়া থাকে। স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প নেক আমল লইয়া চালাক চতুর হুশিয়ার পুরুষের বুদ্ধি-বিবেকের উপর তোমরা যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পার এরূপ অন্য কেহ করিতে পারে তাহা দেখি না।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নেক আমল ও বুদ্ধি স্বল্প কিরূপে ইয়া রসুলুল্লাহ! তিনি বলিলেন—নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্দ্ধ নয় কি? (দুইজন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।) তাহারা বলিল, হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই স্বল্প বুদ্ধির প্রমাণ। তারপর হযরত (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে নামায-রোযা হইতে বিরত থাক না কি? তাহারা স্বীকার করিল—হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই নেক আমল কম হওয়ার প্রমাণ। (ঋতু অবস্থায় নামায পড়িতে ও রমযানের রোযা রাখিতে না পারায় গোনাহ না হইলেও ঐ সব কার্য্য সম্পাদনকারীগণ যে অসংখ্য ছওয়াব হাসিল করে উহা হইতে তাহারা বঞ্চিত নিশ্চয়ই থাকিবে। অন্য উপায়ে ফজিলত হাসিলের ব্যবস্থা থাকিলেও নারী জাতি ঐ পরিমাণ নামায ও রমজানের আসল মর্ত্তবা ত পাইল না।)

ঋতুবতী তওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সব কিছুই করিতে পারে

এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যাহার আলোচনা "হায়েজের আরম্ভ" পরিচ্ছেদে আছে। অত্র পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, ঋতু অবস্থায় সব রকম এবাদৎ নিষিদ্ধ নহে।

ইব্রাহীম নাখ্য়ী (রঃ) বলেন—হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফের এক আয়াত পরিমাণ পড়া যায় তার চেয়ে বেশী নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাবাত অবস্থায় মুখে মুখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্ব্বাবস্থায় আল্লার জেক্র করিতেন (সর্ব্বাবস্থার মধ্যে জানাবাতের অবস্থাও আসিয়া যায়।)

রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (সর্ব্ববিধ নিরাপদ অবস্থা বর্ত্তমান থাকায় এবং রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বক্তব্য শ্রবণ করা নর-নারী প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে) হায়েজ অবস্থার সময়েও নারীদিগকে ঈদগাহে যাইবার আদেশ করা হইত। তথায় তাহারা আল্লাহু-আকবার ইত্যাদি জেক্‌র করিত এবং দোয়ার সময় দোয়ার মধ্যে শামিল হইত।

হাকাম নামক প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ বলেন, আমি জানাবাত অবস্থায়ও দরকার বশতঃ পশু-পক্ষী জবেহ করিয়া থাকি, জবেহ করার সময় বিছমিল্লাহ বলিতে হয়।

রস্থল (দঃ) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন (৬নং হাদীছের বিবরণ) তাহাতে......قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا এই আয়াতটি লিখিয়াছিলেন, অথচ সে কাফের ছিল। কাফের সর্ব্বদাই নাপাক থাকে, এমনকি ফরজ গোসল পূর্ণরূপে করিতে তাহাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—হায়েজ, নেফাছ, জানাবাত অবস্থায় তছবীহ, তাহলীল, দোয়া, দুরূদ পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। এমনকি কোরআন শরীফের কোন আয়াত জেক্‌র ও দোয়া হিসাবে পড়া; যেমন কার্য্যারম্ভে বিছমিল্লাহ·····, হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ, সওয়ার হওয়ার সময় سبحان الذى سخر لنا هذا ইত্যাদি পড়াতে কোন প্রকার আপত্তি নাই। তেমনি ভাবে আরবী ভাষায় কথা বলিতে বা পত্র লিখিতে নিজের পক্ষেরই কোন বাক্য যদি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মিল খাইয়া যায় উহা লেখাতেও দোষ নাই। তেলাওয়াতরূপে কোরআনের আয়াত পাঠ করা বা কোরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয নয়। যদি কেহ শিক্ষয়িত্রী হয় ও অন্য ব্যবস্থা না থাকে সে ক্ষেত্রে শব্দ আলাদা আলাদা পড়াইয়া যাইতে পারে।

এস্তেহাজার (রোগজনিত রক্তস্রাবের) বয়ান

২১৫। **হাদীছ ঃ—** ফাতেমা নাম্নী একজন মহিলা রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি সর্ব্বদাই এস্তেহাজায় লিপ্ত থাকি সে জন্য কি আমি নামায ছাড়িয়া দিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এস্তেহাজার স্রাব কোন একটি রগ বা শিরা হইতে আসিয়া থাকে (অতএব ইহা একটি রোগ ও ব্যধিবিশেষ, এই স্রাব জরায়ু হইতে আসে না, সেজন্য) ইহা হায়েজ নয়; (নামায ছাড়িতে পারিবে না।) এমতাবস্থায় তোমার হায়েজের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে তখন নির্দ্দিষ্ট হায়েজের দিন কয়টিতে নামায ছাড়িয়া দিবে; ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি অতীত হইলে গোসল করিয়া নামায পড়িও।

ব্যাখ্যা ঃ—এস্তেহাজা হায়েজের মতই একটি অবস্থাবিশেষ, কিন্তু হায়েজ একটি সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক রহস্যময় অবস্থা এবং উহার স্রাব জরায়ু হইতে আসিয়া

থাকে। এস্তেহাজা একটি ব্যাধিবিশেষ, ইহার স্রাব রগ হইতে আসিয়া থাকে, যেমন ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়। হায়েজের দরুন যে সমস্ত কার্য্য হারাম হইয়া থাকে এস্তেহাজার দরুন ঐ সব কার্য্যে বাধার সৃষ্টি হয় না। হায়েজ ও এস্তেহাজার সঙ্গে অকাট্য হারাম ও হালালের মছআলাহ জড়িত। বাহ্যিক ভাবে এই দুই এর পার্থক্য অনেক সময় জটিল হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েদের কর্ত্তব্য—যখন যাহার সম্মুখে যে অবস্থার উদ্ভব হয় সে অনুযায়ী বিজ্ঞ আলেম হইতে মছআলাহ জানিয়া লওয়া।

হায়েজের রক্ত পরিষ্কার প্রণালী

২১৬। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কাপড়ের মধ্যে হায়েজের রক্তমাখা স্থানটুকুকে আঁচড়াইয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিশেষভাবে ধৌত করার পর সম্পূর্ণ কাপড়টাকেই মামুলীভাবে ধৌত করিতাম, তারপর উহা দ্বারা নামায পড়িতাম।

এস্তেহাজা অবস্থায় এ'তেকাফ করা

২১৭। **হাদীছ** ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক বিবি তাঁহার সঙ্গে এস্তেহাজা অবস্থায় এ'তেকাফ করিয়া ছিলেন। (এ অবস্থায় তিনি মসজিদে অতি সতর্কতার সহিত থাকিতেন, এমনকি) এক প্রকার বিশেষ পাত্রের উপর বসিতেন। (যেন মসজিদে কোন রকম নাপাকি লাগিতে না পারে।)

হায়েজ অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে নামায পড়া

২১৮। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে (মোসলমানদের আর্থিক অবস্থা দুর্ব্বল ছিল, তখন) আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মাত্র কাপড় থাকিত, হায়েজের সময় উহাই পরা হইত; কোন স্থানে হায়েজের রক্ত লাগিলে থুথুর সাহায্যে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ঐ স্থানকে পানি দ্বারা ধুইয়া নামায পড়িতাম।

হায়েজের পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার ও শরীর মর্দন করা

২১৯। **হাদীছ** ঃ—উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছাল্লাল্লহু আল্লাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদিগকে নিষেধ করা হইত—আমরা যেন স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোকাবেশ ধারণ না করি। স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার বা (আকর্ষনীয়) রঙ্গীন কাপড়

পরিধান জায়েয নহে, কিন্তু এরূপ রঙ্গীন কাপড় যাহার সূতা পূর্ণ রঙ্গীন নহে, স্থানে স্থানে রং লাগান হইয়াছে (অর্থাৎ কোন প্রকার আকর্ষনীয় ধরণের রঙ্গীন নহে) উহা ব্যবহার করা জায়েয। এতদ্ভিন্ন ঐ সময় হায়েজ হইতে পাক-সাফ হওয়া-কালীন গোসলের সময় কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করাও জায়েয করা হইয়াছে।* আমাদের অর্থাৎ নারী জাতিকে জানাযার সঙ্গে যাওয়াও নিষেধ করা হইয়াছে।

২২০। হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মহিলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হায়েজের গোসলের নিয়মাবলী জিজ্ঞাসা করিল। নবী (দঃ) নিয়মাবলী বর্ণনা করিলেন ও বলিলেন, মেশ্‌ক (অথবা তদ্রূপ কোন সুগন্ধি) যুক্ত তুলা (কিম্বা কাপড় ইত্যাদি) দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে। নবী (দঃ) লজ্জায় এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলিতে ছিলেন না; কিন্তু সেও ইহা বুঝিতে ছিল না। তখন আয়েশা (রাঃ) ঐ মহিলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন এবং পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সুগন্ধিময় তুলা বা কাপড় দিয়া স্রাব-স্থানকে মার্জ্জিত করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে।

হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন

ছাহাবীযুগের নারীরা হায়েজকালে স্রাব-স্থানে ব্যবহৃত তুলা হলুদ রং অবস্থায় কৌটার মধ্যে ভরিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট পাঠাইয়া দিত। (তাহাদের ধারণা হইত যে, রক্তের রং লাল হয়, তাই হলুদ বর্ণের পদার্থটি হায়েজের রক্ত হইবে না, এই সন্দেহে মছআলাহ জানার জন্য প্রকৃত বর্ণের নমুনা পাঠাইয়া দিত।) আয়েশা (রাঃ) বলিয়া পাঠাইতেন, তাড়াহুড়া করিও না; যাবৎ সাদা চুণের ন্যায় না দেখা যায় হায়েজ হইতে পাক হওয়া যাইবে না।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মেয়ে শুনিতে পাইলেন, মহিলারা রাত্রিকালে বারংবার আলো জ্বালাইয়া দেখিতে থাকে—হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে কিনা, (এরূপ করিতে অত্যধিক কষ্ট হইত যাহার জন্য শরীয়ত বাধ্য করে নাই, তাই) তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ এরূপ করিত না।

ব্যাখ্যাঃ—হায়েজ শেষ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে নামায রোযা ফরজ বা হারাম-হালাল ইত্যাদি বহু বিষয় জড়িত, তাই হায়েজ শেষ হওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ

---

* এখানে كست । قسط, শব্দ আছে, ইহা এক প্রকার সুগন্ধির নাম। এরূপ সুগন্ধি হায়েজের গোসলে বিশেষতঃ স্রাব স্থানে ব্যবহার করা চাই। কারণ, হায়েজের রক্ত দুর্গন্ধময় হয়, সুগন্ধির দ্বারা উহা পূর্ণ দুরীভূত হইবে। সেন্ট ইত্যাদি নাপাক সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না।

দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের উত্তম যুগের নারীগণ কত সতর্ক থাকিতেন, উপরের দুইটি ঘটনায় উহা লক্ষ্যণীয়। এখানে ২১৫ নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, যে নারী সর্ব্বদা এস্তেহাজা তথা রক্তস্রাব ব্যধিতে আক্রান্ত থাকে তাহার হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন এই যে, এই ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার হায়েজের দিন ও সময় পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ব্যধির সময় ঐ নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময় হায়েজ গণ্য হইবে তদূর্দ্ধের স্রাব এস্তেহাজা হইবে।

হায়েজ অবস্থার পরিত্যক্ত নামায পড়িতে হইবে না

২২১। **ছাদীছ ঃ**—একটি নারী আয়েশা (রাঃ)কে প্রশ্ন করিল, হায়েজের পরবর্ত্তী পবিত্রাবস্থায় নামায আদায় করিলেই যথেষ্ট হয় (হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামাযের কাযা পড়িতে হয় না, অথচ হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা করিতে হয়) কেন ? আয়েশা (রাঃ) তাহার উত্তরে রাগতভাবে বলিলেন, তুমি কি খারেজী ফের্কার লোক ? আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে হায়েজ অবস্থার নামায কাযা পড়িতাম না ; তিনি আমাদিগকে ঐ নামায কাযা পড়ার হুকুমও দিতেন না (রোজা কাযা করার হুকুম দিতেন।)*

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক সময় কোন বিষয়ে কোরআন বা হাদীছে স্পষ্ট নির্দ্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে। এমনকি যুক্তিকে কোরআন ও ছুন্নার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সৎসাহস না করিয়া বরং উলটা কোরআন ও ছুন্নাকেই যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার দুঃসাহস ও অপচেষ্টা করা হয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ হইলে যুক্তিকে মাথায় নিয়াই অগ্রসর হইতে দেখা যায়। যেমন কুফাস্থিত "হারুরা" নামক বস্তির ভ্রষ্ট খারেজী ফের্কার লোকগণ ছিল। তাহারা উল্লেখিত যুক্তি দ্বারা এই মত পোষণ করিত যে, হায়েজ অবস্থার নামাযও রোযার ন্যায় কাযা পড়িতে হইবে। এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এর চেয়ে সরল যুক্তি বিদ্যমান আছে↑। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সেই যুক্তির আশ্রয় না নিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

---

* মোসলেম শরীফে হাদীছটির বর্ণনা মতে বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

↑ সেই যুক্তি এই যে, হায়েজের সর্ব্বোচ্চ সময় দশ দিন এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বনিম্ন সময় পনর দিন। প্রতি মাসে দশ দিন হায়েজ থাকিলে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়। পনর দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায অতিরিক্ত পড়িতে থাকা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বিধায় নামাযের কাযা ফরজ হয় নাই। কিন্তু দশটি মাত্র রোজা এগার মাসের মধ্যে কাযা অতীব সহজ, তাই উহার কাযা করার নিয়ম রাখা হইয়াছে।

আদেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ প্রশ্নকারিণীকে তিরষ্কার করিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লার (দঃ) আদেশ এরূপই ছিল যে, হায়েজ অবস্থার রোজা কাযা করিতে হইবে, নামায কাযা পড়িতে হইবে না। একজন মোসলমানের জন্য এতটুকু যথেষ্ট; কারণ দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তি একমাত্র কোরআন ও ছুন্নাহ। অবশ্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করা যায় যে, কোরআন ও ছুন্নাহ যুক্তিহীন নয়, কিন্তু একই বিষয়ের বিভিন্নমুখী যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অতএব ঈমানদারগণের কর্ত্তব্য কোরআন ও ছুন্নাহ মোতাবেক যুক্তি তালাশ করিয়া লওয়া এবং সেরূপ যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করার জ্ঞান ও সামর্থ্য না থাকিলে উহার জন্য বৃথা মাথা না ঘামাইয়া কোরআন-ছুন্নার প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকা।

ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে বা দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া

২২২। **হাদীছ**ঃ—হাফছাহ-বেনতে-ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদেরকে ঈদ-নামাযের ময়দানে যাইতে নিষেধ করিতাম। একদা এক মহিলা বসরা শহরে আসিয়া বর্ণনা করিল, তাহার ভগ্নিপতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বারটি জেহাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টিতে তাহার ভগ্নিও সঙ্গে ছিলেন। তাহার ঐ ভগ্নি বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জেহাদের সময় আহতদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান ও রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। সেই ভগ্নি একদিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে যদি কাহারও ওড়না না থাকে, তাহার জন্য কোথাও না যাওয়াতে কি দোষ আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্য কাহারও ওড়নার সাহায্যে এছতেছকা, ঈদ ইত্যাদি সৎ দোয়া-প্রার্থনায় শরীক হওয়া চাই। (হাফছাহ বর্ণনা করেন যে,) অতঃপর বিশিষ্টা মহিলা ছাহাবী উম্মে-আ তীয়া (রাঃ) আমাদের এখানে আসিলেন, আমি নিজে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; আপনি কি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে কিছু শুনিয়াছেন? তিনি তাঁহার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হযরতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আজমত প্রদর্শন করতঃ বলিলেন, আমার মাতাপিতার উৎসর্গস্থল নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রাপ্তবয়স্কা পর্দ্দানশীন নারীগণ, এমনকি হায়েজ অবস্থায় হইলেও দোয়া উপলক্ষে বা নেক কাজের জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা নামাযের স্থল হইতে পৃথক থাকিবে। হাফ্‌ছা বলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋতুবতী নারীগণও কি উপস্থিত হইবে? তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আরফার ময়দানে, মোজদালেফায়, মিনা ইত্যাদি স্থানে ঋতুবতী নারীরা উপস্থিত হইয়া থাকে না?

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ পর্দ্দার সহিত চাদরে আবৃত হইয়া ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি, এমনকি পাঁচ ওয়াক্তী নামাযের জমাতেও উপস্থিত হইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিষয়ে আদেশও করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার অনেক রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ—নর-নারী সকলের মধ্যেই সততা অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোন প্রকার ফেতনার আশঙ্কা হইত না। দ্বিতীয়তঃ—ঐ সময় অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল, নূতন নূতন হুকুম-আহ্‌কাম নাযেল হইতে থাকিত। ঐ সময় শরীয়তের হুকুম-আহকামের বহুল প্রচার ও ঘরে বসিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না। সে সময় শিক্ষা প্রাপ্তির একমাত্র কেন্দ্র ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ) ; তাঁহার প্রতিটি কথা কাজ ইত্যাদি শরীয়ত ছিল। তিনি আপাদমস্তক শরীয়তের নমুনা ছিলেন, বিশেষতঃ ছোট বড় জনসমাবেশে ও অনুষ্ঠানাদিতে তাঁহার প্রতিটি বাক্যই শিক্ষা ও শরীয়ত হইত। প্রত্যেক নর-নারী ঐ সুযোগেই দ্বীন শিক্ষা করিত ; এজন্যই ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে নারীদের উপস্থিতির আদেশ ছিল। সেই আদেশ নামাযের জমাতে শরীক হইবার উদ্দেশ্যে হইলে হায়েজ অবস্থার নারীদিগকেও উপস্থিত হওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইত না, অথচ তাহাদের প্রতিও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দ্দেষ ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা এ বিষয়ের আসল হেতু ছিল উহা বাকী থাকে নাই। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও দিন দিন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। অধিকন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার নারীগণ সততার প্রতীক ও সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বাহির হওয়ার জন্য এত কড়াকড়ি ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যখন কোন নারী মসজিদে উপস্থিত হইবে সে সুগন্ধি ছুঁইবে না। (মোসলেম শরীফ)

অন্য এক হাদীছে আছে—যে নারী মসজিদে আসার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করিবে তাহার নামায কবুল হইবে না—যাবৎ সে ফরজ গোসলের ন্যায় বিশেষরূপে উহা ধৌত করতঃ গোসল না করিবে (নাছায়ী শরীফ)। আরও এক হাদীছে আছে—যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া কোন জন-সমাবেশের নিকটবর্ত্তী হইবে সে ভ্রষ্টা নারী। (আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিজী শরীফ)

এ সমস্ত বিষয়ে নারীদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রবল স্রোত যে রূপে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বিধি-ব্যবস্থা বর্ত্তমান কদর্য্য যমানার বহু পূর্ব্বেই স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অনুসারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) উহারই উল্লেখ করিয়াছেন

ও বলিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লার (দঃ) পর নারীগণরে মধ্যে যে প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয় নারীদিগের মসজিদে যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। (বোখারী ও মোসলেম শরীফ)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার সংলগ্ন উত্তম শতাব্দীর নারীদের অবস্থা অনুপাতেই আয়েশা (রাঃ) উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই তুলনায় বর্ত্তমান ফেতনার যুগের উল্লেখ কোথায় হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। সে জন্যই সমস্ত ইমামগণের ও আলেমদের এজমা ও একমত যে, কিশোরী যুবতীদিগকে কোন ক্রমেই ঈদ, জুমা, জমাত ইত্যাদিতে শরীক হইতে দিবে না, এমনকি ইমামগণের পরের আলেমগণ বৃদ্ধাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—নারীদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না; কিন্তু বাড়ীতে নামায পড়াই তাহাদের জন্য শ্রেয়ঃ। (আবু দাউদ)

আরও এক হাদীছে আছে, নারীদের জন্য বারান্দা অপেক্ষা আন্দর বাড়ীর নামায উত্তম। তদুপরি খাস কুঠরীর নামায সর্ব্বোত্তম। (আবু দাউদ শরীফ)

ঈদ ইত্যাদি নামাযের জন্য নারীদের ভিন্ন জমাতের ব্যবস্থা করা শরীয়ত দৃষ্টে একেবারে ভিত্তিহীন ও ব্যঙ্গ তুল্য। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণের যমানায় এরূপ ব্যবস্থার কল্পনাও কোন সময় করা হয় নাই, অথচ বর্ত্তমান যুগের তুলনায় ঐ সমস্ত যুগে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্টতা ও নেক কার্য্যের প্রতি আগ্রহ যে কত বেশী ছিল তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল আলেমই এরূপ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়াছেন।

হায়েজের সময় ভিন্ন জরদ ও মেটে রং-এর স্রাব

২২৩। হাদীছ ঃ— উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে তাঁহার সময়েই আমরা জরদ, মেটে বা ধুসর রঙ্গের নির্গত পদার্থকে (ঋতু সম্পর্কীয়) কিছুই গণ্য করিতাম না।

ব্যাখ্যা ঃ—হায়েজকালীন বা হায়েজের সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে লাল, জরদ, ধুসর ও মেটে যে কোন রং-স্রাব হইবে উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে। যেমন "হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন" পরিচ্ছেদে আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হায়েজের সম্ভাব্য সময় ভিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বদার অভ্যাসগত নির্দ্ধারিত হায়েজের দিনগুলি বা হায়েজের সর্ব্বোচ্চ দশ দিন শেষ হইবার পর; তদ্রূপ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এবং অধিক বয়সের ঋতুবদ্ধা মহিলাদের সময় সময় নানা রং এর কিছু স্রাব দেখা যায় উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে না।

এস্তেহাজার স্রাব রগবিশেষ হইতে নির্গত

২২৪। হাদীছ ঃ—উম্মে-হাবিবাহ নাম্নী ছাহাবীয়া দীর্ঘ সাত বৎসর এস্তেহাজার ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অধিক গোসল করার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, (ইহা একটি বিশেষ রগ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা হায়েজ নয় ; এই স্রাব জরায়ু হইতে নির্গত হয় না। বরং এস্তেহাজা ;) তাই তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করিয়া নামায পড়িতেন।

এস্তেহাজা অবস্থায় হায়েজ শেষ হইলে তাহার হুকুম

অর্থাৎ যদি কাহারও সর্ব্বদাই এস্তেহাজার স্রাব হইতে থাকে তাহার জন্য হুকুম হইল—প্রতি মাসে তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সেই পূর্ব্ব অভ্যাস অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি হায়েজ গণ্য হইবে। ঐ দিন কয়টি গত হইয়া গেলে সে হায়েজ হইতে পাক-পবিত্র গণ্য হইবে, যদিও স্রাব বন্ধ না হইয়া থাকে। কারণ এই স্রাব এস্তেহাজা গণ্য হইবে, সুতরাং এখন হায়েজ হইতে পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করিয়া নামায আদায় করিতে থাকিবে এবং তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পারিবে।

২২৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—(এস্তেহাজাভোগী নারী) হায়েজের সময় উপস্থিত হইলে নামায পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ সময় গত হইয়া দেলে গোসল করিয়া নামায পড়িবে।

ঋতুবতীর সংস্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না

২২৬। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায়—নামায না পড়াকালীন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নাযাযের নিকটবর্ত্তী স্থানে শুইয়া থাকিতাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ঐ অবস্থায় চাটাইর উপর নামায পড়িলেন ; যখন তিনি সেজদায় যাইতেন তাঁহার কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করিত।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হায়েজান্তে গোসলের সময় মাথা আঁচড়াইবে (৪৫ পৃঃ) ; যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিতে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। ● হায়েজান্তে গোসলের সময় চুলের খোপা বেণী ইত্যাদি ছাড়িয়া লইবে (৪৫ পৃঃ)। ● হায়েজ

অবস্থায় হজ্জ এবং ওমরার এহরাম বাঁধা যায় (৪৬ পৃঃ)। ● বিশেষভাবে কাপড় পরিহিতা ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী এক বিছানায় শয়ন করিতে পারে (৪৫ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হায়েজ অবস্থার জন্য বিশেষ কাপড় যোগাড় রাখা ভাল (৪৫ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হজ্জের সময় তওয়াফে জিয়ারত করার পর হায়েজ আরম্ভ হইলে কোন ক্ষতি হইবে না (৪৭ পৃঃ)। অর্থাৎ বিদায় তওয়াফ ছাড়াই হজ্জ পূর্ণ হইবে। ● নেফাছ অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জানাযা-নামায পড়িতে হইবে (৪৭ পৃঃ)।

এখানে আরও একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী গ্রহণ যোগ্য।"

উহার ব্যাখ্যা এই যে, কোন নারী স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হইলে, তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত করা ঐ নারীর উপর ফরজ; তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ। সর্ব্বনিম্ন কত দিনে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে সে বিষয় ইমাম বোখারীর (রঃ) মত এই যে, এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। এই মতের সপক্ষে তিনি আলী (রাঃ) ও কাজী শোরায়হের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহাদের সম্মুখে একটি মহিলা দাবী করিল, এক মাস পূর্ব্বে স্বামী আমাকে তালাক দিয়াছিল, ইতিমধ্যেই আমার তিন হায়েজ অতিবাহিত হইয়া ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজী শোরায়হ বলিলেন, যদি নিকটবর্ত্তী আত্মীয় দ্বীনদার পরহেজগার লোক সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাহার তিন হায়েজ গত হওয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সে প্রত্যেক হায়েজের সময় নামায ত্যাগ করতঃ হায়েজান্তে পবিত্র হইয়া নামায পড়িয়াছে, এরূপ সাক্ষী পাইলে দাবী গ্রহণীয় হইবে। আলী (রাঃ)ও এই রায়ে একমত হইলেন।

অন্য কোন ইমামের মজহাবেই মাত্র এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে অত্যন্ত ৩৩ (তেত্রিশ) দিনে হইতে পারে। কারণ তাঁহার মতে হায়েজের সর্ব্বনিম্ন সময় একদিন একরাত্র এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্ত্তী সময় সর্ব্বনিম্ন পনর দিন। হানাফী মজহাব মতে কমপক্ষে ৩৯ (উনচল্লিশ) দিনে তিন হায়েজ গত হওয়া সম্ভব। কারণ হানাফী মজহাবে হায়েজের সর্ব্বনিম্ন সময় তিন দিন, দুই হায়েজের মধ্যবর্ত্তী সময় পনর দিন।*

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি ঐ নারী তালাকের পূর্ব্বে হায়েজের এবং হায়েজের মধ্যবর্ত্তী সময়ের নির্দ্ধারিত সংখ্যক দিনের অভ্যস্তা থাকে তবে তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী অবশ্যই অভ্যস্ত সংখ্যার সামঞ্জস্যে হইতে হইবে।

* ফতহুল ক্বাদীর নামক কিতাবে এ বিষয়ে অনেক দলীল বর্ণনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তায়াম্মুম

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ

"তোমরা যদি পানি সংগ্রহ বা ব্যবহার করিতে অক্ষম হও তবে পাক মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর—মুখমণ্ডল ও দুই হাত ঐ মাটি স্পর্শনে মছেহ কর।" (৬ পাঃ ৬ রুঃ)

২২৭। **হাদীছ**:—* আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক জেহাদের সফরে গিয়াছিলাম। বায়দা বা জাতুল-জায়শ নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমার গলার মালাটি ছিন্ন হইয়া কোথাও পড়িয়া যায়; ঐ মালার তালাশে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অপেক্ষা করিতে হয় এবং সকলেই অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং কাহারও সঙ্গে পানি ছিল না। তাই সকলে (আমার পিতা আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) নিকট যাইয়া) অভিযোগ করিতে লাগিল যে, আপনি দেখেন না—আয়েশা কি কর্ম্ম করিয়াছে? রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুভূমিতে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে যেখানে পানির নাম-নিশানা পর্য্যন্ত নাই এবং কাহারও সঙ্গেও পানি নাই। ইহা শুনিয়া আবুবকর (রাঃ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার উরুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে ছিলেন আমার পিতা আমাকে তিরস্কারও ও ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন এবং আমার ভাগ্যে যাহা ছিল সব কিছু শুনাইলেন, এমনকি রাগান্বিত হইয়া আমাকে মুষ্টাঘাতও করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কোন প্রকার নড়াচড়াও করিতে পারিলাম না। এমতাবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘুম হইতে উঠিলেন, (ফজরের নামায সম্মুখে) পানির কোন ব্যবস্থা নাই, পানি তালাশ করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখনই আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের হুকুম বর্ণিত আয়াত নাযেল করিলেন। সকলেই তায়াম্মুম করিল। উছায়দ-ইবনে হুজায়ের নামক ছাহাবী (যাঁহাকে ঐ মালার তালাশে নিযুক্ত করা হইয়াছিল) এই খবর শুনিতে পাইয়া আনন্দ মুখর হইয়া বলিলেন, হে আবুবকর পরিবার! ইহা আপনাদের প্রথম বরকত

---

* হাদীছখানা বোখারী শরীফে দশ জায়গায় আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

নয়; আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করুন! খোদার কছম—যখনই আপনার উপর কোন প্রকার বিপদের আগমন হয় তখনই আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া দেন এবং মোসলেম সমাজকে উপকৃত করেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি যেই উটটির উপর সওয়ার ছিলাম ঐ উটটিকে শোয়া অবস্থা হইতে দাঁড় করান হইলে দেখা গেল, মালাটি ঐ উটের নীচে পড়িয়া আছে।

২২৮। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে আমার পূর্ব্বে কেহই উহা লাভ করিতে পারে নাই। (১) সুদুর এক মাসের পথ হইতে শত্রু পক্ষকে ভীত ও ত্রাসিত করার শক্তিশালী প্রভাব দান করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে*। (২) সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য নামাযের ও পবিত্রতা সাধনের উপযোগী সাব্যস্ত করা হইয়াছে+, যে স্থানে নামাযের সময় উপস্থিত হয় সেখানেই আমার উম্মত নামায আদায় করিতে পারিবে। (৩) গণীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে, আমার পূর্ব্বে কোন পয়গাম্বরের উম্মতের জন্য উহা হালাল ছিল না।↑ (৪) শাফা'য়াতের সুযোগ আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে।⁑ (৫) আমি বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি, আমার পুর্ব্বে প্রত্যেক নবী বিশেষ কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইতেন।

---

* খন্দকের জেহাদের পর আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেন। এর পর আর কখনও তাঁহার উপর মদীনায় আসিয়া আক্রমণ করার সাহস কাফেরদের হয় নাই। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "এখন হইতে আমরা তাহাদের তথা কাফেরদে উপর আক্রমণ করিব, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর আক্রমণে সাহসী হইবে না।"

+ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতদের জন্য মসজিদ ভিন্ন অন্য কোথাও নামায শুদ্ধ হইত না এবং তায়াম্মুমের সুযোগ তাহাদের জন্য ছিল না।

↑ পুর্ব্বের উম্মতদের জন্য এই বিধান ছিল যে, গণীমতের মাল একত্রিত করিবে আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া উহা ভস্ম করিয়া যাইবে, ঐমাল কাহারও ব্যবহার করা হারাম ছিল।

⁑ শাফায়াতে-কোবরা—বড় শাফায়াৎ অর্থাৎ কঠিন হাশর-মাঠে যখন তথাকার সমস্ত লোক ভীষণ দুঃখ-যাতনায় থাকিবে। এবং সমুহ কষ্ট-যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ উদ্দেশ্যে হিসাব আরম্ভের জন্য সুপারিশ চাহিয়া লোকগণ বড় বড় নবীগণের শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু কোন নবীই সেই সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। সেই মুহূর্ত্তের ঐ সুপারিশকেই "শাফায়াতে-কোবরা" বলা হয়—যাহা দ্বারা পূর্ব্বাপর সমগ্র বিশ্বের উম্মতগণ উপকৃত হইবে। নবী (দঃ) ঐ শাফায়াৎ বা সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং কৃতকার্য্য হইবেন—ইহা তাঁহারই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া অতি সামান্য ঈমানধারী বড় বড় গোনাহগারের জন্য শাফায়াত করা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বৈশিষ্ট্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা পর পর বর্দ্ধিত হইতে ছিল ; নুতন নুতন বৈশিষ্ট্য হযরত (দঃ)কে পর পর দেওয়া হইয়াছিল। যখন যাহা দান করা হইয়াছে হযরত (দঃ) তাহা জ্ঞাত করিয়াছেন। কারণ, এই সব বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হয় এবং জটিল সমস্যার সমাধান হয়। যেরূপ মুখবন্ধের মধ্যে "রস্থলুল্লার আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য" প্রবন্ধে ইসলামের উক্ত মৌলিক তথ্যটি হযরতের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই উহার জটিলতা খণ্ডন করা হইয়াছে। অনেক সময় হযরতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শরীয়তের মছআলাহও জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তায়াম্মুমের বিধান, মসজিদ ভিন্ন অন্যত্র নামায শুদ্ধ হওয়া, গণীমতের মালামাল হালাল হওয়া জানা গেল। এতদ্ভিন্ন ছুইটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত হওয়া গেল—একটি উপস্থিত সুসংবাদ, অপরটি কেয়ামত পর্য্যন্ত ঈমানের অংশ। উম্মতকে এই শ্রেণীর জ্ঞান দানের জন্যই হযরত (দঃ) আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ উম্মতকে জ্ঞাত করিতেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মোসলেম শরীফের বিভিন্ন হাদীছের সমষ্টিতে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—উহার ছুইটির বর্ণনা মুখবন্ধে উল্লেখিত প্রবন্ধে আছে। তৃতীয়টি হইল—পূর্ব্ব উম্মতগণের নামাযে মোক্তাদিদের ছফ তথা সুশৃঙ্খল কাতার-বন্দির বিধান ছিল না ; ফেরেশতাদের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে। হযরতের উম্মতের জন্যও আল্লাহ সেই নিয়মকে উহার মর্য্যাদা সহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তথা এই উম্মতের নামাযের কাতারকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কাতাররূপ মর্য্যাদাবান সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের সর্ব্বমোট সংখ্যা ষাট পর্য্যন্ত পৌঁছে বলিয়া একজন আলেম উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল-মোলহেম ২—১১৬)

অক্ষমতা ও আশঙ্কার ক্ষেত্রে বাড়ীতেও তায়াম্মুম করা যায়

হাছান বছরী (রঃ) বলেন রুগ্ন ব্যক্তি—যে নড়াচড়া করিতে অক্ষম ; পানি উপস্থিতকারী কাহাকেও না পাইলে তায়াম্মুম করিতে পারিবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক দুরের এক জায়গা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মদীনা হইতে মাত্র এক মাইল ব্যবধানের এক স্থানে পৌঁছিলে আছরের ওয়াক্ত হইল ; পানির ব্যবস্থা ছিল না, তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই মদীনায় পৌঁছিলেন, কিন্তু সেই নামায পুনঃ দোহরাইলেন না।+ (নোটটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

২২৯। **হাদীছ ঃ**—আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বীরে জামাল নামক স্থান হইতে আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। সে নবী (দঃ)কে সালাম করিল, তিনি সালামের উত্তর না দিয়া এক দেয়ালের নিকটবর্ত্তী যাইয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা উহার সংস্পর্শনে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মছেহ (তথা তায়াম্মুম) করিলেন, তারপর ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন।

ফুঁক দিয়া হাতের অতিরিক্ত মাটি ফেলিয়া তায়াম্মুম করিবে

২৩০। **হাদীছ ঃ**—এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমার উপর গোসল ফরজ হয়, কিন্তু পানি পাওয়া না যায় তখন কি করিতে হইবে? আম্মার ইবনে ইয়াছের নামক ছাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন—আপনার কি স্মরণ নাই যে, আমি ও আপনি একবার সফরে ছিলাম, সে অবস্থায় আমাদের উভয়েরই গোসল ফরজ হয়; পানির ব্যবস্থা ছিল না। আপনি নামায পড়িলেন না,↑ কিন্তু আমি মাটির উপর শুইয়া গড়াগড়ি করিয়া সমস্ত শরীরে ধুলা মাখিয়া লইলাম+ এবং নামায পড়িলাম। তারপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলিয়া তাঁহার দুই হাত মাটির উপর মারিলেন এবং হাত উঠাইয়া উহাতে ফুঁক দিলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মছেহ করিলেন।

পাক মাটি পানির পরিবর্ত্তে পবিত্রতা লাভের বস্তু

হাছান বছরী (রঃ) বলেন, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এক বারের তায়াম্মুমই একাধিক নামাযের জন্য যথেষ্ট।* ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়াম্মুম অবস্থায় ইমামতী করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ী'দ (রঃ) বলিয়াছেন, লোনা মাটিতে নামায পড়া যায় এবং তদ্বারা তায়াম্মুমও করা যায়।

+ পথিমধ্যে আছরের নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে তখন তাঁহার জানা ছিল না যে, তিনি পূর্ণ ওয়াক্ত থাকিতে মদীনায় পৌঁছিতে পারিবেন, নচেৎ মদীনায় পৌঁছিয়া অজু করিয়াই নামায পড়িতেন।

↑ কারণ গোছলের পরিবর্ত্তে তায়াম্মুম করার হুকুম তখন তাঁহার জানা ছিল না।

+ গোসলের পরিবর্ত্তে তায়াম্মুমের হুকুম জানা ছিল না, কিন্তু অজুর তায়াম্মুমে হাত ও মুখ মছেহ করা হয়; এই তুলনায় গোসলের পরিবর্ত্তে সমস্ত শরীর মাটির সংস্পর্শ করিলেন।

* অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতনভাবে তায়াম্মুম করিতে হইবে না, অজুর ন্যায় এক তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া যায় যাবৎ তায়াম্মুম ভঙ্গের কোন কারণ উপস্থিত না হয়।

২৩১। **হাদীছ**ঃ—এম্‌রান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন সফরে ছিলাম; আমরা সমস্ত রাত্রি চলিয়া (ক্লান্ত হইয়া) শেষরাত্রে নিদ্রামগ্ন হইলাম; পথিকের জন্য ঐ নিদ্রা বড়ই মধুর হয়। (ফজরের সময় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিল না;) একমাত্র সূর্য্যতাপই আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। প্রথমে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং পর পর আরও দুই ব্যক্তি জাগ্রত হইলেন। নবী (দঃ) স্বয়ং নিদ্রোত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতাম না, কারণ সময় সময় হযরতের উপর নিদ্রাবস্থায় অহী নাযেল হইত, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

ওমর (রাঃ) নিদ্রাভঙ্গ হইয়া সকলের এই অবস্থা দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু-আকবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার তকবীরের আওয়াজে হযরতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই হযরতের নিকট নিজেদের এই অবস্থার উপর আক্ষেপ ও অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বিচলিত হইও না, এখান হইতে চল। এই বলিয়া সকলকে নিয়া রওয়ানা হইলেন; কিছু দুর যাইয়াই অবতরণ করিলেন এবং অজুর পানি আনিতে বলিলেন ও অজু করিলেন। তারপর (ঐ ফজরের কাজা) নামাযের জন্য আজান দেওয়া হইল। সকলকে লইয়া তিনি নামায পড়িলেন; নামাযান্তে দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামাযে শরীক না হইয়া পৃথকভাবে বসিয়া আছে। নবী (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সকলের সঙ্গে নামাযে শরীক হইলে না কেন? সে আরজ করিল, আমার উপর গোসল ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু পানির ব্যবস্থা নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া লও; উহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ওখান হইতে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে সকলেই তাঁহার নিকট পিপাসার অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি এক স্থানে অবতরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও এম্‌রান (রাঃ)কে পানির তালাশে বাহিরে পাঠাইলেন। তাঁহারা পানির তালাশে বাহির হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, জনৈক মহিলা উটের উপর দুই মশক পানি লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি কোথায়? সে বলিল, পানি এখান হইতে পূর্ণ একদিন এক রাত্রির পথ দুরে। আমাদের পুরুষগণ সকলেই বিদেশ গমন করিয়াছে; (সেই জন্যই আমি পানির জন্য বাহির হইয়াছি।) তাঁহারা বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল; সে বলিল, কোথায়? তাঁহারা বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট। সে বলিল—ঐ ব্যক্তি, যাহাকে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মত্যাগী বলা হয়? তাঁহারা বলিলেন, তুমি যাহাকে চিনিতে পারিয়াছ তিনিই; তুমি চল। তাঁহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

খেদমতে হাজির হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। মহিলাটিকে উট হইতে নামান হইল ; রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি পাত্র আনাইলেন এবং মশক দুইটি হইতে সামান্য পানি ঢালিয়া (উহার মধ্যে কুল্লি করিলেন এবং ঐ কুল্লিযুক্ত পানি মশকের মধ্যে পুনরায় ঢালিয়া দিয়া) উহার ঐ মুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং পানি বাহির করার জন্য তলদেশের ছোট মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, সকলেই ইচ্ছানুযায়ী পানি পান কর, নিজের যানবাহন পশুগুলিকেও পান করাও। সকলে তাহাই করিল এবং ঐ ফরজ গোসলওয়ালা ব্যক্তিকেও একটি পাত্র ভরিয়া পানি দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন, যাও এই পানি শরীরে ঢালিয়া গোসল কর। ঐ মহিলাটি দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টে তাকাইতে ছিল এবং তাহার পানি কি করা হইতেছে তাহা দেখিতেছিল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমরান(রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, সকলেই পানি ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত হইলে পর মশক দুইটি পূর্ব্বের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছিল। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে বলিলেন, মহিলাটির জন্য পারিতোষিক ও বখশীশ স্বরূপ কিছু সংগ্রহ কর। তখন খেজুর, আটা ও ছাতু ইত্যাদি খাদ্যবস্তু তাহার জন্য সংগ্রহ করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাকে উটের পিঠে বসাইয়া খাদ্যবস্তুর পটুলিটি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ যে, আমরা তোমার পানি কম করি নাই, (তোমার মশকদ্বয় এখনও পরিপূর্ণ আছে,) তবে (আমরা যাহা খরচ করিয়াছি উহা) আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পান করাইয়াছেন। তারপর সে যখন নিজ বাড়ীতে পৌঁছিল, বাড়ী ফিরিতে গৌণ হওয়ায় বাড়ীর সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আবদ্ধ ছিলে যে কারণে তোমার ফিরিতে এত গৌণ হইল ? সে উত্তর করিল, আশ্চর্য্য এক ঘটনা ! রাস্তায় দুই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আমাকে ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া গেল যাহাকে পুর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মত্যাগী বলা হয়। এইরূপে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া সে শপথ করিয়া বলিল, আসমান-জমীনের মধ্যে তাঁহার তুল্য অলৌকিক ঘটনা কেহ দেখাইতে পারিবে না ; নিশ্চয় তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য রসুল। তারপর হইতে মোসলমানগণ ঐ মহিলাটির গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে মোশরেকদেরে আক্রমণ করিত, কিন্তু তাহার গোত্রকে কিছুই বলিত না। এই ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মহিলা একদিন তাহার গোত্রীয় সকলকে ডাকিয়া বলিল, আমার ধারণা এই যে, মোসলমানগণ (ঐ পানির ঘটনার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করেন না ; (এরূপ অমায়িক ধর্ম্ম) ইসলামের প্রতি কি তোমাদের আগ্রহ হয় ? সকলেই তাহার ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল।

জানাবাতের গোসলে মৃত্যু বা রোগের আশঙ্কা হইলে কিম্বা পানি ব্যয় করায় পানীয় পানির অভাব হইলে তায়াম্মুম করিবে

ছাহাবী আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ভীষণ শীতের প্রকোপময় এক রাত্রে জানাবাতের সম্মুখীন হইলেন। তখন তিনি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ দেখাইলেন—

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"তোমরা নিজকে মৃত্যুপথে টানিয়া নিও না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান; (তিনি সুযোগ সুবিধা দিয়াছেন; উহা উপেক্ষা করিয়া বিপদ টানিয়া আনিও না।)"

আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ছাহাবীর উক্ত ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে বিপরীত কিছুই বলেন নাই।

২৩২। হাদীছ ঃ— একদা আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি জানাবাতের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্তও পানির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সে কি তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে? (অর্থাৎ অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের ন্যায় ফরজ গোসলের পরিবর্তেও তায়াম্মুম হয় কি? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তাহার জন্য তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হইবে না। যে পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা করিতে না পারে নামায কাযা করিবে। দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা না হইলেও তাহাই করিবে। আবু মূসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি জানেন না যে, আম্মার (রাঃ) তাঁহার প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমার জন্য (জানাবাত অবস্থায়) এরূপ (তায়াম্মুম) করিয়া লওয়া যথেষ্ট।* এই বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই হাত মাটিতে মারিলেন এবং একটু ঝারা দিয়া ডান হাতের দ্বারা বাম হাত ও বাম হাতের দ্বারা ডান হাত এবং মুখমণ্ডল মছেহ করিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনি দেখেন না যে, ঘটনার বর্ণনা শুনিয়া ওমর (রাঃ) উহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই+। তখন আবু মূসা (রাঃ)

---

* এখানে যে হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করা হইল উহা ২৩০ নং হাদীছ।

+ ওমর (রাঃ) স্বয়ং ঐ ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলিয়া আম্মার (রাঃ) নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ওমর (রাঃ) পূর্ণ ঘটনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি ইহার গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু আম্মার (রাঃ)কে এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া মছআলাহ বয়ান করিতে বাধাও দান করেন নাই, বরং তাঁহার উপরই এই ঘটনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

বলিলেন, আচ্ছা—আম্মারের ঘটনা ধর্ত্তব্য না-ই হউক, কিন্তু কোরআন শরীফে ছুরা মায়েদার আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন—فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

অর্থাৎ অজু-ভঙ্গ বা জানাবাত অবস্থায় "পানির ব্যবস্থা না হইলে তায়াম্মুম করিয়া লও।" আবদুল্লাহ (রাঃ) এই আয়াতের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি বলিলেন, জানাবাত অবস্থায় গোসলের পরিবর্ত্তে তায়াম্মুমের সুযোগ প্রদান করা হইলে শীতের দিনে পানি ঠাণ্ডা লাগায় তায়াম্মুমের সুযোগ নেওয়া হইবে। তখন আবূ মূসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আচ্ছা! আপনি শুধু কেবল এই আশঙ্কায় জানাবাতের জন্য তায়াম্মুমের ফতওয়া দিতে চান না? তিনি বলিলেন, হাঁ।×

ব্যাখ্যা ঃ— ছুরা মায়েদার আয়াতের অনুরূপ ছুরা নেছাতে যেই আয়াত রহিয়াছে উহাতেও জানাবাত তথা ফরজ গোসলের জন্য প্রয়োজনে তায়াম্মুম করিবে বলিয়া উল্লেখ আছে। ২৩০ নং হাদীছেও বর্ণিত আছে যে, প্রয়োজনে ফরজ গোসলের জন্য তায়াম্মুম করিবে। সমস্ত ইমামগণের মজহাব ইহাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তায়াম্মুমে হাত ও মুখ উভয়কে মছেহ করিতে মাত্র একবার মাটি স্পর্শন যথেষ্ট।" দুইটি অঙ্গের জন্য দুইবার হাত মাটিতে মারিতে হইবে না। ইহা কোন কোন ইমামের মত, কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমগণের মত এই যে, প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ দুইবার হাত মাটিতে মারিবে। এ সম্পর্কে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান আছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আরও দুইটি পরিচ্ছেদ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) "যদি কেহ পানি ও মাটি কোনটিরই ব্যবস্থা করিতে না পারে।" এমতাবস্থায় অজু ব্যতিরেকেই নামায পড়িবে। অবশ্য অধিকাংশ ইমামগণের মতে তাহাকে সুযোগ অনুযায়ী অজু বা তায়াম্মুম করিয়া পুনরায় ঐ নামায কাযাও পড়িতে হইবে।

(২) "তায়াম্মুম মুখমণ্ডল ও শুধু দুই হাতের কব্জা মছেহ করা"। ইহা কোন কোন ইমামের মত। কিন্তু একাধিক হাদীছ দৃষ্টে ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ ওলামাগণ বলেন, দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত মছেহ করিবে—যে পরিমাণ অজুতে ধৌত করিতে হয়।

× এই হাদীছখানা পর পর তিনবার উল্লেখ হইয়াছে; সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

নামায

নামায ফরজ হওয়ার বিবরণ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পূর্ব্বে মক্কায় অবস্থানকালেই নামায ফরজ হইয়াছিল। ৬ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, মক্কাবাসী আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে এই উক্তি করিয়াছিল যে, (এই নবী) আমাদিগকে নামায, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন।

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে নামায ফরজ হয়। প্রথমতঃ দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ণ আনুগত্যের সহিত উহা গ্রহণে আল্লার দরবার হইতে ফিরিলেন। পথিমধ্যে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ইহা আপনার উম্মতের জন্য কঠিন হইবে, ইহা হ্রাস করার জন্য আপনি আল্লার নিকট আবেদন করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন; এইবার পাঁচ ওয়াক্ত কম করিয়া দেওয়া হইল। মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি পুনরায় ঐ পরামর্শই দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় গেলেন, এইভাবে পুনঃ পুনঃ যাইতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম হইতে লাগিল। শেষবার যখন পাঁচ ওয়াক্ত থাকিয়া গেল, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিলেন, এই পাঁচ ওয়াক্তকে পূর্ণভাবে আদায় করিলে ইহাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছি—"পঞ্চাশ ওয়াক্ত" আমার নিকট (ছওয়াবের ক্ষেত্রে) তাহাই ঠিক রহিল। এইবারও মূসা (আঃ) আরও কম করার জন্য পুনরায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার পরও পুনরায় আল্লাহ তায়ালার নিকট আরও কম করার আবেদন করিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লজ্জা বোধ করিলেন।

মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ পূর্ণভাবে বিষদ ব্যাখ্যার সহিত ইনশাল্লাহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে মে'রাজ শরীফের পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

২৩৩। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা নামায ফরজ করেন মুসাফির অবস্থায় ও বাড়ীতে থাকাকালীন—সর্ব্বাবস্থায়ই (মগরেব ভিন্ন) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায দুই দুই রাকাত। পরে সফর অবস্থার

জন্য দুই রাকাত ঠিকই রহিল, কিন্তু বাড়ী থাকাকালীন অবস্থায় (তিন ওয়াক্ত) নামায চার চার রাকাত করিয়া দেওয়া হইল।

নামায পড়িতে কাপড় পরা ফরজ

অর্থাৎ নামায অবস্থায় ছতর (তথা বিশেষ অঙ্গসমূহ) ঢাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— خذوا زينتكم عند كل مسجد "প্রত্যেক নামাযেই কাপড় পরিবে।"

ছালামা ইবনে-আক্‌ওয়া (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শিকারে অভ্যস্ত; কোন সময় শুধু লম্বা একটি জামা পরিধান করিয়া থাকি, ঐ অবস্থায় নামায পড়িতে পারিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—কিন্তু বুতামের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। বুতাম না থাকিলে কাঁটা দ্বারা হইলেও বুতাম পট্টি গাঁথিয়া লও, যেন বুকের উপর জামা উন্মুক্ত না থাকে। নতুবা রুকু করার সময় স্বীয় দৃষ্টি গুপ্তস্থানের উপর পড়িতে পারে।

উল্লেখিত হাদীছের ছনদ তথা ক্রমিক সাক্ষী সমূহের একজন সাক্ষী দুর্ব্বল, তাই ইহা দ্বারা কঠোর আদেশ প্রমাণিত হইবে না এবং নিজের দৃষ্টি নিজের ছতরের উপর পড়িলে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না। অবশ্য মকরুহ হইবে।

একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে উহা ঘাড়ের সঙ্গে গিরা দিয়া লইবে

ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িলে ঐরূপভাবেই পড়িতেন। কারণ, সমস্ত শরীর আবৃত করার উদ্দেশ্যে চাদরটিকে সীনার উপর বাঁধিলে চাদর খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ঐ আশঙ্কায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত থাকিবে—তাহার লক্ষ্য ও ধ্যান আল্লার প্রতি নিবদ্ধ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ খুটীনাটি বিষয়ে এমন আদর্শের শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহাতে নামায অবস্থায় একাগ্রচিত্তে, কায়মনোবাক্যে এক আল্লার প্রতি ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না হইতে পারে। যেমন পায়খানা প্রস্রাবের বেগ লইয়া বা ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় আহারের প্রতি আগ্রহ লইয়া নামাযে দাঁড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২৩৪। হাদীছ ঃ—ছাহাবী জাবের (রাঃ) একদা একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয়া ঘাড়ের সঙ্গে গিরা লাগাইয়া নামায পড়িলেন; অথচ তাঁহার অন্যান্য কাপড় সম্মুখেই আলনার উপর রাখা ছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আপনি মাত্র এক কাপড়ে নামায পড়েন? তিনি বলিলেন হাঁ—আমি ইচ্ছা করিয়াই

এরূপ করিয়াছি; যেন তোমার মত বোকা মানুষ আমাকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির দুই কাপড় ছিল?

ব্যাখ্যা ঃ—শয়তান অতিশয় ধূর্ত্ত; সে মানুষকে বাহ্যিকভাবে ভাল পথ দেখাইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেক লোক নামায পড়ে না; জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, নামাযের জন্য কাপড়ের সুব্যবস্থা নাই। সেই জন্য নামায পড়ি না। সামর্থ অনুযায়ী নামাযের জন্য কাপড়ের সুব্যবস্থা রাখা ভাল কথা, কিন্তু শয়তান তাহাকে এই পথ দেখাইয়া কিরূপ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করিল যে, কাপড়ের ছুতা দিয়া তাহাকে নামায ছাড়াইয়া দিল, অথচ কাপড় একেবারে না থাকিলেও নামায মাফ হয় না; উলঙ্গ অবস্থায়ই নামায পড়িতে হইবে। শয়তান মানুষকে সাধুতার সহিত ধোকা দিয়া থাকে, সে জন্যই অনুকরণযোগ্য আদর্শ শ্রেণীর ব্যক্তিদের উচিত সর্ব্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য সময় সময় এরূপ কার্য্য করা যাহা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েযের গণ্ডিভূক্ত; যদিও উত্তমের বিপরীত হয়। ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত ঘটনায় এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত ককিয়াছেন।

২৩৫। **হাদীছ ঃ**—মোহাম্মদ ইবনে-মোনকাদের (রঃ) বলেন, আমি ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

লম্বা চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে চাদরের উভয় দিক দুই কাঁধের উপর পিছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে

অর্থাৎ—এক চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া নামায পড়িতে হইলে যদি চাদরটি বিশেষ লম্বা না হয় তবে উহার দুই মাথা ঘাড়ের উপর দিয়া গিরা লাগাইয়া দিবে। লম্বা হইলে চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে ও বাম দিক ডান কাঁধে পেছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে, গিরা দিতে হইবে না।

২৩৬। **হাদীছ ঃ**—ওমর ইবনে আবু ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চাদর উভয় দিক কাঁধের উপর ঝুলাইয়া পরিধান করতঃ নামায পড়িয়াছেন।

২৩৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, এক কাপড়ে নামায

পড়া কিরূপ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি কাপড় থাকে ?

অর্থাৎ—এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয না হইলে অনেকের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অবশ্য সামর্থ থাকিলে পূর্ণ পোশাকে নামায পড়া উচিৎ।

২৩৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়িবে অবশ্যই চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে বামদিক ডান কাঁধে ঝুলাইয়া লইবে।

অপ্রশস্ত কাপড়ে কিরূপে নামায পড়িবে ?

২৩৯। হাদীছ :—ছায়ীদ ইবনে-হারেছ বলেন, আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক কাপড়ে নামায পড়া যায় কি ? তিনি বর্ণনা করিলেন, আমরা কোন এক জেহাদের ছফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাত্রিকালে আমি নিজের কোন প্রয়োজনে হযরতের নিকট আসিলাম ; দেখিলাম, তিনি নামাযে মশগুল আছেন। আমার পরিধানে একটি মাত্র কাপড় ছিল, (কাপড়টি অপ্রশস্ত ও খাট ছিল, তাই কুঁজোর ন্যায় হইয়া কোন প্রকারে) ঐ কাপড়টি পেঁচাইয়া পূর্ণ শরীর আবৃত করিলাম এবং হযরতের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে কেন আসিয়াছ ? আমি আমার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এভাবে কাপড় পরিয়াছিলে কেন ? আরজ করিলাম, একটি মাত্র কাপড় (তাও খাট, পূর্ণ শরীর আবৃত করার জন্য বাধ্য হইয়াই এরূপ করিতে হইয়াছে)। হযরত (দঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়িতে হইলে, যদি প্রশস্ত হয় তবে উহার দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিবে, অপ্রশস্ত (খাট) হইলে উহাকে লুঙ্গির ন্যায় পরিবে।

২৪০। হাদীছ :—ছহল্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক পুরুষ এমতাবস্থায় নামায পড়িত যে, একটি মাত্র চাদর দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিয়া চাদরের দুই মাথা ঘাড়ের উপর গিরা দিয়া রাখিত—যেমন শিশুদেরকে চাদর পরান হইয়া থাকে। (এ অবস্থায় সেজদার সময় চাদরটি শরীরের নিম্ন অংশ হইতে ফাঁক হইয়া থাকার দরুন পেছনের দিকে ঝুলন্ত চাদরের তলদেশে ছতর দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকায়, নামাযরত পেছনে উপবিষ্টা) নারীদিগকে বলা হইত, যাবৎ পুরুষগণ সেজদা হইতে সোজা হইয়া বসিয়া না যায় তাবৎ তোমরা সেজদা হইতে মাথা উঠাইও না।

বিধর্ম্মীদের তৈরী কাপড়ে নামায পরা

হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, অগ্নিপূজকদের তৈরী কাপড়কে দোষণীয় মনে করা হইত না, (উহাতে নামায ইত্যাদি পড়া জায়েজ আছে)।

আলী (রাঃ) নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া উহাতে নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ— বিধর্ম্মীদের তৈয়ারী কাপড় বা নূতন কাপড়ে কোন প্রকার নাপাকি থাকার অবগতি না থাকিলে বা নাপাকির লক্ষণ দৃষ্ট না হইলে উহা ধৌত না করিয়া উহাতে নামায পড়া যায়। এরূপ সাধারণ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দিলে অছওয়াছা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইবে। আর যদি উহাতে নাপাকি থাকে তবে উহা ধৌত করার শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রণালীতে ধোয়ার পর উহা ব্যবহার করা এবং উহাতে নামায পড়া জায়েজ আছে। ইয়ামন দেশের তৈরী এক প্রকার রঙ্গিন কাপড় যাহা রং করিতে প্রস্রাব ব্যবহৃত হইত; ইমাম যুহরী (রঃ) উহা পরিধান করিতেন এবং উহাতে নামাযও পড়িতেন। (কিন্তু শরীয়তী প্রণালীতে পাক করিবার পর।)

২৪১। ছাদীছ ঃ—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, পানির পাত্র লও, আমি উহা লইলাম, রসুলুল্লাহ (দঃ) নির্জ্জন স্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং আমার অদৃশ্যে চলিয়া গেলেন। তারপর তিনি হাজত পুরা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অজু করিতে লাগিলেন। আমি অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। তাঁহার পরিধানে সিরিয়া দেশের তৈরী একটি জুব্বা ছিল। উহার আস্তিনের মুহরী সরু ছিল, তাই উহা টানিয়া কনুই-এর উপর উঠান সম্ভব হইল না, সেজন্য হস্তদ্বয় ভিতর দিক হইতে টানিয়া উহা হইতে বাহির করিয়া লইলেন এবং পূর্ণ অজু করিয়া পা ধোয়ার পরিবর্ত্তে চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) শাম দেশের তৈরী জুব্বা পরিহিত ছিলেন; সে কালে শাম দেশের অধিবাসী অমোসলেম ছিল।

নামায বা অন্য কোন অবস্থায় উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ

২৪২। ছাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবুয়তের পুর্ব্বের ঘটনা—) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘর মেরামতের জন্য সকলের সঙ্গে কাঁধে বহন করিয়া পাথর আনিতে ছিলেন, তাঁহার পরনে লুঙ্গি ছিল। তাঁহার চাচা আব্বাস (সেই অন্ধকার যুগের রীতি অনুসারে) বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লুঙ্গি খুলিয়া কাঁধের উপর রাখিলে পাথর আনিতে কষ্ট হইত না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন; এই ঘটনার পর তিনি সর্ব্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন।

জামা, পাজামা, জাঙ্গিয়া বা জুব্বা পরিধানে নামায পড়া

২৪৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি দুই কাপড়ের সামর্থ্য রাখে? আর এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এখন আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে সামর্থ্য দিয়াছেন, তাই তোমাদের কর্ত্তব্য সেই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা। প্রত্যেকের উচিত একাধিক কাপড়ে নামায পড়া। লুঙ্গি ও চাদর, লুঙ্গি ও জুব্বা, পাজামা ও চাদর, পাজামা ও জামা, পাজামা ও জুব্বা, জাঙ্গিয়া ও জুব্বা, জাঙ্গিয়া ও (লম্বা) জামা বা জাঙ্গিয়া ও চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ছতর আবৃত করা পরিমাণ একটি মাত্র কাপড় পরিধানে নামায পড়া যায়, কিন্তু সামর্থ্য থাকিলে অন্ততঃ দুই খানা কাপড়ে নামায পড়া ভাল, যেমন—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা উবাই (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের মতানৈক্য হইল—উবাই (রাঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া মকরূহ নহে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই মাছআলাহ ঐ সময়ের যখন একাধিক কাপড়ের সামর্থ্য মোসলমানদের ছিল না। খলীফা ওমর (রাঃ) এই মতানৈক্যের ফয়ছালা করিলেন যে, উবাই (রাঃ) মছআলাহ্ ঠিকই বলিয়াছেন; তবে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)ও ভুল বলেন নাই।

ছতর আবৃত রাখা ফরজ

২৪৪। হাদীছ ঃ—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি মাত্র চাদর দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া উহার এক দিক কাঁধের উপর উঠাইয়া রাখা (যাহাতে ঐ পার্শ দিয়া ছতর খোলা থাকিয়া যায়) বা একটি মাত্র কাপড় (যেমন চাদর কিম্বা জামা বা লুঙ্গি) পরিধান করতঃ দুই হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যেন তলদেশ উন্মুক্ত থাকিয়া যায় এবং লজ্জাস্থানের উপর আবরণ না থাকে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই উভয় অবস্থাকে নিষিদ্ধ (হারাম) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ভাবে কাপড় পরিধান করা যাহাতে ছতর উন্মুক্ত থাকিয়া যায় বা উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ইহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সেকালের আরবগণ উল্লিখিত দুই ধরণে কাপড় পরিত যাহাতে ছতর উন্মুক্ত হইত, সে জন্যই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষভাবে ঐ দুইটি অভ্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

২৪৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (নবম হিজরীতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক) যখন আবু বকর (রাঃ) আমীরুল-হাজ্জ নিযুক্ত

হইলেন; সেই হজ্জের সময় মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন তিনি আমাকে এই ঘোষণা জারীর আদেশ করিলেন, কোন মোশরেক এই বৎসরের পরে আর হজ্জে শরীক হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যক্তি উলঙ্গাবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না। এদিকে রস্থলুল্লাহ (দঃ) আবু বকরের পিছনে পিছনে আলী (রাঃ)কে পাঠাইয়া দিলেন, বিশেষভাবে এই ঘোষণা জারী করার জন্য যে, কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির বাধ্যবাধকতা তুলিয়া লইয়া হইল।* আলী (রাঃ) মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন এই ঘোষণাও জারী করিলেন যে, কোন মোশরেক এই বৎসরের পর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না।

উরু (জানুর উর্দ্ধভাগ) ছতরের অন্তর্ভুক্ত কি না?

আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস, জারহাদ এবং মোহাম্মদ ইবনে-জাহ্‌শ (রাঃ) হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন হাদীছ দ্বারা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইমাম বোখারী (রঃ) ঐরূপ হাদীছের ইঙ্গিত দানে বলেন যে, উল্লিখিত ছাহাবীত্রয়ের বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী আমল করাই অবশ্য কর্তব্য। কেননা তাহা হইলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২৪৬। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে রওয়ানা হইলেন। খয়বরের নিকটে পৌঁছিয়া ফজরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকার থাকিতেই পড়িলেন। তারপর শহরে প্রবেশ করিবার জন্য উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। আমি (আমার মাতার স্বামী—) আবু তালহার সঙ্গে এক উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম। নবী (দঃ) খয়বর শহরে প্রবেশ করিয়া শহরের পথসমূহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। (সরু রাস্তায় যানবাহনের অত্যন্ত ভীড়, যানবাহনগুলি ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া চলিতেছিল, তাই) আমার হাঁটু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুকে স্পর্শ করিতেছিল; এতদ্ভিন্ন কোন এক মুহূর্তে হযরতের লুঙ্গি তাঁহার উরু হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল, এমনকি তাঁহার উরুর শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হইল।+

---

* সন্ধির বাধ্য-বাধকতা তুলিয়া লওয়ার ঘোষণা জারির বিষয়টি কোরআন শরীফে ছুরা বরাআতের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ঘোষণা প্রচারের জন্য রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আলী (রাঃ)কে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

+ এই হাদীছখানার মধ্যে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, বোখারী (রঃ) ইহাকে ৩৬স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এখানে শুধু এইস্থান সম্পর্কীয় অংশটুকু অনুবাদ করিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ—যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ধারণা জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে এই হাদীছখানাই অন্যতম। ইহার দুইটি বাক্যের দ্বারা ঐ ধারণার সূত্রপাত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন বাক্যের দ্বারাই উরু ছতর নয় বলিয়া প্রমাণিত হয় না। প্রথম বাক্যটি ركبتى لتمس فخذ نبى الله "(ভীড়ের কারণে যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে) আমার হাঁটু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুকে স্পর্শ করিতেছিল।" এখানে উরু উন্মুক্ত হওয়ার কোনই উল্লেখ নাই; পরিধেয় কাপড়ের উপর উরু স্পর্শিত হওয়াকেও এরূপ বাক্যে ব্যক্ত করা যায়, তদুপরি ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছখানাকেই ৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন—সেখানে فخذ "উরু" শব্দের স্থানে قدم "পা" শব্দ উল্লেখ হইয়াছে— ان قدمى لتمس قدم النبى "আমার পা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা-কে স্পর্শ করিতেছিল।" সাধারণতঃ যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে আরোহীদের পায়ের স্পর্শনই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় বাক্যটি "حسر الازار عن فخذه" আরবী ভাষায় حسر শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—"খোলা বা উন্মুক্ত করা" এবং "খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হওয়া"। অধিকন্তু মোসলেম শরীফে এই হাদীছখানার মধ্যেই حسر শব্দের পরিবর্তে انحسر উল্লেখ হইয়াছে; যাহার একমাত্র অর্থ হইতেছে, "খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া।" সেই অনুসারে উক্ত বাক্যের অর্থ এই হয় যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের উরু হইতে লুঙ্গি সরিয়া পড়িল, উরু উন্মুক্ত হইল। ভীড়ের কারণে বা হাওয়া-বাতাসের দরুন অনিচ্ছাকৃত এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তুতঃ উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নারীগণ কিরূপ বস্ত্রে নামায পড়িবে ?

ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট শাগের্দ এক্‌রেমা (রঃ) বলেন, সমস্ত শরীরকে আবৃত করার মত একটি কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়া নারীদের জন্য জায়েয আছে।

২৪৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) জমাতে ফজরের নামায পড়িতেন, মোসলমান নারীগণ প্রশস্ত চাদরে আবৃত হইয়া জমাতে উপস্থিত হইত এবং নামাযান্তে বাড়ী ফিরিবার সময়* তাহাদেরকে চেনা যাইত না।

* এই রেওয়ায়েতে ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, من الغلس অর্থাৎ অন্ধকার থাকার দরুন নারীদিগকে চেনা যাইত না। কিন্তু ইবনে মাজা শরীফের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিবি আয়েশার উক্তি নহে। পক্ষান্তরে এক হাদীছে আছে যে, ফজরের নামায হযরত(দঃ) শেষ করিলে প্রত্যেকে তাহার নিকটবর্ত্তী মানুষকে চিনিতে পারিত।

নক্সী বস্ত্রে নামায পড়িলে নক্সার প্রতি ধ্যান করিবে না

২৪৮। **ছাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ডোরা-বিশিষ্ট চাদর পরিধানে নামায পড়িতেছিলেন ; হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঐ ডোরার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নামাযান্তে ঐ চাদরটিকে ঘৃণিতরূপে খুলিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, এই চাদরটি আবু জাহ্মকে ফেরৎ দাও এবং এর বদলে তাহার এক রঙ্গের মোটা পশমী চাদরটি নিয়া আস। এই ডোরাগুলি নামাযে আমার পূর্ণ ধ্যান ও মগ্নতার প্রতিবন্ধক হইতেছিল।

নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি ঐ ডোরাগুলির উপর পতিত হয়, তাই আমার আশঙ্কা হয়, চাদরটি এইরূপে আমাকে নামাযের মগ্নতা হইতে বিরত না করিয়া ফেলে।*

ব্যাখ্যা ঃ—নামাযে আল্লার প্রতি একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও মগ্নতা হাসিল করা একান্ত কর্ত্তব্য যে কোন বস্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক হয় বা সেরূপ আশঙ্কা হয় উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ক্রুশ-চিত্রের বা অন্য কোন বিশেষ আকর্ষণীয় ছাপের কাপড় সম্পৃক্তে নামায পড়িবে না

জীবের ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করাই নিষিদ্ধ ; নামায অবস্থায় উহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এমনকি কোন কোন আলেম বলেন, ঐরূপ কাপড় পরিধান করিয়া নামায হইবে না।

২৪৯। **ছাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নক্সী ছাপার একটি পর্দ্দা ছিল যাহাকে তিনি ঘরের এক কোণে লটকাইয়া (উহার আড়ালে আসবাবপত্র) রাখিতেন। একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন, পর্দ্দাটিকে সরাইয়া ফেল, ইহার নক্সাগুলি নামাযের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামায় ইমাম বোখারী (রঃ) ক্রুশের আকৃতিকে নিষিদ্ধরূপে উল্লেখ করিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন! ক্রুশের ছবি কোন জীবের ছবি নয় বলিয়া শরীয়তের সাধারণ নীতি

---

* এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ ডোরাগুলি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একাগ্রতায় প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই ; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শান ও মর্ত্তবা দৃষ্টে উহা সম্ভবও নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হইয়া থাকে বলিয়া প্রিয় উম্মতকে সতর্ক করার জন্য স্বীয় কাঁধে ত্রুটির বোঝা নিয়া বুঝাইয়াছেন ; স্নেহপূর্ণ মুরব্বি এইরূপই করিয়া থাকেন।

অনুসারে কেহ ইহাকে জায়েয মনে করিতে পারে, সে জন্যই উহা নিষিদ্ধ হওয়া বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রুশ-চিহ্ন একটি বিধর্ম্মীয় প্রতীক এবং উহা ব্যবহারে বিজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিধর্ম্মীয় প্রতীক ও বিজাতীয় প্রভাব অবলম্বন করিয়াই মোসলেম জাতি চরম অধঃপতনে পড়িয়াছে। এই ক্রুশের প্রতীকধারী খৃষ্টানগণ এক সময়ে স্পেন, তারাব্লস ইত্যাদি সমস্ত ইউরোপ হইতে মোসলেম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই ক্রুশের দোহাই দিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। এমনকি "জঙ্গে ছলীব" বা ক্রুশের যুদ্ধ নাম দিয়া তাহারা অগণিত মোসলেম নরনারীর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। সে সব কাহিনী ভুলিয়া যাওয়া কোন মোসলমানের জন্য জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক হইবে না। আজও খৃষ্টানগণ আমাদের দেশে মোসলমানদের মন-মগজে সেই নরখাদক মনহুস অশুভ ক্রুশের প্রভাব বিস্তার করার হাজার হাজার ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। খ্রীষ্টান পরিচালিত স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহে আজও সেই মোসলেম হৃদয়ে বর্শাঘাতকারী ক্রুশ মাথা উচু করিয়া আছে। সেখানেই আমাদের সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাছা বাছা বালক বালিকা হইতে যুবক যুবতী পর্য্যন্ত লালিত পালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং সর্ব্বদা তাহারা ঐ ক্রুশের মাথা উচু দেখিয়া প্রতিদিন উহার প্রতি ভক্তির প্রণাম দিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয় বরং এই বিষয়কে ব্যাপকভাবে মোসলেম সমাজে ঢুকাইবার জন্য শান্তি ও সাহায্যের প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও প্রতীক "রেডক্রস" (Rebcroos) এর ভিতর দিয়াও ক্রুশের প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। মোসলেম জ্ঞানিগণ ঐ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াই উহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা "রেড ক্রিসেন্ট" (Rcbcrescent) নিজস্ব প্রতীক প্রচলিত করিয়াছিলেন।

প্রতিটি মোসলমানের ভিতর বিজাতীয় প্রতীকের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে। বোখারী শরীফের ৮৮০ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ঘরে ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কোন বস্তু দেখিলে উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেন।

রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়া

২৫০। হাদীছঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল (তখন রেশমী বস্ত্র ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম ছিল না)। তিনি উহা

পরিধান করিয়া নামায পড়িলেন। কিন্তু নামায-শেষে উহাকে ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, ইহা মোত্তাকীদের জন্য সমীচীন নয়।

ব্যাখ্যা :—রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার ইহা প্রথম পদক্ষেপ। এরপর রসুলুল্লাহ (দঃ) পরিষ্কার বলিয়াছেন—দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র ঐ পুরুষই ব্যবহার করিতে পারে, আখেরাতে যাহার সুখ লাভের আদৌ কোন আশা নাই। "খলীফা ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।" (বোখারী শরীফ ৮৬৭ পৃঃ)

লাল রঙ্গের কাপড় পরিধানে নামায পড়া

২৫১। হাদীছ :—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদিন দেখিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চামড়ার তাঁবুতে উপবিষ্ট এবং বেলাল (রাঃ) তাঁহার অজুর পানি আনিয়াছেন, সকলেই তাঁহার অজুর ব্যবহৃত পানির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছে। কেহ ঐ পানির কিছু অংশ লাভ করিয়া শরীরে মলিতেছে, কেহবা উহা লাভ করিতে না পারিয়া স্বীয় সঙ্গী হইতে শুধু আর্দ্রতা গ্রহণ করিতেছে। তারপর বেলাল (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লাঠিখানা গাড়িয়া দিলেন; নবী (দঃ) তাঁবু হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি এক জোড়া লাল রং-এর বস্ত্র পরিহিত ছিলেন; তাঁহার লুঙ্গি পায়ের গিরা হইতে অনেক উপরে ছিল। নবী (দঃ) ঐ লাঠিকে সম্মুখে রাখিয়া জমাতে দুই রা'কাত নামায পড়িলেন। আমি দেখিয়াছি, নামাযের সময় মানুষ এবং জীবজন্তু ঐ লাঠির সম্মুখ দিয়া চলাচল করিতেছিল।

ছাদের উপর বা মিম্বর ও চৌকি ইত্যাদির উপর নামায পড়া

হাছান বছরী (রঃ) বলেন, পুলের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়া দোষণীয় নয়। যদিও ঐ পুলের তলদেশে বা সম্মুখভাগে নাপাক বস্তু প্রবাহিত হইতে থাকে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার জমাতে শামিল হইয়া ছাদের উপর নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বরফের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা :— এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, মাটি ভিন্ন অন্য বস্তুর উপর নামায পড়া যায়। একটু সম্মুখেই এক হাদীছে উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) চাটাই এর উপরে নামায পড়িয়াছেন।

২৫২। হাদীছ :—ছাহ্‌ল্ ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বর গাবা নামক বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা

নির্ম্মিত ছিল। ঐ মিম্বরটি যখন তৈরী হইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার সঙ্গে নামাযে শামিল হইল। হযরত (দঃ) ঐ মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ক্বেরাত পড়িলেন ও রুকু করিলেন পেছনের সকলেই রুকু করিল। তারপর তিনি রুকু হইতে উঠিয়া পশ্চাদপায়ে নামিয়া আসিলেন (কারণ মিম্বরের উপর সেজদা করা সম্ভব নয়, তাই) নীচে নামিয়া সেজদা করিলেন।

● ইমাম বোখারী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়—ইমাম মোক্তাদিদের অপেক্ষা উচু স্থানে দাঁড়াইতে পারে।

এ সম্পর্কে সাধারণ মছআলাহ এই যে, এক হাত পরিমাণ উচা বা যাহাতে ইমাম সুস্পষ্টতঃ সকল হইতে উচ্চ দেখা যায় এরূপ উচা জায়গায় একা ইমাম দাঁড়ান বিশেষ কোন কারণ ছাড়া হইলে তাহা মকরূহ। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীছ আছে (শামী, ১—৬০৪)। আলোচ্য হাদীছের ঘটনাকে বিশেষ কারণাধীন বলা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ- রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যবহারিক বস্তুকে সর্ব্বপ্রথম নামাযের দ্বারা ব্যবহার আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। মিম্বরটি তৈয়ার হইয়া আসিলে সেই উদ্দেশ্যে এবং নামাযের আদর্শ শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে তিনি উহার উপর নামায পড়িয়া ছিলেন। সামান্য উঠা-নামার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সম্ভাব্য আমল সমূহ মিম্বরের উপর আদায় করতঃ ঐ মহৎ উদ্দেশ্যদ্বয় পূর্ণ করিলেন।

২৫৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় ঘোড়া হইতে পতিত হইয়া তাঁহার ডান পার্শ আঁচড়াইয়া (এবং পা মচকাইয়া) গিয়া ছিল। ঐ সময় তিনি স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি (বিভিন্ন কারণে) রাগ হইয়া এক মাস তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন এবং একটি দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ কক্ষের সিঁড়িটি খেজুর গাছের ছিল। একদা ছাহাবীগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ কক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি সেখানেই সকলকে নিয়া জমাতে নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) বসিয়া এবং মোক্তাদিগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে ছিলেন।...... ..

রসুলুল্লাহ (দঃ) উনত্রিশ দিন ঐ কক্ষে অবস্থান করার পর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ঐ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, আপনি এক মাস পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; হযরত (দঃ) বলিলেন, এই মাস উনত্রিশ দিনে হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে প্রমাণ করা হইল যে, মাটি হইতে এত উচ্চস্থান যেখানে সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয় সেখানেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছেন ।

চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

জাবের (রাঃ) এবং আবু ছায়ীদ (রাঃ) নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন।

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, সাধ্যানুযায়ী নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। তাহা সম্ভব না হইলে বসিয়া এবং নৌকা কেবলামুখ হইতে ঘূর্ণমান হইয়া গেলে নামায অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণমান হইয়া কেবলামুখী থাকিবে।

২৫৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার দাদী একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। খাওয়া শেষে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দাঁড়াও তোমাদের (বরকতের) জন্য (তোমাদের ঘরে) নামায পড়িব। আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি একটি পুরান চাটাই আনিলাম, বহু দিন ব্যবহৃত হইয়া উহা কাল হইয়া গিয়াছিল আমি উহাকে পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর দাঁড়াইলেন, আমি ও আর একটি ছোট ছেলে তাঁহার পিছনে সারি বাঁধিলাম এবং আমার বৃদ্ধা দাদীও আমাদের পিছনে দাঁড়াইলেন—এইভাবে দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চলিয়া গেলেন।

২৫৫। হাদীছ ঃ— মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চাটাই-এর উপর নামায পড়িতেন।

(২২৬ নং হাদীছও এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।)

ফরাশ ইত্যাদি বিছানার উপর নামায পড়া

২৫৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় (রসুলুল্লাহ (দঃ) শয়নের বিছানার উপর তাহাজ্জুদ নামায আরম্ভ করিতেন।) আমি হযরতের সম্মুখভাগে শায়িত থাকিতাম। ঐ সময় ঘরে চেরাগ জ্বালাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই আমার পা তাঁহার সেজদাস্থানে চলিয়া যাইত; তিনি সেজদা করার সময় আমার পায়ের উপর হাত দ্বারা চাপ দিতেন। তখন আমি পা গুটাইয়া লইতাম। হযরত (দঃ) সেজদা হইতে উঠিলে আমার পা আবার লম্বা হইয়া যাইত।

২৫৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই বিছানায় তিনি এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শয়ন করিতেন—অনেক সময় হযরত (দঃ) সেই বিছানার উপর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন। হযরতের নামায অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) হযরতের সম্মুখে জানাযার ন্যায় আড়াআড়ি শুইয়া থাকিতেন; (হযরতের কক্ষ প্রশস্ত ছিল না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অতঃপর যখন হযরত (দঃ) বেতের নামায পড়িতেন তখন তিনি আমাকে জাগাইয়া দিতেন; আমি উঠিয়া বেতের নামায পড়িতাম।

অধিক উত্তাপে (পরিহিত) বস্ত্রাংশের উপর সেজদা করা

হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ অত্যধিক উত্তাপের সময় পাগড়ীর কাপড়ের উপর ও টুপির উপর সেজদা করিতেন* এবং আস্তিনের ভিতর হাত রাখিতেন।

২৫৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতাম; মাটি উত্তপ্ত হওয়ার দরুণ আমাদের অনেকে সেজদাস্থানে (পরিহিত) কাপড়ের অংশবিশেষ রাখিয়া উহার উপর সেজদা করিত।

চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

অপবিত্রতার সন্দেহ না হইলে এবং পায়ের অঙ্গুলী মাটিতে লাগায় বিঘ্নের সৃষ্টি না করিলে এরূপ চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয, নতুবা জায়েয নয়।

২৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়িতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ।

চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

২৬০। হাদীছ ঃ-হাম্মাম ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি প্রস্রাব করিলেন, তারপর অজু করিতে চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামাযে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী (দঃ)কে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। জরীর ইবনে আবদুল্লার এই হাদীছ সকলের নিকট পছন্দনীয় ছিল, কারণ তাঁহার ইসলাম গ্রহণ অনেক বিলম্বে ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—কোরআন শরীফে ছুরা মায়েদায় যে আয়াতে অজুর বর্ণনা হইয়াছে সেখানে পা ধৌত করার আদেশ রহিয়াছে, মছেহ করার উল্লেখ নাই। জরীর (রাঃ) চামড়ার মোজার উপর মছেহ করার উল্লেখ করিলে এরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিল যে, মছেহ করার ঘটনা হয় ত ছুরা মায়েদার আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে হইবে, তাই উহা মনছুখ ও রহিত। এরূপ সন্দেহে জরীর ইবনে আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করা হইত, আপনি যে ঘটনা বর্ণনা করেন তাহা ঐ আয়াতের পূর্ব্বে কি পরে? তিনি বলিতেন, আমি মোসলমান হইয়াছি ঐ আয়াত অবতরণের বহু পরে। ইহা দ্বারা ঐ সন্দেহ খণ্ডন হইয়া যাওয়ায় এই হাদীছখানাকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করা হইত।

---

* সাধারণতঃ পাগড়ীর বা মোটা টুপির উপর সেজদা করা নিষেধ।

কা'বা দিককে কেবলারূপে গ্রহণ করা ইসলামের জন্য অপরিহার্য্য

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, নামাযের মধ্যে সেজদার সময় এবং বসার সময় পায়ের অঙ্গুলী সমূহকে কেবলামুখী রাখিবে।

২৬১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়িবে, আমাদের কেবলাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিবে এবং আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে, তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের তরফ হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে তোমরা ভঙ্গ করিও না।

২৬২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, বিশ্ববাসীর বিরুদ্ধে জেহাদ ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাবৎ তাহারা এই স্বীকারোক্তি না করে যে, এক আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। যাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে, নামায পড়িবে, আমাদের কেবলামুখী হইবে এবং আমাদের জবেহকৃত খাইবে তাহাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন আমাদের জন্য হারাম। হাঁ—শরীয়ত অনুযায়ী যদি সে কোন শাস্তির উপযোগী হয় উহা প্রবর্ত্তন করা হইবে। আন্তরিক অবস্থার জন্য সে আল্লার নিকট দায়ী থাকিবে এবং সেই অনুসারেই তাহার হিসাব হইবে।

● আনাছ (রাঃ)কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, কিসের দ্বারা জান-মালের নিরাপত্তার অধিকার লাভ হয়? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইবে—একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমাদের কেবলামুখী হইবে, আমাদের ন্যায় নামায পড়িবে, আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে। তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। সে মোসলমানের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে, মোসলমানদের আইন-কানুনই তাহার উপর প্রবর্ত্তিত হইবে।*

যেখানেই নামায পড়া হউক কেবলামুখী হইতে হইবে

২৬৩। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় আসিয়া প্রথম অবস্থায় ষোল বা সতর মাসকাল

---

* ২২ নং হাদীছখানাও এই বিষয়েই বর্ণিত হইয়াছে, সেমতে মোসলমানদের প্রতীক ও পরিচয় হিসাবে মোট পাঁচটি বিষয় হইল। (১) তৌহিদ ও রেছালতের স্বীকারোক্তি। (২) নামায। (৩) যাকাত (৪) কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা। (৫) মোসলমানদের জবেহ করা জীব খাওয়া।

বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী নামায পড়িলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার আকাঙ্খা ছিল, কা'বা শরীফমুখী নামায পড়া। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আকাঙ্খাবস্থা ব্যক্ত করিয়া উহা পূর্ণ করতঃ আয়াত নাজেল করিলেন—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"আমি লক্ষ্য করিতেছি, আপনি (কা'বামুখী নামায পড়ায় আকাঙ্খিত হইয়া উহার জন্য অহীর প্রতীক্ষায়) পুনঃ পুনঃ আসমানের দিকে তাকাইতেছেন। আমি নিশ্চয় আপনার ভালবাসার কেবলামুখী হওয়ার আদেশ প্রবর্ত্তন করিব। (এখনই করিয়া দিলাম—) আপনি মসজিদে-হারামের (তথা কা'বার) প্রতি মুখ করুন। (হে মোসলমানগণ !) তোমরা যে স্থানেই থাক স্বীয় মুখ ঐ মসজিদে-হারাম বা কা'বার প্রতি করিয়া নামায পড়িবে।" (২ পাঃ ১ রুঃ)

এই আয়াত নাযেল হইলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা শরীফমুখী নামায পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইহুদীরা মোসলমানদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ এবং অযথা প্রশ্নাবলী নিশ্চয় করিবে, তাই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই আয়াতও নাযেল হইল—(২ পাঃ ১ রুঃ)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ـ
قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"একদল জ্ঞান বুদ্ধিশূন্য লোক এরূপ প্রশ্ন করিবে যে, মোসলমানগণ কি কারণে পূর্ব্বাবলম্বিত কেবলা (বায়তুল-মোকাদ্দাস) ছাড়িয়া দিল ? আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, (এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নাই। কারণ,) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সবদিকের মালিক ; (মুখ করার আদেশ একমাত্র তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী প্রবর্ত্তিত হইবে। আল্লার আদেশাবলীর অনুগত হওয়া, ইহাই সৎপথ ;) আল্লাহ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন।"

২৬৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় তাঁহার যানবাহন যে দিকে চলিত সে দিক হইয়াই নফল নামায পড়িতেন। (কারণ, যানবাহনের পৃষ্ঠে অন্যদিক হইয়া নামায পড়া সম্ভব নয়,) কিন্তু ফরজ নামায পড়ার সময় যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ নির্দ্দিষ্ট কেবলামুখী হইয়া নামায পড়িতেন।

কেবলা নয় এমন দিকে ভুলবশতঃ নামায শুদ্ধ হইবে*

২৬৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মদীনার নিকটবর্ত্তী) কোবা নামক স্থানের লোকগণ (অজ্ঞাত অবস্থায় পূর্ব্ব বিধান অনুযায়ী বায়তুল-মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করিয়া) ফজরের নামায পড়িতে-ছিল। কোন একজন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, গত রাত্রেই (শুনিয়াছি ও দেখিয়াছে—) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে ; যাহাতে তিনি কা'বামুখী হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা কা'বামুখী ফিরিয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ ব্যক্তিগণ ফজরের নামায যে দিকে পড়িতেছিল ঐ সময় সে দিকে কেবলা ছিল না, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে এরূপ হওয়ায় নামায পুনরারম্ভ করিতে হইল না, বরং জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী নামায কেবলার দিক হইয়া পড়িয়া নিল এবং তাঁহাদের নামায দুরস্ত হইল।

মসজিদে থুথু ইত্যাদি দেখিলে নিজেই পরিষ্কার করা

২৬৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইয়া নামায পড়া অবস্থায় মসজিদের কেবলামুখী দেওয়ালে থুথু দেখিতে পাইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মসজিদে হাজিরানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক (মিম্বরের উপর) লোকদের মুখী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ নামায অবস্থায় সম্মুখ দিকে থুথু ফেলিবে না ; নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিক আল্লার (বিশেষ রহমতের) দিক। অতঃপর হযরত (দঃ) মিম্বার হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

২৬৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে থুথু বা কফ দেখিতে পাইয়া উহাকে পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

মছআলাহ ঃ—নাকের শ্লেষ্মা ও কফ ইত্যাদি কোন ঘৃণ্য বস্তু মসজিদে দেখা গেলে উহা কোন বস্তুর সাহায্যে পরিষ্কার করিবে।

---

* ভুলবশতঃ কেবলাহীন দিকে নামায ছহীহ হয়, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, সঠিক কেবলা জানিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, এমনকি যদি কেবলা নির্দ্ধারণের কোন ব্যবস্থা না হয় তবে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেক খাটাইয়া খুব ভালভাবে চিন্তা করতঃ যে দিক কেবলা হওয়ার ধারণা প্রবল হইবে সেই দিকে নামায পড়িবে পরে ভুল প্রকাশ হইলেও নামায দোহরাইতে হইবে না, কিন্তু চেষ্টা বা চিন্তা না করিয়া যে কোন এক দিকে নামায পড়িলে নামায ছহীহ হইবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অশুষ্ক কোন ঘৃণ্য বস্তুর উপর দিয়া হাটিয়া আসিলে (মসজিদে প্রবেশ করিতে) পা অবশ্যই ধুইয়া লইবে। আর যদি উহা শুষ্ক হয় যাহা পায়ে লাগিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই, সে ক্ষেত্রে পা ধোয়া আবশ্যকীয় নহে।

নামাযে থুথু ফেলার আবশ্যক হইলে

২৬৮। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়া উহা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, (নামায অবস্থায়) থুথু কফ ফেলা হইতে গত্যন্তর না হইলে সম্মুখ দিকে বা ডান দিকে ফেলিবে না। বাম পার্শ্বে (যদি কোন লোক না থাকে) বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে।*

এই বিষয়ে আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ১৭২ নং হাদীছ বিশেষ লক্ষ্যণীয় ; নামাযে থুথু ফেলার যে নিয়ম ২৬৮ ও ২৭০ নং হাদীছে বর্ণিত আছে, উহা ছাড়া তৃতীয় আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা উক্ত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে—স্বীয় কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া উহা মর্দ্দন করিয়া দিবে।

মসজিদে থুথু মাটির নীচে পুঁতিয়া না দিলে গোনাহ মাফ হইবে না↑

২৬৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ ; ঐ গোনাহ মাফ হওয়ার শর্ত্ত উহাকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া।

২৭০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় সে যেন সম্মুখদিকে কখনও থুথু না ফেলে, কেননা নামাযরত থাকাকালীন সে আল্লাহ

---

* বামদিকে বা পায়ের নীচে থুথু ফেলিবার সুযোগ একমাত্র মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে বা ঐরূপ মসজিদে হইতে পারিবে যাহা আরব দেশের ন্যায় মরুভূমির গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে যে, উহার জমিন কেবলমাত্র মরুভূমির বালু ; উহা পাকা-পোক্তা নয়, উহার উপর বিছানাও নাই। কেবল বালুর উপর নামায পড়া হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ মসজিদ এরূপই হইত।

↑ এই মছআলার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে মসজিদের জমিন পাকা বা বিছানাযুক্ত উহাতে থুথু ইত্যাদি ফেলা কোন মতেই জায়েয নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া অসম্ভব।

তায়ালার নিকট মোনাজাত করিতেছে। ডান দিকেও ফেলিবে না, কারণ (নামাযের সময় বিশেষ সাহায্যকারী) ফেরেশতা ডান দিকে উপবিষ্ট থাকেন। (আবশ্যক হইলে) বাম দিকে বা পায়ের নীচে ফেলিবে এবং উহাকে মাটির নীচে পুতিয়া দিবে।

ত্রুটিগোচরে মোক্তাদীদেরে নামাযান্তে সতর্ক করা ইমামের কর্ত্তব্য

২৭১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। তারপর মিম্বরে যাইয়া দাড়াইলেন এবং নামায ও রুকু-সেজদা সম্পর্কে নছীহত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা রুকু-সেজদা সুন্দর ও পূর্ণরূপে করিও; নামাযের মধ্যে এবং যখন তোমরা রুকু সেজদা কর তখন আমি তোমাদিগকে পিছন দিকে ঐরূপই দেখিতে পাই যেমন সম্মুখে থাকাকালীন দেখিতে পাই।*

কোন গোত্র-বিশেষের মসজিদ বলা যায় কি?

২৭২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জেহাদের যোগ্যতা অর্জ্জনে অভ্যস্ত বা উৎসাহিত করার জন্য) ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান করিতেন। বিশেষভাবে গঠিত ঘোড়াগুলির দৌড়ের জন্য "হাফ্‌ইয়া" নামক স্থান হইতে "ছানিয়াতুল-বেদা" স্থান পর্য্যন্ত (প্রায় সাত মাইল) নির্দ্দিষ্ট করিতেন। আর সাধারণ ঘোড়ার জন্য (তদপেক্ষা কম) ছানিয়াতুল-বেদা হইতে মসজিদে বনী-জোরাইক+ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিতেন।

মসজিদে কোন বস্তু বণ্টন করা বা লোকদের জন্য খেজুর ছড়া রাখা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ ছিল, প্রত্যেক বাগান হইতে যেন গরীব দুঃখীদের জন্য কিছু ছড়া মসজিদে লটকাইয়া রাখা হয়। (ফতহুলবারী)

২৭৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বাহ্‌রাইন দেশ হইতে আগত বাইতুল-মালের ধন-দৌলত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে

---

* অনেকে ইহার রূপক অর্থ বলিয়াছেন; অর্থাৎ জ্ঞাত হওয়া। আর অনেকে বলিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবেই হযরত (দঃ) ইচ্ছা করিলে স্বীয় চোখে পেছন দিকেও দেখিতে পাইতেন, ইহা তাঁহার খোদা প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সাধারণতঃ কানের দ্বারা পেছনের শব্দও শুনা যায়।

+ এখানেই প্রমাণ হইল যে, কোন গোত্র বা ব্যক্তি অথবা কোন স্থান বিশেষের প্রতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন মসজিদের নাম করা জায়েয, যেমন—বনী-জোরাইক্‌ গোত্রের বস্তির মসজিদকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সাধারণ্যে মসজিদে বনী-জোরাইক্‌ বলা হইত।

পৌঁছিলে তিনি ঐ সব মালকে মসজিদের ভিতরে রাখিতে আদেশ করিলেন। উহা এত প্রচুর ছিল যে, এত প্রচুর মাল ইতিপূর্বে আর কখনও আসে নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন, কিন্তু ঐ ধন-দৌলতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। নামাযান্তে ঐ মালের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং যাহাকেই দেখিতে পাইলেন তাহাকেই দান করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাকে দান করুন; আমি বদরের যুদ্ধের ঘটনায় নিজের এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আকীলের মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়া একেবারে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, নিজ হস্তে ইচ্ছানুযায়ী লউন। তিনি কাপড় বিছাইয়া তন্মধ্যে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া লইলেন, তারপর উহা কাঁধে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপারগ হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, হয় কোনও ব্যক্তিকে আমার বোঝা উঠাইয়া দিতে বলুন অথবা আপনি নিজে উঠাইয়া দিন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইবে না; (স্বীয় বহন-ক্ষমতা অনুযায়ীই লইবেন।) তাই তিনি বোঝা কিছু কম করিয়া লইলেন এবং পুনরায় উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবারও উঠাইতে পারিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও ঐরূপই বলিলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় বোঝা কম করিলেন এবং অতি কষ্টে কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি দৃষ্টিগোচরে ছিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মালের প্রতি তাঁহার স্পৃহা দেখিতে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন, যাবৎ সেখানে একটি দেরহাম (এক সিকি) অবশিষ্ট ছিল রসুল (দঃ) তথা হইতে উঠেন নাই; সমস্ত ধন সাধারণ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মসজিদে দাওয়াত করা এবং উহা কবুল করা

২৭৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আমাকে আবু তালহা (রাঃ) হযরতের নিকট পাঠাইলেন; আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি অন্যান্য অনেকের সহিত মসজিদে রহিয়াছেন; আমি সেখানে দাঁড়াইলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠাইয়াছে কি? আমি বলিলাম হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার জন্য? বলিলাম হাঁ। তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন, সকলেই চল—এই বলিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। আমি (পথ প্রদর্শকরূপে) সম্মুখে চলিতে লাগিলাম।*

---

* এই হাদীছটি হযরত রসুলুল্লার (দঃ) মো'জেযা সম্পর্কীয় ঘটনায় বর্ণিত বড় একটি হাদীছের এক অংশ মাত্র। পূর্ণ হাদীছটি ৫ম খণ্ডে হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

মসজিদে বিচার বিভাগীয় কাজ করা

২৭৫। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখিতে পাইলে সে কি করিবে? তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে কি? (তারপর ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গেই এরূপ ঘটনা ঘটিল এবং সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। অন্য সাক্ষী ছিল না, তাই শরীয়ত মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়া'নের হুকুম দেওয়া হইল) তাহারা উভয়ে মসজিদের মধ্যে "লেয়া'ন"* করিল।

আবাস গৃহে নামাযের স্থান রাখা চাই

বরা-ইবনে আযেব (রাঃ) স্বীয় গৃহে নামাযের জন্য নির্দ্দিষ্টকৃত স্থানে জমাতের সহিত নামায পড়িয়াছেন।

২৭৬। হাদীছ ঃ—এত্‌বান-ইবনে-মালেক (রাঃ) যিনি বদরের জেহাদে শরীক ছিলেন একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয় আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি আমাদের মসজিদের ইমাম, কিন্তু যখন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় পানির স্রোত বহিতে থাকে তখন আমি মসজিদে উপস্থিত হইতে পারি না; (নিজ গৃহেই আমার নামায পড়িতে হয়।) আমার বাসনা, আপনি আমার গৃহে যাইয়া কোন এক স্থানে নামায পড়িয়া আসুন; আমি ঐ স্থানটিকেই সর্ব্বদার জন্য নামাযের স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। এত্‌বান (রাঃ) বলেন, পরদিন একটু বেলা হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলেন। আমি তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাইলাম; তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরের কোন্ স্থানে নামায পড়িব? আমি ঘরের এক কোণ্ দেখাইয়া দিলাম; তিনি তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার পেছনে দাঁড়াইলাম। তিনি

---

* কাহারও প্রতি যেনার তোহ্‌মত লাগাইয়া শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রমাণ পেশ করিতে না পারিলে তাহাকে ৮০ বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু যদি স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনার তোহ্‌মত লাগান হয় এবং স্বামী প্রমাণ দিতে না পারে সে স্থলে উভয়ে পাঁচবার করিয়া লা'নত তথা অভিশাপযুক্ত কসম খাইলে ঐ বেত্রাঘাত হইতে রেহাই দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদে বাধ্য করা হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাকে "লেয়া'ন" বলে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কোরআন-হাদীছে এবং ফেকার কিতাবে বিদ্যমান আছে; ষষ্ঠ খণ্ডে ইন্‌শা আল্লাহ পাইতে পারেন।

দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ নাস্তার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের খবর শুনিয়া আমার বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইল। আগন্তুকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, মালেক-ইবনে-দোখায়শেন কোথায়, সে কি এখানে উপস্থিত হয় নাই? অন্য একজন বলিয়া উঠিল, সে মোনাফেক—আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি সে অনুরাগী নয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, এরূপ বলিও না। তুমি জ্ঞাত নও যে, সে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর! আমরা তাহাকে মোনাফেকদের প্রতি হিতাকাঙ্খী দেখিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টির জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাহারও ঘরে যাইয়া বাহ্যিক পবিত্রতা দৃষ্টে বা মালিকের নির্দ্দেশিত স্থানে নামায পড়িবে; অহেতুক সন্দেহ করিবে না।

মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিবে

আবদুল্লাহ ইবনে-ওমর (রাঃ) মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিতেন এবং বাহির হইবার সময় বাম পা প্রথমে বাহির করিতেন।

এখানে ১২৯ নং হাদীছ উল্লেখ আছে।

যেস্থানে কবর আছে তথায় নামায পড়া ও কাফেরদের কবর উচ্ছেদ করতঃ সেই স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা

এখানে দুইটি মছআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

(১) কবরযুক্ত স্থানে অর্থাৎ কবরের উপর, কবরের নিকটে বা কবরমুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়া জায়েয নয়। কারণ, কবররে তাজিম ও শ্রদ্ধা বা উহার কোন বিশেষত্বের উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে নামায পড়িলে উহা কবর-পূজারূপে গণ্য হইয়া কুফরী ও শেরেকী গোনাহ হইবে। এবং যদি কবরের তাজিম ও বিশেষত্বের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি না থাকে তবুও ঐরূপ স্থানে নামায পড়া দোষণীয়। কারণ ইহাতে ইহুদী ও নাছারাদের রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তাহাদের এই রীতি ছিল যে, পীর-পয়গাম্বরদের কবরের উপর মসজিদ বানাইয়া নামাযে উহার তাজীম ও সম্মানের নিয়্যত রাখিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিয়াছেন। তদুপরি যদিও নিজ মনে কোন প্রকার কু-নিয়্যত না থাকে তবুও

ইহা দ্বারা দর্শকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। অতএব নিয়্যত ঠিক রাখিয়াও কবরের নিকটবর্ত্তী নামায পড়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ কবর যদি কেবলা দিকে দৃষ্টিগোচর অবস্থায় থাকে তবে সে ক্ষেত্রে অনেক বড় গোনাহ হইবে ; যদিও নামায শুদ্ধ হইবে পুনঃ পড়িতে হইবে না। একদা আনাছ (রাঃ) অজ্ঞাতে কবরের নিকটে নামায পড়িলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে কবর, কবর বলিয়া সতর্ক করিলেন, কিন্তু নামাযকে পুনঃ পড়িবার আদেশ করিলেন না।

(২) কবর উচ্ছেদ করিয়া সে স্থানে মসজিদ তৈরী করা জায়েয কি না? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কবর যদি কাফেরদের হয় তবে এরূপ করা জায়েয। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করিয়া ঐরূপেই স্বীয় মসজিদ তৈয়ার করিয়াছিলেন। আর ঐ কবর যদি মোসলমানের হয় তবে ঐরূপ করা জায়েয নয় ; কারণ কোন মোসলমানের কবর উচ্ছেদ করা জায়েয নয়। হাঁ—কবর যদি বহু প্রাচীন হয় যাহাতে মৃতদেহের হাড্ডি-মাংস বর্ত্তমান না থাকে, তবে সে স্থানে কবরের কোন চিহ্ন না রাখিয়া মসজিদ বানাইতে পারে এবং উহাতে নামায পড়ায় দোষ নাই। (কাওকাবুদ্ ছুরবী—মাওলানা গঙ্গুহী, ১—৫৩)

২৭৭। হাদীছ ঃ—উম্মে হাবিবা (রাঃ) এবং উম্মে ছালামাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ার "মারিয়া" নামক গির্জ্জা ঘর দেখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে বহু রকমের ছবি ছিল। তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোগ-শয্যায় তাঁহার নিকট উহার উল্লেখ করিলেন। নবী (দঃ) শোয়া অবস্থায়ই মাথা উঠাইয়া বলিলেন, ইহুদী ও নাছারাদের রীতি ছিল, তাহাদের কোন নেক্কার-পরহেজগার ব্যক্তি মারা গেলে তাহার কবরের উপর মসজিদ তৈয়ার করিয়া উহাতে ঐরূপ নেক্কার আওলিয়া-দরবেশ, পীর-পয়গাম্বগণের ছবি রাখিয়া দিত। এ সমস্ত অপকর্ম্মকারী কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট জঘন্য পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২৭৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালীন যখন মৃত্যু-যাতনায় অস্থির ছিলেন সেই মূহূর্ত্তে বলিয়াছেন, ইহুদী ও নাছারাদের উপর আল্লার লা'নত বর্ষিত হউক ; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদ (সেজদার স্থান) রূপে ব্যবহার করিয়াছে। এই বলিয়া হযরত (দঃ) স্বীয় উম্মতকে ঐরূপ অপকর্ম্ম হইতে সতর্ক করিতেছিলেন। (৬২ পৃঃ)

২৭৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অভিশাপ ও বদ-দোয়া করতঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদিগকে ধ্বংস করুন ; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। (৬২ পৃঃ)

২৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা স্বীয় আবাস গৃহে (নফল) নামায (ইত্যাদি) পড়িও ; (আল্লার জেকরের দ্বারা গৃহ আবাদ থাকিবে ;) গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত বাক্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, যে গৃহে নামায ইত্যাদি আল্লার জেকর নাই, সেই গৃহবাসী মৃত এবং সেই গৃহ কবরস্থান তুল্য। তাই তোমরা স্বীয় আবাস গৃহকে আল্লার জেকর হইতে খালি রাখিয়া কবরস্থানে পরিণত করিও না। বাহ্য দৃষ্টিতে এই বাক্যের অর্থে ইহাও অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আবাস গৃহে মৃতদেহ দাফন করিও না, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবাস গৃহে নামায পড়িও অথচ কবরযুক্ত স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ। (৬২ পৃঃ)

২৮১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় পদার্পণ করিয়া প্রথমে "বনু-আমের-ইবনে-আউফ" নামক গোত্রের বস্তিতে চৌদ্দ দিন অতিবাহিত করিলেন। তারপর তাঁহার পিতামহের মাতুল বংশ—বনী নাজ্জার বংশীয় লোকদিগকে তিনি খবর দিলে পর (তাহারা তাঁহাকে জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে অভ্যর্থনা করিয়া নেওয়ার জন্য) প্রত্যেকে নিজ নিজ স্কন্ধে তলওয়ার লটকাইয়া হাজির হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে পেছনে বসাইয়া উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক আসিতেছিলেন এবং বনী-নাজ্জার গোত্রীয় লোকগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ছিল। এইভাবে পথ চলিয়া আসিয়া (মদীনা শহরে) আবু আইউব আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে হযরতের যানবাহন উটটি বসিয়া পড়িল (অবশেষে তথায়ই হযরতের আবাস গৃহ তৈরীর ব্যবস্থা হইল।)

রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হইত সেখানেই নামায পড়িয়া লইতেন, এমনকি বকরী রাখার স্থানেও নামায পড়িতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কিন্তু মদীনায় যখন বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়া গেল তখন তিনি সেখানে মসজিদ তৈরীর আদেশ দিলেন। বনী-নাজ্জার বংশীয় একদল লোককে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমাদের এই বাগানটি আমার নিকট বিক্রয় কর, তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত আরজ করিল, আমরা ইহা বিক্রি করিব না, বরং দান করিয়া আল্লার নিকট ইহার মূল্য প্রাপ্ত হইব। (অবশেষে তিনি উহা মূল্য দিয়াই ক্রয় করিলেন।) আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ বাগানের মধ্যে ছিল—মোশরেকদের কতকগুলি (পুরানা) কবর, পুরাতন ঘর-বাড়ীর ভাঙ্গা-চুরা অবশিষ্ট এবং খেজুর গাছ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী ঐ কবরগুলি উচ্ছেদ করা হইল, ভাঙ্গা-চুরা

সমতল করা হইল এবং খেজুরের গাছগুলি কাটিয়া মসজিদের বেড়া ও বেষ্টনীরূপে কেবলার দিকে সারিবদ্ধ ভাবে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরওয়াজার চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইল। সকলেই মসজিদ তৈরীর জন্য পাথর আনিতেছিল এবং আনন্দ-মুখে এই তারানা গাহিতেছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

"হে খোদা! পরকালের জেন্দেগীই একমাত্র জেন্দেগী; ঐ জেন্দেগীর সুখ-শান্তির ব্যবস্থা স্বরূপ সমস্ত আনছার ও মোহাজেরদের গোনাহ্-খাতা মাফ করিয়া দাও।"

বকরী, উট (ইত্যাদি) জন্তুর নিকটবর্ত্তী নামায পড়া

২৮২। হাদীছ ঃ—নাফে' নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে-ওমর (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি স্বীয় উষ্ট্রকে (ছোতরা স্বরূপ) সম্মুখে বসাইয়া নামায পড়িলেন এবং বলিলেন—আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(২৮১নং হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (দঃ) বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িতেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—নামাযে "খুশু-খুজু" অর্থাৎ নিবেদিত আত্মার সহিত আল্লার প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা আবশ্যক, তাই এমন পরিবেশে নামায আরম্ভ করা কর্ত্তব্য যে স্থানে পূর্ণ একাগ্রতা হাসিলে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। সে অনুযায়ী কোন কোন হাদীছে আছে, "বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িতে পার, কিন্তু উষ্ট্র রাখার স্থানে নামায পড়িও না"। অর্থাৎ বকরী ছোট জন্তু; উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির কারণ নাই, উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ দিকে ধাবিত হইবে না। কিন্তু উষ্ট্র অতি বিরাট জন্তু, অনেক সময় কামড় দেয়, অনেক সময় লাথি মারে; তাই উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হইবে এবং তাহার একাগ্রতা নষ্ট হইবে—সে জন্য এই পার্থক্য করা হইয়াছে এবং অনাবশ্যকে বড় জন্তুর নিকটবর্ত্তী নামায আরম্ভ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইতে চাহেন যে, উষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী নামায নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, আসল কারণ হইল একাগ্রতা হাসিল করিতে বাধার সৃষ্টি হওয়া। অতএব যদি কোন স্থানবিশেষে সেই ভয় না হয় তবে উষ্ট্রের নিকটবর্ত্তীও নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন—কাহারও পালা-পোষা স্বীয় ব্যবহারের উষ্ট্র, উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির আশঙ্কা নাই, তাই উহার নিকটবর্ত্তী নামায পড়া জায়েয।

আল্লার গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান এড়াইয়া নামায পড়িবে

আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বাবেল এলাকার বস্তীতে নামায পড়া মকরূহ বলিতেন ; ঐ এলাকার অধিবাসীকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বসাইয়া দিয়াছিলেন।

২৮৩। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (তবুকের জেহাদে যাইবার পথে "হেজর" নামক বস্তী—যেখানে ছামুদ বংশীয় কাফেরদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়াছিলেন, উহার নিকটবর্ত্তী হইলে পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিলেন—ধ্বংস প্রাপ্ত স্বৈরাচারী লোকদের বস্তীর ভিতর (আল্লার আজাবকে স্মরণ করতঃ ও) ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করিবে। (এমন স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াও) যদি ক্রন্দনের সৃষ্টি না হয় তবে (এরূপ কঠিন হৃদয় লইয়া) ঐ স্থানে প্রবেশ করিবে না। নচেৎ আশঙ্কা আছে—তোমাদের উপরও সেইরূপ আজাব আসিয়া পড়িতে পারে যাহা ঐ বস্তীবাসীদের উপর আসিয়াছিল।

আশ্রয়হীন নারীকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া যায়

২৮৪। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আরব দেশেরই কোন গোত্রে জনৈকা হাবসী ক্রীতদাসী ছিল। তাহারা উহাকে আজাদ করিয়া দিলেও সে তাহাদের সঙ্গেই থাকিত। একদা তাহাদের একটি অলঙ্কার পরিহিতা মেয়ে বাহিরে চলাফেরা কালে তাহার অলঙ্কারটি খসিয়া পড়িয়া গেল বা সে নিজেই কোথাও খুলিয়া রাখিল। এদিকে হঠাৎ একটি চিল আসিয়া ঐ অলঙ্কারটিকে মাংস-খণ্ড ভাবিয়া ছো মারিয়া লইয়া গেল। ঐ ক্রীতদাসীর বর্ণনা যে—তারপর উহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ না পাইয়া তাহারা আমাকেই দোষী মনে করিয়া তল্লাশী লইল, এমনকি আমার লজ্জাস্থানে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চালাইল। আমি তাহাদের সঙ্গেই ছিলাম, হঠাৎ ঐ চিল অলঙ্কারটিকে আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তখন আমি বলিলাম, তোমরা আমাকে যে বস্তুর জন্য সন্দেহ করিতেছিলে এই দেখ সেই বস্তু। এই ঘটনায় ঐ ক্রীতদাসী তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে চলিয়া আসিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর একটি তাঁবুর ন্যায় করিয়া উহাতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইল। সে যখনই আমার নিকট আসিত কথাবার্ত্তার মধ্যে এই ছন্দটি বলিত—

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا - ولكنها من دارة الكفر نجت .

"অলঙ্কার হারাইবার ঘটনা আল্লার কুদরতের একটি আশ্চর্য্যজনক লীলা ; উহার অছিলায়ই আমি কুফরস্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি।" সর্ব্বদা তাহার

মুখে এই বাক্য শুনিয়া আমি একদিন এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ণ ঘটনাটি আমার নিকট ব্যক্ত করিল।

প্রয়োজনে পুরুষ মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারে

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীদের মধ্যে একদল নিরুপায় নিরাশ্রয় সর্ব্বহারা লোক ছিলেন। নিজস্ব বলিতে তাঁহাদের কিছুই ছিল না; তাঁহাদিগকে আছহাবে-ছোফ্‌ফা বলা হইত। ছোফ্‌ফা অর্থ চবুতরা (বারান্দা)। তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের চবুতরায় দিবারাত্র কাটাইতেন এবং এলেম শিক্ষায় রত থাকিতেন।

২৮৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সত্তরজন আছহাবে-ছোফ্‌ফাকে এরূপ দরিদ্রাবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পরিধানে ছুইটি কাপড় ছিল না। প্রত্যেকেই শুধু একটি লুঙ্গি পরিহিত বা একটি কম্বল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃতাবস্থায় থাকিতেন। ঐ কম্বল কাহারও শুধু হাঁটুর নীচে, কাহারও পায়ের গিরার নিকটবর্ত্তী হইত এবং কম্বল ছোট হওয়ায় উহার উভয় কিনারা হাতে ধরিয়া রাখিতে হইত যেন ছতর খুলিয়া না যায়।

২৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যৌবন বয়সেও যখন তাঁহার নিজস্ব ঘর-বাড়ী ছিল না, বিবাহও করেন নাই—তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে ঘুমাইতেন।

২৮৭। হাদীছ ঃ—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কন্যা ফাতেমার গৃহে আসিলেন; জামাতা আলী (রাঃ)কে না পাইয়া কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ফাতেমা উত্তর করিলেন, আমার সঙ্গে তাঁহার কথা কাটাকাটি হওয়ায় রাগান্বিত হইয়া আমার নিকট কিছু না বলিয়াই তিনি কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, আলী কোথায় গিয়াছে তালাশ কর। সে খোঁজ করিয়া আসিয়া আরজ করিল, তিনি মসজিদে শুইয়া আছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীরের এক অংশ খালি মাটির উপর রহিয়াছে। মাটি মাখা অবস্থায় তিনি নিদ্রামগ্ন আছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় হস্তে তাঁহার শরীর ঝাড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, উঠ হে—আবু তোরাব! ("আবু তোরাব" অর্থ মাটি-মাখা। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্নেহভরে এরূপ সম্বোধন করিলেন।)

বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথম নামায পড়া

কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই কোন সফর হইতে বাড়ী আসিতেন সর্ব্বপ্রথম মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামায পড়িতেন।

২৮৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম; তিনি আমার এক দিন পরে বাড়ী পৌঁছিলেন; এবং প্রথমে মসজিদে আসিলেন।) আমি বেলা পূর্ব্বাহ্নে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি মসজিদেই ছিলেন। তিনি আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করিলেন। তাঁহার নিকট আমার একটি উটের মূল্য পাওনা ছিল, তিনি সেই আসল পাওনা প্রদান করিয়া আরও বেশী দিলেন।

মসজিদে বসিবার পূর্ব্বে দুই রাকাত নামাম পড়িবে*

২৮৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ মসজিদে প্রবেশ করিবে; বসিবার পূর্ব্বে সর্বপ্রথম দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইবে।

মসজিদের ভিতর অজু ভঙ্গ করা দোষণীয়

২৯০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- নামাযী ব্যক্তি তাহার নামাযস্থানে বসিয়া থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকেন— হে আল্লাহ। তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর রহমত নাযেল কর—যাবৎ না সে মসজিদে অজু ভঙ্গ করে।

মসজিদ তৈরী কিরূপ হওয়া ভাল

আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ছাদ খেজুর গাছের পাতায় তৈরী ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীকে প্রশস্ত করার আদেশ দিলেন। (মসজিদে সঙ্কুলান হয় না, লোকেরা বাহিরে দাড়াইয়া রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, তাই) তিনি বলিলেন, লোকদিগকে বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়া দাও। খবরদার। লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙ্গীন নক্সা করিও না; উহাতে নামাযীদের মন আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মগ্নতা ও একাগ্রতা নষ্ট হইবে।

---

* এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলে। এই নামায মসজিদে যাইয়া বসিবার পূর্ব্বে পড়িতে হয়, নতুবা ছওয়াব কম হইবে। অনেকে মসজিদে যাইয়া প্রথমে বসিয়া নেয়--ইহা ভুল।

আনাছ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—আমার উম্মতের উপর এমন এক যমানা আসিবে যে, তাহারা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক ভাবে (বড় বড় সুন্দর সুন্দর) মসজিদ তৈরী করিবে, কিন্তু ঐ মসজিদসমূহ অতি সামান্যই আবাদ হইবে।

অর্থাৎ—মসজিদ আবাদ হয় নামায ও আল্লার জেক্‌রের দ্বারা। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী মোসলমান সম্প্রদায় শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হইবে—তাহাদের মসজিদ সমূহ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু নামাযীর সংখ্যা অতি নগণ্য হইতে থাকিবে। মোসলমানদের এই দুর্ব্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "হে মোসলমানগণ! তোমরাও মসজিদ সমূহের শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হইবে যেমন ইহুদী-নাছারাগণ করিত।"

২৯১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদ পাথর দ্বারা দেওয়াল ও খেজুরের ডালা দ্বারা ছাদ তৈরী ছিল এবং খেজুর গাছ দ্বারা উহার খুঁটি দেওয়া হইয়াছিল। (প্রথমে খলীফা) ওমর (রাঃ) উহাকে সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের ন্যায় পাথর, খেজুর পাতা ও খেজুরের গাছ দ্বারাই তৈরী করিয়াছিলেন। (তৃতীয় খলীফা) ওসমান (রাঃ) উহাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন এবং উহার দেওয়াল নক্সা করা পাথর দ্বারা চুণা ও শুরকির গাঁথনীর সাহায্যে তৈয়ার করেন এবং থামগুলিও নক্সী পাথর দ্বারা করেন এবং ছাদের মধ্যে শাল কাঠ লাগাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—মসজিদকে চিত্রাঙ্কিত নক্সী ও রঙ্গিন না করিয়া সাদাসিদাভাবে তৈরী করা আবশ্যক। বিশেষতঃ সম্মুখ দেওয়ালে চিত্তাকর্ষক নক্সা নমুনা করা চাই না; ইহাতে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ সবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হাঁ, আড়ম্বরহীন সাদাসিদাভাবে পাকা-পোক্তা ও মজবুত করা বিশেষতঃ বর্ত্তমান যমানায় দোষণীয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় মসজিদ খেজুর গাছের ও উহার পাতায় তৈরী ছিল বটে, কিন্তু সে যমানায় মানুষের আবাস গৃহ সাধারণতঃ এর চেয়েও নিম্নস্তরের হইত। বর্ত্তমান যমানায় যখন সাধারণ মানুষের আবাস-গৃহও খেজুর গাছের নয়, অগণিত আলীশান ইমারতে পরিপূর্ণ; এই অবস্থায় মসজিদকে নিম্নস্তরের বানাইলে উহার মর্য্যাদাহানি হইবে। বোখারী শরীফের শরাহ ফতহুলবারী নামক কিতাবে একজন প্রসিদ্ধ আলেমের ফৎওয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب ان يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة -

"যেহেতু মানুষের আবাস-গৃহ জাকজমকপূর্ণ আলীশান হইয়াছে, তাই মসজিদসমূহ সেই তুলনায় তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যেন মসজিদের মর্য্যাদাহানি না হয়।"

তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের রূপকে পরিবর্ত্তনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মসজিদ তৈরী করিতে সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—(১০ পারা ৯ রুকু)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ--"মোশরেকরা আল্লার ঘরসমূহকে আবাদ করার সুযোগ পাইতে পারে না।" এই আয়াত উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য, মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ করিবে না। মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ জায়েয নহে। (ফয়জুলবারী ২—৫২)

২৯২। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদ তৈরীর সময়) আমরা এক একটি ইট আনিতে ছিলাম, আম্মার (রাঃ) দুই দুইটি ইট আনিতে ছিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহার মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিলেন, পরিতাপের বিষয়—বিদ্রোহী দলের লোক আম্মারকে হত্যা করিবে; সে তাহাদেরে আহ্বান করিবে বেহেশতের দিকে; আর তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিবে দোযখের দিকে। আম্মার (রাঃ) ইহা শুনিয়া এই দোয়া করিতে লাগিলেন, "আমি পথভ্রষ্টতা হইতে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করি।"

ব্যাখ্যা ঃ—আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে একটি সুসঙ্গবদ্ধ দল রাফেজী ফের্কা নামের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গা-ঢাকা দিয়া মোসলমানদের মধ্যে শামিল ছিল। অতঃপর ষড়যন্ত্র মূলকভাবে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মোসলেম জাতির সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনকর্ত্তা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই বিদ্রোহী দলের সক্রিয় ষড়যন্ত্রেই তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হন। এই বিদ্রোহী দলের মূল মোনাফেকদের সুপরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রে

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থক এবং আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী "জামালের যুদ্ধ" অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে উভয় পক্ষে দশ হাজার লোক শহীদ হয়। অতঃপর এই বিদ্রোহী দলটাই আলী (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে "সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ" সংঘটিত হয়। আলোচ্য আম্মার (রাঃ) সব সময়ই আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ছিলেন; তিনি সেই সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। আম্মার (রাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন—

يَا عَمَّارُ لَا يَقْتُلُكَ أَصْحَابِىْ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

"হে আম্মার! আমার ছাহাবী দল তোমাকে হত্যা করিবে না; তোমাকে হত্যা করিবে বিদ্রোহী দলের লোক" (মোস্‌নাদে-বজ্জার হইতে "ওফাউল-উফা")। এই তথ্য দৃষ্টে মনে হয়, ঐ মোনাফেকদের সৃষ্ট বিদ্রোহী দলের লোক পরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহাদের উভয়ের দলেই গা-ঢাকা দিয়া পঞ্চম বাহিনীরূপে শামিল থাকে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষকে লোক-চোখে দোষী করার উদ্দেশ্যে আম্মার (রাঃ)কে শহীদ করে। কিম্বা তাহারা বাহ্যতঃ ছিল আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষেই যে পক্ষে আম্মার (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আলী ও মোয়াবিয়া উভয়ের কাহারও পক্ষে ছিল না; তাহারা ছিল পঞ্চম বাহিনী দল। তাহারা সুযোগ প্রাপ্তে আলী ও মোয়াবিয়া উভয় পক্ষের মোসলমানকেই হত্যা করিতে ছিল—যেরূপ তাহারা জামাল যুদ্ধে করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাদেরই কোন লোকের হাতে আম্মার (রাঃ) শহীদ হন। এই ভাবে আম্মার (রাঃ) সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে বিদ্রোহী দল তথা মোনাফেকদের সৃষ্ট গোপন ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী দলের কোন সদস্যের হাতে নিহত হন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।

মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহার প্রকৃত সমর্থক পক্ষ যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত "বিদ্রোহী দল"-এর উদ্দেশ্য নহে, তাহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লেখিত উক্তিতেই প্রকাশিত হয়। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) নিশ্চয় ছাহাবী—অহী লিখক বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন; ইহা অকাট্য।

আম্মার (রাঃ) শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটিলে স্বয়ং মোয়াবিয়া (রাঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়া ছিলেন যে, আমি বা আমার কোন লোক আম্মার (রাঃ)কে হত্যা করে নাই। (মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর পুস্তিকা হইতে গৃহিত।)

সার কথা—আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত বিদ্রোহী দল বলিতে ঐ দল উদ্দেশ্য যাহারা মোসলমানদের শান্তি ও শক্তি খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারীরূপে সৃষ্টি হইয়া খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতঃ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া শহীদ করিয়াছিল। তারপরেও তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতে থাকে এবং মোসলমানদের মধ্যে লড়াই-যুদ্ধ সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং তাহাদের লোকের হাতেই আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। তাহাদের দলের এবং তাহাদের বিদ্রোহের ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই দলের যে প্রচেষ্টা ছিল তাহা যে দোযখের পথ এবং আম্মার (রাঃ)-এর প্রচেষ্টা যে বেহেশতের পথ তাহা সুস্পষ্ট।

মসজিদ বা উহার জিনিষ তৈরী করিতে কারিগরের সাহায্য

২৯৩। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি স্ত্রীলোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, (মসজিদে খোৎবা ইত্যাদির সময়) বসিবার উদ্দেশ্যে আপনার জন্য কাঠের দ্বারা একটি আসন তৈরী করিতে ইচ্ছা করি; আমার একটি ক্রীতদাস আছে, সে মিস্ত্রী-কাজ জানে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা হইলে তাহা করিতে পার। তারপর যথাসত্বর উহার কাজ সম্পন্ন করার জন্য হযরত (দঃ) নিজেও খবর পাঠাইলেন। সে একটি মিম্বর তৈরী করিয়া দিল। (এখানে ২৫২নং হাদীছও উল্লেখ আছে।)

মসজিদ তৈরী করার ফজিলত

২৯৪। হাদীছ :— ওসমান (রাঃ) যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের পরিবর্ত্তন সাধিত করিলেন, তখন সাধারণ্যে উহার সমালোচনা হইতে লাগিল। এই সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ—তৈরী কাজে শরীক হইবে আল্লাহ তায়ালা সে অনুপাতে বেহেশতের মধ্যে তাহার জন্য ইমারত তৈরী করিবেন।

মসজিদের মধ্যে সতর্কতার সহিত চলিবে

২৯৫। হাদীছ :—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মসজিদে বা বাজারে চলাফেরার সময় হাতে তীর ইত্যাদি থাকিলে উহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখিবে, যেন কোন মোসলমান ব্যক্তি উহার দ্বারা আঘাত না পায়।

২৯৬। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে তীর হাতে লইয়া যাইতেছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন, ইহার ফলক মুষ্ঠির ভিতরে রাখ।

মসজিদের ভিতর ভাল কবিতা পাঠ করা

২৯৭। **হাদীছ ঃ**—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাছ্ছান (রাঃ)কে বলিতেন, হে হাছ্ছান! তুমি আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে (কাফেরদের উক্তির) উত্তর দান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন—হে খোদা! জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্ছানকে সাহায্য কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আরব দেশে কবিতার খুবই প্রচলন এবং জনসমাজে উহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। কাফের কবিরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুখ্যাতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কুউক্তি করিয়া মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া কবিতা প্রকাশ করিত। মোসলমানদের মধ্যে ছাহাবী হাছ্ছান (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কাফেরদের উত্তরে কবিতা রচনা করিতে বলিতেন, এমনকি অনেক সময় মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঐ কবিতা পাঠের আদেশ করিতেন এবং তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন, হে খোদা! তুমি জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্ছানকে (এই কবিতা রচনায়) সাহায্য কর।

মসজিদে (জেহাদ শিক্ষায়) অস্ত্র চালনা

২৯৮। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমার ঘরের দরওয়াজায় দণ্ডায়মান দেখিলাম। কয়েকজন হাবসী লোক মসজিদের মধ্যে অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দ্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাদের ঐ খেলা দেখিতে ছিলাম।

মসজিদে ঋণ আদায়ের তাকিদ করা

২৯৯। **হাদীছ ঃ**—কায়া'ব (রাঃ) নামক ছাহাবী ইবনে হাদরাদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর নিকট পাওনাদার ছিলেন। একদিন মসজিদের মধ্যে উহা আদায়ের তাকিদ দিলে পর উভয়ের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কথা কাটাকাটি হইল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ঘরের ভিতর হইতে উহা শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং দরওয়াজার পর্দ্দা উঠাইয়া কায়া'বকে ডাকিলেন। কায়া'ব হাজির হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দাও। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) ইবনে হাদরাদ (রাঃ)কে আদেশ করিলেন—যাও এখনই ইহা আদায় করিয়া দাও।

মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করার ফজিলত

৩০০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি কৃষ্ণ বর্ণের পুরুষ বা স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়ু দিয়া থাকিত। তাহার মৃত্যু হইলে পর একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; সকলেই বলিল, সে মারা গিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমাকে খবর দেওয়া হয় নাই কেন ? উত্তরে সকলেই ঐ লোকটির প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিল ; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমাকে তাহার কবর দেখাইয়া দাও। হযরত (দঃ) তাহার কবরের নিকট আসিয়া জানাযার নামায পড়িলেন বা বিশেষভাবে দোয়া করিলেন।

মসজিদের জন্য খাদেম রাখা

পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মাতা বিবি মরয়্যামের জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন—

رَبِّ إِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ

"হে পরওয়ারদেগার। তোমার জন্য মান্নত মানিলাম, আমার গর্ভস্থ সন্তান মুক্ত হইবে।" অর্থাৎ তোমার সন্তুষ্টির কাজে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য দুনিয়ার কাজ-কাম হইতে সে মুক্ত হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফছীরে বলিয়াছেন, ঐ মান্নতের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বায়তুল-মোকাদ্দাস মসজিদের খেদমতের জন্য মুক্ত হইবে।

সে কালে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এই মান্নতের রীতি শরীয়ত সম্মত ছিল। আমাদের শরীয়তে এইরূপ মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য মসজিদের খেদমত করা বড় ছওয়াবের কাজ।

কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধা

ইসলামের সোনালী যুগে বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ইত্যাদি অনেক কার্য্য-বিধির কেন্দ্র ছিল মসজিদ। কারণ, তখন মোসলেম সমাজের কোন ক্ষেত্রেই দ্বীন ও দুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইত না, উভয়ই এক সঙ্গে চলিত এবং ইহাই ছিল মোসলমানদের উন্নতির উৎস। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। যেমন, পূর্ব্বের একটি পরিচ্ছেদে আছে "মসজিদে বিচার বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করা।" রসুলুল্লার (দঃ) সময় খানকাহ, মাদ্রাসা, বিচারালয় এমনকি হাজত-কেন্দ্রও মসজিদই ছিল। কারণ,

আসামী ও কয়েদীদিগকে শুধু শাস্তি দান করিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় না, যাবৎ তাহাদের জন্য সৎ পরিবেশের ব্যবস্থা করা না হইবে। এখানে মসজিদকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল—সৎ পরিবেশের ব্যবস্থা করা; যার দ্বারা কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধন হইয়া তাহারা দোষমুক্ত হইতে পারিবে। যেমন—নিম্নের হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজতখানা আসামীকে কত উর্দ্ধে উন্নীত করিত এবং তাহার ভাব-ধারায় পরিবর্ত্তন আনিয়া তাহার চরিত্রের কত সংশোধন করিত।

খলীফা ওমরের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক কাজি শোরায়হ্ (রঃ) অভিযুক্তকে মসজিদের খুঁটির সহিত আবদ্ধ রাখার নির্দ্দেশ দিতেন।

৩০১। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজ্‌দ দেশের প্রতি একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা ছুমামা-ইবনে উছাল নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া আসিল এবং তাহাকে মসজিদে-নববীর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমামা! তোমার ধারণা কি? সে উত্তর করিল আমার ধারণা ভালই (যে, আপনি কোন প্রকার জুলুম-অত্যাচার করিবেন না)। যদি আপনি আমাকে মারিয়া ফেলেন তবে স্মরণ রাখিবেন, ইহার প্রতিশোধের চেষ্টা করা হইবে, আর যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। আর যদি আমার নিকট হইতে ধন আদায়ের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে যত ইচ্ছা আপনি বলুন; আমি উহা দিয়া দিব। ঐ দিন তাহাকে বাঁধা অবস্থায়ই রাখিয়া দেওয়া হইল। পরদিন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিলেন। সে উত্তর করিল, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি আজও তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। এই দিনও তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায়ই রাখা হইল। তৃতীয় দিনও রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঐ প্রশ্নই করিলেন। এবারও সে পূর্ব্বের ন্যায়ই উত্তর দিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর সে মসজিদের নিকটবর্ত্তী একটি খেজুর বাগানে চলিয়া গেল এবং সেখানে গোসল করিয়া মসজিদে ফিরিয়া আসিল ও ইসলামের কলেমা পড়িল—

"اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله"

এবং বলিল, হে মোহাম্মদ (দঃ)। আমার নিকট দুনিয়াতে কোন বস্তু আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন একমাত্র আপনিই সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র। কোন ধর্ম্ম আপনার ধর্ম্ম হইতে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন আপনার ধর্ম্মের তুল্য প্রিয় ধর্ম্ম আর নাই। আপনার দেশের চেয়ে অধিক ঘৃণিত দেশ আর ছিল না, কিন্তু এখন আপনার দেশের চেয়ে প্রিয় দেশ আর নাই।

আমি ওমরা করায় মক্কা যাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আপনার সৈন্যদল আমাকে লইয়া আসিয়াছিল। সেই ওমরার বিষয় আপনার আদেশ কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ ঘোষণা পূর্ব্বক তাহাকে ওমরা করার পরামর্শ দিলেন। সে মক্কা আসিলে পর কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিল—তুমি ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছ? সে উত্তর করিল, না না—আমি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের হাতে মোসলমান হইয়াছি। আমি শপথ করিয়া ঘোষণা দিতেছি, মক্কাবাসীগণ (আমার দেশ) "ইয়ামামা" হইতে একটি দানাও আর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে পাইবে না।

(নিরাশ্রয়) রুগ্নকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া

৩০২। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) শিরা রগে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে তাঁহার জন্য তাঁবুর ন্যায় তৈরী করিয়া দিলেন; যেন তিনি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখা-শুনা করিতে পারেন।

মসজিদে বাড়ীর দরওয়াজা কাটা বা যাতায়াতের রাস্তা করা

অর্থাৎ কাহারও আবাস-গৃহ মসজিদ সংলগ্ন, তাই সে ইচ্ছা করে যে, তাহার বাড়ী বরাবর মসজিদের দেওয়ালে ছোট খাট দরওয়জা করিয়া নেয়, যেন সোজাসুজি উহা দ্বারা মসজিদে প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ করা জায়েয নয়। তাছাড়া স্বীয় গৃহে যাতায়াতের জন্য মসজিদের ভিতর দিয়া কোন প্রকার রাস্তা করিয়া লওয়াও জায়েয নহে।

৩০৩। হাদীছ :— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম রোগ অবস্থায় একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদের মিম্বরের উপর আসিয়া বসিলেন এবং আল্লার ছানা-ছিফত দ্বারা বক্তব্য আরম্ভ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ ছোবহানাহু তায়ালা এক বন্দাকে তাহার নিজ ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, সে দুনিয়াতে থাকিয়া দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে পারে বা

আল্লার নিকটও চলিয়া যাইতে পারে। সেই বন্দা আল্লার নিকট চলিয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিয়াছে। (আবু সায়ীদ (রাঃ) বলেন,) ইহা শুনিয়া আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই বুড়া কাঁদে কেন? আল্লাহ তায়ালা এক বন্দাকে ছুনিয়া ও আখেরাত তাহার নিজ ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ঐ বন্দা আখেরাতকে পছন্দ করিয়াছেন তাহাতে এই বুড়ার কি হইল? পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, ঐ "বন্দা" স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)ই এবং (ঐ কথা তাঁহার ছুনিয়া ত্যাগের ইঙ্গিত।) সত্যই আমাদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ)কে কাঁদিতে দেখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, হে আবু বকর! তুমি কাঁদিও না এবং উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহার সঙ্গ ও জান-মাল আমাকে সর্ব্বাধিক সাহায্য করিয়াছে সে হইল একমাত্র আবু বকর! আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার ভিন্ন মানুষের মধ্য হইতে কাহাকেও আন্তরিক ভালবাসার পাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে নিশ্চয় আবু বকরকে গ্রহণ করিতাম। (কিন্তু তোমাদের এই রসুলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয়পাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন* তাই সেও অন্য কাহাকে বন্ধু বানাইতে পারে না।) তবে আবু বকর আমার সঙ্গী ও ইসলামী ভাই, সেই মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব তাহার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম। (আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তখন) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—মসজিদের মধ্যে যত লোকই গৃহ-দরওয়াজা বাহির করিয়াছে প্রত্যেকের দরজাই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, একমাত্র আবু বকরের দরওয়াজা খোলা থাকিতে পারিবে।

মসজিদসমূহে কপাট ও তালা-চাবির ব্যবস্থা রাখা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফ নগরীতে বসবাস অবলম্বন করিয়া তথায় মসজিদ তৈরী করিয়াছিলেন; উহাতে মজবুত দরওয়াজা লাগাইয়া ছিলেন।

মসজিদে সকলের সমান অধিকার থাকিলেও মসজিদের আসবাবপত্র রক্ষার জন্য এবং ব্যভিচার হইতে মসজিদের হেফাজতের জন্য মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ উহাতে কপাট লাগাইতে এবং উহা বন্ধের ব্যবস্থা করিতে পারে।

৩০৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পবিত্র মক্কা জয় করার পর কা'বা ঘরের কুঞ্জি-বরদার ওসমান ইবনে-তাল্‌হাকে ডাকিয়া আনিলেন। সে আসিয়া কা'বার দরওয়াজা

---

* হাদীছের এই অংশটুকু মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।

খুলিয়া দিলে নবী (দঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে বেলাল, উছামাহ এবং ওসমান ইবনে তাল্‌হাও ছিলেন।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কিছু সময় ভিতরে রহিলেন, তারপর সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরতের প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম নবী (দঃ) ভিতরে নামায পড়িয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন স্থানে নামায পড়িয়াছেন? বেলাল বলিলেন, পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ঐ দিকের দেওয়াল হইতে প্রায় তিন হাত ব্যবধানে, ডান দিকে ছুইটি খুঁটি ও বাম দিকে একটি খুঁটি এবং পিছনে তিনটি খুঁটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। ঐ সময় কা'বা ঘরের ছাদ মোট ছয়টি খুঁটির উপরই স্থাপিত ছিল; (তিন তিনটি খুঁটি ছুই সারিতে ছিল, প্রথম সারিতে দক্ষিণ দিকের খুঁটিদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া হযরত (দঃ) নামায পড়িয়াছিলেন। আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,) হযরত (দঃ) কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার স্মরণ ছিল না।

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা

৩০৫। **হাদীছ ঃ**—ছায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি মসজিদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম, এক ব্যক্তি আমার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিল, আমি তাকাইয়া দেখিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ)। তিনি আমাকে আদেশ করিলেন, ঐ ছুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ দেশবাসী লোক? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফবাসী। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা মদীনাবাসী হইলে আমি তোমাদিগকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতাম; তোমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বল!

মসজিদে উর্দ্ধমুখী হইয়া শোয়া

৩০৬। **হাদীছ ঃ**—আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচা (আবছুল্লাহ (রাঃ)) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মসজিদে উর্দ্ধমুখী শায়িত অবস্থায় দেখিয়াছেন। হযরতের এক পা অপর পায়ের উপর রাখা ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—এই শয়ন নিদ্রার শয়ন নয়, বরং হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহের শ্রান্তি ও অবসাদ দুর করণার্থে আরাম লাভের উদ্দেশ্যে শরীর লম্বা করা। যেমন— কেহ দীর্ঘ সময় মসজিদে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া এবাদত-বন্দেগী করিয়া দেহে অবসাদ ও শ্রান্তি অনুভব করিয়াছে, আরও অধিক সময় মসজিদে অবস্থান করা তাহার

ইচ্ছা। এমতাবস্থায় মধ্যভাগে অবসাদ দুর করণার্থে ঐরূপ শয়ন করিতে পারে এবং সেই শয়ন অবস্থায়ও মসজিদে অবস্থানের ছওয়াব তাহার লাভ হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৬)। এইরূপ শয়নে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—লোকদের সমাবেশে না হয় এবং পূর্ণরূপে ছতর আবৃত রাখায় যত্নবান হয়। ছতর আবৃত রাখায় শালীনতাময় সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপই হযরত (দঃ) ঐ অবস্থায় পাদ্বয় লম্বা করিয়া এক পা অপর পায়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ)ও ঐরূপ করিতেন বলিয়া বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ঊর্দ্ধমুখী শয়নে উক্তরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু মসজিদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট নহে। সাধারণভাবেও ঊর্দ্ধমুখী শয়নে উহা আবশ্যক; বোখারী (রঃ) ৯৩০ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর এক হাদীছে ঊর্দ্ধমুখী শায়িত হইয়া এক পা অপর পায়ের উপর রাখা নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য ঊর্দ্ধমুখী শয়নে এক পা খাড়া করিয়া উহার উপর অপর পা স্থাপন করা। লুঙ্গি পরিধান অবস্থায় এইরূপ করিলে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; পায়জামা পরিধান অবস্থায়ও ইহা খুবই অসুন্দর দেখায়।

মসজিদে বা অন্যত্র তশ্‌বীক করা

"তশ্‌বীক" অর্থ পরস্পর এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করান। হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—নামাযের জন্য অজু করিয়া মসজিদে আসিতে হস্তদ্বয়ে তশ্‌বীক করিবে না। কারণ, ঐ সময়টি নামাযের মধ্যেই শামিল।

আর এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"নামায পড়াকালে কেহ তশবীক করিবে না; উহা শয়তানী কাজ। আরও স্মরণ রাখিবে, কোন মানুষ (নামাযের অপেক্ষায় বা নামাযান্তে আল্লার জেক্‌র ও তছবীহ ইত্যাদির জন্য) যাবৎ মসজিদে থাকে; মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পুর্ব্ব পর্য্যন্ত সে নামাযে গণ্য হয়।" (ফতহুলবারী ১—৩৪৯)

নামায পড়াকালে তশবীক করা বস্তুতঃই শয়তানী কাজ তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজ। নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত আদায় করা শরীয়তের বিশেষ কাম্য। উহাতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় নামাযের প্রস্তুতির আরম্ভ হইতেই নিজকে নামাযীরূপে রূপান্তরিত করা এবং নামাযে শোভণীয় নয় এইরূপ অনাবশ্যক কার্য্যাবলী হইতে সংযত থাকা। তদ্রূপ নামাযান্তে নামাযে লব্ধ একাগ্রতা ও ধ্যান ধারণার সহিত কিছু সময় জিক্‌র ও তছবীহ পাঠ করা উত্তম এবং উহা নামাযের

মধ্যে শামিল। এতদ্ভিন্ন এক নামায পড়িয়া অপর নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করিলে মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যেই গণ্য বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সেমতে ঐ সময়ও নামাযে শোভণীয় নয় এই শ্রেণীর অনাবশ্যক কার্য্য হইতে বিরত থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে নামাযের পূর্ব্বে ও পরে উক্ত সময়দ্বয়েও তশবীক করা অপছন্দণীয়ই বটে। উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের সমষ্টিতে এই তিন সময়ে তশবীক করাকেই নিষেধ করা হইয়াছে—(১) নামায পড়াকালে; ইহাতে মকরুহ তাহ্‌রিমী (শামী ১—৬০১)। (২) নামাযের পূর্ব্বে—নামাযের জন্য অজু করার পর হইতে। (৩) নামাযের পরে অপর নামাযের অপেক্ষায় বা জিক্‌র ও তছবীহ পাঠে মসজিদে বসা থাকা পর্য্যন্ত; এই দুই সময়েও তশবীক হইতে বিরত থাকা চাই। অবশ্য ইহা নামায সম্পৃক্তে তশবীকের মছআলাহ।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে তশবীক সম্পর্কে এই বলিতে চাহেন যে, সাধারণভাবে অর্থাৎ উক্ত তিন অবস্থা ও তিন সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তশবীক করা নিষিদ্ধ নহে। এমনকি মসজিদের মধ্যেও উহা করিতে পারে। যেমন, বিশ্রান্তি লাভ উদ্দেশ্যে যদি কেহ তশবীক করিয়া বসে তবে তাহা জায়েয হইবে। এ সম্পর্কে বোখারী (রঃ) এস্থলে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন; উহার অনুবাদ যথাস্থানে আসিবে। উক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযান্তে উঠিয়া যাইয়া মসজিদের এক পার্শ্বে বসিলেন; তিনি তাঁহার বাম হাতের উপর ডান হাতকে তশবীকরূপে একত্রিত করিয়া ডান হাত দণ্ডায়মান করতঃ বাম হাতের কব্জিকে ডান কব্জির উপরে স্থাপন পূর্ব্বক উহার পৃষ্ঠে মুখমণ্ডলের ডানপার্শ্ব রাখিয়া অস্বস্তিবোধকের ন্যায় বসিলেন।

এতদ্ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা আঙ্গুল সমূহের অবসাদ দুর করনার্থে তশবীক করিলে তাহাও জায়েয আছে মকরূহ নহে (শামী ১—৬০১)।

তদ্রূপ কোন একটি বিষয় বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে তশবীক করিলে তাহাও মকরূহ হইবে না; এ সম্পর্কেও ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হাদীছ যাহার অনুবাদ যথাস্থানে হইবে—উহাতে উল্লেখ আছে, মোসলমানদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ঐরূপ হওয়া চাই যেরূপ হয় একটি দেওয়ালের ইট সমূহের মধ্যে। ইহা উল্লেখের সময় হযরত (দঃ) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে অপর হস্তের আঙ্গুলসমূহ প্রবেশ করাইয়া দেওয়ালের ইটসমূহের গাথুনির দৃষ্টান্তও দেখাইলেন। দ্বিতীয় হাদীছটি এই—

৩০৭। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র!

কি নীতি অবলম্বন করিবে যখন তুমি খোসা-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে ? এই কথার সময় হযরত (দঃ) স্বীয় হস্তের আঙ্গুলসমূহে তশবীক করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এই—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, (চালণী দ্বারা আটা ইত্যাদি চালিলে উহার ভাল অংশ নীচে পড়িয়া যায়, খোসা বা তুষ জাতিয় অংশই উপরে থাকে। তদ্রূপ কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ হইতে ভাল মানুষ নিঃশেষ হইয়া শুধু কেবল তুষ ও খোসা-শ্রেণীর মানুষ থাকিয়া যাইবে।) হে আবদুল্লাহ! তুমি কি নীতি অবলম্বন করিবে ? যদি তুমি খোসা-জাতিয় লোকদের যুগে বর্ত্তমান থাক ; যাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকার ও আমানতদারী বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (তথা অঙ্গীকার রক্ষা করিবে না, আমানতে খেয়ানত করিবে) এবং আপসের বিবাদ-বিরোধে লিপ্ত হইয়া এইরূপে পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া পড়িবে। (এই বাক্য বলার সময়) ঐ লোকদের পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে হযরত (দঃ) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন (—যে অবস্থায় উভয় হস্তের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া থাকে।)

আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) আরজ করিলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার আদেশ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, (ঐরূপ সময়ে) তুমি তোমার নিজের দ্বীন-ঈমানকে রক্ষা করায় দৃঢ় থাকিবে ; যুগের লোকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইবে না।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে—হযরত (দঃ) বলিলেন, যুগের লোকদের হইতে ভালটা গ্রহণ করিবে, খারাবটা বর্জ্জন করিবে। শুধু নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষায়ই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিবে ; যুগের লোকদের জন্য মাথা ঘামাইবে না। (ফতহুল-বারী ২৩—৩২)

জন-সাধারণের দ্বীন ঈমান রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা একটি বিশেষ ফরজ কাজ। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপরোক্ত হাদীছে যেই অবস্থার যুগের উল্লেখ করিয়াছেন সেইরূপ যুগের আবির্ভাব হইলে তখন উক্ত ফরজ রহিত হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে—তশবীকের মছআলাহ সম্পর্কে যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে আঙ্গুল ফুটাইবার মছআলাহ সম্পর্কেও সেই বিবরণ প্রযোয্য। (শামী ১—৬০১)

মক্কা-মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ ও রসুলুল্লার (দঃ) নামায-স্থান সমুহের বর্ণনা

৩০৮। হাদীছ ঃ—মূসা ইবনে ওক্বাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ছালেম ইবনে আবদুল্লাকে দেখিয়াছি, তিনি মক্কা-মদীনা যাতায়াতের রাস্তায় কতগুলি স্থানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ও ঐ স্থান সমূহে নামায পড়িয়া থাকেন এবং বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই

স্থানসমূহে নামায পড়িতেন। কারণ, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই স্থান সমূহে নামায পড়িতে দেখিয়াছেন।

৩০৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্য মদীনা হইতে মক্কা পানে যাওয়া কালে (মদীনার অনধিক দূরে অবস্থিত) জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করিতেন। হযরতের অবতরণ স্থলটি বাবুল গাছের নীচে--পরবর্ত্তী সময় যে স্থানে মসজিদ হইয়াছে তথায়ই অবস্থিত·········

পাঠক বৃন্দ। ইহা একটি সুদীর্ঘ হাদীছ। এই হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কা-মদীনার তৎকালীন রাস্তায় কতকগুলি স্থানের নিদর্শন বর্ণনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই পথ অতিক্রম করাকালে এই স্থানসমূহে নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন এই রাস্তায় যাতায়াত-কালীন এই স্থানসমূহে বিশেষভাবে নামায পড়িতেন। এমনকি উহার কোন কোন স্থানের নিকটবর্ত্তী পরে মসজিদও তৈরী হইয়াছিল, তবুও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সেই মসজিদে নামায না পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পড়ার স্থানে নামায পড়িতেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবীদের এশ্‌ক-মহব্বত এতই বিস্তীর্ণ ও সুগভীর ছিল যে, হযরতের সামান্যতম স্পর্শপ্রাপ্ত বস্তুসমূহের প্রতিও ছাহাবীগণ এত আসক্ত ও আকৃষ্ট হইতেন যে, দুনিয়াতে কোন বস্তুকেই উহার সমতুল্য গণ্য করিতেন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ জুতা ব্যবহার করিয়াছেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন ঐরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই রং পছন্দ করিতেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন ঐ রং পছন্দ করিতেন। এইভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বস্তু ও কার্য্যের প্রতি ছাহাবীগণ জীবনের তরে আশেক হইয়া যাইতেন। কেহ কাহারও প্রতি খাঁটি আশেক হইলে স্বেচ্ছায়ই সে এই অবস্থায় পৌঁছে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

پائے سگ بوسید مجنوں خلق گفتند این چہ بود -

گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلی رفتہ بود -

"একদা মজনু একটি কুকুরের পা চুম্বন করিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল তুমি এ-কি করিতেছ? সে বলিল, এই কুকুর সময় সময় লায়লার গলিতে যাতায়াত করিত।"

লায়লার প্রতি মজনুর কেবলমাত্র পার্থিব এশ্‌ক ছিল। সেই এশ্‌কের দরুন সে লায়লার বাসস্থানের গলির প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ গলিতে যাতায়াতকারী কুকুরের প্রতিও অনুরাগী হইয়া পড়ে। এমনকি সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার

প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঐ কুকুরের পা চুম্বন করে; ইহাকেই বলে এশ্‌ক্‌ ও মহব্বত। অন্য এক কবি বলেন—

امر على الديار ديار ليلى - اقبل ذا الجدار وذا الجدار -

وما حب الديار شغفن قلبى - ولكن حب من سكن الديار -

"আমি আমার প্রেমাস্পদের বস্তী দিয়া যাতায়াতকালে উহার গৃহগুলিকে চুম্বন করি। আমি গৃহগুলির অনুরাগী নই, ঐ গৃহবাসীর ভালবাসা আমাকে আকৃষ্ট করে।"

ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের সময় সিরিয়া দেশ নূতন জয় হইলে পর তিনি ঐ দেশ পরিদর্শনে যাইয়া সেস্থানের বড় বড় লোকদের এক ভোজ সভায় যোগদান করিলেন। তিনি দস্তরখানার উপর একটি রুটীর টুক্‌রা দেখিতে পাইয়া সুন্নত তরীকা অনুযায়ী ঐ টুক্‌রাটি উঠাইয়া খাইলেন। সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ নগণ্য কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত করিলে তিনি গর্ব্বভরে বলিলেন—

أاترك سنة حبيبى لاجل هذه الحمقاء -

"এ সমস্ত আহমক লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কি আমার মাহবুবের সুন্নত ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়।" আশেকের চোখে মাশুক ও মাহবুবের বিরুদ্ধাচরণকারী সমস্ত দুনিয়া আহমক বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান যুগে আমাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সেই এশ্‌ক ও মহব্বত নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার সুন্নতের প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িয়াছি।

ইমামের সম্মুখে ছোতরা মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা বড় গোনাহ। হাদীছ শরীফে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কবাণী রহিয়াছে; তাই খোলা জায়গায় নামায পড়িতে হইলে অন্ততঃ এক হাত উঁচু কোন বস্তু আড়াল স্বরূপ সম্মুখে রাখা আবশ্যক, যেন যাতায়াতকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়; উহাকেই ছোতরা বলা হয়। ছোতরার বাহির দিয়া গমন করিলে গোনাহ নাই।

৩১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনার মধ্যে (খোলা জায়গায় জামাতের সহিত) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে ছিলেন; তাঁহার সম্মুখে কোন দেওয়াল ছিল না, (কোন বস্তু দাঁড় করা ছিল।) ঐ সময় আমি একটি গাধীর উপর আরোহিত তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়া কিছু অংশ অতিক্রম

করতঃ গাধী হইতে অবতরণ করিয়া গাধীকে ঘাস খাইতে ছাড়িয়া দিলাম এবং আমি হযরতের পেছনে লোকদের সহিত নামাযে শরীক হইলাম। আমি তখন বয়ঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি; কিন্তু উক্ত কার্য্যে আমাকে কেহ মন্দ বলেন নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝমান হওয়ার বয়সে নামাযীদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন; বস্তুতঃ ইহা বাধা প্রদানের ও মন্দ বলার কাজ ছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন ছোতরা ছিল; খোলা জায়গায় নামায পড়িতে ইমামের সম্মুখে ছোতরা থাকিলে মোক্তাদীদের পক্ষেও উহা ছোতরা গণ্য হয়, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে কেহ মন্দ বলেন নাই।

৩১১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন ময়দানে আসিয়া, ছোট বর্শার ন্যায় এক প্রকার অস্ত্র (ছিল; উহাকে) সম্মুখে গাড়িয়া দিতে আদেশ করিতেন। তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতেন এবং সকলে তাঁহার পিছনে শরীক হইত। তিনি ভ্রমণ অবস্থায়ও নামাযের সময় ঐরূপ করিতেন।

ছোতরা কতটুকু ব্যবধানে রাখিবে ?

৩১২। **হাদীছ ঃ**—ছাহ্ল ইবনে ছায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায-স্থান ও মসজিদের সম্মুখ দেওয়ালের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান থাকিত যে, মধ্য দিয়া একটি বকরি যাতায়াত করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—নামায-স্থানের অর্থ সেজদার স্থান। ছোত্রা এত নিকটেও রাখিবে না যে, সেজদার সময় মাথায় লাগে; এত দুরেও রাখিবে না যে, পথ সঙ্কীর্ণ হয়।

৩১৩। **হাদীছ ঃ**—সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে মিম্বর এবং সম্মুখস্থ দেয়াল—উভয়ের মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল যে, উহাতে কোন প্রকারে একটি বকরি অতিক্রম করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বর কাঠের তৈরী ছিল। হযরতের মসজিদে মেহরাব বা সোলতানখানা ছিল না। হযরতের ডান পার্শ্বে তাঁহার নামাযের পদদ্বয়ের স্থান বরাবরে মিম্বর স্থাপিত ছিল এবং হযরত (দঃ) নামাযে দাঁড়াইতে এমন স্থানে দাঁড়াইতেন যে, স্বীয় অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক প্রশস্ততার সহিত সেজদা করায় দেয়াল যেন মাথায় না লাগে—একটু ব্যবধানে থাকে। সুতরাং উক্ত মিম্বর ও সম্মুখস্থ দেয়ালের মধ্যে যে ফাঁক ও ব্যবধান ছিল। সেই ফাঁকেরই পরিমাণ আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এতটুকু ফাঁকই হযরতের সেজদার স্থান এবং দেয়ালের মধ্যেও থাকিত। সেজদার স্থান ও ছোত্রার মধ্যেও সাধারণতঃ ঐ পরিমাণ ফাঁকই থাকা চাই।

মসজিদের খুঁটি সম্মুখীন হইয়া নামায পড়া

ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নামায পড়িতে ইচ্ছা করিবে সে ব্যক্তি মসজিদের খুঁটি ও থাম সমূহের বরাবর স্থানের অধিকারী।" যাহারা নামাযরত নয় তাহাদের উচিত ঐ স্থান হইতে সরিয়া পড়া, যেন নামাযী ব্যক্তি ঐ স্থানে নামায আরম্ভ করিতে পারে। নামাযীদের জন্য ছোত্‌রা আবশ্যক, মসজিদের খুঁটি ও থাম উহার জন্য যথেষ্ট।

ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে দুই খুঁটির মধ্যস্থলে নামায আরম্ভ করিতেছে, তিনি তাহাকে খুঁটি সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, এখানে নামায পড়।

৩১৪। হাদীছ ঃ—ইয়াযিদ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী সালামাহ ইবনে আকওয়ার সঙ্গে মসজিদে আসিতাম। তাঁহাকে দেখিতাম, তিনি ঐ থামের নিকট নামায পড়েন, যে থামের নিকট (হযরতের পরে) সিন্দুকে কোরআন শরীফ রক্ষিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বিশেষভাবে এই থামের নিকটবর্ত্তী নামায পড়েন কেন? তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই থামের নিকটে বিশেষভাবে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

আরোহণের পশু বা বৃক্ষ ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

যদি গাড়িবার কোন বস্তু না থাকে তবে যানবাহন বা এক হাত উঁচু কোন বস্তু সম্মুখে রাখিয়া কিম্বা বৃক্ষের সম্মুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, উহাই ছোত্‌রা হইবে।

৩১৫। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বীয় আরোহণের উষ্ট্রকে সম্মুখে রাখিয়া উহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। যদি উষ্ট্র উপস্থিত না থাকিত, কোথাও চলিয়া যাইত, তবে উহার উপর বসিবার গদিকে সম্মুখে রাখিয়া উহার দিকে নামায পড়িতেন। (গদির সঙ্গে পিছন দিকে এক বা সোয়া হাত উঁচু একটি খুঁটি থাকে।)

খাট, চৌকি ইত্যাদির সম্মুখী নামায পড়া

৩১৬। হাদীছ ঃ—(এক হাদীছে আছে—"স্ত্রীলোক, কুকুর ও গাধা এর কোন একটি নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করিলে নামায নষ্ট হয়।"↑ এই হাদীছ

↑ অধিকাংশ ইমামগণের মতে এক্ষেত্রে নামায নষ্ট হওয়ার অর্থ নামায বাতিল হওয়া নহে, বরং নামাযে একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই বস্তুত্রয়ের কোন একটি নামায অবস্থায় সম্মুখ দিয়া গেলে নামাযের একাগ্রতা ব্যহত হয়। কারণ, নারীর ব্যাপারে পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ মানবীয় দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক ভাবেই রহিয়াছে; সম্মুখ দিয়া নারীর গমন হইলে পুরুষের উপর চঞ্চলতার প্রতিক্রিয়া হয়। আর হাদীছ দৃষ্টে দেখা যায়,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

দৃষ্টে এরূপ মত পোষণ করা হইত যে, উক্ত কারণে নামায ফাছেদ হইবে। এই মতবাদের লোকদের প্রতি তিরস্কার করিয়া) উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন—তোমরা আমাদিগকে (নারী সম্প্রদায়কে) কুকুর ও গাধার সমতুল্য বানাইয়াছ ? অথচ অনেক সময় এরূপ হইত যে, আমি খাটের উপর শুইয়া থাকিতাম ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ খাটের মধ্যস্থল বরাবর মাটিতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিতেন। এমতাবস্থায় আমার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইত এবং আমি ওখান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম ; নামায অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করা ভাল মনে করিতাম না বিধায় আমি শোয়া অবস্থায়ই পায়ের দিক পথে সরিয়া পড়িতাম ।×

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনে বাধা দিবে

ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযের শেষ অবস্থায় যখন আত্তাহিয়্যাত পড়িতে বসিতেন, তখনও যদি কেহ তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে উদ্যত হইত তাহাকে বাধা দান করিতেন এবং কা'বা ঘরের ভিতরেও যদি কেহ এরূপ করিতে উদ্যত হইত তাহাকেও বাধা দিতেন।* তিনি ইহাও বলিতেন যে, যদি সাধারণ বাধায় বিরত না থাকে, তবে সজোরে আঘাত করিবে।

৩১৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) জুমা'র দিন মসজিদের থাম ইত্যাদি কোন একটি বস্তুর বরাবর দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন ; হঠাৎ এক যুবক উহার ভিতর দিয়া তাঁহার সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি তাহার বুকের

গাধা ও কুকুরের সহিত শয়তানের বিশেষ সংশ্রব আছে, অতএব সম্মুখ দিয়া উহার গমনে বিচলতার আধিক্য হইবে। সুতরাং নামায আরম্ভ করিতে এই বস্তুত্রয়ের গমন আশঙ্কা এড়াইবার ব্যবস্থায় বিশেষ তৎপর হইবে।

বিবি আয়েশার ঘটনা হযরতের ব্যক্তিগত ঘটনা ; নামাযে হযরতের সুদৃঢ় একাগ্রতার সহিত অন্যের তুলনা হইতে পারে না ; এতদ্‌সত্ত্বেও আয়েশা (রাঃ) অতি প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যে, শোয়া অবস্থায় সম্মুখ হইতে এমন ভাবে সরিয়া পড়িতেন যাহাতে পূর্ণ পরিদৃষ্ট না হন এবং হযরতের একাগ্রতায় ব্যঘাত ঘটায় হযরত বিব্রত না হন। অবশ্য যদি নারীর অতিক্রমে মূল নামাযই বাতিল সাব্যস্ত হইত তবে নিশ্চয় বিবি আয়েশা ঐরূপও করিতেন না এবং হযরত (দঃ) বিবি আয়েশার ঐরূপ ভাবে সরিয়া পড়াকেও নিষিদ্ধ বলিতেন।

× নামাযীর সম্মুখ অতিক্রম করা গোনাহ ও নিষিদ্ধ ; সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়া ঐরূপ গোনাহ নহে। অবশ্য ইহাকেও সতর্কতামুলক মকরুহ বলা হয়।

* ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হেরেম শরীফেও নামাযের সম্মুখ কাটিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

উপর ধাক্কা দিলেন। সে এদিক ওদিক তাকাইয়া কোন সুযোগ না দেখিয়া পুনরায় ঐরূপ করিলে তিনি আরও জোরে ধাক্কা দিলেন। যুবক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতঃ শাসনকর্ত্তা মারওয়ানের নিকট নালিশ দায়ের করিল ; এমন সময় আবু সায়ীদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছিলেন। মারওয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আপনারই এক মোসলমান ভাইএর ছেলেকে কি দোষে এরূপ করিয়াছেন ? আবু সায়ীদ (রাঃ) এক হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ ছোত্‌রা সম্মুখীন নামায পড়ে তখন যদি কোন ব্যক্তি উহার ভিতর দিয়া সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে তাহাকে বাধা দিবে। বাধা না মানিলে তাহার প্রতিরোধে লড়াই অর্থাৎ কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবে—সে নিশ্চয়ই শয়তান।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের অর্থ এই নয় যে, উভয়ে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিবে এবং ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ কার্য্য অত্যন্ত দোষণীয় এবং ঐ ব্যক্তি কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। তবে বাধাদানের নিয়ম এই যে, শুধু এক হাত দ্বারা তাহার বুকে ধাক্কা দিয়া তাহাকে সতর্ক করিবে, পুনরায় আবশ্যক হইলে জোরে ধাক্কা দিবে এর চেয়ে বেশী কিছু করিতে যাইয়া দুই হাত ব্যবহার করিলে বা অধিক নড়াচড়া করিলে বা কেবলা দিক ব্যতিক্রম হইলে নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাওয়া বড় গোনাহ

৩১৮। হাদীছ ঃ— আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাতায়াতকারী যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে, এরূপ করা কত বড় গোনাহ ; তবে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বৎসর) দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলেও সে নামাযের সম্মুখ কাটিয়া কখনও যাইত না।

ছোট শিশুকে কাঁধে লইয়া নামায পড়া

৩১৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দৌহিত্রী (জয়নবের মেয়েকে) কাঁধে লইয়া নামায পড়িতেন। সেজদার সময় তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং দাঁড়াইবার সময় পুনঃ উঠাইয়া লইতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই সমস্ত নড়াচড়া ইত্যাদি যদি শুধু এক হাতের সাহায্যে সামান্য ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তবে ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিতেন, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য

রাখিতে হইবে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে তাঁহার মন ও ধ্যানকে এত দৃঢ়তার সহিত মগ্ন রাখিতেন যে, কোন বিষয়ই তাঁহার মন ও ধ্যানকে এদিক ওদিক ধাবিত করিতে পারিত না। সেরূপ অবস্থার অধিকারী না হইয়া এতটুকু দেখিলে চলিবে না, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে এরূপ ঝামেলার সংশ্রব রাখিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এরূপ করা মকরূহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে যে, শিশুর শরীর বা কাপড় যেন তাহার মল-মূত্র ইত্যাদির দরুন নাপাক না হয়, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শুধু লুঙ্গি পরিধান করিয়া শরীর আবৃত করায় অন্য কোন কাপড় ব্যবহার ব্যতিরেকেই নামায শুদ্ধ হইবে (৫৩ পৃঃ)। ● নামায অবস্থায় স্বীয় কাপড় স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৫৫ পৃঃ ২২৬ হাঃ)। ● অমোসলেমরা যে সব বস্তুর পূজা করিয়া থাকে, যেমন—আগুন; অগ্নিপূজক কাফেররা উহার পূজা করে। কিম্বা অমোসলেমরা কোন বিশেষ বস্তুকে পূজনীয় বানাইয়া নিয়াছে; যেমন—কোন বৃক্ষ ইত্যাদি—এইরূপ কোন বস্তু নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে আছে; সে ক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও নিয়্যত পূর্ণ একাগ্রতার সহিত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলে তাহার নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু ঐরূপ বস্তু প্রকাশ্যভাবে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য আকৃতিবিশিষ্ট নয় এমন বস্তু—যেমন, পূজনীয় বট—বৃক্ষ বা অগ্নি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী পর্য্যায়ের) মকরুহ সাব্যস্ত হইবে। এমনকি বাতি-প্রদীপ, তন্দুর-চুলা ইত্যাদি কেবলা স্থলে রাখিয়া সোজাসুজি তদমুখী হইয়া নামায পড়াকেও মকরুহ বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ কোন বস্তু সম্মুখে অপ্রকাশ্য থাকিলে দোষণীয় হইবে না (৬১ পৃঃ)। আর আকৃতিবিশিষ্ট মূর্ত্তি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে সেস্থলে নামায পড়া হারাম হইবে। ● গির্জ্জা ইত্যাদি ইহুদ-নাছারাদের এবাদৎখানায় নামায পড়াকে সাধারণভাবে মকরুহ বলা হইয়াছে এবং মকরুহ তাহরীমী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য গির্জ্জার মধ্যে কোন ছবি বা মূর্ত্তি, যেমন—বিবি মরয়্যামের বা ঈসা আলাইহেচ্ছালামেরও মূর্ত্তি বা ছবি থাকিলে সেখানে নামায পড়া, বরং সাধারণভাবে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ।

খলীফা ওমর (রাঃ) একবার সিরিয়া পরিদর্শনে আসিলে তথাকার এক বিশিষ্ট নাছরাণী খৃষ্টান তাঁহার জন্য (গির্জ্জা ঘরে) ভোজ-সভা অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের গির্জ্জা সমূহে (পীর-পয়গাম্বরগণের) বিভিন্ন ছবি থাকে; ছবি থাকার কারণে আমি যাইব না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রয়োজনে গির্জ্জায় নামায পড়িতেন, কিন্তু ছবি থাকিলে তথায় নামায পড়িতেন না—বৃষ্টি হইলেও বাহিরে নামায পড়িতেন (৬২পৃঃ ২৮৯হাঃ)।

হিন্দুদের পূজার ঘর ভিন্ন জিনিষ ; উহা ত এবাদৎখানা মোটেই নহে, বরং উহা ত প্রকাশ্য শেরেক ও মূর্ত্তি পূজার ঘর। তথায় কোন অবস্থায়ই নামায পড়িবে না।

● মসজিদের মধ্যে দুনিয়াদারীর কথাবার্ত্তা ত নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন দুনিয়াদারী বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের মছআলাহ বর্ণনা করা এবং সেই উপলক্ষে উহার আলোচনা করা দোষণীয় নহে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মসজিদের মিম্বরে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক ঘটনায় হযরত (দঃ) মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার মছআলাহ মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন (৬৫ পৃঃ)।

● কোন পশুকে মসজিদে প্রবেশ করান নিষিদ্ধ ; অবশ্য যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে প্রবেশ করাইতে পারিবে, কিন্তু উহার মল-মূত্রে মসজিদ অপবিত্র না হয় উহার সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন রাখিবে (৬৬ পৃঃ)। ● অমোসলেমকে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাবে নিষিদ্ধ। হানফী মজহাব মতে শুধু মোসলমান না হওয়ার কারণে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ নহে (৬৭ পৃঃ)। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন কারণ অমোসলেমের মধ্যে সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে ; যেমন, অপবিত্র শরীর বা কাপড় বহনকারীর মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অমোসলেমরা জানাবাতের গোসলে শরীয়ত সম্মতরূপে মোটেই তৎপর নহে, পায়খানা-প্রস্রাবে সৌচকার্য্য সম্পর্কেও তাহাদের যে রীতি তাহাতে তাহাদের শরীর ও কাপড় অপবিত্র থাকেই। এই দৃষ্টিতেই ফৎওয়ার মধ্যে মসজিদে অমোসলেমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ দেখা যায় (এমদাদুল ফৎওয়া ২য় খণ্ড)। ● মসজিদের মধ্যে গোলাকারে একত্রিত হইয়া বসা—ইহা যদি দ্বীনের শিক্ষা এবং ওয়াজ-নছিহত শুনিবার জন্য হয় এবং সাধারণ নামাযীদের চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটায় তবে জায়েয ; অন্যথায় জায়েয নহে (৬৮ পৃঃ)।

● জন-সাধারণের চলাচলের পথে মসজিদ তৈরী করা। অর্থাৎ চলাচলের সাধারণ পথ যাহা কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত নহে, এইরূপ পথ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশস্ত হয় তবে জনগণের চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটাইয়া ঐ পথের কিছু অংশে মসজিদ তৈরী করা জায়েয (ঐ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে নয় এবং সরকার কর্ত্তৃক জনগণের প্রয়োজনে সংরক্ষিত এলাকাও নয় এইরূপ জায়গায় জনগণের প্রয়োজনে মসজিদ তৈরী করা জায়েয আছে এবং সেই মসজিদ বৈধ মসজিদ গণ্য হইবে। অবশ্য এইরূপ স্থানে মসজিদ তৈরী করিতে যদি কোন ক্ষেত্রে জনগণের মতবিরোধ

দেখা যায় তবে সে ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৩, ফয়জুল বারী ৩—৭১ দ্রষ্টব্য)।

● বাজার শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম স্থান, কিন্তু বাজারের কোন স্থানে বা বাজারে নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ মসজিদে নামায পড়া আবশ্যক, কিন্তু নিজ গৃহে নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে (৬৯ পৃঃ)।

মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে জমাতে নামায পড়িলে জমাতের ছওয়াব হাসিল হইবে, কিন্তু মসজিদের ফজিলত ও ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। (ফয়জুল-বারী ২—৭১)

● সম্মুখ দিয়া লোক যাতায়াতের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ স্থানে নামায পড়িলে সেজদাস্থলের সংলগ্নে কোন বস্তু দাঁড় করিয়া বা উঁচু বস্তু রাখিয়া নামাযে দাঁড়াইতে হয়—সেইরূপ বস্তুকে ছোতরা বলা হয়। ছোতরা অন্ততঃ এক হাত উঁচু যে কোন বস্তুই হইতে পারে, যেমন লাঠি বা বর্শা—যদি উহাকে গাড়িয়া লওয়া হয় (৭১ পৃঃ)। ● সব জায়গায়ই ছোতরা প্রয়োজন। নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে ছোতরা না থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবে না (৭২ পৃঃ)।

● মসজিদের খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে একাকী নামায পড়া জায়েয, কিন্তু অন্য মুছল্লিদের চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

জমাতের সময় খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে এইভাবে কাতার বানান যে, খুঁটি ও থাম কাতার কর্ত্তনকারী হয় তাহা দোষণীয় যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয়। আর যদি জায়গার অভাবে ঐরূপ কাতার বাঁধার প্রয়োজন বোধ হয় তবে দোষণীয় নহে (৭২ পৃঃ)। ● কাহারও মুখামুখী হইয়া নামায পড়া মকরুহ তাহ্‌রিমী। [যদি নামাযী ব্যক্তিই কাহারও মুখামুখী নামাযে দাঁড়ায় তবে উহার গোনাহ নামাযী ব্যক্তির হইবে, আর নামায আরম্ভ করার পর কেহ তাঁহার মুখামুখী হইলে গোনাহ সেই ব্যক্তির হইবে (শামী ১—৬০২)।

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুখামুখী হওয়ার দরুন যদি নামাযী ব্যক্তি বিব্রত হয় তবে উহা মকরুহ হইবে, অন্যথায় নহে (৭৩ পৃঃ)। কিন্তু ফেকাবিদগণ সর্ব্বাবস্থায়ই উহাকে মকরূহ তাহ্‌রিমী বলিয়াছেন। ● ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয আছে (৭৩ পৃষ্ঠা ২৫৭ হাদীছ)। ● নামাযের সময় সম্মুখে কোন মেয়েলোক ঋতুবতি থাকিলেও নামায নষ্ট হইবে না (৬৩ পৃঃ ২৫৬ হাঃ)। ● নামাযের সম্মুখ দিয়া যে কোন বস্তুর (কুকুর, গাধা বা কোন মেয়েলোকের) গমনে নামায নষ্ট হইবে না (৭৩ পৃঃ ৩১৭ হাদীছ) অবশ্য সেইরূপ সম্ভাবনার স্থলে সতর্কতা অবলম্বন না করায় ঐরূপ ঘটিলে মকরুহ গণ্য হইবে। ● নামায অবস্থায় স্ত্রী বা কোন মহ্‌রম নারীর স্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৭৪ পৃঃ)।

নামাযের ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

"নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পড়াকে মোমেনদের উপর ফরজ করা হইয়াছে।"

অর্থাৎ নামায যে কোন সময় পড়িয়া লইলেই ফরজ আদায় হইবে না, বরং নামাযের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত আছে সেই সময় মত নামায আদায় করিতে হইবে। (৫ পারা ১২ রুকু)

৩২০। হাদীছ ঃ—ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) (যখন বাদশাহ অলীদ ইবনে আবদুল মালেকের পক্ষ হইতে মদীনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন) একদা (তিনি) আছরের নামায আদায় করিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ ওরওয়াহ্ ইবনে জোবায়ের (রঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ইরাকের শাসনকর্ত্তা থাকাকালীন এরূপ একদিন নামায পড়িতে বিলম্ব করিলে ছাহাবী আবু মসউদ আনছারী (রাঃ) তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিলেন এবং রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুগিরা! এ কি ব্যাপার? আপনি জ্ঞাত নহেন যে, (নামাযের নির্দ্ধারিত সময় অবহেলার বস্তু নয়, উহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়াই উহার জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সময় নির্দ্ধারণ শুধু বর্ণনার দ্বারাও হইতে পারিত, কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা (তাহা না করিয়া উহার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রত্যেকটি নামাযের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিবার জন্য) স্বয়ং জিব্রীল ফেরেশতাকে পাঠাইলেন। তিনি প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্ত মত পড়িলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার সঙ্গে নামায পড়িলেন। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিলেন—আপনার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আপনি এই নির্দ্ধারিত সময় সমূহে নামায আদায় করিবেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এই বয়ান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, হে ওর্ওয়াহ্! চিন্তা করিয়া কথা বলুন! স্বয়ং জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া নামাযের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কি?

ওর্‌ওয়াহ্ (রঃ) বলিলেন—হাঁ, নিশ্চয়। এই ঘটনা বর্ণনাকারী আবু মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ছেলে বশীর তাঁহার পিতা হইতে এই ঘটনা আমাকে শুনাইয়াছেন; (ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।)

অতঃপর ওর্‌ওয়া (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আরও একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আছর নামায এরূপ বিলম্বে পড়িতেন না যেরূপ বিলম্বে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ঐ দিন পড়িয়াছিলেন। উক্ত হাদীছটির অনুবাদ ৩৩২ নম্বরে আসিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে যে, মে'রাজের রাত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হইল। তিনি মে'রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর দিনের বেলা সূর্য্য আকাশের ঠিক মধ্য রেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রীল ফেরেশতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কা'বা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায পড়িলেন। এইরূপে পর পর আছর মগরের, এশা ও ফজর প্রত্যেকটি নামাযের জন্যই জিব্রীল ফেরেশতা অবতরণ করিলেন এবং এই দিন প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সময়ের সর্ব্বাগ্রভাগে আদায় করিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সর্ব্বশেষ ভাগে আদায় করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকটি নামায এই দুই দিন যে দুই সময়ে আরম্ভ ও শেষ করা হইল এই সময়দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়কে ঐ নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইল। পূর্ব্বের নবীগণের জন্যও এইরূপই করা হইয়াছিল।

নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে

৩২১। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা খলীফা ওমরের নিকট (তাঁহার খেলাফত কালে) বসিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ সমস্ত বয়ান স্মরণ রাখিয়াছে কি যাহা তিনি "ফেৎনা" সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছিলেন? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে ত এ বিষয়ে বড় সাহসী দেখা যায়; আচ্ছা, বল। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—) পরিবারবর্গ, ছেলেমেয়ে, পাড়াপড়শী (তথা পরিবেশ) ও ধন-দৌলত দ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া বা এই সব জিনিষের ব্যাপারে শরীয়তের যে নীতি রহিয়াছে ইহাতে) মানুষ যে, ফেৎনায় পতিত হয় অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া ফেলে এবং নানারকম গোনাহ করে (যাহা সাধারণতঃ ছগিরা গোনাহ হয়)

উহা নামায, রোযা, ছদকা, সৎকার্য্য প্রচার ও অসৎ কার্য্যে বাধাদান (ইত্যাদি নেক কার্য্য) সমূহের দ্বারা মাফ হয়।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই অর্থের ফেৎনার কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার জিজ্ঞাসা ঐ ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে যাহা (কালক্রমে) উথলিত সমূদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় প্রচণ্ড ও ব্যাপক আকারে একের পর এক হু হু করিয়া সমাজে প্রবেশ করিবে এবং সমাজকে ধ্বংস করিবে। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন—হে আমিরুল-মোমেনীন! সে বিষয় আপনার চিন্তা করিতে হইবে না; এ ফেৎনা আপনাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না; আপনার (সময়কালের) মধ্যে এবং ঐসব ফেৎনার মধ্যে লৌহ নির্ম্মিত বন্ধ দ্বার প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। খলীফা ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন (মোসলেম সমাজের দুর্ভাগ্যের সময় যখন ঘনাইয়া আসিবে তখন) ঐ বন্ধ-দ্বার খোলা হইবে—না, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে ত উহা বন্ধ করার ব্যবস্থা কেয়ামত পর্য্যন্ত আর হইবে না। (হোযায়ফা (রাঃ) বলেন—)

মোসলেম সমাজে ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় এবং হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক দরওয়াজা স্বয়ং লৌহ মানব খলীফা ওমর (রাঃ) নিজেই ছিলেন। যাহা তিনি নিজেও সন্দেহাতীতরূপে জানিতেন। (তিনি যে দুর্বৃত্ত ঘাতকের হাতে শহীদ হইবেন, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছিল "দরওয়াজা ভাঙ্গা হইবে" বলিয়া। আর সেই সময় হইতেই ফেৎনার পত্তন হইল।)

ব্যাখ্যা :—"ফেৎনা" শব্দের দুইটি অর্থ আছে। প্রথম—ত্রুটি বিচ্যুতি ও বিপথগামী হওয়া। দ্বিতীয়—বিপর্য্যয়, হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা। হোযায়ফা (রাঃ) প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ফরমান বয়ান করিলেন উহাতে ফেৎনা শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে বা বিভিন্ন মোহ ইত্যাদিতে বেষ্টিত হইয়া খোদাকে ভুলিয়া মানুষ পদে পদে যে অসংখ্য ছোটখাট গোনাহ করিতে থাকে যদিও উহার এক একটি ছোট ছোট হয়, কিন্তু উহা এত অগণিত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে যে, আপাদ-মস্তক গোটা মানুষটি তাহাতে ডুবিয়া জাহান্নামী হইবার জন্য যথেষ্ট হয় এবং এরূপ হইলে অতি নগণ্য সংখ্যক মানবই জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে। তাই মানবের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মেহেরবান হইয়া আশা দিয়াছেন যে, সতর্ক থাকিয়া যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত রকমের যত ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হইবে, উহা নেক আমল যথা—নামায, রোযা ইত্যাদির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মাফ হইতে থাকিবে।

হোযায়ফা (রাঃ) "ফেৎনা" শব্দের যে অর্থে হাদীছ শুনাইলেন সেই অর্থে ফেৎনার হাদীছ খলীফা ওমরের জিজ্ঞাস্য ছিল না, বরং তিনি ঐ শব্দের দ্বিতীয়

অর্থের হাদীছ জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে কালক্রমে মোসলেম সমাজে নানা কারণে যে বিপর্য্যয় এবং বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে, এমনকি পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি তুফান আকার ধারণ করিবে উহার বিষয় খলীফা ওমর অবগত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। এ সমস্ত বিষয় রসুলুল্লাহ (দঃ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নাম ও পরিচয় সহ তাহাদের আত্মপ্রকাশের সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনেক হাদীছে ঐরূপ তথ্য কিছু কিছু বর্ণিতও আছে। যথা—

হাদীছ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় অচিরেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সতর্ক থাকিও—তারপর আরও অধিক বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে বসা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হইতে উত্তম, যে হাঁটিয়া চলিবে সে ধাবমান হইতে উত্তম। (অর্থাৎ সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা হইতে যে যতটুকু সংযত ও বিরাগী হইবে সে ততটুকুই উত্তম গণ্য হইবে।) সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা যখন আরম্ভ হইবে তখন যাহার উট আছে সে নিজের উট লইয়া, যাহার বকরী আছে, সে বকরী লইয়া এবং যাহার জায়গা-জমি আছে সে উহা লইয়া লিপ্ত থাকাই তাহার কর্ত্তব্য হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যাহার ঐ সব কিছুই নাই? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পাথর দ্বারা স্বীয় তরবারির ধার ভাঙ্গিয়া দিবে এবং সুযোগ থাকিলে দ্রুত ছুটিয়া পালাইবে। এই পর্য্যায়ে হযরত নবী (দঃ) দুইবার আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার কথা পৌঁছাইয়া দিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি কোন দলের বল প্রয়োগে বাধ্য হই সেই দলে শামিল হইতে এবং কাহারও তরবারি বা তীরের আঘাতে আমার মৃত্যু হয়? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী (কেয়ামতের দিন) যে ভাবে নিজের গোনাহের বোঝা উঠাইবে তদ্রূপ তোমার গোনাহের বোঝাও তাহার উপর পতিত হইবে এবং সে দোযখে যাইবে। (মোসলেম)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, অচিরেই বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে শোয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তি হইতে, বসা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে, দণ্ডায়মান চলমান হইতে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান হইতে উত্তম গণ্য হইবে। সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রতি যে কেহ তাকাইয়া দেখিবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া লইবে, অতএব উহা হইতে দূরে থাকিবার আশ্রয়স্থল পাইলে আশ্রয় নিবে। (ঐ)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সুযোগ থাকিতে নেক আমল করিতে যত্নবান হও বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পূর্ব্বে—যাহা অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় পুঞ্জীভূত হইয়া আসিবে। উহাতে

সকাল বেলার মোমেন ব্যক্তি বিকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে, বিকাল বেলার মোমেন ব্যক্তি সকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে—সে দুনিয়ার লোভে নিজের দীনকে বিক্রয় করিবে। (মোসলেম ও মেশকাত শরীফ)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়া শেষ হইবে না—এইরূপ যুগ না আসা পর্য্যন্ত যখন হত্যাকারী নিজেও জানিবে না, কেন সে হত্যা করিল, নিহত ব্যক্তিও জানিবে না কেন তাহাকে হত্যা করা হইল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অত্যধিক রক্তারক্তির কারণে। (তখন অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ করায় উভয়ই বাতেলের উপর হইবে, ফলে) হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোযখী হইবে।

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, অচিরেই এরূপ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইবে যাহা সম্পূর্ণ বধির, বোবা ও অন্ধ হইবে। যে কেহ উহার প্রতি তাকাইবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া ধরিবে; উহাতে মুখের অংশগ্রহণ তরবারির অংশগ্রহণের ন্যায়ই হইবে। (আবু দাউদ—মেশকাত)

পাঠকবৃন্দ! মোসলেম সমাজে বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার আগমনের আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর হাদীছ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে—সপ্তম খণ্ড "ফেৎনা-ফছাদ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা" পরিচ্ছেদে ঐরূপ বহু হাদীছের অনুবাদ রহিয়াছে। সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল ও দলপতিদের পরিচয় হযরত (দঃ) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। হাদীছে উহারও প্রমাণ আছে। যথা—

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যত দলপতি দুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হইবে—যাহার দলে মাত্র তিনশত বা কিছু বেশী লোকও হইবে এরূপ একজন দলপতিকেও রসুলুল্লাহ (দঃ) বাদ দেন নাই; প্রত্যেক জনের নাম তাহার পিতার নাম এবং তাহার গোত্রের নামও রসুল (দঃ) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। (আবু দাউদ ও মেশকাত শরীফ)

উল্লেখিত বয়ান-বর্ণনা বিক্ষিপ্ত আকারে ত হইতই; এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ে এক আনুষ্ঠানিক সুদীর্ঘ ভাষণও হযরত (দঃ) দিয়াছিলেন। হোযায়ফা (রাঃ)ই উহার খোঁজ দানে বলিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের সমাবেশে ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন। কেয়ামত পর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিবে একটিও বাদ না দিয়া সবই সেই ভাষণে তিনি বয়ান করিলেন। যে স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে স্মরণ রাখিয়াছে, আর যে স্মরণ রাখিতে পারে নাই সে ভুলিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই বর্ণনার ঘটনা ঘটে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনা দেখিয়া হযরতের সেই বর্ণনা স্মরণ হয়। যেরূপ এক ব্যক্তি কাহারও আকৃতি দেখিয়া পরিচয় লাভ

করিয়াছে, সে অন্যত্র চলিয়া গেলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু পুনরায় দেখিলেই পূর্ব্বের পরিচয় স্মরণে আসে। (বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফ)

রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ভাষণ যে, কত দীর্ঘ ছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখও মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে। আবু যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রস্থলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে নিয়া ফজর নামায পড়িলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হইল, হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নামিয়া জোহরের নামায পড়িলেন এবং পুনঃ মিম্বরে চড়িলেন ও ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। আছরের ওয়াক্ত হইল; হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নামিয়া আছরের নামায পড়িলেন; আবার মিম্বরে চড়িয়া ভাষণ আরম্ভ করিলেন এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভাষণ দিলেন। যত কিছু ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে সব বয়ান করিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) সকল ফেৎনা—বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের লৌহ-দ্বার ছিলেন বলিয়া এখানে যাহা উল্লেখ হইয়াছে তাহা স্বয়ং রস্থলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ রহিয়াছে; যেমন—ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা ওমর (রাঃ)কে "হে ফেৎনার তালা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ওমর (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম, আপনি সেই পথে গমন করিলেন; নবী (দঃ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি ফেৎনার জন্য তালা—যাবৎ জীবিত থাকিবে তোমাদের এবং ফেৎনার মধ্যে অতি মজবুত বন্ধ দরওয়াজা বিদ্যমান থাকিবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই বৈশিষ্ট্য তৌরাত কেতাবেও উল্লেখ ছিল। (ফতহুল-মোলহেম, ১—২৮৮।২৮৯)

৩২২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন এক নারীকে চুম্বন করিল; অতঃপর সে ভীষণ অনুতপ্ত হইল এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। (যেন তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাহাকে এই কর্ম্মের শাস্তি দান করেন যাহাতে তাহার এই গোনাহ মাফ হইয়া যায়।) ঐ সময় কোরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হয়—

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ

يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ -

অর্থ—"দিনের উভয় অর্দ্ধে (ফজর, জোহর ও আছর) এবং রাত্রের কিছু অংশে (মগরেব ও এশা) নামায আদায় কর। নিশ্চয় জানিও, নেক আমল গোনাহকে

বিলীন করিয়া দেয়।" ঐ ব্যক্তি এই আয়াতের দ্বারা তাহার ঘটনার সমাধান পাইল ; তখন সে আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ্ (দঃ)। এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এই সুযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—ছগীরা গোনাহসমূহে এই নিয়ম প্রযোজ্য যে, খাঁটী নেক আমলের দ্বারা উহা মাফ হইয়া যায়। কবীরা গোনাহ মাফ হইবার জন্য বিশেষভাবে তওবা করিতে হইবে। তওবার মূল হাকিকত এই যে, কোন গোনাহ অনুষ্ঠিত হইলে পর উহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অন্তরের অন্তস্থল হইতে ঐ গোনাহ না করার স্থির প্রতিজ্ঞা করা ; যেমন উক্ত হাদীছে উল্লেখিত ব্যক্তির অবস্থা ছিল। সে স্বীয় গোনাহের উপর কত অনুতপ্তই না হইয়াছিল! এমনকি, সে অস্থির হইয়া নিজেকে মুরব্বির নিকট সমর্পণ করিয়া দিল ; যেন তিনি শাস্তির বিধান করিয়াও গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষ মাত্রই গোনাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনুতপ্ত ও অস্থির হওয়ার অর্থই তওবা এবং ইহাই মোমেনের নিদর্শন। যেমন, এক হাদীছে আছে—মোমেনের নিদর্শন এই যে, যখন কোন গোনাহ করিয়া ফেলে তখন সে ভয়ে এরূপ ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়ে যেন তাহার মাথার উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর মোনাফেকের অবস্থা এই যে, সে গোনাহের প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি বসিয়াছে, হাত নাড়িলেই উড়িয়া যাইবে।

ওয়াক্তমত নামায আদায় করার ফজিলত

৩২৩। **হাদীছ** ঃ— ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম—কোন্ আমল আল্লার নিকট সর্ব্বাধিক পছন্দীয় ? হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর ? তিনি বলিলেন, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর ? তিনি বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত করা হইল ; আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) আরও উত্তর দিতেন।

৩২৪। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলত! কাহারও ঘরের দরওয়াজা সংলগ্নে যদি একটি প্রবাহিত নদী থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহার শরীরে কি ময়লা থাকিতে পারে ?

সকলে উত্তর করিল—না, না, কোন প্রকার ময়লাই থাকিতে পারে না। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থা তদ্রূপই ; উহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মুছিয়া দেন।

ওয়াক্তমত নামায না পড়া নামাযকে নষ্ট করা

৩২৫। হাদীছ ঃ—একদা আনাছ (রাঃ) অনুতাপ ও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (মোসলমানদের মধ্যে) যে সমস্ত (নেক আমল) দেখিয়াছিলাম এখন তাহার একটিও দেখিতে পাই না। এক ব্যক্তি বলিল, নামায এখনও বাকি আছে। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, দেখনা ! তোমরা নামাযকে কিরূপ নষ্ট করিয়াছ।

৩২৬। হাদীছ ঃ—ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—দামেস্ক শহরে একদা আমি ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাঁদেন কেন ? তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হায়। (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়) যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম এখন তাহার কিছুই দেখি না। এমনকি, এই নামাযকেও নষ্ট করা হইতেছে। (ইহার প্রতিও মুসলমানদের লক্ষ্য ও আগ্রহ কম হইয়া যাইতেছে, যাহারা নামায পড়িয়া থাকে তাহারাও সময় ইত্যাদির কোনই পাবন্দি করে না)।

গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের তাপ কমিলে জোহর নামায পড়িবে

৩২৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তাপমাত্রা বৃদ্ধিকালে (জোহরের) নামায (বিলম্বে) ঠাণ্ডা সময় পড়। কারণ, অত্যধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ।

দোযখের অগ্নি একবার আল্লার দরবারে নালিশ করিল, হে পরওয়ারদেগার ! (আমরা সর্বদা জাহান্নামে আবদ্ধ আছি, তোমার অনুমতি ব্যতীত বাহিরের দিকে আমরা নিশ্বাসও ফেলিতে পারি না। সুতরাং উত্তাপ বেষ্টনীর ভিতরই আবদ্ধ, তাই) আমরা একে অন্যের দ্বারা ভস্ম হইতেছি। তখন আল্লাহ তায়ালা দোযখকে দুই রকম দুইটি নিঃশ্বাস বাহিরের দিকে ফেলিবার অনুমতি দিলেন—একটি গ্রীষ্মকালে, একটি শীতকালে। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক উত্তাপ ঐ জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট এবং শীতকালের অধিক ঠাণ্ডার প্রকোপ ঐজাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ—জাহান্নাম আল্লার অভিশাপ কেন্দ্র, সেই অভিশাপ কেন্দ্রের উত্তেজনা যখন বাহিরে ছড়াইতে থাকে তখন নামায আদায় না করিয়া সেই উত্তেজনার উপশম হইলে পর নামায আদায় করাই বিবেচ্য ও বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ

দুনিয়ার কোন বড় লোকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইলেও তাঁহার মেজাজ, মতি-গতি লক্ষ্য করিয়াই পেশ করা হয়, রাগ বা উত্তেজনার সময় উহা পেষ করা হয় না। নামায আল্লার দরবারে পেশকৃত দরখাস্ত; উহা পেশ করিতেও আল্লার ছেফতে-রহমত ও ছেফতে-গজবের নিদর্শন দেখিয়া পেশ করা বাঞ্ছনীয়।

এই হাদীছের উপর প্রশ্ন হয় যে, অগ্নি একটি নির্জীব নির্ব্বাক বস্তু। উহা কিরূপে নালিশ দায়ের করে বা এরূপ আরজ করিতে পারে? উত্তর এই যে, অগ্নি আমাদের পক্ষে নির্জীব বটে, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষে উহা বোদ্ধা, সচেতন জীব-বিশেষ। এমনকি যখনই আল্লার কোন আদেশ তাহার প্রতি আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে উহাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করিয়া ঐ আদেশ অনুযায়ী কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। যেমন—কোরআন শরীফে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে—ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনা। যখন নমরুদ তাঁহাকে মারিবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল তখন সেই অগ্নির প্রতি আল্লার আদেশ পৌঁছিল—

يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ -

"হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও।" (১৭ পাঃ ৫রুঃ) অগ্নি আল্লার এই আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ্যে পালন করিয়া দেখাইয়াছে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, "দজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তাহার সঙ্গে বেহেশত নামধারী সুখ শান্তির ব্যবস্থার একটি বস্তু এবং দোযখ নামধারী একটি অগ্নিকুণ্ড থাকিবে। দজ্জালকে যে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে সে তাহাকে ঐ বেহেশতে স্থান দিবে এবং যে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে না তাহাকে ঐ দোযখে নিক্ষেপ করিবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—স্মরণ রাখিও, তাহার ঐ বেহেশতে প্রকৃতপক্ষে দোযখের ন্যায় কষ্ট ও আজাব হইবে এবং যাহারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে পক্ষান্তরে তাহারা ঐ স্থানে বেহেশতের ন্যায় শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতে থাকিবে।" দেখুন—অগ্নি কত বিচক্ষণ। সে আল্লার দোস্ত দুশমন সকলকেই চিনিতে পারে; আল্লার আদেশ অনুযায়ী সে কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। মাওলানা রুমী এ বিষয়ে কি সুন্দর বলিয়াছেন—

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند - با من و تو مردہ با حق زندہ اند -

মাটি, বায়ু, পানি, অগ্নি ইহারা সকলেই আল্লার বন্দা; তোমার ও আমার পক্ষে ইহারা নির্জীব, কিন্তু আল্লার পক্ষে ইহারা সকলেই সজীব।

এই হাদীছের উপর আর একটি প্রশ্ন হয় যে, এখানে অধিক তাপমাত্রা ও শীতের প্রকোপের সম্বন্ধ দোযখের সঙ্গে বলা হইয়াছে, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা উহার সম্বন্ধ সূর্য্যের সঙ্গে দেখিয়া থাকি। সে জন্যই সূর্য্যের গতি পথের দুরত্ব অনুপাতে ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা পরিমাণে ও সময়ে বেশ কম হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, সূর্য্য হইতেই যদি উত্তাপের বিস্তার ধরিয়া লওয়া হয় তবুও দেখিতে হইবে, সূর্য্যের মধ্যে সেই উত্তাপ কোথা হইতে আসিল? এরূপও হইতে পারে যে, জাহান্নামের সঙ্গে সূর্য্যের কোন সম্পর্ক আছে, যদ্বারা জাহান্নামের নিঃশ্বাস দুনিয়ার বুকে একমাত্র সূর্য্যের পথে ছড়াইতে থাকে। যেমন কাহারও ঘরে যদি ইলেট্রিক হিটার থাকে তবে ঐ ঘরের মধ্যে উত্তাপ একমাত্র ঐ হিটার হইতেই ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উত্তাপের কেন্দ্র পাওয়ার হাউসের সঙ্গে এই ঘরের হিটারের সঙ্গে একটি তারের যোগাযোগ ও সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে ঐ পাওয়ার হাউসের উত্তাপ এই ঘরের হিটার হইতেই বিস্তীর্ণ হয়; সুতরাং এই ঘরের বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা হিটারের দুরত্বের অনুপাতেই হইবে।

আর একটি বিষয় এই যে, জাহান্নামের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুই প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রাখা আছে। একটি তব্‌কায়ে-নার—অগ্নিদগ্ধের শাস্তি; আর একটি তব্‌কায়ে-যমহরীর—ভীষণ ঠাণ্ডার শাস্তি। উভয়টি একত্রিত নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ের পরিমাণ এত বেশী যে, উহার লক্ষাংশের এক অংশও সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের হইতে পারে না, কিন্তু সেখানে মৃত্যু নাই, তাই শুধু যাতনাই হইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্তি হইতে থাকিবে।

أَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ النَّارِ۔

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দোযখ হইতে রক্ষা করুন।"

পাঠকবৃন্দ! এই হাদীছের ব্যাখ্যায় কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করা হইল বর্ত্তমান যুগের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া। নতুবা আল্লার ও আল্লার রসুলের বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য প্রশ্নোত্তর ও বিতর্কের পথ মঙ্গলজনক নয় এবং তর্কের দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে পূর্ণ সুরাহাও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা; প্রতিটি বস্তুর সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা একমাত্র তিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত। তিনি যখন স্বয়ং বা স্বীয় রসুলের মারফৎ কোন বস্তুর কোন অবস্থার খবর দেন, তখন উহা নিশ্চয় নিশ্চয় পূর্ণ সঠিক হইবে, বিন্দুমাত্রও নড়চড় হইবে না। কিন্তু উহা আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের আওতার বাহিরেও হইতে

পারে; আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের মাত্রা যে কি তাহা বলা বাহুল্য। আল্লার সৃষ্ট মামুলী কোন বস্তুর এমনকি আমরা নিজের সৃষ্টিরই কি রহস্য উদঘাটন করিতে পারিয়াছি? এ অবস্থায় আল্লার বর্ণিত সংবাদের উপর প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক সৃষ্টির অনধিকার চর্চ্চা করা ঐ নির্বোধ কাকের সমতুল্য নয় কি? যে কাক তাহার নগণ্য ঠোঁট দ্বারা মহাসাগরের গভীরতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে খাঁটি-ভাবে চিন্তা করিলে আল্লার সৃষ্টি রহস্যের মহাসাগরের সম্মুখে আমাদের বিবেক বুদ্ধি ঐ পাতি কাকের ঠোঁট হইতেও নগণ্য। তাই এরূপ বিষয়সমূহে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের খবরের বিশ্লেষণের প্রতি মাথা ঘামান উচিত নয়। হাঁ, এখানে শুধু একটি বিষয় ভালভাবে দেখিয়া লইতে হইবে যে, এই খবরটি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বলিয়া সঠিক ও প্রমাণিক সাব্যস্ত আছে কি না? এ বিষয়ে নিশ্চিত হইলে পর আর কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করা চলিবে না। যেমন, আবু হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্যকে আলোহীন সাদা বস্তুর ন্যায় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। হাসান বছরী (রঃ) প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্র-সূর্য্য কি পাপ করিয়াছে যে কারণে উহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে? আবু হোরায়রা (রাঃ) উত্তর করিলেন—

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ শুনাইলাম," অর্থাৎ হাদীছ শুনাইবার পর প্রশ্নের অবকাশ কি আছে? তখন হাছান বছরী (রঃ) আর কোন শব্দও করিলেন না। (মেশকাত)

زبان تازه کردن باقرار تو - نه انگیختن علت از کار تو -

কোন এক কবি বলিয়াছেন—তোমার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ বা হেতু জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার আমাদের নাই।

৩২৮। **হাদীছ ঃ**—আবু জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমরা কোন এক সফরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মোয়াজ্জেন জোহরের আজান দিতে চাহিলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দ্বিপ্রহরের উত্তাপ কম হওয়ার অপেক্ষা কর। কিছু সময় পর পুনরায় মোয়াজ্জেন আজান দিতে চাহিলে তিনি ঐরূপেই অপেক্ষা করিতে বলিলেন, এমনকি এত বিলম্ব করিলেন যে, টিলাসমূহের ছায়া দেখা যাইতে লাগিল। হযরত (দঃ) বলিলেন—অধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ, ঐ সময় নামায না পড়িয়া বিলম্ব করা চাই।

ব্যাখ্যা ঃ—অপ্রশস্ত দাঁড়ান বস্তু, যেমন—লাঠি, কঞ্চি, বাঁশ, থাম ইত্যাদির ছায়া সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইতে থাকে, কিন্তু উঁচু প্রশস্ত বস্তু যেমন—টিলা ইত্যাদির ছায়া সূর্য্য অধিক পরিমাণ নীচে না আসা পর্য্যন্ত দেখা যায় না, তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জোহরের নামায অপেক্ষা করিতে করিতে দেরী করিয়া পড়িলেন।

৩২৯। **হাদীছ ঃ**— আবু বরজা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ নামাযসমূহ কোন্ কোন্ সময়ে আদায় করিতেন? তিনি বলিলেন, জোহরের নামায পড়িতেন সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পর। আছরের নামায পড়িতেন এমন সময় যে, মদীনার শেষ প্রান্তের অধিবাসীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য সতেজ থাকিতে বাড়ী ফিরিতে পারিত। এশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশের পর পড়িতে ভাল বাসিতেন এবং তিনি এশার নামাযের পূর্ব্বে নিদ্রা যাওয়া বা এশার নামাযান্তে কথাবার্ত্তায় লিপ্ত হইয়া ঘুম নষ্ট করা খুবই নাপছন্দ করিতেন। (কারণ, প্রথম অবস্থায় এশার নামায ও দ্বিতীয় অবস্থায় ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।) ফজরের নামায এতটুকু আলো হওয়া অবস্থায় শেষ করিতেন যখন নিকটস্থ লোক চিনিতে পারা যাইত। হযরত (দঃ) এই নামাযে ষাট হইতে একশত পর্য্যন্ত কোরআনের আয়াত পাঠ করিতেন। (৭৮ পৃঃ)।

৩৩০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জোহরের নামায এতটুকু উত্তাপ বাকী থাকিতে পড়িতাম যে, মাটির উপর কাপড় রাখিয়া সেজদা করিতে হইত।

ওজর বশতঃ জোহরের নামায বিলম্বে পড়া

৩৩১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা মদীনায় থাকা অবস্থায়ই জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশার নামায এক সাথে পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ সেদিন শহরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় বার বার মসজিদে উপস্থিত হওয়া সকলের জন্য খুবই অসুবিধাজনক হইবে সন্দেহ নাই। আবার মসজিদের জমাত ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল নয়, তাই বোধ হয় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, জোহরের শেষ সময় মসজিদে উপস্থিত হইয়াছিলেন যেন জোহরের নামায আদায় করিলে পর সঙ্গে সঙ্গেই আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায় এবং ঐ সময় আছরের নামায পড়িলে প্রত্যেক নামাযই উহার-নির্দ্ধারিত সময়ের ভিতরেই আদায় হইল।

জোহরের নামায উহার শেষ ওয়াক্তে এবং আছরের নামায উহার আউয়াল ওয়াক্তে, অথচ দুই নামায একত্রে হইয়া গেল, বার বার মসজিদে আসিতে হইল না। মাগরের ও এশার নামাযের ব্যবস্থাও তদ্রূপই করিলেন। এই নামাযসমূহের উভয়ের নির্দ্ধারিত ওয়াক্ত যেহেতু পরস্পর সংলগ্ন তাই এরূপ করিতে কোন বাধা নাই। সফরের সময়ও বার বার ভ্রমণ স্থগিত রাখাতে অসুবিধার সৃষ্টি হইলে বা অন্য কোন সাময়িক ওজর বশতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিধান শরীয়তে রহিয়াছে।

আছরের নামায পড়ার সময়

৩৩২। হাদীছ ঃ—ওর্‌ওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই সময়ে আছর নামায পড়িয়া থাকিতেন তখন আমার ঘরের মেঝে রৌদ্র বিদ্যমান থাকিত অর্থাৎ রৌদ্র তথা হইতে উঠিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে। তখনও তথায় ছায়া আসে নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনা শরীফে কেবলা দক্ষিণ দিকে। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘর মসজিদের পূর্ব্ব পার্শ্বে ছিল; ঘর মসজিদের সহিত সংযুক্ত ছিল না, অবশ্য সন্নিকটেই ছিল। ঘরটি পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বানে ছিল এবং ঘরের দরওয়াজা ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে ছিল। সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া গেলে ঘর ও মসজিদের মধ্যস্থ উন্মুক্ত জায়গা-পথে ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিত এবং সেই রৌদ্র ঘরের মেঝে পতিত হইত। সূর্য্য অধিক নীচে নামিয়া গেলে রৌদ্র মেঝ হইতে উপরে উঠিয়া যাইত এবং মেঝে ঘরের দরওয়াজার সন্মুখস্থ আঙ্গিনায় কোন প্রকার বেষ্টনী থাকিয়া থাকিলে উহার কিম্বা সম্মুখস্থ মসজিদের ছায়া আসিয়া যাইত। আয়েশা (রাঃ) এখানে বুঝাইতে চাহেন যে, আমার ঘরের মেঝে হইতে রৌদ্র চলিয়া গিয়া তথায় ছায়া আসিয়া যায়—সূর্য্য এতদুর নীচে যাওয়ার পূর্ব্বেই হযরত (দঃ) আছরের নামায় পড়িয়া থাকিতেন।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে—বয়োঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি বয়সের বালকের হাত ছাদ পর্য্যন্ত পৌঁছে—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ শুধু এতটুকুই উঁচু ছিল বলিয়া প্রমাণিত। আর হযরতের মসজিদের ছাদ খেজুর পাতা বিছানো ছিল—উহাও বেশী উঁচু ছিল না, সুতরাং উক্ত ঘরের মেঝে রৌদ্র থাকার জন্য সূর্য্য অধিক উপরে হওয়ার প্রয়োজন হইত না।

৩৩৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের নামায এমন সময় পড়িতেন যখন সুর্য্যের কিরণ ও উহার তীক্ষ্ণতা পুরাপুরিই বজায়

* হাদীছের তরজমা ফতহুল-বারী ২—৩০ কেতাবের ব্যাখ্যা অনুপাতে করা হইল।

থাকিত এবং সূর্য্য এতটুকু উপরে থাকিত যে, মদীনার উর্দ্ধপ্রান্তবাসীগণ হযরতের সহিত আছর নামায পড়িয়া সূর্য্য আকাশের নিম্নস্তরে আসিবার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিতে পারিত। আনাছ (রাঃ) বলেন, উর্দ্ধপ্রান্তের কোন কোন বস্তি খাস মদীনা হইতে চার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

৩৩৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে) আছরের নামায পড়িয়া আমাদের কেহ কেহ সূর্য্য নিম্নস্তরে আসার পূর্ব্বেই ক্কোবা পৌঁছিতে পারিত। (ক্কোবা নগরীর ব্যবধান মদীনা হইতে প্রায় তিন মাইল)।

৩৩৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে) আছরের নামায পড়ার পর কোন কোন ব্যক্তি বনী-আম্র-বিন-আউফের বস্তীতে পৌঁছিয়া দেখিত তাঁহারা আছরের নামায পড়িতেছেন। (ঐ বস্তীই ক্কোবা নগরী।)

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত তিনটি হাদীছ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আছরের নামায সকাল সকাল—প্রথম ওয়াক্তেই পড়া হইত; কিন্তু হযরতের সময়েই মদীনার অন্যান্য মসজিদে, যেমন—মসজিদে বনী-হারেছা, মসজিদে বনী-আম্র ইত্যাদিতে একটু বিলম্বে—মধ্য ওয়াক্তে পড়া হইত। ইহার কারণ এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, হযরতের সঙ্গে দূর প্রান্তের বস্তীসমূহের লোক-জন নামায পড়িত এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহাদের বাড়ী ফিরার আবশ্যক হইত। তাছাড়া মহল্লা ও বস্তীসমূহের লোকগণ কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিত তাই তাহারা নিজ নিজ বস্তীর মসজিদে আছরের নামায একটু দেরীতে পড়িত। যেহেতু ইহার প্রতিও হযরত রসুলুল্লহে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ সমর্থনই ছিল, তাই সাধারণ লোকদের অবস্থানুপাতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আছর নামাযে এরূপ বিলম্ব কিছুতেই করিবে না যে, সূর্য্য এতটুকু নিস্তেজ হইয়া আসে যে, উহার উপর দৃষ্টি স্থাপন করা সহজ হয়।

৩৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তোমাদের জিন্দেগী ও বয়স পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মত ইহুদ ও নাছারাদের বয়সের তুলনায়—যেমন আছরের ওয়াক্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। (কিন্তু পরকালে তোমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক মর্ত্তবা লাভ করিবে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করতঃ বলেন—তোমাদের এবং ইহুদী নাছারাদের তুলনামূলক অবস্থা এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মজুরকে নির্দ্দিষ্ট মজুরী "এক কীরাত" (যেমন—এক টাকা) ধার্য্য

করিল, তাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কার্য্য করিল। তারপর অন্য আর একদল মজুর ডাকিল, তাহাদের জন্যও ঐ পরিমাণ মজুরী ধার্য্য করিল, তাহারা দুপুর হইতে আছরের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর তৃতীয় আর একদল মজুর ডাকিয়া তাহাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় দলের দ্বিগুণ মজুরী ধার্য্য করিয়া বলিল, তোমরা আছরের সময় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাজ করিবে। প্রথম দল ইহুদীদের দৃষ্টান্ত, যাহাদিগকে তৌরাত কেতাব দান করতঃ উহার আমল করিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল। (ইহুদীগণ তাহাদের পরবর্ত্তী সকলের চেয়ে বয়স বেশী পাইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অন্যের তুলনায় তাহারা কোন প্রকার অগ্রগামী হইবে না)। দ্বিতীয় দল নাছারাদের দৃষ্টান্ত; যাহাদিগকে ইঞ্জিল কেতাব দিয়া সেই অনুযায়ী আমল করিতে বলা হইয়াছিল। (তাহারা তাহাদের পরবর্ত্তী উম্মতের তুলনায় অধিক বয়স পাইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অগ্রগামী হইতে পারিবে না)। তৃতীয় দল তোমাদের (তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের) দৃষ্টান্ত; তাহাদিগকে কোরআন দেওয়া হইয়াছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করিতে বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল উম্মতের চেয়ে এই উম্মতের বয়স কম, কিন্তু কেয়ামতের দিন এই উম্মতগণ অন্য সকল উম্মত হইতে অগ্রগামী হইবে। অন্যান্য উম্মত হইতে আমল করার সময় কম পাইয়াও অধিক সওয়াব ও বড় বড় মর্ত্তবার অধিকারী হইবে। তখন ইহুদ ও নাছারাগণ আল্লার দরবারে অভিযোগ করিবে, হে প্রভু! আমরা (অধিক বয়স পাওয়ায়) কাজ বেশী করিয়াছি, মজুরী কম পাইয়াছি, ইহারা কাজ কম করিয়াছে মজুরী বেশী পাইয়াছে—আমাদের দ্বিগুণ, ইহার কারণ কি? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাদের নির্দ্ধারিত মজুরী হইতে কি তোমাদিগকে একটুকুও কম দিয়াছি? তাহারা উত্তর করিবে—না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই তৃতীয় দলকে বেশী দেওয়া—ইহা আমার মেহেরবানী; যাহাকে আমার ইচ্ছা হয় দিয়া থাকি। (ইহাতে অভিযোগের অধিকার নাই)।

ব্যাখ্যা ঃ— এই হাদীছের উদ্দেশ্য হদরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের ফজিলত বর্ণনা করা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি অন্য বিষয়েরও মীমাংসা হয়। সেই হিসাবেই এই হাদীছটি এখানে নামাযের সময় নির্দ্ধারণ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহুদীগণ যাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে, তাহাদের কার্য্য-সময় তৃতীয় দলের কার্য্য-সময় (আছর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) হইতে স্পষ্টতঃই বেশী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দল নাছারা, তাহাদের কার্য্য-সময় (জোহর হইতে আছর পর্য্যন্ত) তৃতীয় দলের কার্য্য-সময় হইতে বেশী, এই অভিযোগ

সত্য ও সঠিক হওয়া নির্ভর করে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত হইতে স্পষ্টরূপে বড় হওয়ার উপর—এমন বড় যাহা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে এবং একেবারে নগণ্য না হয়, নতুবা একটা অভিযোগ খাড়া করা যাইতে পারে না। তাই এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত হইতে বড়, আছরের ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্ত হইতে ছোট। এতদ্দৃষ্টে আবু হানিফা (রঃ) এই ওয়াক্তদ্বয়ের সীমা এরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যাহাতে আছরের ওয়াক্ত সর্ব্বদা ছোট বলিয়াই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

৩৩৭। **হাদীছ ঃ**—আবু উমামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সহিত জোহর নামায পড়িলাম। তারপর আমরা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাতে পৌঁছিলাম। আমরা তাঁহাকে আছর নামায পড়িতে পাইলাম; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চাচা মিঞা। আপনি এইটা কোন নামায পড়িলেন? তিনি বলিলেন, আছর নামায; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামমের সহিত যে, আমরা আছর নামায পড়িতাম তাহা এইরূপ সময়েই ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) তখন খলীফা হন নাই, বরং তিনি উমাইয়্যা গোত্রীয় শাসকের গভর্ণর ছিলেন এবং সময় সময় নামাযের জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন। যেমন, ৩২০নং হাদীছের ঘটনায় তিনি একদিন আছরের নামায বিলম্বে পড়ায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় তিনি জোহরের নামায তদ্রূপ বিলম্বে পড়িয়াছিলেন, ফলে আছর নামাযের ওয়াক্তের ব্যবধান খুব কমই ছিল; অল্প সময়ের মধ্যেই আছর নামাযের উত্তম সময় উপস্থিত হইয়া গেল, তাই আনাছ (রাঃ) নিজ গৃহে আছর নামায পড়িয়া নিলেন। কারণ, মসজিদের ইমাম শাসনর্ত্তা জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন।

আছরের নামায ছুটিয়া যাওয়ার ক্ষতি কত বড়!

৩৩৮। **হাদীছ ঃ**—عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اَلَّذِىْ تَفُوْتُهٗ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهٗ وَمَالَهٗ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তির আছরের নামায (কোন কারণ বশতঃ) কাজা হইয়া গিয়াছে তাহার এত বড় ক্ষতি হইয়াছে যেন তাহার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামায ছাড়িয়া দেওয়ার গোনাহ কত বড়!

৩৩৯। **হাদীছ** ঃ—عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قال من ترك صلوة العصر فقد حبط عمله ....

অর্থ—আবুল মলীহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বোরায়দা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে এক জেহাদে ছিলাম। মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল; তিনি বলিলেন, সতর্কতামূলকভাবে আছরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেও। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আছরের নামায ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামাযের ফজিলত

৩৪০। **হাদীছ** ঃ—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম। একদা পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হযরত (দঃ) উপস্থিত ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা (বেহেশতে যাইয়া) আল্লাহ তায়ালাকে এরূপ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে, যেমন এই পুর্ণিমার চাঁদকে দেখিতেছ—কোন প্রকার ভীড় ও কোলাহল ছাড়াই দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই নেয়ামত হাসিলের জন্য সূর্য্য উদয়ের ও অস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী (ফজর ও আছর) নামাযদ্বয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩৪১। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—দুনিয়ার কার্য্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দুইটি দল—রাত্রিকালের জন্য ও দিনের জন্য একের পর এক আসিয়া থাকেন। উভয় দলই ফজর ও আছরের সময় দুনিয়ার বুকে একত্রিত হন। নূতন দল দুনিয়ার উপর থাকেন, পুরাতন দল আল্লাহ তায়ালার নিকট চলিয়া যান। আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ তাহা সত্ত্বেও তিনি ঐ ফেরেশতা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বন্দাদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তর করিয়া থাকেন—আমরা যাইয়া তাহাদিগকে নামাযরত পাইয়াছিলাম, ফিরিয়া আসার সময় নামাযরতই দেখিয়া আসিয়াছি। (কারণ একদল ফজরের সময় আসিয়াছেন এবং আছরের সময় ফিরিয়াছেন। দ্বিতীয় দল আছরের সময় আসিয়াছেন, ফজরের সময় ফিরিয়াছেন।)

সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছর নামাযের ওয়াক্ত অল্প পাইলে?

৩৪২। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্ব্বে আছরের নামাযের

এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ নামায পড়িবে এবং যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ ফজরের নামায আদায় করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছটি দ্বারা দুইটি মছআলাহ প্রতীয়মান হয়। প্রথম মছআলাহ—যে ব্যক্তির উপর নামায ফরজ ছিল না ; সে নামায ফরজ হওয়ার উপযোগী এমন সময় হইয়াছে যখন সূর্যাস্তের বা উদয়ের সামান্য সময় বাকি আছে। যেমন—নাবালেগ এমন সময় বালেগ হইয়াছে বা ঋতুবতী এমন সময় পবিত্র হইয়াছে, পাগল এমন সময় ভাল হইয়াছে, কাফের এই সময় মোসলমান হইয়াছে এমতাবস্থায় তাহার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হইবে কি না ? এই হাদীছে প্রমাণ হইল যে ফরজ হইবে। এই মছআলাহ প্রত্যেক নামাযের বেলায়ই প্রযোজ্য, ৩৫৬ নম্বর হাদীছে প্রমাণিত হইবে। দ্বিতীয় মছআলাহ—যে ব্যক্তির আছর ও ফজর নামায কোন কারণে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে, এখন সূর্য্যাস্ত বা উদয়ের মাত্র সামান্য সময় বাকি আছে, যেমন—কাহারও এই সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল বা নামাযের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এখন এই সময় স্মরণ হইল বা অলসতা করিয়াছিল এখন সে সতর্ক হইল। এমতাবস্থায় সে নামায আরম্ভ করিয়া দিবে, না সূর্য্যাস্ত বা উদয়ের পরে কাজা পড়িবে ? এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তখনই নামায আরম্ভ করিয়া পূর্ণ নামায আদায় করিবে। অবশ্য যেহেতু মশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় নামায ছহীহ হয় না সে জন্য সতর্কতামূলকরূপে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের পর ঐ নামায পুনরায় কাযাও পড়িয়া লইবে। (এ'লাউছ-ছুনান)

মাগরেবের নামাযের ওয়াক্ত

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরেব এবং এশার নামায একত্রে পড়িতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশা এই দুই জোড়া নামাযের ওয়াক্ত পরস্পর লাগালাগি ; কোন কোন ইমামের মতে ছফর, রোগ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে উহার প্রতি দুই ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তে একত্রে পড়িয়া নেওয়া জায়েয আছে। আ'তা রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাব সেইরূপ। হানফী মজহাব মতে উভয় নামাযকে একত্রিত করিবে বটে, কিন্তু এক ওয়াক্তে নয়, প্রত্যেক নামাযকে বস্তুতঃ উহার ওয়াক্তের গণ্ডির ভিতরই পড়িবে—এক নামায উহার ওয়াক্তের সর্ব্বশেষ অংশে এবং দ্বিতীয় নামায উহার ওয়াক্তের সর্ব্ব প্রথম অংশে। যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি নামাযের প্রস্তুতি নিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় ; এমতাবস্থায় দুই দুই বার যাতনা ভোগ না করিয়া সে এরূপ করিতে পারে যে, জোহর বা মাগরেব উহার সর্ব্বশেষ ওয়াক্তে পড়িবে যেন নামায শেষ করিলে অনতিবিলম্বেই আছর বা এশার ওয়াক্ত হয়

এবং উহা পড়িয়া নেয়। এইভাবে এক প্রস্তুতিতেই দুই নামায একত্রে পড়িবে, কিন্তু প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্তে ; যদিও সাধারণ অবস্থায় উহা উত্তম ওয়াক্ত নহে।

৩৪৩। **হাদীছ ঃ**—রাফে ইবনে-খাদিজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মাগরেবের নামায পড়িয়া ফিরিবার সময়ও চতুর্দ্দিক এতটুকু আলোকিত থাকিত যে, কেহ তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্যস্থল স্পষ্টই দেখা যাইত।

৩৪৪। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায দুপুরের সময় পড়িতেন, আছরের নামায সূর্য্য নিস্তেজ হইবার পূর্ব্বে পড়িতেন, মাগরেবের নামায সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, এশার নামায কখনও একটু বিলম্বে পড়িতেন, কখনও সত্বরই পড়িয়া লইতেন ; যখন দেখিতেন, মুছল্লিগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছে তখন বিলম্ব না করিয়া এশার নামায পড়িয়া লইতেন ; যখন তাহারা বিলম্বে আসিত তখন দেরীতেই পড়িতেন। ফজরের নামায একটু অন্ধকার থাকিতেই পড়িতেন।

৩৪৫। **হাদীছ ঃ**—ছালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মাগরেবের নামায আরম্ভ করিতাম সূর্য্যাস্তের সঙ্গেসঙ্গেই।

মাগরেবের নামাযকে এশার নামায বলিবে না

৩৪৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্ক করিয়াছেন, মাগরেবের নামাযের নামে গ্রাম্য কাফেরদের ভাষা যেন তোমাদের উপর প্রবল না হইতে পারে, তাহারা মাগরেবকে এশা বলে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়টি স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হইতে পারে, কিন্তু পক্ষান্তরে এখানে একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোসলমান জাতি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে তাহাদের নিজস্ব তামাদ্দুন, তাহজীব বৈশিষ্ট্য সব কিছু আছে। তাহাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও সমাজগত সব বিষয়সমূহই স্বতন্ত্র, এমনকি কথাবার্ত্তার ভাষা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। মোসলমানদের নামসমূহ অন্য জাতি হইতে ভিন্ন, এমনকি শুধু মানুষের নামই নয়, বস্তুসমূহের নামেও ঐ স্বতন্ত্রতা অতি স্পষ্ট ও ব্যাপক। প্রত্যেকটি মোসলমানের পক্ষে জাতিত্ববোধ অপরিহার্য্য এবং এই জাতিত্ববোধের প্রথম সিঁড়ি হইল এই যে, মোসলমানদের জন্য (বিশেষতঃ কোরআন-হাদীছের ইঙ্গিতে) যাহা প্রচলিত আছে উহা যত সাধারণই মনে হউক না কেন, কখনও উহা পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় প্রথা অবলম্বন করিবে না। যেমন, এই হাদীছে এবং মোসলেম শরীফে উল্লিখিত এই হাদীছেরই দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন—মোসলমানগণ সূর্য্যাস্তের পরের নামাযকে মাগরেব ও তার পরের নামাযকে এশা

বলিয়া থাকে। কোরআন শরীফেও এই দ্বিতীয় নামাযটি "এশা" নামেই উল্লেখ আছে, কিন্তু আরবের গ্রাম্য কাফেরদের ভাষায় মাগরেবকে এশা এবং এশাকে "আতামাহ্" বলা হইত (মোসলেম শরীফ)। হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, খবরদার! বিজাতীয়দের ঐ নাম যেন তোমাদের মধ্যে প্রচলিত না হইতে পারে।↑

শরীয়ত সামান্য বিষয়েও জাতিত্ব-বোধের শিক্ষা দেয় এবং আমাদেরই এই সমস্ত অমূল্য আদর্শসমূহ দ্বারা বিজাতীয়গণ কত উন্নতি করিতেছে। আর আমরা নিজেদের আদর্শ হারাইয়া বিজাতীদের প্রতি তাকাইয়া আছি। বর্ত্তমান যমানায় "জল, লবণ" ইত্যাদি বহু বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা এই হাদীছ অনুযায়ী অবাঞ্ছনীয় গণ্য হইবে।

এশার নামাযের ফজিলত

৩৪৭। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায পড়িতে বিলম্ব করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়া গেল, এখনও তিনি মসজিদে যান না, তাই ওমর (রাঃ) আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! শিশু ও নারীগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ এশার নামায আর কত বিলম্ব করিবেন?) তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিলেন এবং (এত রাত্র পর্য্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষারত মুছল্লিগণকে ধন্যবাদ স্বরূপ) বলিলেন, তোমরা (মুষ্টিমেয় কয়েকজন) ব্যতীত দুনিয়ার বুকে এই সময় নামাযের অপেক্ষাকারী আর কেহ নাই; এই ফজিলতের অধিকারী শুধু তোমরাই। কারণ, (একমাত্র মোসলমানই নামায পড়িবে এবং) তখন মদীনার বাহিরে ইসলাম প্রসারিত হয় নাই (আর মদীনার অন্য সব মসজিদে পূর্ব্বেই নামায শেষ হইয়াছে।)

৩৪৮। হাদীছ:—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাহাজ যোগে মদীনায় আসিয়াছিলাম নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতাম। তাই আমরা দুই একজন করিয়া পালাক্রমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির থাকিতাম। একদা আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী তাঁহার খেদমতে পৌঁছিলাম, নবী (দঃ) কোন কাজে আবদ্ধ ছিলেন, তাই এশার নামায পড়িতে বিলম্ব হইল। নবী (দঃ) রাত্র অধিক হইলে পর মসজিদে আসিলেন এবং নামাযান্তে সকলকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ গ্রহণ কর; তোমাদের উপর আল্লার অতি বড় নেয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত অন্য

↑ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এশার নামাযকে "আতামাহ" বলার অবকাশ দেখাইয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, উহা হারাম পর্য্যায়ের নিষিদ্ধ নহে।

কোন উম্মত এই সময় নামায পড়ে নাই। (এখনও দুনিয়ার বুকে এই সময় কেহ কোথাও নামায পড়িতেছে না)। আবু মুছা (রাঃ) বলেন, আমরা রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তি শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ—সেখ সা'দী (রঃ) খুবই সুন্দর পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন—

منت منه که خدمت سلطان همی کنی -

منت شناس ازو که بخدمت بداشتت -

"গর্ব করিও না যে, তুমি বাদশার খেদমতের সুযোগ পাইয়াছ। ইহা তাঁহারই দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তোমাকে তাঁহার খেদমতের সুযোগ দান করিয়াছেন।"

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এশার পূর্ব্বে নিদ্রা যাইবে না

৩৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু বরজা(রাঃ) বলিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) এশার নামাযের পূর্ব্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথাবার্ত্তায় লিপ্ত হওয়া অতিশয় নাপছন্দ করিতেন।

ঘুমের ভারে বাধ্য হইলে এশার পূর্ব্বে ঘুমাইতে পারে

ঐরূপ অবস্থায় এশার নামাযের পুর্ব্বে ঘুমাইতে পারে, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের ভিতরে নিদ্রা ভঙ্গের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐরূপ অবস্থায় এশার পূর্ব্বে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য লোক নিয়োগ করিতেন—এই ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনে এশার পূর্ব্বে নিদ্রা যাইতে তিনি দ্বিধা করিতেন না।

৩৫০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রস্থলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ প্রয়োজনে লিপ্ত থাকায় এশার নামাযে অনেক বিলম্ব করিলেন। এমনকি আমরা বসা অবস্থায় মসজিদে ঘুমাইয়া পড়িলাম, একবার জাগিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। তারপর জাগ্রত হইলে হযরত নবী (দঃ) নামাযের জন্য আসিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন এই সময় তোমরা ভিন্ন কেহ ভূপৃষ্ঠে নামাযের অপেক্ষারতঃ নাই। (অর্থাৎ যদিও তোমাদের কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমরা এমন একটি ফজিলত পাইয়াছ যাহার একক অধিকারী তোমরাই।)

৩৫১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) একদা এশার নামাযে অধিক বিলম্ব করিলেন ; (মসজিদে উপস্থিত) লোকেরা (বসা অবস্থায়) বার বার ঘুমাইতে ও জাগ্রত হইতে লাগিল। তখন ওমর (রাঃ) যাইয়া হযরত (দঃ)কে নামাযের কথা বলিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) তখন গোছল করিয়া আসিতে ছিলেন ; তাঁহার মাথা হইতে পানি ঝড়িতে ছিল। তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের কষ্ট হইবে এই আশঙ্কা না হইলে এশার নামায এই সময়েই পড়ার আদেশ করিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এশার নামাযের উত্তম সময় বিলম্বে তথা রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশের পরেই হইত, যদি নবী (দঃ) সেই আদেশ করিতেন। কিন্তু হযরত (দঃ) উম্মতের কষ্টের লক্ষ্য করিয়া সেই আদেশ করেন নাই। হযরতের এবং ছাহাবীগণের আমল ও নীতি ইহাই ছিল যে, তাঁহারা রাত্রের তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িতেন।

৩৪৭নং হাদীছ বর্ণনান্তে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন—

وكانوا يصلون فيما ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول

"নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণ পশ্চিম আকাশের শুভ্রতা বিদুরিত হওয়ার পর রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায পড়িয়া থাকিতেন।" সুতরাং এশার নামাযের উত্তম ওয়াক্ত তৃতীয়াংশের মধ্যেই থাকিবে। উহার পরের সময় এশার নামায পড়া নবী (দঃ) কর্ত্তৃকই পরিত্যক্ত। (৮১ পৃঃ)

নেছায়ী শরীফে আছে, হযরত নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা রাত্রের তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িবে।

এশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত থাকে*

৩৫২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়িলেন এবং নামাযান্তে বলিলেন, অন্যান্য বস্তীর লোকজন নামায পড়িয়াছে, তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ। স্মরণ রাখিও, যে পর্য্যন্ত তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়াছ সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে নামাযরত গণ্য করা হইবে।

ফজরের নামাযের ফজিলত

৩৫৩। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা সময়ের (আছর ও ফজর) নামাযদ্বয় আদায়ে অভ্যস্ত হইবে, সে বেহেশতী হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফরমান শিরোধার্য্য। কারণ, সাধারণতঃ দেখিবেন, যে ব্যক্তি এই নামাযদ্বয়ে অভ্যস্ত হয়, সে অন্য তিন ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত নিশ্চয় হয় এবং যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে নামাযে অভ্যস্ত হয়, সে অন্যান্য দিক দিয়াও শরীয়ত অনুসারী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ○

"নামায মানুষকে অপকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম হইতে বিরত রাখার সহায়ক।" (২১ পাঃ ২রুঃ)

* মধ্যরাত্রের পর ছোবহে-ছাদেক পর্য্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু উহা মকরুহ ওয়াক্ত।

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

৩৫৪। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহ্‌রী খাওয়ার একটু পরেই ফজরের নামাযে দাঁড়াইয়া গেলাম ; সেহ্‌রী ও নামাযের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান ছিল।

৩৫৫। হাদীছ ঃ—ছাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের বাড়ী হইতে সেহ্‌রী খাইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামায পড়িতে হইলে অতি দ্রুতবেগে আসিতে হইত।

(এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ২৪৭ নম্বরে দেখুন)

যে কোন নামাযের এক রাকাত পড়ার মত সময় পাইলেই ঐ নামায পূর্ণরূপে ফরজ হইয়া যাইবে

৩৫৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কোন ব্যক্তি যে কোন নামাযের মাত্র এক রাকাত পড়ার সময় পাইলেই ঐ নামায তাহার উপর ফজর হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের ব্যাখ্যার জন্য ৩৪২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন।

ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য্য পূর্ণ উদিত হওয়ার পূর্ব্বে নফল নামায পড়া নিষেধ

৩৫৭। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধ করিয়াছেন—ফজরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ উদিত না হয় এবং আছরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্ত না যায়।

৩৫৮। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন সূর্য্যের কিনারা উদিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ পূর্ণ উদিত না হয় এবং যখন সূর্য্যের কিনারা অস্ত যাইতে আরম্ভ করে তখনও নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্তমিত না হইয়া যায়।

৩৫৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দুই প্রকার পরিধান এবং দুই সময়ের নামায নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত এবং আছরের নামাযের পর সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। দুই হাত আবদ্ধ করিয়া চাদরে আবৃত হইতে এবং লুঙ্গি ইত্যাদি

পরিধান করিয়া হাঁটুদ্বয়কে খাড়া করিয়া এরূপ অসাবধানভাবে বসা যে, তলদেশের কাপড় নীচে পড়িয়া ছতর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এরূপ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। একে অন্যের প্রতি বিক্রয় দ্রব্য নিক্ষেপ করা বা একে অন্যকে ছোঁয়ার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আসিবে)।

আছরের নামায পড়ার পর নফল পড়া নিষিদ্ধ

৩৬০। **হাদীছ ঃ**—মোয়াবিয়া (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন একটি নামায পড়িয়া থাক যাহা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পড়িতে দেখি নাই, বরং তিনি উহা পড়িতে নিষেধ করিতেন—আছরের পরে দুই রাকাত নফল নামায।

৩৬১। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—ফজর নামাযের পর সূর্য্য উপরে উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং আছর নামাযের পর সূর্য্য অস্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ।

সূর্য্য উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ

৩৬২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য উদয়ের সময় তোমরা নামাযের জন্য উদ্যত হইও না এবং অস্তের সময়ও নামাযের জন্য উদ্যত হইও না।

আছর নামাযের পর কাযা নামায পড়া জায়েয

৩৬৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি নামায কখনও ছাড়িতেন না। প্রকাশ্যে বা গোপনে অবশ্যই উহা পড়িতেন—ফজরের পূর্ব্বে দুই রাকাত ও আছরের পরে দুই রাকাত।*

৩৬৪। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে দিনই আছরের পর আমার নিকট আসিতেন ২ রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আছরের নামায পড়ার পরে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ বলিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে—যেমন পূর্ব্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীছদ্বয় হইতে বুঝা যায়, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ইহার মীমাংসা করিবার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

* অবশ্য আছরের পরের দুই রাকাত সর্ব্বদা গোপনেই পড়িতেন ; যেমন ৩৬৬নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ)ই বলিয়াছেন। উহা সকলে দেখিত না—যেরূপ ৩৬০নং হাদীছে উল্লেখ আছে।

প্রথমতঃ আছরের পর দুই রাকাত নামায হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাজা স্বরূপ পড়িতেন—জোহরের ফরজ পড়ার পর দুই রাকাত ছুন্নত পড়া হয়, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক বিশেষ কর্ম্মব্যস্ততার দরুন ঐ ছুন্নত পড়িতে পারেন নাই, তাই উহা আছরের পর কাজা স্বরূপ পড়িয়াছেন। তারপর অবশ্য তিনি উহা সর্ব্বদাই পড়িতে থাকেন, কিন্তু উহার প্রথম সুচনা সুন্নতের কাজা স্বরূপই হইয়াছিল।* দ্বিতীয়তঃ—যে কোন কারণেই হউক আছরের পর সর্ব্বদা এই দুই রাকাত নামায পড়াকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, অন্য কেহ ইহা অবলম্বন করুক তাহা তিনি চাহিতেন না, বরং নিষেধ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীছদ্বয়ে উক্ত বিষয় দুইটির বয়ান রহিয়াছে।

৩৬৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ), মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীত্রয় কোরায়েব নামক খাদেমকে এই বলিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইলেন যে, তাঁহার নিকট আমাদের সালাম বলিবে এবং আছরের পর দুই রাকাত নামাযের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে যে, শুনিতে পাইলাম আপনি ঐ নামায পড়িয়া থাকেন, অথচ আমাদের নিকট এরূপ প্রমাণ পোঁছিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমরের সহিত একমত হইয়া আমিও লোকদিগকে এই নামায হইতে বিরত রাখার জন্য শাস্তি দিয়া থাকিতাম। (তাই এবিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান চালান দরকার মনে করিলাম।) কোরায়েব বলেন—আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং ঐ ছাহাবীত্রয়ের কথার পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে পৌঁছাইলাম। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টি বিবি উম্মে-ছালামার নিকট জিজ্ঞাসা কর; (তিনিই উহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত আছেন।) কোরায়েব ছাহাবীত্রয়ের অনুমতি লইয়া উম্মে-ছালামাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই নামায হইতে নিষেধ করিতে শুনিতাম, একদা তাঁহাকে আছরের পর এই নামায পড়িতে দেখিলাম। তখন আমি কর্ত্তব্যব্যস্ত থাকায় আমার গৃহকর্ম্মীনীর মারফত জিজ্ঞাসা করাইলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনাকে এই নামায হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, এখন আপনাকে উহা পড়িতে দেখি। নামাযান্তে হযরত (দঃ)

---

* আছরের নামাযের পর এরূপ সুন্নতের কাজা অন্য কেহ পড়িবে তাহা এক হাদীছে হযরত (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ছৌমে-বেছাল তথা দিবারাত্র মিলাইয়া একটানা একাধিক দিনের রোযা স্বয়ং হযরত (দঃ) রাখিতেন, অন্যের জন্য উহা নিষেধ করিয়াছেন, রাখিলে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ফরজ কাজা নামায আছরের নামাযের পর সকলেই পড়িতে পারে।

আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আছরের পর দুই রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ? ঘটনা এই যে, আবদুল কায়েছ গোত্রের একদল লোক আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে লিপ্ততায় পরিস্থিতি এমনই হইয়াছিল যে, জোহরের ফরজান্তে দুই রাকাত সুন্নত পড়িতে পারি নাই; ইহা সেই দুই রাকাত নামায।

৩৬৬। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আছরের পর) দুই রাকাত নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও ছাড়েন নাই, সর্ব্বদাই তিনি উহা পড়িতেন; কিন্তু মসজিদে কখনও পড়িতেন না—এই আশঙ্কায় যে তাঁহার উম্মত একটি অতিরিক্ত কষ্টে পড়িয়া যাইবে। তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় উম্মতের কষ্ট লাঘব করার প্রতি তৎপর থাকিতেন।

একদল লোকের নামায কাজা হইলে আজান ও জমাতের সহিত ঐ কাজা নামায পড়িতে পারে

৩৬৭। **হাদীছ**ঃ—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক ছফরে ছিলাম। একদা সমস্ত রাত্র ভ্রমণ করতঃ ক্লান্ত হইয়া শেষ রাত্রে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশ্রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হযরত বলিলেন, এখন আরাম করিলে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা আছে। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, (নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কায় সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করার প্রয়োজন নাই;) আপনারা আরাম করুন, (আমি বসিয়া থাকি;) নামাযের সময় আপনাদিগকে জাগাইয়া দিব। তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেলাল (রাঃ) ছোবহে-সাদেকের অপেক্ষায় পূর্ব্বদিকে তাকাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার চক্ষু বুজিয়া গেল, তিনিও নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। (সকলেই নিদ্রামগ্ন, নামাযের সময় চলিয়া গেল।) যখন সূর্য্য উদিত হইতে ছিল, তখন সর্ব্বপ্রথম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রা ভাঙ্গিলে তিনি বেলালকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার কর্ত্তব্য তুমি কি করিলে? বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নিদ্রা আমার উপর জীবনে কখনও চাপে নাই। আমাদের সকলের আত্মাই নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হাতে চলিয়া গিয়াছিল* যখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে পুনরায় উহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ—নামাযের জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল, এমতাবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও অনিচ্ছাকৃত নিদ্রা "ওজর" রূপেই গণ্য হইবে।) তারপর

* মানুষের দেহের সঙ্গে তাহার রূহের দুই প্রকার সংযোগ আছে—একটি দ্বারা মানুষ জীবিত থাকে, মৃত্যুর সময় উহা বিচ্ছিন্ন হয়; অপরটি দ্বারা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইয়া থাকে, নিদ্রাবস্থায় উহাই ছিন্ন হয় এবং জাগ্রত হইলে উহা পুনঃ স্থাপিত হয়।

রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে বলিলেন, এখানে শয়তানের আছর আছে, যদ্দরুন আমরা নামাযের ওয়াক্ত হইতে মাহরুম হইয়াছি। এখান হইতে সত্বর অন্যত্র যাইয়া সকলে অজু করিলে পর হযরত (দঃ) বলিলেন, হে বেলাল! লোকদিগকে একত্র করার জন্য আজান দাও। তারপর যখন সূর্য্য সম্পুর্ণরূপে উদিত হইয়া লাল বর্ণ চলিয়া গেল তখন ঐ কাজা নামায সকলে জামাতে পড়িলেন।

৩৬৮। **ছাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) খন্দকের জেহাদরত অবস্থায় একদিন বিষণ্ণ মনে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাফেরদের প্রতি ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রস্থলুল্লাহ (দঃ)। অদ্য (কাফের শত্রুদলের প্রতিরোধে লিপ্ত থাকায়) আমি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আছরের নামায পড়ার স্থযোগ করিতে পারি নাই। রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমরাও পড়িতে পারি নাই। সেমতে সূর্য্যাস্তের পরে আমরা সকলে ময়দানে একত্রিত হইয়া অজু করিলাম এবং প্রথমে (কাজা) আছরের নামায পড়িলার, তারপর মাগরেবের নামায আদায় করিলাম।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তির ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাজা হইলে ঐ কাজা নামায যথাক্রমে প্রথমে পড়িয়া তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়িতে হইবে; অন্যথায় উপস্থিত ওয়াক্তের নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য যদি কারণ বশতঃ উপস্থিত নামায এমন সময় পড়িতে উদ্যত হয় যখন কাজা নামায পড়িতে গেলে উপস্থিত নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবে তবে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত নামাযই প্রথমে পড়িবে। কাজা নামাযের কথা ভুলিয়া উপস্থিত নামায পড়িলে তাহাও শুদ্ধ হইবে। ছয় ওয়াক্ত বা ততধিক নামায কাজা হইলে সে ক্ষেত্রে এই বাধ্য-বাধকতা নাই। উক্ত হাদীছের উপরই বোখারী (রঃ) এই মছআলাহটিও উল্লেখ করিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ— কতিপয় নামায কাজা হইলে সেই নামায আদায় করিতে উহাদের মধ্যেও তরতীব তথা আগ-পাছের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আগের ওয়াক্ত আগে এবং পরের ওয়াক্ত পরে পড়িতে হইবে অন্যথায় সেই আদায় শুদ্ধ হইবে না।

অবশ্য এই মছআলাহ সর্ব্বমোট ছয় ওয়াক্ত কাজা পর্য্যন্ত। যদি কাজার সংখ্যা ছয় ওয়াক্তের অধিক হয় তবে সে ক্ষেত্রে ঐ বাধ্য বাধকতা থাকে না।

নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই নামায পড়িবে

৩৬৯। **ছাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায ভুলিয়া যায়, স্মরণ হওয়া মাত্রই উহা আদায় করিবে। স্মরণ হওয়া মাত্রই উহা আদায় না করিলে ঐ গোনাহ মাফ করাইবার কোন উপায় নাই।

মছআলাহ ঃ—কোন নামায ছুটিয়া গেলে তওবা-এস্তেগফার করতঃ নামায কাজা পড়িবে—একাধিক বার ঐ কাজা পড়িতে হইবে না। ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, এক ওয়াক্ত নামায দশ বৎসর কাজা থাকিয়া গেলেও সেই এক ওয়াক্তের কাজা একবারই পড়িতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– ৩৪৯নং হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) মছআলাহ লিখিয়াছেন যে, এশার নামাযের পর গল্প করা ও কথাবার্ত্তায় সময় ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অতঃপর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, দ্বীন শিক্ষার কথাবার্ত্তায় এবং ওয়াজ-নছীহতের কথাবার্ত্তায় লিপ্ততা এশার নামাযের পরে জায়েয আছে। নিম্নের পরিচ্ছেদেও ঐরূপ একটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন।

এশার পরে পরিবারবর্গ বা মেহমানের সহিত প্রয়োজনীয় কথা বলা

৩৭০। **হাদীছ ঃ**—আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক "আছহাবে-ছোফ্‌ফাহ"* নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত গরীব ও অসহায় ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা সকলের প্রতি এই আহ্বান জানাইলেন—যাহার ঘরে দুই জনের খানা আছে সে (আছহাবে ছোফ্‌ফাহ হইতে) একজনকে সঙ্গে লইয়া যাও। যাহার নিকট দুইজনের ব্যবস্থা আছে, সে তৃতীয়জনকে এবং যাহার নিকট তিনজনের ব্যবস্থা আছে, সে চতুর্থজনকে এইরূপে এক একজন করিয়া লইয়া যাও এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) একাই দশজনকে লইয়া গেলেন। (আবদুর রহমান বলেন,) আমাদের ঘরে আমি, আমার স্ত্রী, আমার মা এবং বাবা আবু বকর ছিলেন, এবং সকলের জন্য একটি মাত্র চাকর ছিল। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়া) আমার পিতাও কয়েকজন মেহমান আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং আমাকে হুকুম করিলেন—তুমি এই মেহমানদের খেদমতগোজারী করিও, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাইতেছি; আমার জন্য কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া মেহমানদের খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিও। এই বলিয়া আবু বকর (রাঃ) চলিয়া

---

* "ছোফ্‌ফাহ" শব্দের অর্থ সংলগ্ন বারান্দা। এই ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের জন্য বাপ-দাদার ধন-সম্পত্তি সব কিছু ত্যাগ করতঃ এমন নিঃসহায় নিসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, মসজিদের বারান্দা ভিন্ন তাঁহাদের বাসস্থানের আর কোন ব্যবস্থা ছিল না; সে জন্যই তাঁহাদিগকে আছহাবে-ছোফ্‌ফাহ বলা হইত। এমনকি তাঁহাদের পরনের কাপড়টুকু পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে জুটিয়া উঠিত না। তাঁহারা দ্বীনের এল্‌ম শিক্ষা করার জন্য সর্ব্বদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারেই থাকিতেন, অবসর সময় রাত্রিকালে এবাদতে কাটাইতেন, দিনের বেলা বন-জঙ্গল হইতে লাক্‌ড়ী কুড়াইতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন।

গেলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনেক সময় কাটাইলেন, এমনকি সেখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করিয়া এশার নামায পড়িলেন। তারপর যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘুমের সময় হইল তখন আবু বকর (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন। এদিকে আমি পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ী মেহমানদের খানা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীওয়ালা—মেজবান কোথায় ? আমি অনুরোধ করিলাম আপনারা খাওয়া-দাওয়া করিয়া লউন। তাঁহারা বলিলেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমরা খাইব না। আমি বলিলাম, তিনি আসিয়া যদি দেখেন, আপনাদের খাওয়া হয় নাই তবে তিনি আমার প্রতি অত্যধিক রাগান্বিত হইবেন। এত করিয়া বলা সত্ত্বেও তাঁহারা খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) যখন বাড়ী আসিলেন তখন আমি ভয়ে পালাইয়া রহিলাম। আমার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, মেহমানদিগকে ছাড়িয়া এত রাত্র কিরূপে কাটাইলেন ? তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও কি মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া হয় নাই ? মা বলিলেন, আমরা খাবার দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা খাইতে সম্মত হন নাই। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আমাকে পাজী বলিয়া ডাকিলেন এবং নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি চুপ করিয়া পলাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে কয়েকবার ডাকিয়া অবশেষে বলিলেন—সত্বর উপস্থিত হও, নতুবা ভাল হইবে না। তখন আমি উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, আপনি মেহমানদিগকে জিজ্ঞাসা করুন! তাঁহারা বলিলেন, এই বেচারা ঠিকই বলিতেছে—ইহার কোন দোষ নাই ; আমাদের জন্য খাবার উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু আমরাই খাইতে স্বীকৃত হই নাই। তখন আমার পিতা বলিলেন, আপনারা খাইয়া লউন, কসম খোদার—আমি এই রাত্রে খাইব না। তখন মেহমানগণও শপথ করিয়া বসিলেন যে, আপনি না খাইলে আমরাও খাইব না। তখন আবু বকর একটু স্থিরতার মধ্যে আসিয়া বলিলেন, আজ রাত্রের ন্যায় এরূপ দুর্ঘটনা আর ঘটে নাই ; আপনারা কেন খাবার গ্রহণ করিবেন না ? এই বলিয়া খাবার উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, প্রথমে অর্থাৎ ক্রুদ্ধাবস্থার কথা-বার্ত্তার মূলে শয়তানের কারসাজি ছিল (যদ্দারা সকলেই ক্ষুধার্ত থাকার উপক্রম হইয়াছে।) এই বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই খাইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন যে, (আবু বকর (রাঃ) মেহমানগণের প্রতি যে তৎপরতা প্রদর্শন করিলেন এবং এমন উদারতা দেখাইলেন যে, তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় শপথ ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারার বোঝাও মাথায় লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং তৎক্ষণাৎ মেহমানদের অভিপ্রায় অনুযায়ী খাওয়া আরম্ভ করিলেন এবং মেহমানগণও

সহানুভূতির পরিচয় দিলেন যে, আবুবকরকে ছাড়িয়া না খাওয়ার শপথ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষের এই সহানুভূতির ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হইল এবং উহার ফলাফল প্রকাশ্যে দেখা যাইতে লাগিল। আল্লাহ তায়ালা ঐ খাদ্যের মধ্যে এত বরকত দান করিলেন যে,) খোদার কসম—আমরা এক এক লোকমা পাত্র হইতে উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বস্তু মাত্রায় আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল, এমনকি উপস্থিত সকলে খাইয়া তৃপ্ত হইলেন; এদিকে খাদ্যবস্তু পূর্ব্বের চেয়েও বেশী দেখা যাইতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) এ অবস্থা দেখিয়া স্বীয় স্ত্রীকে ডাকিলেন, তিনিও আশ্চার্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন—বর্ত্তমান খাদ্যবস্তু ত পূর্ব্বের তুলনায় তিন গুণ বেশী। আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয় আল্লার তরফ হইতে বরকত নাযেল হইয়াছে; ইহা অতি মোবারক খাদ্য; (তাই যত খাওয়া যায় ততই ভাল। এই ভাবিয়া) তিনি আরও খাইলেন এবং স্বীয় ত্রুটির পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—ক্রুদ্ধাবস্থায় যে কসম খাওয়া হইয়াছিল তাহা শয়তানের তাছীরেই হইয়াছিল, এই বলিয়া আরও এক লোকমা খাইলেন। পাত্রে আরও খাদ্য অবশিষ্ট থাকিয়া গেল। ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া দিলেন। ভোর পর্য্যন্ত ঐ খাদ্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট থাকিল।

ঘটনাক্রমে ইতিপূর্ব্বে মোসলমানদের সঙ্গে অন্য কোনও এক আরব গোত্রের সন্ধি চুক্তি হইয়াছিল এবং উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ায় ঐ গোত্রের বারজন নেতৃস্থানীয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কয়েকজন করিয়া লোক ছিল, তাঁহারা সকলেই তৃপ্তি সহকারে ঐ খাদ্য খাইলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, নামায ঈমানের এরূপ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে, নামায না পড়া মোশরেক কাফেরদের কাজ বলিয়া পরিগণিত (৭৫)। ● ইসলাম গ্রহণকারী হইতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে নামায পড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন (৭৫ পৃঃ ৫১ হাদীছ)। ● নামাযী ব্যক্তি বস্তুতঃ তাহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আবেদন-আরাধনায় মগ্ন হয় (৭৬ পৃঃ)। অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তির সব হাল-অবস্থা ঐ ধরণের হওয়া চাই। ● এশার নামাযের জমাত অনুষ্ঠানে মুছল্লীদের সমাগমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্র-পশ্চাৎ করা সুন্নত (৩৪৪ হাদীছ)। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সতর্কতামুলকভাবে নামায অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পড়িবে (৩৩৯ হাদীছ)। যাহাতে অজ্ঞাতে নামাযের ওয়াক্ত ছুটিয়া না যায়।

আজানের বিবরণ

মোসলমানদের মধ্যে আজানের প্রচলন

আজানের আলোচনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। যথা, আল্লাহ্ বলেন—

إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا......

"(হে মোসলমান! দেখ—কাফেররা তোমাদের কত বড় ঘোর শত্রু ;) যখন তোমরা নামাযের প্রতি আহ্বান জানাও (অর্থাৎ আজান দাও) তখন তাহারা উহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসা করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা জ্ঞানশূন্য সম্প্রদায়। (নতুবা স্বীয় পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, জীবনদাতা আল্লার দিকে আহ্বানকে লইয়া কখনও এরূপ করিত না।)" (৬ পাঃ ১৩ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ

"জুমার দিন যখন তোমাদিগকে জুমার নামাযের জন্য ডাকা (অর্থাৎ আজান দেওয়া) হয় তখন তোমরা সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া আল্লার জেক্‌র অর্থাৎ নামাযের দিকে ধাবিত হও।" (২৮ পাঃ জুরা জুমা)

৩৭১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—মদীনায় মোসলমানদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে নামাযের সময় জ্ঞাত করার আলোচনা হইল ; তখন ছাহাবীগণ উচ্চস্থানে অগ্নি জ্বালাইবার বা "নাকুস"* বাজাইবার প্রস্তাব করিলেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, এই সব ত ইহুদ-নাছারাদের প্রথা। তাই এই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। তারপর (আজান একামতের প্রথা সাব্যস্ত হইলে) রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে আদেশ করিলেন—আজানের বাক্যগুলি দুই দুইবার এবং একামতের বাক্যগুলি এক একবার বলিবার জন্য। কিন্তু ক্বাদক্বামাতিছ্‌ছালাহ বাক্যটি একামতের মধ্যে দুইবারই বলিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হানফী মজহাব মতে একামতের বাক্যগুলি সংখ্যায় আজানের সমানই থাকিবে, তদুপরি "ক্বাদক্বামাতিছ্‌ছালাহ" বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু যে সব বাক্য দুই

---

* স্কুল, কলেজে কাঁশার তৈরী গোল আকারের ঘণ্টা হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া বাজান হয়। প্রাচীনকালে লম্বা আকারের কাঠ দ্বারা ঘণ্টা তৈরী হইত। ছোট আর একটি কাঠ দ্বারা পিটাইলে তাহাতে শব্দ হইত উহাই "নাকুস" ; নাছারারা গির্জ্জায় উহা ব্যবহার করিত।

দুই বার রহিয়াছে আজানের মধ্যে উহার প্রত্যেকবার পৃথক পৃথক শ্বাসে বলিতে হইবে এবং একামতের মধ্যে উহার দুই দুই বারকে মিলাইয়া এক সঙ্গে বলিতে হইবে। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম পদ্ধতিকে "তারাচ্ছোল" বলা হয় যাহা আজানের মধ্যে সুন্নত। এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে "হদর" বলা হয় যাহা একামতের মধ্যে সুন্নত।

৩৭২। **হাদীছ ঃ**— ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ (মক্কায় থাকাকালে প্রকাশ্যে ও জমাতে নামায পড়ার কোনরূপ ব্যবস্থাই করিতে পারিত না।) মদীনায় আসার পর তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে জমাতের সহিত মসজিদে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন নামাযের প্রতি আহ্বান জানাইবার কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ আন্দাজ মত মসজিদে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে সকলে একত্রিত হইলে পর কোন সময় নামায আরম্ভ করা হইবে তাহা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিতেন; প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যই এরূপ করিতে হইত। একদা তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন যে, সর্ব্বসাধারণকে নামাযের সময় জ্ঞাত করাইবার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, নতুবা ইহাতে সকলেরই অসুবিধা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিলেন, নাছারাদের ন্যায় নাকুস বাজান হউক; কাহারও মত হইল, ইহুদীদের ন্যায় শিঙ্গা বাজান হউক। ওমর (রাঃ) এই পরামর্শ দিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করা হউক, সে নামাযের সময় হইলে লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান করিবে। এই পরামর্শই সাময়িক-ভাবে গৃহীত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বেলাল (রাঃ)কে এই কার্য্যের আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— নামাযের সময় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট পন্থা বা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে তখনও গৃহীত হইয়াছিল না; ঠিক এমনই সময়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আজান ও একামতের প্রতি একটি আশাতীত ইঙ্গিত আসিল, যাহার বিস্তারিত বিবরণ আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ছাহাবী বর্ণনা করেন—যখন নামাযের প্রতি লোকদিগকে একত্রিত করার জন্য কোন পন্থা অবলম্বনের আলোচনা হইতেছিল এবং এই প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছিল যে, একটি নাকুস তৈরী করা হউক, উহা বাজাইয়া লোকদিগকে সমবেত করা হইবে। তখনকার এক রাত্রের ঘটনা এই যে, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম—এক ব্যক্তি আমার নিকট ঘুরাফেরা করিতেছে, তাহার হাতে একটি নাকুস আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার বন্দা! তুমি কি এই নাকুসটি বিক্রি করিবে? সে আমাকে প্রশ্ন করিল, আপনি ইহা দ্বারা কি করিবেন? আমি বলিলাম, ইহা বাজাইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান জানাইব। সে বলিল, এই কাজের জন্য

আমি নাকুস বাজান হইতে অধিক উৎকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম—হাঁ, নিশ্চয়। সে বলিল, আপনি উচ্চৈস্বরে বলিবেন—

ا لله ا كبر...و كذا ا لا قا مة আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এইরূপে আমাকে আজানের সমস্ত বাক্যগুলি পূর্ণরূপে শুনাইল এবং তারপর একামতও তদ্রূপই শিক্ষা দিল। সকাল বেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আমার স্বপ্নের ঘটনা পূর্ণ ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইন্‌শা-আল্লাহ ইহা নিশ্চয়ই খাঁটী সত্য স্বপ্ন; তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই বাক্যগুলি শিক্ষা দাও, সে এইরূপে আজান দিবে। কারণ, বেলালের স্বর তোমার চেয়ে উচ্চ। তখন আমি তাহাই করিলাম; বেলাল আজান দিতে লাগিল। এদিকে ওমর (রাঃ) তাঁহার বাসস্থান হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, অবিকল এই স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আল্লার শোক্‌রিয়া আদায় করিলেন (যে, আল্লাহ তায়ালা অতি সহজে একটি জরুরী বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সুন্দর ব্যবস্থা শিক্ষাদান করিয়াছেন।)

আজানের ফজিলত

৩৭৩। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন নামাযের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে দৌড়িয়া বহু দুরে চলিয়া যায়, যেন আজানের আওয়াজ তাহার কানে প্রবেশ না করে। আজান শেষ হইলে লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখনও ঐরূপে দৌড়িয়া পালায়। একামত শেষ হইলে পুনরায় আসিয়া নামাযরত ব্যক্তিদের মনে নানা অছওয়াছাহ সৃষ্টি করে। তাহাদের দেলে এদিক-সেদিক হইতে নানা কথা টানিয়া আনিতে থাকে—যে সমস্ত কথা তাহাদের স্মরণেও ছিল না। এইরূপে শয়তান নামাযী ব্যক্তিকে নানা কথায় ফেলিয়া তাহার নামায ভুলাইয়া ফেলে। এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহাও স্মরণ থাকে না।

উচ্চৈঃস্বরে আজান দেওয়া উচিত

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মোয়াজ্জেনদিগকে বলিতেন, সাদা-সিধা আজান দিবে, নতুবা এই পদ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে; কিন্তু আজান হইবে অতি সাদা ভাবের, উহাতে কোন প্রকার কৃত্রিম সুন্দর স্বর বানাইবার দরকার নাই।

৩৭৪। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) একজন লোককে বলিলেন, তোমাকে দেখি—তুমি বন-জঙ্গলে বকরি চরাইয়া বেড়াইতে ভালবাস। যখন তুমি এ অবস্থায় বন-জঙ্গলে থাক এবং আজান দেও (যদিও লোকালয় হইতে বহু দূরে, তবুও) তখন সাধ্যানুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে। কেননা, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি, মোয়াজ্জেনের সামান্য আওয়াজও যে কোন মানুষ, জ্বিন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা তরুলতা ইত্যাদি শুনিবে, সকলেই কেয়ামতের ভীষণ দিনে আজানদাতার পক্ষে (আজানের বাক্যাবলীর মর্ম্ম অনুযায়ী ঈমানদার হওয়ার) সাক্ষ্য দান করিবে।

বস্তী হইতে আজান শুনা গেলে উহার উপর আক্রমণ করিবে না

৩৭৫। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী (দঃ) যখনই আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোন বস্তীর দিকে জেহাদ করিতে যাইতেন, ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত উহার উপর আক্রমণ চালাইতেন না। ভোর হইলে লক্ষ্য করিতেন, যদি ঐ বস্তী হইতে আজানের শব্দ শুনিতে পাইতেন তবে আর আক্রমণ করিতেন না। যদি আজানের শব্দ না পাইতেন তবে আক্রমণ চালাইতেন। যেমন, আমরা খয়বরের জেহাদের জন্য রওয়ানা হইলাম; রাত্রিকালে উহার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলাম; ভোরে যখন সেখান হইতে আজানের শব্দ শুনা গেল না, তখন আক্রমণ চালাইবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) যানবাহনে আরোহণ করিলেন। আমি আমার মাতার স্বামী আবু তাল্‌হা ছাহাবীর সঙ্গে একই বাহনে আরোহণ করিলাম। আমরা খয়বর নগরীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। নগরবাসীরা প্রভাতে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি লইয়া বাহির হইল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"মোহাম্মদ ও তাঁহার সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে।" রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দেখা মাত্রই না'রায়ে তকবীর ও "খয়বর ধ্বংস হউক" ধ্বনি দিলেন এবং কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

"আমরা মোসলমান কোন বস্তি আক্রমণে উপস্থিত হইলে ঐ বস্তিবাসীর পরাজয় অনিবার্য্য।"

আজানের শব্দ শুনিয়া কি বলিবে

৩৭৬। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—আজানের শব্দ যখন তোমরা শুনিতে পাও তখন মোয়াজ্জেনের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ কর।

৩৭৭। **হাদীছঃ**—একজন ছাহাবী আজানের "হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ" শুনিয়া "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিলেন।

আজান শুনিয়া কি দোয়া পড়িবে?

৩৭৮। **হাদীছঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ) وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ (اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ)*

যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে, সে কেয়ামতে আমার শাফায়া'তের অধিকারী হইবে।

আজান দেওয়ার ফজিলত

৩৭৯। **হাদীছঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ যদি জানিত আজান দেওয়ার মাহাত্ম্য ও ফজিলত কি? তবে লটারি করিয়া হইলেও আজান দেওয়ার সুযোগ সন্ধানী হইত। জোহরের নামায জমাতে পড়ার ফজিলত জানিতে পারিলে উহার প্রতি ছুটিয়া আসিত এবং এশা ও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসিবার মর্তবা জানিতে পারিলে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই সময় মসজিদে উপস্থিত হইত।

ছাহাবীদের যুগে একবার ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, আজান দেওয়ার প্রার্থী অনেক হইল। এমনকি, উপস্থিত ছাহাবী সায়াদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে লটারি করিতে বাধ্য হইলেন।

---

* এই দোয়ার বন্ধনীর মধ্যবর্তী শব্দগুলি বোখারী শরীফ ভিন্ন অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে, দোয়াটির অর্থ এইঃ—হে খোদা! এই চরমোৎকর্ষ্যে পরিপূর্ণ আহ্বানের ও তৎপরবর্ত্তী নামাযের মালিক! তুমি (আমাদের প্রিয় নবী) মোহাম্মদ (দঃ)কে বেহেশতের ঐ বিশিষ্ট স্থানটি দান কর যাহা একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশেষভাবে তৈরী হইয়াছে এবং তাঁহাকে শীর্ষস্থানের অধিকারী কর এবং ঐ মর্য্যাদাপূর্ণ পদ দান কর, যেই পদের অধিকারী সমস্ত মখলুকাতের প্রশংসাভাজন হইবে, এ বিষয়ে তুমি নিজেই অঙ্গীকারাবদ্ধ; তুমি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

আজানের মধ্যে কথা বলা

বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, সোলায়মান ইবনে ছোরাদ তাবেয়ী (রঃ) একদা আজানের মধ্যে কথা বলিয়াছেন। (হয় ত বিশেষ প্রয়োজনে সামান্য কথা হইবে।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, হাসি আসিলে আজান বা একামত ভঙ্গ হইবে না।

মছআলাহ ঃ— আজান বা একামতের মধ্যে সামান্য কথা বলাও মকরুহ, এমনকি যদিও উহা উত্তম কথা হয়। যেমন, সালাম করা বা আলহামদু-লিল্লাহ ইত্যাদি। আর কথার পরিমাণ বেশী হইলে আজান ও একামত ফাছেদ হইয়া যায়। ঐরূপ আজান বা একামত দোহরাইতে হইবে (ফয়জুল-বারী ২—১৬৯)।

কেহ সময় বলিয়া দিলে অন্ধ ব্যক্তি আজান দিতে পারে

৩৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন—বেলাল শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের আজান দিয়া থাকে, তাই রোযার সময় বেলালের আজান শুনিয়া পানাহার বন্ধ করিও না, যাবৎ ইবনে-উম্মে-মাকতুমের আজান না হয়। ইবনে-উম্মে-মাকতুম একজন অন্ধ ছাহাবী ছিলেন, তিনি ফজরের আজান দিয়া থাকিতেন। কোন ব্যক্তি যখন তাঁহাকে খবর দিত, ভোর হইয়াছে তখন তিনি আজান দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদে ফজরের পূর্ব্বে রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের আজান দেওয়া হইত ; এই উদ্দেশ্যে যে, যাঁহারা এখনও শুইয়া আছেন তাঁহারা সত্বর উঠিয়া কিছু তাহাজ্জুদ পড়িয়া লউন, ভোর হইতেছে। তাহাজ্জুদের এই আজান সাধারণতঃ বেলাল (রাঃ) দিয়া থাকিতেন। রোযার সময় ছেহ্‌রী খাইতে তাহাজ্জুদের আজান দ্বারা যেন বিভ্রান্তি না হয়, সেই জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা আর একটি মছআলাহ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফজরের আজান ছোবহে-সাদেকের পূর্ব্বে দেওয়া যায় না। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ছোবহে-সাদেকের পূর্ব্বের আজান তাহাজ্জুদের আজান হইয়া থাকে ; ঐ আজান ফজরের জন্য যথেষ্ট নহে, ফজরের জন্য পুনরায় ছোবহে-সাদেকের পর আজান দিতে হইবে।

আজান ও একামতের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের পরিমাণ

আজান ও একামতের মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হওয়া চাই সে সম্পর্কে শরীয়তে পূর্ণ নির্দ্ধারিত কোন পরিমাণের বাধ্যবাধকতা নাই। বোখারী (রঃ)ও কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করেন নাই। আজান ও একামতের মধ্যে নামায পড়ার

আদেশ বর্ণিত ৩৮২ নং হাদীছটি বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান হওয়া চাই।

তিরমিজী শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, নবী (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে আদেশ করিয়াছিলেন—আজান ও একামতের মধ্যবর্ত্তী এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিও যাহাতে পানাহারে লিপ্ত ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং মলমূত্র ত্যাগ-কারী তাহার প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া নামাযের জামাতে শামিল হইতে পারে।

অবশ্য মগরেবের আজান ও একামতের বিষয়টি উল্লিখিত হাদীছের মর্ম্ম হইতে ভিন্ন। কারণ, আনাছ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ যাহা ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছেন; হাদীছটির অনুবাদ "অন্যান্য সুন্নত নামায" পরিচ্ছেদে হইবে; উক্ত হাদীছে উল্লেখ আছে, "মাগরেবের নামাযে আজান ও একামতের মধ্যে অতি সামান্য ব্যবধান হইত।"

উক্ত হাদীছে যে উল্লেখ আছে—"কিছু সংখ্যক ছাহাবী মগরেব নামাযের ফরজের পূর্ব্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়িতেন" সে সম্পর্কে বলা হয়, আজান আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাঁহারা উহা আরম্ভ করিতেন। (ফতহুল-বারী, ২—৮৫)

এ সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রের বিবরণ এইরূপ—আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান না রাখিয়া লাগালাগি আদায় করা সর্ব্বসম্মতরূপে মকরূহ। উভয়ের মধ্যে এই পরিমাণ ব্যবধান বাঞ্ছনীয় যাহাতে সর্ব্বদার মোক্তাদীগণ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু মগরেব নামাযে আজান ও একামতের মধ্যে শুধু এতটুকু ব্যবধান রাখিবে যাহাতে কোরআন শরীফের ছোট ছোট তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়। (শামী, ১—৩৬২)

আজানের পর ঘরে থাকিয়া একামতের অপেক্ষা করা যায়

৩৮১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—ফজর নামাযের ওয়াক্তে মোয়াজ্জেন আজান দিয়া ক্ষান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতেন এবং ছোবহে-সাদেকের পরে ফজরের ফরজের পূর্ব্বেকার সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন। তারপর মোয়াজ্জেন কর্ত্তৃক একামতের জন্য তাঁহার নিকট না আসা পর্য্যন্ত তিনি ডান কাতের উপর আরাম করিয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত (দঃ) ফজরের আজানের পর পরই দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া নিতেন, অতঃপর ডান কাতে শুইতেন, কিন্তু এই শোয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত অভ্যাস ছিল না। "ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্ত্তা বলা বা আরাম করা" পরিচ্ছেদের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) ফজরের সুন্নত

পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন, আমি জাগ্রত না থাকিলে ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই শয়ন মসজিদের মধ্যে কখনও হয় নাই।

প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যে নফল পড়া ভাল

যে সমস্ত নামাজে ফরজের পূর্ব্বে সুন্নত-মোয়াক্কাদা আছে—যেমন ফজর, জোহর ও জুমা এই ক্ষেত্রে ত আজান ও একামতের মধ্যে নামায নির্দ্ধারিত আছে। এতদ্ভিন্ন যে ওয়াক্তের পূর্ব্বে কোন সুন্নত-মোয়াক্কাদা নাই; যেমন আছর ও এশা এই নামাযেও ফরজের পূর্ব্বে কিছু নফল নামায পড়া ভাল। মগরেবের ওয়াক্তে এই হুকুম পালনে কয়েকটি বাধাবিঘ্ন আছে বলিয়া ইমামগণের একটু মতভেদ আছে, ইহার বিবরণ "অন্যান্য সুন্নত নামায" পরিচ্ছেদে আসিবে।

৩৮২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যবর্ত্তী কিছু নামায পড়া উচিত। এই কথাটি পুনঃ পুনঃ তিনবার বলিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, ইহা ইচ্ছাধীন। (অর্থাৎ সুন্নতে-মোয়াক্কাদা নয়, কিন্তু পড়া ভাল।)

ছফরেও আজান দিয়া জামাতে নামায পড়া উচিত

৩৮৩। হাদীছ ঃ—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক গোত্রের কতিপয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম, তথায় আমরা বিশ দিন কাটাইলাম। নবী (দঃ) বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয় ছিলেন। তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা পরিবার-পরিজনের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি; তখন তিনি নিজেই বলিলেন, তোমরা বাড়ী ফিরিয়া যাও। সেখানে লোকদিগকে দ্বীন শিক্ষা দিও, নামাযের পাবন্দি করিও এবং আমাকে যেরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছ সেইভাবে নামায পড়িও। সর্ব্বাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইলেই একজনে আজান দিও এবং সর্ব্বাধিক উপযুক্ত বা বয়স্ক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইয়া নামায আদায় করিও।

৩৮৪। হাদীছ ঃ—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা সফরে বাহির হইলে পর যখন নামাযের ওয়াক্ত হইবে তখন যে কোন একজন আজান ও একামত বলিবে এবং যে বেশী উপযুক্ত বা বেশী বয়স্ক তাহাকে ইমাম বানাইয়া জমাতে নামায আদায় করিবে।

৩৮৫। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) একদা তুফান ও ভয়ঙ্কর শীতের রাত্রে নামাযের আজান দিলেন ; আজান শেষে ইহাও বলিলেন যে, সকলে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়ুন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর অবস্থায় ভীষণ শীত বা বৃষ্টিপাতের রাত্রেও মোয়াজ্জেনকে আদেশ করিতেন, আজান দিতে এবং (সকলে একত্র হওয়া কষ্টকর, তাই) আজানের পর ইহাও বলিতে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়িয়া নেও।

ব্যাখ্যা ঃ—আজানের মধ্যে "হাইয়্যা-আলাছ্ছালাহ"—নামাযের প্রতি আস ; "হাইয়্যা-আলাল্ ফালাহ"—(দ্বীন-দুনিয়ার) মঙ্গল ও কল্যাণের তথা (নামাযের) প্রতি আস ; বিশেষ আদেশ রহিয়াছে। এই আদেশ মোয়াজ্জেনের মুখ হইতে নিসৃত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বিঘোষিত। আল্লার বান্দাগণ এই আহ্বান ও আদেশ শুনিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; ছাহাবীদের যামানার মোসলমানদের অবস্থা এইরূপই ছিল। উহার পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ শীত ও বৃষ্টিপাতের রাত্রে উক্ত আদেশ ও আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) জনগণের অধিক কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লার আদেশ ও আহ্বানের ঘোষণাকারী ঐ মোয়াজ্জেনের মুখেই আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়িয়া নেও।

আজান দিবার সময় মুখ উভয় দিকে ঘুরাইবে

বেলাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আজান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল দিতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ করিতেন না।

তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলেন, আজান অজু অবস্থায় দেওয়া সুন্নত ও আবশ্যক। তাবেয়ী ইব্রাহীম (রঃ) বলেন, বিনা অজুতে আজান দিলে ঐ আজান পুনঃ দিতে হইবে না ; হাদীছে প্রমাণিত আছে, আল্লার জেকর সর্ব্বাবস্থায়ই করা যায়, অজুহীন অবস্থায়ও করা যায়।

৩৮৬। হাদীছ ঃ—(নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোয়াজ্জেন—) বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আজান দিবার সময় মুখ এদিক ওদিক করিতে দেখা যাইত।

নামাযে শরীক হইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না

৩৮৭। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতেছিলাম ; নামাযরত অবস্থায় তিনি কিছু লোকের ছুটাছুটির শব্দ শুনিতে পাইলেন। নামাযান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে ? তাহারা আরজ করিল, আমরা

নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসিতে ছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ কখনও করিও না। শান্তি, শৃঙ্খলা ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসিবে, তাহাতে যে কয় রাকাত ইমামের সঙ্গে পাওয়া যায় পড়িয়া লইবে, আর যাহা ছুটিয়া যায় উহা ইমামের নামাযের পরে পুরা করিয়া লইবে।

৩৮৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহেহ অসাল্লাম বলিয়াছেন, একামত শুনিয়া ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না; শান্তি শৃঙ্খলা ও গাম্ভীর্যের সহিত নামাযে আসিবে। (ইমামের সঙ্গে নামায) যতটুকু পাইবে পড়িবে, আর যাহা ছুটিয়া গিয়াছে উহা পরে পূরণ করিবে। (অবশ্য একামতের পূর্ব্বেই জমাত স্থলে উপস্থিত থাকা চাই।)

মছআলাহ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, এইরূপ বলা মকরুহ যে—"আমার নামায ছুটিয়া গিয়াছে" বরং এইরূপ বলিবে "আমি নামায ধরিতে পারি নাই।"

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত মছআলার উদ্দেশ্য শুধু বাক্য আওড়ানো নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ এই যে, নামাযের প্রতি প্রত্যেক মোসলমানের সর্ব্বদা তৎপর ও সচেষ্ট থাকা চাই, মুহূর্ত্তের জন্যও নামাযের প্রতি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসা চাই না। "ছুটিয়া গিয়াছে" বাক্যের মধ্যে এইভাব প্রকাশ পায় যে, পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য বা অসাবধানতায় হাত ছাড়া হইয়াছে। নামাযের প্রতি এইভাব বস্তুতঃই জঘণ্য। "ধরিতে পারি নাই" বাক্যে প্রকাশ পায় যে, সচেষ্ট থাকা সত্বেও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কোন মোসলমানের কোন নামায কাজা হইলে তাহা এই পর্য্যায়েই হইতে পারে; প্রথম পর্য্যায়ের কখনও হওয়া চাই না।

আলোচ্য মছআলার উদ্দেশ্য দ্বিতীয়তঃ এই যে, নামাযের প্রতি কার্য্যতঃ শৈথিল্য ও অবহেলা ত হওয়াই চাই না, কথায়ও ঐরূপ ভাব থাকা চাই না। কোন নামায কাজা হইলে উহার উক্তিও এমন বাক্যে করিবে যাহাতে নামাযের প্রতি শৈথিল্য ও অবহেলাভাবের আঁচও না থাকে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য মছআলাহটি উল্লেখ পুর্ব্বক বলিয়াছেন, কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ভাব প্রকাশ পাইতে পারে এরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণভাবে ঐরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যেরূপ আলোচ্য পরিচ্ছেদে জমাতের সহিত রাকাত ছুটিয়া যাওয়ার মছআলাহ বর্ণনা করা ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে।

মোক্তাদি নামায আরম্ভের জন্য কোন্ সময় দাঁড়াইবে?

৩৮৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন, একামত বলা হইলেও যাবৎ আমাকে হুজরাখানা হইতে

বাহির হইয়া আসিতে না দেখ তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিও না। শান্তভাবে অপেক্ষা করিতে থাক।

মছআলাহ:—ইমাম যদি একামতের পূর্ব্বে মসজিদের বাহিরে থাকেন এবং নামায আরম্ভের সময় হইলে মসজিদে প্রবেশ করেন তবে ইমাম মসজিদে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইয়া যাইবে। আর যদি ইমাম প্রথম হইতেই নিজ মোছাল্লায় বিদ্যমান থাকেন তবে ইমাম দাঁড়াইবার সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইবে। ইহা উত্তম নিয়ম বটে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম করিলে গোনাহ হইবে না (ফয়জুলবারী ২—১৭৮)। অবশ্য ইমাম নামায আরম্ভ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণের নামায আরম্ভ করিতে হইবে এবং নামাযের কাতার ইহার পূর্ব্বেই পূর্ণ ও সোজা করিতে হইবে, অতএব এই সব কাজের পরিমাণ সময় লইয়াই মোক্তাদীগণকে দাঁড়াইতে হইবে। স্মরণ রাখিবে—ইমাম নামায আরম্ভ করিলে তথায় কোন প্রকার শব্দ করা নাজায়েয, অথচ কাতার পূর্ণ ও সোজা করিতে পরস্পর কথা বলা স্বাভাবিক।

মছআলাহ:—ইমাম যদি মোক্তাদীগণকে তাঁহার অপেক্ষা করার জন্য বলেন তবে মোক্তাদীগণ অপেক্ষা করিবে (৮৯ পৃঃ ১৯৩ হাঃ)। অর্থাৎ ইমামের এতটুকু মর্য্যাদা ও প্রাধান্য থাকা চাই; এরূপ ক্ষেত্রে ইমামের প্রতি কটাক্ষ বা বিরূপ ভাব প্রকাশ করা চাই না।

মছআলাহ:—মসজিদে আসিয়া বিশেষ প্রয়োজনে নামাযের পূর্ব্বে মসজিদ হইতে বাহিরে যাওয়া জায়েয আছে (৮৯ পৃঃ ১৯৩ হাঃ)।

একামত হওয়ার পর ইমাম দরকারী কাজ করিতে ও দরকারী কথা বলিতে পারেন

৩৯০। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এশার নামাযের একামত বলা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে আসিতেছিলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল; তিনি তাহার সহিত মসজিদের এক কিনারায় জরুরী আলাপে মশগুল হইলেন। নামায আরম্ভে এত বিলম্ব হইল যে, মোক্তাদীগণের তন্দ্রা আসিয়া গেল।

মছআলাহ:—একামতের পরে নামায আরম্ভ করিতে বিলম্ব যদি সামান্য হয় তবে একামত পুনঃ বলিতে হইবে না। আর যদি বিলম্ব বেশী হয় তবে নামায আরম্ভের পূর্ব্বে পুনঃ একামত বলিতে হইবে (ফয়জুলবারী ২—১৮৯)।

জমাতের সহিত নামায পড়া ওয়াজেব

হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহারও মাতা আদর করিয়া তাহাকে এশার জমাতে আসিতে নিষেধ করিলে ঐ নিষেধ তাহার অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

৩৯১। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আজানের পর কাহাকেও ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিবার আদেশ দেই এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করি যাহারা নামাযের জমাতে শরীক হয় নাই এবং কাহারও দ্বারা জ্বালানি কাঠ আনাইয়া ঐ ব্যক্তিগণ ঘরে থাকাবস্থায় তাহাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, খোদার কসম—বহুলোক এমনও আছে যে, সামান্য কিছু শীরনী পাওয়ার আশা থাকিলে তাহারা রাত্রিকালে এশার সময়ও মসজিদে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। (কিন্তু জমাতের প্রতি ততটুকু আকৃষ্টও হয় না।)

জমাতের সহিত নামাযের ফজিলত

আছওয়াদ (রঃ) নামক তাবেয়ী এক মসজিদে জমাত না পাইলে অন্য মসজিদে যাইয়া জমাত পাইবার চেষ্টা করিতেন।

আনাছ (রাঃ) একদা এক মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে (তাঁহার সঙ্গে একদল লোক ছিল) তিনি আজান দিয়া, একামত বলিয়া জমাতে নামায আদায় করিলেন।

মছআলাহ ঃ—যে মসজিদ কোন বস্তিতে অবস্থিত নহে—যেমন, বস্তি হইতে পৃথক কোন পথের ধারে অবস্থিত মসজিদ কিম্বা সাপ্তাহিক হাট বা সাময়িক বাজারে অবস্থিত মসজিদ—যাহার সংলগ্নে মুছল্লীগণ বসবাসকারী বা অবস্থানকারী হয় না, বরং যাতায়াত পথে বা সমাবেশ সময়ে লোকেরা পর পর আসিতে থাকে এবং নামায পড়িতে থাকে। এইরূপ মসজিদে যখনই একদল লোক নামাযের জন্য উপস্থিত হইবে তাহাদের পক্ষে আজান ও একামতের সহিত জমাতে নামায পড়া উত্তম হইবে (শামী, ১—৫১৬)।

৩৯২। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামায একাকী নামায হইতে সাতাইশ গুণ বেশী ছওয়াব রাখে।

৩৯৩। হাদীছঃ—عن ابى صالح سمعت ابا هريرة رضى الله عنه—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الرجل فى الجماعة

تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك

انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا

الصلوة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة

فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه - اللهم

صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم فى الصلوة ما انتظر الصلوة -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘরে বা দোকানে নামায পড়া হইতে (মসজিদের) জমাতে নামায পড়া (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াবের পাত্র। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে চলিতে থাকে তখন তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক একটি গোনাহ মাফ হইয়া যায় এবং এক একটি মর্ত্তবা বাড়ান হয়। তারপর সে যখন নামায পড়ে, (এমনকি নামাযান্তে যাবৎ নামায স্থানে বসিয়া থাকে,) ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন—"হে খোদা! তাহার গোনাহ মাফ কর, হে খোদা! তাহার উপর রহমত নাযেল কর" এবং সেই ব্যক্তি নামাযের জন্য যত সময় অপেক্ষায় থাকে—একমাত্র নামাযই তাহাকে বাড়ী চলিয়া আসা হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে; তাহার জন্য ঐ সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৩৯৪। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামাযের ছওয়াব একাকী নামায অপেক্ষা (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী।

৩৯৫। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জমাতের নামাযে একাকী নামাযের তুলনায় (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, জাগতিক কার্য্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা একদল ফেরেশতা

দিনের বেলা ও অন্য একদল রাত্রি বেলা পাঠাইয়া থাকেন। উভয় দলই ফজরের সময় ভূ-পৃষ্ঠে একত্রিত হইয়া থাকেন।

কোরআন শরীফে আছে— ان قران الفجر كان مشهودا "ফজর নামাযের সময় ফেরেশতাগণ (উভয় দল ভূপৃষ্ঠে) একত্র হইয়া থাকেন।" (অতএব ফজরের নামায জমাতে পড়ায় বিশেষভাবে তৎপর হওয়া চাই)।

৩৯৬। হাদীছ:— عن ابى موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم

اعظم الناس اجرا فى الصلوة ابعدهم فابعدهم ممشى والذى ينتظر

الصلوة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذى يصلى ثم ينام .

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে যত বেশী দূর হইতে মসজিদে আসিবে, সে তত বেশী ছওয়াবের অধিকারী হইবে। মসজিদে আসিয়া যে ব্যক্তি ইমামের সহিত নামায পড়ার অপেক্ষায় থাকে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের অধিকারী যে (মসজিদে) একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী যাইয়া শুইয়া থাকে।

প্রখর রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৯৯৭। হাদীছ:— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—একদা এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতে ছিল। সে দেখিল, কাঁটাযুক্ত গাছের একটি ডাল রাস্তার উপর পড়িয়া আছে, সে উহা অপসারিত করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিফল দান করিলেন যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন—

الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم

والشهيد فى سبيل الله .

"শহীদ পাঁচ প্রকার। (১) প্লেগ—মহামারীতে মৃত। (২) কলেরা—উদরাময়ে মৃত। (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত। (৪) চাপা পড়িয়া মৃত। (৫) আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী নিহত।*

---

* তৃতীয় খণ্ডে "জেহাদ ব্যতিরেকে শাহাদতের সওয়াব" পরিচ্ছেদে আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী ছাড়া ২১ প্রকার শহীদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, মানুষ যদি জানিত, আজান দেওয়ার ও জমাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ানের কত ছওয়াব, তবে লটারি করিয়া হইলেও উহার সুযোগ হাসিল করিত। আরও যদি জানিত, প্রখর রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে আসার কি সওয়াব, তবে নিশ্চয় উহার জন্য তৎপর হইত। আরও যদি জানিত, এশা ও ফজরের জন্য মসজিদে আসার কি ছওয়াব, তবে সকলেই হামাগুড়ি দিয়া হইলেও মসজিদে আসিত।

মসজিদে আসিতে প্রতি পদে সওয়াব লেখা হয়

অর্থাৎ—বাসস্থান মসজিদ হইতে দূরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হওয়া চাই, মসজিদের প্রতি যত বেশী পদক্ষেপ হইবে তত বেশী ছওয়াব লেখা হইবে।

৩৯৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনী-ছালেমা নামক গোত্রের বাসস্থান মদীনার শহরতলীতে ছিল। তাহারা সেখান হইতে উঠিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্ত্তী বাসস্থান তৈরী করার ইচ্ছা করিল। নবী (দঃ) মদীনার শহরতলী জনশূন্য থাকা অপছন্দ করিলেন ; তাই তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যে, শহরতলী হইতে আল্লার মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া থাক এই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য পদে পদে ছওয়াব লেখা হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য কর। (মসজিদের সংলগ্ন বসবাস করিলে এই পর্য্যায়ের ছওয়াব হারাইতে হইবে)। তখন তাহারা তাহাদের বস্তিতেই থাকিয়া গেল।

এশা ও ফজরের জমাতে হাজির হওয়ার তাকিদ

৩৯৯। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোনাফেকদের উপরই ফজর এবং এশা (নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়া) সর্ব্বাপেক্ষা ভারী। (কারণ, ইহা অধিক কষ্ট সাপেক্ষ ; আর ছওয়াবের উদ্দেশ্য ত তাহাদের নাই।) লোকেরা যদি ফজর ও এশার জমাতের ফজিলত জানিত তবে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযদ্বয়ের জমাতে হাজির হইত

ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী হইলেই জমাত গণ্য হইবে

অর্থাৎ একজন ইমাম ও একজন মোক্তাদী—এই দুই জনের সমষ্টিই জমাত গণ্য হইবে এবং ইহাতেই জমাতের অতিরিক্ত ছওয়াব হাসিল হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ৩৮৪ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই মর্ম্মে একখানা স্পষ্ট হাদীছও বর্ণিত আছে। একদা নবী (দঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি একা নামায আরম্ভ করিয়াছে। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, কেহ আছে যে এই ব্যক্তির উপকার করে, তথা তাহার সঙ্গে নামায পড়ে ? সেমতে এক ব্যক্তি

দাঁড়াইল এবং ঐ লোকটির সহিত নামায পড়িল। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই দুইজনে জমাত হইয়াছে। (ফতহুল বারী ২--১১২)

মসজিদে নামায পড়া এবং নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বিলম্ব করা

৪০০। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم —

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লার (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে না। তখন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দান করিবেন—(১) ন্যায় পরায়ণ শাসনকর্ত্তা। (২) যে যুবক যৌবনের ঢেউএর মধ্যেও আল্লার বন্দেগী ও গোলামীতে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। (৩) ঐ ব্যক্তি যাহার মন মসজিদের সঙ্গে লটকানো থাকে অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাহার মন এ বিষয়ে ব্যস্ত থাকে যে, কখন নামাযের সময় উপস্থিত হইবে এবং সে মসজিদে যাইয়া নামায পড়িবে। (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছে একমাত্র আল্লার ভালবাসার দরুন, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে ভালবাসে বলিয়া তাহাদের উভরের মধ্যেও ভালবাসার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এমন খাঁটী ভালবাসা যে, সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সর্ব্বদাই সেই ভালবাসা স্থায়ীভাবে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যাহাকে কোন একটি উচ্চবংশীয়া পরমা সুন্দরী যুবতী স্বয়ং আকৃষ্ট করিয়াছে ও ডাকিয়াছে, কিন্তু সে উত্তরে বলিয়াছে, আমি খোদাকে ভয় করি। (৬) ঐ ব্যক্তি যে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত গোপনভাবে করে—তাহার ডান হাত যাহা দান করিয়াছেন, বাম হাত উহা জানিতে পারে নাই। (৭) ঐ ব্যক্তি যে একাকী খোদাকে স্মরণ করে এবং (ভয় ও মহব্বতে) তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বহায়।

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য ৩৯৩ নং হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে।

সকালে-বিকালে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৪০১। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد اوراح اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا اوراح -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা বা বিকাল বেলা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রতি সকাল-বিকালের এই পরিশ্রমের প্রতিফলে বেহেশতের মধ্যে নিমন্ত্রণ-সামগ্রী তৈরী করিয়া রাখেন।

ফরজ নামাযের একামত হইলে সুন্নত বা নফল আরম্ভ করিবে না

৪০২। হাদীছ :—মালেক ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাযের একামত হইলে এক ব্যক্তিকে ভিন্ন নামায পড়িতে দেখিলেন। (ঐ ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িতেছিল)। নামাযান্তে যখন সকলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্ত্তী ঘিরিয়া বসিল তখন হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, ফজরের (ফরজ) নামায কি চারি রাকাত হয় ? অর্থাৎ একামতের পর ফরজ ভিন্ন অন্য নামায পড়া যায় না, তুমি ভিন্নভাবে দুই রাকাত ও জমাতে দুই রাকাত পড়িয়াছ ; তুমি কি ফজরের ফরজ চার রাকাত পড়িলে ?

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে, সে ভিন্নভাবে যে নামায পড়িয়াছে উহা ফজরের ফরজ নহে, কিন্তু ফরজ নামাযের একামত হইবার পর জমাতের সংলগ্ন স্থানে অন্য কোন প্রকার নফল বা সুন্নত নামায পড়া নিষিদ্ধ। ঐ ব্যক্তি এই মছআলার ব্যতিক্রম করিয়া একামতের পর জমাতের সংলগ্ন স্থানে সুন্নত আরম্ভ করায় ক্ষোভ প্রকাশ স্বরূপ রসুলুল্লাহ(দঃ) উহার প্রতি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

মছআলাহ :—ফজর ভিন্ন অন্য কোন নামাযের সুন্নত, এমনকি জোহরের পূর্ব্বে যে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াক্কাদা আছে উহাও জমাত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না। তদ্রূপ জুমার ফরজের পূর্ব্বে চার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদাও খোৎবার আজানের পূর্ব্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না। জামাতের সহিত ফরজ নামায আদায় করিয়া ঐ সুন্নত পড়িবে। কিন্তু ফজরের ফরজ-পূর্ব্ব দুই রাকাত সুন্নত অতি উচ্চ পর্য্যায়ের

সুন্নতে-মোয়াক্কাদা। কোন কোন ইমাম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। সেমতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) শুধু ফজরের সুন্নতের জন্য এতটুকু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, ফজরের জমাত আরম্ভ হওয়ার পরও যদি আশা করা যায় যে, সুন্নত পড়িয়া জমাতে শরীক হওয়া যাইবে তবে সুন্নত পড়িয়া লইবে। কিন্তু জমাতের সংলগ্ন স্থান হইতে যথাসম্ভব দুরে সুন্নত পড়িবে, নতুবা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষোভের পাত্র সাব্যস্ত হইবে। যদি দেখা যায় যে, সুন্নত পড়িলে জমাত শেষ হইয়া যাইবে তবে সুন্নত না পড়িয়া জমাতে শরীক হইবে এবং সূর্য্য উদয়ের পর ঐ সুন্নত পড়িবে।

কিরূপ অসুস্থ হওয়া সত্বেও জমাতে শামিল হওয়া উচিত

৪০৩। **হাদীছ ঃ**—বিশিষ্ট তাবেয়ী আছওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বসিয়া নামাযের গুরুত্ব ও উহার প্রতি তৎপরতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইবার পর একদিন যখন নামাযের সময় উপস্থিত হইল এবং আজান দেওয়া হইল তখন বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের খবর দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আবুবকরকে জমাতে নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, তিনি (আবুবকর) অত্যন্ত, কোমল হৃদয় মানুষ; যখনই তিনি আপনার স্থলে ইমামতীর জায়গায় দাঁড়াইবেন তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়িবেন; মোক্তাদীদিগকে ছুরা-কেরাত কিছুই শুনাইতে পারিবেন না। যদি আপনি ওমর (রাঃ)কে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এ সমস্ত ওজর-আপত্তি না শুনিয়া পুনরায় ঐ আদেশই করিলেন যে, তোমরা আবুবকরকে নামায পড়াইবার জন্য বল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হাফ্‌সাহ (রাঃ)কে* বলিলাম, আপনি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলুন যে, আবুবকর অতি নরম-দেল মানুষ, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবেন; যদি ওমরকে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। হাফ্‌সাহ (রাঃ)ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ অনুরোধই জানাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় আদেশের বিপরীত পুনঃ পুনঃ ঐ উক্তি শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক পুনরায় ঐ কথাই বলিলেন, আবু বকরকে বল, জমাত পড়াইবার জন্য। (আবু বকর জমাত আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং কয়েক ওয়াক্ত নামায তাঁহার ইমামতীতেই পড়া হইল।) অতঃপর

* উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌সাহ (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা; হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন বিশিষ্টা পত্নী ছিলেন।

একদা আবু বকরের ইমামতীতে নামায আরম্ভ হওয়ার পর হযরত (দঃ) একটু সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া জমাতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। (তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, পা উঠাইয়া চলার শক্তি ছিল না,) তাঁহার পা দুইটি মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে উপনীত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ইমামতী করা অবস্থায়ই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের আভাস পাইয়া ইমামের স্থান ছাড়িয়া পেছনের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন।↑ রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থায় থাকিবার ইশারা করিলেন এবং তিনি আবু বকরের বাম পার্শ্বে আসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, আবু বকর তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া মোকাব্বের হইলেন, এইরূপে সকলে নামায আদায় করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের আরও বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু শয্যায় যখন তাঁহার অসুস্থতা চরমে পৌঁছিয়া গেল, তখন একদা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত শেষ হইয়া গিয়াছে কি ? আমরা বলিলাম, এখনও জমাত হয় নাই। সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তখন তিনি বলিলেন, আমার জন্য টবের মধ্যে পানি রাখ। পানি রাখা হইল তিনি একটু সুস্থিরতা হাসিলের আশায় গোসল করিলেন এবং জমাতে যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথায় চক্র আসিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে কি ? আমরা বলিলাম, সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি পুনরায় ঐরূপ গোসলের ব্যবস্থা করিলেন এবং গোসল করিয়া জমাতে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইবামাত্র বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ তিন বার জমাতে যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেকবারেই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাই চতুর্থবার তিনি আবু বকরকে জমাতে নামায পড়াইবার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

খাবার উপস্থিত, জমাতও আরম্ভ তখন কি করিবে ?

এই বিষয়ে মোটামুটি মছআলাহ এই যে, যদি বিশেষ ক্ষুধা না থাকে এবং খাওয়ার প্রতি এরূপ আকর্ষণ না থাকে যাহাতে নামাযরত অবস্থায় মন উহার

↑ আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আসিয়া ঐ নামাযেরই ইমাম হইলেন, আবুবকর মোক্তাদী হইয়া গেলেন। এরূপ করা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্যই খাছ ছিল।

প্রতি ধাবিত হয় তবে খাওয়ায় লিপ্ত না হইয়া জমাতে শরীক হইবে। নতুবা প্রথমে খাবার গ্রহণ করিবে তারপর একাগ্রচিত্তে নামায পড়িবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ অবস্থায় প্রথমে খাবার গ্রহণ করিতেন।

আবুদ্‌-দরদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বলেন—মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, নামাযের পূর্ব্বে তাহার সমস্ত প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া মনকে সমস্ত ধ্যান ও আকর্ষণ হইতে মুক্ত করতঃ একাগ্রচিত্তে নামাযে মগ্ন হয়।

৪০৪। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রিকালে খাবার উপস্থিত হয় এবং এদিকে নামাযের একামত বলা হয়, তখন প্রথমে খাবার গ্রহণ কর। (এই হাদীছের তাৎপর্য্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে)।

৪০৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন সময় রাত্রের আহার উপস্থিত করা হয় (এবং ক্ষুধার কারণে উহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়) তবে প্রথমে আহার গ্রহণ কর; যদিও (এরূপ ঘটনা) মগরেবের নামায পড়ার পূর্ব্বে হয়। আহারের পূর্ব্বে তাড়াহুড়া (করিয়া নামায আদায়) করিও না।

৪০৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কাহারও রাত্রের আহার সম্মুখে রাখা হয় এবং ঐ সময় নামাযের জমাত আরম্ভ হয় তবে সে প্রথমে রাত্রের আহার গ্রহণ করিবে। আহার গ্রহণ না করিয়া নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করিবে না, যাবৎ না আহার গ্রহণ হইতে অবসর হয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাঁহার জন্য খানা উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ সময় নামাযের জমাতও দাঁড়াইয়াছে—এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আহার গ্রহণ হইতে অবসর না হইয়া জমাতে আসেন নাই, অথচ (নামাযের জমাত এত নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল যে,) তিনি ইমামের কেরাত-শব্দ শুনিতে ছিলেন। এখানে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীছও আছে যে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেহ খাওয়া আরম্ভ করিলে আবশ্যক পরিমাণ পূর্ণ না খাইয়া উঠিবে না, যদিও নামাযের জমাত আরম্ভ হয়।

সাংসারিক কাজের জন্য জমাত ছাড়িবে না

৪০৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ঘরের কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন, কিন্তু যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হইত, তখনই তিনি সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত পরিচ্ছেদদ্বয়ের বিভিন্ন হাদীছসমূহের সমষ্টি দৃষ্টে মছআলাহ এই সাব্যস্ত হয় যে, মানবীয় প্রয়োজনের কোন বিষয়ের তাকিদে মনের আকর্ষণ অন্য দিকে ধাবমান হইলে নামাযের পূর্ব্বে সেই প্রয়োজন মিটাইয়া নেওয়া চাই ; যদিও তাহাতে জমাত ছুটিয়া যায়। যেমন পেটে ক্ষুধা রহিয়াছে এবং খাদ্য উপস্থিত আছে। এমতাবস্থায় জমাত আরম্ভ হইয়া গেলেও প্রথমে ক্ষুধা নিবারণ করা চাই। পক্ষান্তরে যদি মনকে বিচলিতকারী ক্ষুধা না থাকে তবে উপস্থিত খাদ্য ছাড়িয়া জমাতের প্রতি ধাবিত হইবে। এমনকি খাদ্য আরম্ভ করিলে উহা অসম্পূর্ণ ফেলিয়া চলিয়া যাইবে যেরূপ ১৫২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মানবীয় প্রয়োজন ভিন্ন জাগতিক বা সাংসারিক কাজের জন্য জমাতের প্রতি মোটেই অবহেলা করিবে না। সব কিছু ছাড়িয়া জমাতের জন্য ছুটিয়া যাইবে, যেরূপ ৪০৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

বিশিষ্ট তাবেয়ী যুরারা ইবনে আবু আওফা (রঃ) তিনি একজন কর্ম্মকার ছিলেন। তিনি তাঁহার হাতুড়ী উঠাইয়া মারিবার পূর্ব্বে আজান শুনিলে ঐ অবস্থায়ও হাতুড়ী ফেলিয়া নামাযে চলিয়া যাইতেন। (ফয়জুলবারী ২—২০৭)

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ক্ষুধার তাড়নায় জমাতের উপর আহার গ্রহণকে অগ্রগণ্য করার অনুমতি শুধু ক্ষুধার তিব্রতা নিবারণ পরিমাণের জন্য ; পেট পুরিয়া খাওয়ার জন্য নহে। সুতরাং কয়েক গ্রাস গ্রহণের পর জমাত পাওয়ার অবকাশ থাকিলে সেই চেষ্টা অবশ্যই করিবে ; সেই সুযোগ ছাড়িবে না।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই যে, ক্ষুধার তাড়নায় আহারের জন্য শুধু জমাত ছাড়া যায়, নামায কাজা করা জায়েয নহে। যদি নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ থাকে যে, আহারে লিপ্ত হইলে নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবে নামায কাজা হইয়া যাইবে ; তবে প্রাণ বাঁচিয়া থাকার অবকাশে শত কঠোর ক্ষুধার কারণেও আহার করিতে নামায কাজা করা জায়েয নহে।

এল্‌ম ও মর্য্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হইবার জন্য অগ্রগণ্য

৪০৮। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহার অন্তিমকালের রোগ শয্যায় পতিত হইলেন এবং তাঁহার রোগের প্রকোপ বাড়িয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আবু বকর নরম-দিল মানুষ ; তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া লোকদের নামায পড়াইতে সক্ষম হইবেন না। নবী (দঃ) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরোক্তি করিলেন। নবী (দঃ) ঐ কথাই বলিলেন—আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। ইউসুফ আলাইহে-

ছেলামের ঘটনার নারীদের ন্যায় তোমরাও আমাকে প্রভাবিত করিতে চাহিতেছ! অতঃপর আবু বকরের নিকট সংবাদদাতা পৌঁছিল। তখন হইতে আবু বকর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায়ই নামায পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

৪০৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিম রোগ যখন বাড়িয়া গেল তখন তাঁহাকে নামাযের জমাত সম্পর্কে বলা হইলে তিনি বলিলেন, আবু বকরকে বল, লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আবু বকর নরম-দিল মানুষ; তিনি (আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া) ক্রন্দনের দরুন কেরাতও পড়িতে পারিবেন না। হযরত (দঃ) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে বল, নামায পড়াইতে। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন (এবং হাফছাহ (রাঃ)কেও তাঁহার সমর্থনকারীণী বানাইলেন)। হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, আবু বকরকে নামায পড়াইতে বল; তোমরা ত (হযরত) ইউসুফের ঘটনার নারীদের ন্যায়। অর্থাৎ তাহারা যেরূপ ইউসুফ (আঃ)কে তাঁহার অভিরুচির বিপরিত জোলেখার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতে ছিল, তদ্রূপ তোমরাও আমাকে আমার অভিরুচির বিপরিত কথা বলিতেছ।

মছআলাহ ঃ—এলম, মর্য্যাদা ও কোরআন শরীফ পড়ায় কতিপয় ব্যক্তি সমপর্য্যায়ের উপস্থিত; সে ক্ষেত্রে বয়সে যিনি বড় তিনিই ইমাম হওয়ায় অগ্রগণ্য।

(৯৪ পৃঃ ৩৮৩ হাঃ)

নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত না থাকায় অন্য ইমাম জমাত আরম্ভ করার পর প্রথম ইমাম আসিয়া পৌঁছিলে ?

৪১০। **হাদীছ ঃ**—ছাহল্-ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আম্র-ইবনে আউফ গোত্রের একটি বিবাদ মিটাইবার জন্য তাহাদের বস্তিতে তশরীফ লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইল, এদিকে আছরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল, হযরতের মসজিদে ইমাম নাই। তখন মোয়াজ্জেন আবু বকর (রাঃ)কে অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আপনি জমাত পড়াইয়া দেন। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। জমাত আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তিনি পেছনের সারিসমূহ ভেদ করিয়া প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। (তিনি পেছনে থাকিলে তাঁহার সম্মুখের লোক বিচলিত হইবে।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমন আবু বকর (রাঃ)কে অবগত করাইবার জন্য মোক্তাদীগণ হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিল। আবু বকর (রাঃ) নামাযে এত মগ্ন থাকিতেন যে, নামায অবস্থায় কোন কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে

পারিত না, কিন্তু এই ঘটনায় যখন অত্যধিক শব্দ হইতে লাগিল, তখন তিনি আড়-চোখে একটু লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পেছনের দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে এরূপ না করার প্রতি ইশারা করিলেন। আবু বকর (রাঃ) হযরতের এই আদেশে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লার শোকর করিলেন, কিন্তু ইমামতের স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীর সারিতে সরিয়া আসিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইমাম হইলেন; তাঁহারই ইমামতিতে নামায সমাপ্ত হইল। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আদেশ রক্ষা করিয়া ইমাম থাকিলেন না কেন? আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আবু কোহাফার পুত্র তথা আবু বকরের পক্ষে উচিত নহে, সে আল্লার রসুলের সম্মুখে ইমামতি করে।

এই উপলক্ষে হযরত (দঃ) মোক্তাদীদিগকে বলিলেন, তোমরা হাত মারিয়া শব্দ করিলে কেন? নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষগণ—سبحان الله (সোব্‌হানাল্লাহ্) বলিবে—উহাতেই ইমামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে। অবশ্য মহিলাগণ এরূপ ক্ষেত্রে ডান হাত বাম হাতের পৃষ্ঠে মারিয়া শব্দ করিবে। (কারণ. মহিলাদের কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষকে শুনান চাই না।)

ব্যাখ্যা ঃ—এরূপ ঘটনার প্রকৃত মছআলাহ এই যে, যে ইমাম নামায আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই নামায সমাপ্ত করিবেন, নির্দ্ধারিত ইমাম মোক্তাদী হইয়া নামায পড়িবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপই করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবু বকর (রাঃ) যাহা করিয়াছিলেন উহা একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষত্ব ছিল; অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ করা হইলে সকলের নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

ইমামের অনুকরণ করা

৪১১। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার উপর হইতে পতিত হইয়া তাঁহার দেহের ডান পার্শ্ব ক্ষত হইয়া যায় এবং পা মচকিয়া যায়, তাই তিনি মসজিদে না যাইয়া স্বীয় অবস্থান গৃহেই নামায আদায় করিতেন। এমতাবস্থায় একদিন ছাহাবীগণ তাঁহার সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভ করিলেন, অসুস্থতার দরুন তিনি বসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। ছাহাবীগণ তাঁহার পেছনে নামাযে শরীফ হইলেন, কিন্তু তাঁহারা দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের প্রতি ইশারা করিলেন যে, তোমরাও আমার অনুসরণে বসিয়া নামায পড় এবং নামাযান্তে বলিলেন, মোক্তাদীগণ ইমামের

অনুসরণ করিবে—এই উদ্দেশ্যেই ইমাম নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। যখন ইমাম রুকু করিবে তখন তোমরাও রুকু করিবে যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইবে তখন তোমরাও মাথা উঠাইবে, যখন ইমাম বলিবে "ছামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ" তখন তোমরা বলিবে "রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ" যখন ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িবে, তোমরাও বসিয়া পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমামের অনুকরণ মোক্তদীদের জন্য অপরিহার্য্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একটি বিষয়ে নয়, অর্থাৎ ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িলে মোক্তাদীগণ বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়িতে পারিবে না, তাহাদের দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হইবে যেরূপ ৪০৩ নং হাদীছে আছে। অবশ্য ৪১১ নং হাদীছখানা ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাই এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) ৪০৩ নং হাদীছখানা পুনরায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ হাদীছখানা দ্বারা এই হাদীছখানার হুকুম মনছুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে। কারণ, ৪১১ নং হাদীছের ঘটনা বহু পূর্ব্বের এবং ৪০৩ নং হাদীছের ঘটনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ জীবনের। এই ঘটনাতে যখন আবু বকরের স্থলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, তখন তিনি অসুস্থতার দরুন বসিয়া নামায পড়িতে ছিলেন, মোক্তাদীগণ সকলেই হযরতের পেছনে নামাযে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী হাদীছ পূর্ব্বের হাদীছের বিপরীত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী হাদীছ মনছুখ (রহিত) পরিগণিত হয়।

মছআলাহ ঃ—মোক্তাদী রুকু-সেজদার মধ্যে ইমামের পূর্ব্বে মাথা উঠাইয়া যদি দেখে যে, এখনও ইমাম মাথা উঠায় নাই তবে মোক্তাদী অবশ্যই পুনঃ রুকুতে ও সেজদায় চলিয়া যাইবে (৯৫ পৃঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ফতওয়া)।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি ইমামের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িতেছে, যেমন—ফজর নামায। ভিড়ের কারণে সে প্রথম রাকাতেরও সেজদা করার অবকাশ পায় নাই, এমনকি সম্মুখ কাতারের মুছল্লীদের পিঠের উপর সেজদা করারও সুযোগ পায় নাই এবং দ্বিতীয় রাকাতের সেজদাও ইমামের সহিত করিতে সুযোগ পায় নাই। ঐ ব্যক্তি যখনই সুযোগ পাইবে, এমনকি ইমামের সালাম ফেরার পরে হইলেও প্রথমে দুইটি সেজদা করিবে ; ইহা তাহার দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা গণ্য হইয়া দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পূর্ণরূপে রুকু-সেজদা ইত্যাদির সহিত একা একা মছ্বুকের ন্যায় আদায় করিবে।

মছআলাহ ঃ—ইমামের সহিত নামায পড়া অবস্থায় মধ্যভাগে (অজ্ঞাতে বা তন্দ্রা ইত্যাদি কোন কারণে) রুকু বা সেজদা পূর্ণই ইমামের সহিত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করিয়া তারপর ইমামের সহিত পুনঃ দাঁড়াইবে। (৯৫ পৃঃ হাসান বছরী (রঃ) তাবেয়ীর ফতওয়া)

সাবধান! নামাযের মধ্যভাগে নয়, বরং নামায আরম্ভ করার সময় ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে তখন অনেকে নিজে নিজে রুকু করিয়া ইমামের সহিত সেজদায় মিলিত হয় এবং মনে করে, সে ঐ রাকাত ইমামের সহিত পাইয়াছে—ইহা ভুল। ঐ রাকাত ইমামের সহিত গণ্য নহে। ইমামের ছালামের পর ঐ রাকাত পূর্ণ আদায় না করিলে নামায হইবে না।

মোক্তাদীগণ কোন্ সময় সেজদার জন্য নত হইবে?

৪১২। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে দাঁড়াইবার পর যাবৎ তিনি সেজদায় চলিয়া না যাইতেন তাবৎ আমরা সেজদার জন্য নত হইতাম না?

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ মছআলাহ এইযে, রুকু, সেজদা ইত্যাদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে। যেমন অন্য হাদীছের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত আছে। কিন্তু যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইমামের সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সেজদা করার ফলে মোক্তাদীগণ ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে। যেমন ইমাম যদি বয়ঃপ্রাপ্ত বা ভারী শরীরের হয় বা অন্য কোন কারণ বশতঃ রুকু, সেজদায় ধীরে ধীরে যাইয়া থাকেন, যদ্দরুন মোক্তাদীগণ সাধারণভাবে রুকু, সেজদা করিতে গেলে ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীছ অনুযায়ী আমল করিবে, এই হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই। ইহা হযরতের বয়ঃপ্রাপ্তিকালের ঘটনা।

রুকু-সেজদা হইতে ইমামের পূর্ব্বে উঠিবার পরিণতি

৪১৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু বা সেজদা হইতে ইমামের পূর্ব্বে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মাথা বা তাহার আকৃতি গাধার ন্যায় করিয়া দিতে পারেন?

ক্রীতদাস গোলামও ইমামতি করিতে পারে

৪১৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম দিকে মোহাজেরীনদের যে দলটি মদীনায় আসেন তাঁহারা কোবা নগরীতে অবস্থান করিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরত করিয়া আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানে ইমামতি করিতেন আবু হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস ছালেম (রাঃ)। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কোরআনের অধিক অভিজ্ঞ।

মছআলাহ ঃ—ক্রীতদাস, অবৈধ গর্ভজাত সন্তান এবং নিম্ন শ্রেণীর (uncivilized) লোক যদি শিক্ষা ও পরহেজগারীতে উন্নত হয় এবং তাহার সমকক্ষ অন্য লোক উপস্থিত না থাকে তবে তাহাদের ইমামতিতে কোন দোষ নাই (৯৬ পৃঃ)।

নাবালক ছেলের ইমামতি কোন কোন মজহাবে জায়েয আছে, কিন্তু হানফী মজহাব মতে সাবালকদের ফরজ নামায নাবালকের ইমামতিতে শুদ্ধ হয় না।

ইমাম নামায পূর্ণাঙ্গ করে নাই মোক্তাদী পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে ঃ

৪১৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক (জবরদস্তিমূলক) ইমাম হইয়া তোমাদের নামায পড়াইবে। তাহারা যদি পূর্ণাঙ্গ সুন্দররূপে নামায পড়ায় তবে ত (তাহাদের এবং) তোমাদের (উভয়েরই) পূর্ণ ছওয়াব হইবে। আর যদি তাহারা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়ায় (কিন্তু তোমরা নিজেরা ত্রুটি না কর) তবে তোমাদের ছওয়াব পূর্ণই থাকিবে, ত্রুটির ক্ষতি শুধু তাহাদের উপর পড়িবে। (বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যাবলী ফতহুল বারী ২—১৪৯।)

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছের বাক্য "যদি তাহারা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়ায়" এই বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীছের উদ্দেশ্য মূল নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী বিষয়াবলী নহে ; বরং যাহা নামাযে শুধু ত্রুটি অর্থাৎ নামাযের সৌন্দর্য্য বিনষ্টকারী পরিগণিত। যেমন, নামাযে 'খুসু-খুজু'—আল্লাহ তায়ালার প্রতি এক ধ্যানে একাগ্রচিত্তে ধীর-স্থিরতার সহিত নামায পড়া, প্রয়োজনের অধিক শুদ্ধরূপে দোয়া তছবীহ্ ও কেরাত পড়া ইত্যাদি বহু রকমের মছআলাহ রহিয়াছে। এই সব সম্পর্কে ইমাম মোক্তাদী প্রত্যেকে নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্ন পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী কোন কাজ শুধু ইমামে একা করিলে মোক্তাদীদের সকলের নামাযও ফাছেদ হইয়া যাইবে। এমনকি যদি ইমাম উহা পুনঃ আদায় না করে তবুও মোক্তাদীদের উহা পুনরায় পড়া ফরজ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য যদি মোক্তাদী ইমামের ঐ কার্য্য জানিতে না পারে তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমামের মোক্তাদী হওয়া

৪১৬। হাদীছ ঃ—আ'দী ইবনে খেয়ার (রাঃ) খলীফা ওসমানের (রাঃ) নিকট গেলেন, যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহে আবদ্ধ ছিলেন এবং মদীনার মসজিদে বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমাম ছিল। সেই বিষয়েই আ'দী ইবনে খেয়ার ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোসলমানদের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা আপনি ; কিন্তু আপনার ত এই অবস্থা এবং বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমাম আমাদিগকে নামায পড়াইয়া থাকে ; এই ইমামের পেছনে নামায পড়া আমরা গোনাহ মনে করি। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া গিয়াছে ; এখন তাহাদের ভাল কাজে যোগদান কর, মন্দ কাজে শরীক হইও না। যেমতে নামায মোসলমানদের সর্ব্বোত্তম আমল, যখন সকলে এই আমলটি আদায় করে তখন তুমিও উহাতে যোগদান কর।

মছআলাহ ঃ—বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হয়। হাসান বছরী (রঃ)কে এই মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায পড় (জমাত ছাড়িও না) ; তাহার বেদাতের গোনাহ্ তাহার উপর থাকিবে।

এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। একটি এই যে—কোন ক্ষেত্রে কাহাকেও ইমাম বানাইতে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে যে, সে যেন বেদাতী না হয়। বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানান জায়েয নয় ; যাহারা বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে তাহারা গোনাহগার হইবে। কিন্তু কোন মসজিদে বা কোন ক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি ইমাম হইয়াছে যে বেদাতী এবং ঐ বেদাতী ইমামের জমাতে শামিল না হইলে জমাতহীন—একা নামায পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, এরূপ ক্ষেত্রে জমাত না ছাড়িয়া বেদাতী ইমামের জমাতে শামিল হইবে ; হাসান বছরী রহমতুল্লাহে আলাইহের ফতওয়ার মর্ম্ম ইহাই।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এস্থলে "বেদাত" বলিতে শুধু এরূপ গর্হিত কাজ উদ্দেশ্য যাহা ফাছেকী, কুফুরী বা শেরেকী গোনাহের কাজ বা ঐরূপ আকিদা ও মতবাদ ভিত্তিক কাজ নহে। ফাছেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়িবে না ; কুফুরী ও শেরেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলী স্বভাব-চরিত্র, মেয়েলী বেশ-ভূসা মেয়েলী চাল-চলন অবলম্বনকারীর পেছনে নামায পড়া শক্ত মকরূহ ; গত্যন্তরহীন অনিবার্য্য প্রয়োজন ছাড়া ঐরূপ লোকের পেছনে নামায পড়িবে না।

এরূপ দীর্ঘ ক্বেরাত পড়িবে না যাহাতে কর্ম্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ জমাতে যোগদানে বিরত থাকে

৪১৭। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) স্বীয় মহল্লার মসজিদে ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি সন্ধ্যার পর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতেন এবং এশার নামায পর্য্যন্ত তাঁহার খেদমতেই থাকিতেন। এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এশার জমাতে নামায পড়িয়া তারপর স্বীয় মহল্লার মসজিদে যাইয়া এশার নামাযের ইমামতী করিতেন। ইহাতে স্বভাবতঃই এই মসজিদে এশার নামায পড়িতে অধিক রাত্র হইয়া যাইত। একদা এই মহল্লাবাসী একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া সেও এই মসজিদে এশার নামাযের জমাতে আসিল। জমাতের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল একে ত মসজিদে উপস্থিত হইতেই বিলম্ব করিয়া থাকেন, তদুপরি অদ্য তিনি

(আড়াই ছিপারা ব্যাপী সুদীর্ঘ) ছুরা বাকারা আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্রমিক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া জমাত ছাড়িয়া দিল এবং একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মসজিদের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) নামাযান্তে এই খবর শুনিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতি ভর্ৎসনা করিলেন। ঐ ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং মোয়াজ ইবনে জাবালের নামে অভিযোগ করিল যে, তিনি আমাদের মসজিদের ইমাম, তিনি এশার নামায পড়াইতে অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়া থাকেন, তদুপরি তিনি ছুরা বাকারার ন্যায় সুদীর্ঘ ছুরা আরম্ভ করেন ; এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ ইবনে জাবালের প্রতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে মোয়াজ ; তুমি কি লোকদিগকে নামায হইতে তাড়াইতে চাও ? এই ভাবে তিনি তাঁহার প্রতি তিনবার কটাক্ষ করিলেন এবং সর্ব্বদার জন্য সতর্ক করতঃ والشمس وضحها - سبح اسم ربك الاعلى - والليل اذا কয়েকটি মধ্য আকারের ছুরার নাম বলিয়া এই সমস্ত ছুরা দ্বারা নামায পড়াইবার আদেশ দিলেন। (ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমার সঙ্গে নামায পড়িয়া তারপর দীর্ঘ ইমামতী করিতে পারিবে না। হয় ত শুধু আমার সঙ্গেই নামায পড়িবে, না হয় শুধু ইমামতীই করিবে, কিন্তু দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে না) এবং বলিলেন, তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জমাতের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও কর্ম্মব্যস্তগণও থাকিতে পারে। (৭৬নং হাদীছও এখানে উল্লেখ আছে।)

মছআলাহ ঃ কোন নামায একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার ঐ নামাযেরই ইমামতী করা জায়েয আছে (৯৮ পৃঃ ৪১৭ হাঃ)। ইহা কোন কোন ইমামের মত ; হানফী মজহাব মতে ঐরূপ করা জায়েয নহে ; ঐরূপ করিলে মোক্তাদীদের ফরজ নামায আদায় হইবে না। অবশ্য কোন নামাযের জমাত হইতেছে, এক ব্যক্তি অন্যত্র মোকারর ইমাম ; সে ঐ জমাতে শামিল হইয়াছে, কিন্তু নফলের নিয়্যত করিয়া শামিল হইয়াছে, অতঃপর নিজ মসজিদে যাইয়া ফরজের নিয়্যতে ঐ নামাযের ইমামতী করিয়াছে—ইহা হানকী মজহাব মতেও জায়েয আছে এবং এই অবস্থায় মোক্তাদীদের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বা ইমামের লম্বা নামায কারণ-বিশেষে তাহার পক্ষে অসহণীয় ; সেই ব্যক্তি ইমামের লম্বা নামায ত্যাগ করতঃ একা নামায পড়িলে তাহার গোনাহ হইবে না। অবশ্য জমাতের স্থান হইতে যথাসম্ভব দুরে বা নিজ গৃহে আসিয়া পড়িবে (৯৭ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—ইমাম (নিয়মিত সুন্নত তরিকা অপেক্ষা) অধিক লম্বা নামায পড়াইলে সে সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা যায় (ঐ)।

একাকী নামায পড়িলে দীর্ঘ নামায পড়িতে পারে

৪১৮। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন তুমি অন্য লোকদের ইমাম হও, তখন নামাযকে অধিক দীর্ঘ করিও না। কারণ, তাহাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও থাকে। আর যখন তুমি একাকী নামায পড় তখন যতদুর ইচ্ছা দীর্ঘ নামায পড়।

কম সময়ে নামায পড়িলেও আরকান-আহকাম সুষ্ঠুরূপে আদায় করিবে

৪১৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জমাতের) নামায অল্প সময়ে শেষ করিতেন। কিন্তু অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে আদায় করিতেন।

কোন কারণে অল্প সময়ে নামায শেষ করিয়া দেওয়া জায়েয

৪২০। **হাদীছ ঃ**—আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, আমি নামায আরম্ভ করি এবং উহা দীর্ঘরূপে পড়িতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আশপাশের শিশুদের ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া ঐ নামায অল্প সময়ে শেষ করিয়া দেই। কারণ, হয় ত ঐ শিশুদের মাতা জমাতে যোগদান করিয়াছে, সে বিচলিত হইবে।

৪২১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অল্প সময়ে নামায পড়িলেও যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করিতেন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি জমাতে নামায পড়ার সময় যদি আশপাশে শিশুদের ক্রন্দন শুনিতে পাইতেন, তবে অল্প সময়েই নামায শেষ করিয়া দিতেন। জমাতে যোগদান-কারিণী ঐ শিশুর মাতা যেন বিচলিত না হয়।

নামাযে কাঁদিলে

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী, তিনি বলেন—আমি জমাতে নামায পড়িতে ছিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ) ইমাম ছিলেন। আমি পেছনের সারিতে দাঁড়াইয়াছিলাম। ওমর (রাঃ) নামায অবস্থায় (খোদার ভয়ে) উদ্‌গত ক্রন্দন চাপিয়া রাখার দরুন তাঁহার সীনা ও কণ্ঠনালীর ভিতরে যে শব্দ হইতেছিল, আমি পেছনে থাকিয়াও তাহা শুনিতে ছিলাম।

মছআলাহ ঃ—আল্লাহ তায়ালার প্রতি কাতরতা অনুরক্তি বা ভয়ের প্রভাবে যে কোন প্রকারে কাঁদিলে নামায নষ্ট হইবে না ; অন্য কারণে সশব্দে কাঁদিলে নামায ফাছেদ হইবে।

একামত আরম্ভেই কাতার সোজা করিবে, প্রয়োজন হইলে পরেও উহার জন্য তৎপর হইবে

৪২২। **হাদীছ ঃ**—عن النعمان بن بشير ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ -

অর্থ—নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, খবরদার হুশিয়ার। তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—নামাযের মধ্যে কাতার বাঁকা করিয়া দাঁড়ান একটি সাধারণ বিষয় মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কুফল বড়ই মারাত্মক। ইহার দরুন আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের বিরোধ, বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দেন। বর্ত্তমান মোসলমানদের অবস্থা দেখিলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। পরস্পর বিভেদ ও বিবাদ বড় শাস্তি যাহা জ্ঞানীমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু স্থানে ইহুদ ও নাছারাদের উপর স্বীয় গজব ও আজাবের উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"আমি তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।"

মূল হাদীছটির অর্থ এরূপও বলা হয়, তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি বিকৃত করিয়া দিতে পারেন।"

কাতার সোজা করিতে ইমাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে

৪২৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নামাযের একামত শেষ হইয়া গেলে পর, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সোজা সারিবদ্ধভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া দাঁড়াও। স্মরণ রাখিও আমি পেছনের দিকেও তোমাদিগকে দেখি। (২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।)

কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

৪২৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—কাতার সোজা কর। কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৪২৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও। কারণ, উহার উপর নামাযের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

কাতার সোজা এবং পূর্ণ না করা গোনাহ

৪২৬। হাদীছ ঃ—(রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু দিন পর) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বছরা হইতে মদীনায় আসিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার অনুপাতে আমাদের মধ্যে কি কি দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান ? তিনি বলিলেন 'অন্য কোন দোষ বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে চাই না, কিন্তু এই একটি দোষ যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কাতার ঠিক ও দুরস্ত কর না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এস্থানে ৩৯৭ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম কাতারের ফজিলত অনেক বেশী।

পরস্পর লাগালাগি হইয়া সারি বাঁধিবে ফাঁক রাখিবে না

ছাহাবী নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের (তথা ছাহাবীদের) প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এবং পরস্পর পায়ের গিঁঠ মিলাইয়া নামাযে দাঁড়াইতেন।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জমাতে নামায পড়িতে) আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইতেন।

পাঠকবৃন্দ! একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পরস্পর পা মিলাইয়া দাঁড়ানের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বস্তুতঃ একে অন্যের পায়ের সহিত পা মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। সে জন্যই এখানে কাঁধের এবং পায়ের গিঁঠেরও উল্লেখ আছে ; অথচ সারি বাঁধিতে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলান সহজ ব্যাপার নহে এবং পায়ের গিঁঠে গিঁঠ মিলান ত সম্ভবই নহে। এখানে এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা বস্তুতঃ দুইটি বিষয়ে তৎপর হওয়ার আদেশ করাই আসল উদ্দেশ্য। প্রথম—এই যে, খুব সোজাভাবে সারি বাঁধিবে ; যেরূপ কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইলে স্বভাবতঃই উহা হইয়া থাকে এবং কাতার সোজা করার ইহা অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়—এই যে, যথাসাধ্য লাগালাগি দাঁড়াইবে ; মধ্যভাগে ফাঁক ছাড়িবে না।

অনেক হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, মধ্যভাগে একটু মাত্র ফাঁক থাকিলে শয়তান সেখানে আসিয়া প্রবেশ করে (নামাযীদের অন্তরে ওছ্‌ওয়াছার সৃষ্টি করে)।

আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তি কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলানের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আনাছ (রাঃ) তাঁহার উক্তির ভিত্তি নিয়ে বর্ণিত হাদীছটির উপর স্থাপন করিয়াছেন।

৪২৭। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى……

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কাতার খুব সোজা করিবে; আমি আমার পেছন দিকেও দেখিয়া থাকি*। আনাছ (রাঃ) বলেন—সেমতে আমাদের প্রত্যেকেই কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলাইয়া থাকিত।

মহিলা একজন হইলেও একাই সকলের পেছনে দাঁড়াইবে

৪২৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের গৃহে (নফল) নামায পড়িলেন। আমি এবং অন্য একটি বালক—হযরতের পেছনে দাঁড়াইলাম, আর আমার মাতা উম্মে-ছোলায়ম আমাদের পেছনে দাঁড়াইলেন।

ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে আড়াল থাকিলে ?

হাছান বছরী (রঃ) বলেন, ইমাম ও মোক্তাদীদর মধ্যে (ছোট) নালা থাকিলে দোষ নাই। আবু মেজ্‌লায (রঃ) বলেন, মধ্যভাগে (ছোট) রাস্তা বা দেওয়াল থাকিলেও ইমামের সঙ্গে এক্তেদা শুদ্ধ হইবে যদি ইমামের রকু-সেজদা জানিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—বড় রাস্তা বা খাল ইত্যাদি মধ্যস্থলে ফাঁকা রাখিয়া উহার অপর পারে দাঁড়াইয়া এক্তেদা করিলে সেই এক্তেদা শুদ্ধ হইবে না। ইমামের আড়ালে এমন স্থানে এক্তেদা শুদ্ধ নহে যে স্থান হইতে ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা ইত্যাদি জ্ঞাত হইবার ব্যবস্থা নাই। যদি সেই ব্যবস্থা করা হয় বা ইমামের তকবীরের আওয়াজ শুনা যায় তবে এক্তেদা শুদ্ধ হইবে।

৪২৯। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহ সংলগ্ন যে ছাদহীন ঘেরাও করা স্থানটি ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। ঐ ঘেরাওএর দেওয়ালটি নীচু

* নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছন দিকেও দেখা সম্পর্কে ২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।

ছিল ; তাই একদা কয়েকজন লোক তাঁহাকে নামায পড়িতে দেখিয়া (দেওয়ালের অপর পার্শ্ব হইতে) তাঁহার সহিত এক্তেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল। সকাল বেলা তাহারা পরস্পর এ বিষয়ে বলাবলি করিলে দ্বিতীয় রাত্রে আরও কয়েকজন লোক জুটিয়া গেল. তাহারাও এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়িল। দুই-তিন রাত্র তাহারা এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত তাহাজ্জুদ পড়িল। তারপরের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন না। সকালবেলা সকলেই তাঁহার নিকট এ বিষয় আলোচনা করিলে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছিল, এরূপে সমবেতভাবে তোমরা তাহাজ্জুদকে পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাজ্জুদকে তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দিতে পারেন। (তাহাতে উম্মতের উপর একটি ফরজের চাপ বাড়িয়া যাইত। হযরত (দঃ) সর্ব্বদা উম্মতের জন্য সহজ পন্থা কামনা করিতেন।)

৪৩০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চাটাই ছিল ; (মসজিদে এ'তেকাফকালে) দিনের বেলা তিনি উহা বিছাইতেন এবং রাত্রিকালে উহা দ্বারা ঘেরাও করিয়া ভিতরে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। কয়েকজন লোক খোঁজ পাইয়া ঐ ঘেরার পেছন হইতে তাঁহার সঙ্গে এক্তেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল।

৪৩১। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মসজিদে এ'তেকাফ করিলেন এবং মসজিদের ভিতরেই চাটাই দ্বারা ঘেরাও করিয়া উহাতে তিনি (রাত্রে তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন ; ছাহাবীগণও ঐ ঘেরার বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে এক্তেদা করিয়া ঐ নামাযে শরীক হইতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি পূর্ব্ব দিনের ন্যায় লোকগণ তাঁহার সঙ্গে শামিল হওয়ার সুযোগ পায় সেইরূপে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হইতে বিরত থাকিলেন ; (এমনকি ছাহাবীগণ যখন দেখিলেন যে. তিনি আজ পূর্ব্বের ন্যায় নামায আরম্ভ করিতেছেন না,) তাঁহারা ভাবিলেন—বোধ হয় তিনি আজ নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন বা অন্য কাজে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি। তাই তাঁহারা হযরতের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে গলা খাকরান আরম্ভ করিলেন। (কিন্তু হযরত (দঃ) কিছুতেই সাড়া দিলেন না।) পরদিন হযরত (দঃ) সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে তোমরা যাহা কিছু করিয়াছ আমি সব উপলব্ধি করিয়াছি ; (আমি যাহা করিয়াছি ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছি। ফরজ ভিন্ন অন্য নামাযের জন্য জমাতের এরূপ পাবন্দি আমি করি নাই। তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল) নামায তোমরা নিজ নিজ ঘরে পড়িবে। ফরজ ভিন্ন অন্য নামায নিজ নিজ ঘরে পড়াই শ্রেয়।

নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে হাত উঠাইবে এবং হাত কতদূর উঠাইবে

৪৩২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—যখন নামায আরম্ভ করার জন্য তকবীর বলিতেন তখন তিনি উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইতেন ; এত দুর যে, (হাতের তালু) কাঁধ বরাবর উঠিত।* রুকুতে যাইবার জন্য তকবীর বলার সময়ও ঐরূপ হাত উঠাইতেন এবং রুকু হইতে উঠিয়া "ছামিয়াল্লাহু লেমান-হামিদাহ" বলার সময়ও হাত উঠাইতেন এবং "রাব্বানা ওয়া-লাকাল-হামদু" বলিতেন। কিন্তু সেজদায় যাইবার সময় বা সেজদা হইতে উঠিবার সময় হাত উঠাইতেন না।

৪৩৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন এবং যখন রুকুতে যাইতেন ও রুকু হইতে উঠিতেন এবং দুই রাকাতের পর অর্থাৎ প্রথম আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসা হইতে যখন দাঁড়াইতেন তখনও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

৪৩৪। **হাদীছ ঃ**—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) যখন তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন, আর রুকুতে যাইবার পূর্ব্বে এবং রুকু হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(এই হাদীছটি "নাছায়ী শরীফে" ছহীহরূপে বর্ণিত আছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ আছে, সেজদায় যাওয়ার পূর্ব্বে এবং সেজদা হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন)।

ব্যাখ্যা ঃ—নামায আরম্ভ করার তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে ইহাতে দ্বিমত নাই। অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইবার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা ভিন্ন অন্যান্য ইমামগণ ৪৩২ নং হাদীছ অনুযায়ী আরও দুই স্থানে হাত উঠাইবার মত প্রকাশ করেন। আবু হানিফা (রঃ) প্রথম স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইতে বলেন না। তাঁহার দলীল এই যে—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এ বিষয় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

---

* নামাযের মধ্যে হাত কি পর্য্যন্ত উঠাইবে সে বিষয়ে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে—কানের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত, কানের লতি পর্য্যন্ত এবং কাঁধ পর্য্যন্ত। উক্ত হাদীছসমূহ দৃষ্টে সর্ব্বোত্তম পন্থা এই যে, হাত এতদুর উঠাইবে যে, হাতের অঙ্গুলী কানের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি পর্য্যন্ত এবং হাতের তালুর অংশ কাঁধ পর্য্যন্ত পৌছে।

রীতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ও কার্য্যে দেখাইয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভের তকবীরের সময় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে হাত উঠাইতেন না।*

পাঠকবৃন্দ। স্মরণ রাখিবেন, এখানে ইমামগণের যে মতভেদ আছে ইহা অতি সামান্য। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য এই যে, প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি ছিল—রুকু, সেজদা ইত্যাদি প্রত্যেক উঠা-বসার ক্ষেত্রে হাত উঠান। যেমন—৪৩২, ৪৩৩ ও ৪৩৪ নং হাদীছসমূহকে সমষ্টিগতভাবে লক্ষ্য করিলেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে হযরত (দঃ)ই উহা শিথিল করিয়া রীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন, ৪৩২ নং হাদীছের দ্বারা ৪৩৩ ও ৪৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিকে শিথিল করা হয়। লক্ষ্য করুন—৪৩৪ নং হাদীছে সেজদার সময় হাত উঠাইবার বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২ নং হাদীছে উহার বিপরীত উল্লেখ হইয়াছে এবং ৪৩৩ নং হাদীছে দুই রাকাত হইতে দাঁড়াইয়া হাত উঠাইবার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২ নং হাদীছে তাহা নাই। অতঃপর ৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিও পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই ৪৩২ নং হাদীছ বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেই শেষ পর্য্যন্ত রুকু ইত্যাদিতে হাত উঠান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ)ও তদ্রূপই করিতেন, আরও অসংখ্য ছাহাবী এইরূপই করিতেন। তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, সর্ব্বপ্রথম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানসমূহে হাত উঠাইবার রীতি রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; উহা সুন্নত রূপে পরিগণিত থাকে নাই, তবে এখনও কেহ ঐরূপ করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।

অন্যান্য ইমামগণ ঐ একমাত্র ৪৩২ নং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, উক্ত হাদীছে বর্ণিত দুই স্থানে হাত উঠানও সুন্নতরূপে প্রচলিত আছে ও থাকিবে। তবে তাঁহারাও বলেন যে, কেহ এইরূপ না করিলে তাহরে নামায নষ্ট হইবে না। সুতরাং এই সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা অজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে।

নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে

৪৩৫। হাদীছ :—সাহল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে এই আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নামাযের মধ্যে (দাঁড়ান অবস্থায়) লোকেরা ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে।

---

* আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই হাদীছখানা নাছায়ী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হাদীছটি নিঃসন্দেহে ছহীহ প্রমাণিত হইয়াছে।

নামাযে আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতা বজায় রাখা কর্ত্তব্য

৪৩৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি ধারণা করিয়া থাক যে, আমার দৃষ্টি একমাত্র কেবলার দিকে ; (আমি পেছন দিকের খবর রাখি না ?) আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমরা কিরূপ রুকু কর, আল্লার প্রতি কতটুকু ধ্যান ও মগ্নতা রাখ তাহা সবই আমি জ্ঞাত থাকি। আমি আমার পেছনেও দেখিতে পাই। তোমরা রুকু-সেজদা ভালরূপে আদায় করিও। (২৭১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।)

নামায আরম্ভ করিতে তকবীর বলার পর কি পড়িবে ?

৪৩৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীরে-তাহরীমা ও কেরাত আরম্ভ করার মধ্যে অল্প সময় চুপে চুপে কিছু পড়িতেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ! আপনি চুপ থাকাবস্থায় কি পড়েন ? তিনি বলিলেন, এই দোয়া পড়িয়া থাকি—

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - *

অর্থ ঃ—হে খোদা। আমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ ও কুকর্ম্ম হইতে এত অধিক দূরে রাখ যেরূপ দূরত্ব সূর্য্য উদয় ও অস্তের স্থানদ্বয়ের মধ্যে আছে। (অর্থাৎ আমাকে পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আর যদি আমারই ত্রুটির দরুন কোন পাপ আমার দ্বারা সংগঠিত হইয়া যায়, তবে) হে খোদা! (আমার গোনাহসমূহকে মাফ করিয়া) আমাকে এরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়ের ময়লা দুর করিয়া পরিষ্কার করা হয়। (যাবৎ একটুও ময়লা বা দাগ থাকে উহার ধৌত কার্য্য ক্ষান্ত হয় না।) হে খোদা। আমার গোনাহসমূহকে ঠাণ্ডা পানি, বরফের পানি ও শিলার পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও।

---

* এখানে অন্যান্য দোয়াও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে ; একাকী নামায পড়াকালে বিভিন্ন দোয়া পড়া চাই, অবশ্য জমাতের নামাযে যেহেতু দীর্ঘতা অবলম্বন না করা উত্তম, তাই জমাতের সময় এস্থনে হানফীগণ "ছানা" অবলম্বন করেন যাহা তিরমিজী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন—ধৌত কার্য্যের জন্য ত গরম পানি শ্রেয়; ঠাণ্ডা ও বরফের পানি নয়।

উত্তর—লক্ষ্য করুন! আপনি একটি আমের আঁটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে কিছুদিন পর ঐ আমের আঁটিই আপনার সম্মুখে মাটির উপর আম গাছ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে তেমনিভাবে ইহজগতে আমরা যে পাপ কার্য্য ও গোনাহ করিতেছি, পরকালে এ সমস্ত পাপ ও গোনাহসমূহই দোযখের আগুনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তাই গোনাহের পরিণতি ও আকৃতি হইল আগুন; আগুনকে সমূলে নির্ব্বাপিত করিতে বরফ ও শিলার পানির ন্যায় ঠাণ্ডা পানিই শ্রেয়। অতএব গোনাহ ধৌতের ক্ষেত্রে শিলা ও বরফের পানির উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণই বটে।

৪৩৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) নামাযের মধ্যে আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন হইতে ক্বেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ক্বেরাত অর্থ সশব্দে পড়া; নামাযের মধ্যে "আলহামদু" হইতে সশব্দে পড়া আরম্ভ হয়। এর পূর্ব্বে ছানা, তাআউজ, বিছমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া হইয়া থাকে। উপরোক্ত হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, আল্‌হামদুর পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ ইত্যাদি সশব্দে পড়িতেন না। কিন্তু বিছমিল্লাহ ইত্যাদি চুপে চুপে পড়িতে হইবে তাহা অন্যান্য হাদীছে উল্লেখ আছে।

নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকান জায়েয নহে

৪৩৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ভীষণ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, যাহারা নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকায়, তাহারা অনর্থক এরূপ কেন করে? নবী (দঃ) আরও বলিলেন, তাহারা যদি তাহাদের এই অভ্যাস হইতে বিরত না থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখা জায়েয নহে

৪৪০। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহার দ্বারা শয়তান মানুষের নামায হইতে ছোঁ মারিয়া কিছু অংশ লইয়া যায় (অর্থাৎ নামাযকে পঙ্গু করে)।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মোক্তাদী তাহার ইমামের প্রতি তাকাইলে নামায নষ্ট হয় না (১০৩)।

মছআলাহ ঃ—নামাযের মধ্যে কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে শুধুমাত্র কোণ-চোখে উহার দিকে লক্ষ্য করা বা নামাযান্তের কর্ত্তব্য বিষয়ক সম্মুখস্ত কোন

বস্তুর প্রতি শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাকান—যেমন, মসজিদের দেওয়ালে থুথু ইত্যাদি থাকিলে নামাযান্তে উহা পরিষ্কার করিতে হইবে, তাই উহার প্রতি তাকান জায়েয আছে (১০৪ পৃঃ ২৬৬, ৪১০ হাঃ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে ২৪৮ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দূরের কোন বস্তু নয়, স্বয়ং নামাযী ব্যক্তির শরীরের কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য করা যাহাতে নামাযের একাগ্রতায় ত্রুটি আসে তাহাও বিশেষভাবে বর্জ্জনীয়।

নামাযে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই কেরাত পড়া ওয়াজেব

৪৪১। **হাদীছ ঃ**—ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে আলহামদু ছুরা না পড়িবে তাহার নামায হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ব্যতীত অন্যান্য অনেকেই ইমাম মোক্তাদী উভয়কেই এই হাদীছের আওতাভুক্ত করিয়া বলেন যে, ইমাম এবং ইমামের পেছনে প্রত্যেক মোক্তাদিকেই আলহামদু ছুরা পড়িতে হইবে ; ইমাম বোখারী (রঃ)ও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু অন্য বড় বড় মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন, এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ঐ নামাযী ব্যক্তি যে কোন ইমামের সঙ্গে মোক্তাদি না হয়। কারণ, মোক্তাদীদের জন্য ভিন্ন দুইটি বিশেষ হাদীছ বর্ণিত আছে। প্রথম হাদীছটির মর্ম্ম এই যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ইমামের সঙ্গে একতেদা করিলে কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়, যেমন—ইমাম 'ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলিলে মোক্তাদি উহা না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলিবে। তেমনিভাবে و اذا قرا فانصتوا ইমাম যখন পড়িবে তখন মোক্তাদিগণ (পড়ায় লিপ্ত না হইয়া) চুপ থাকিবে—(মোসলেম শরীফ)। দ্বিতীয় হাদীছটি—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামের একতেদা করিবে, ইমামের কেরাতই তাহার পক্ষে কেরাত বলিয়া গণ্য হইবে (সে নিজে কেরাত পড়িবে না)। [ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

এই বক্তব্য অনুসারে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, মোক্তাদি আলহামদু ছুরাও পড়িবে না।

পাঠকবৃন্দ ! এখানেও ইমামগণের মতভেদ অতি সামান্য বিষয়ে। ইহা শুধু নিয়ম ও পদ্ধতির বিভিন্নতা* উভয় নিয়মেই মূল নামায শুদ্ধ হইবে, ইহাতে দ্বিমত নাই।

---

* অন্যান্য ইমামগণ যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন উহা সুফলপ্রসুই বটে, কারণ মোক্তাদীগণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিলে তাহাদের মন নানা চিন্তা ও খেয়ালে মত্ত হইবে,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিভিন্ন নামাযের মধ্যে কেরাতের বিবরণ

৪৪২। **হাদীছঃ**—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে

তাহাদের অন্তরে নানা অছওয়াছা উদয় হওয়ার সুযোগ পাইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত নিয়মের তাৎপর্য অতি গভীর যে—আলহামদু ছুরাটি হইল আল্লার দরবারে আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা। আলহামদু ছুরার অর্থ ইহাই প্রমাণ করে, তা ছাড়া ইহার দ্বিতীয় নাম হইল "তা'লিমুল-মছআলাহ" অর্থাৎ দরখাস্তের মুসাবিদা। বাদশার দরবারে যখন একদল লোক কোন দরখাস্ত পেশ করিতে উপস্থিত হয় তখন অবশ্য দরবারের আদব-কায়দা সকলেরই আদায় করিতে হয়, কিন্তু আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা বা যাহা কিছু বলার দরকার হয় তাহা একমাত্র তাহাদের নেতাই বলিয়া থাকেন। সকলে এক সঙ্গে বলা আরম্ভ করে না, বরং তাহারা চুপ করিয়া বাদশার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁহার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং আরজ সমাপ্তে সমর্থনসূচক কোন একটি শব্দ বলিয়া দেয় মাত্র। এখানেও তদ্রূপই—তক্‌বীর, তছবীহ এবং রুকু-সেজদা ইত্যাদি সম্ভাষণ ও আদব-কায়দা সকলেরই তামীল করিতে হইবে। আলহামদু ছুরার দ্বারা আরজী ও দরখাস্ত শুধু নেতাই (ইমাম) পেশ করিবেন। মোক্তাদিগণ সকলে আল্লার দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকিবে এবং ইমাম কর্ত্তৃক দরখাস্ত পড়ার শব্দ শুনা গেলে উহার প্রতিটি অক্ষরের প্রতি একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য রাখিবে ও দরখাস্ত সমাপ্তে সম্মতিসূচক শব্দ 'আমীন' বলিবে। "আমীন" অর্থ—আমিও ইহাই চাই বা হে আল্লাহ কবুল করুন।

পাঠকগণ! লক্ষ্য করিবেন; এখানে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য দুইটি বিষয়ের সমষ্টি। প্রথম—মোক্তাদি চুপ করিয়া থাকিবে; আলহামদু ছুরা পড়িবে না। দ্বিতীয়—তাহার অন্তর আল্লার ভয়-ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবে পরিপূর্ণ রাখিবে, অছওয়াছাহ বা অন্য খেয়াল তাহার অন্তরে যেন বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। সে যেন আল্লার দরবারে হাজির হইয়াছে, সে যেন আল্লাহকে দেখিতেছে; আল্লাহও তাহাকে দেখিতেছেন; এই অবস্থা তাহার উপর প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। সে জন্যই হাদীছে বলা হইয়াছে— الصلوة معراج المؤمن "প্রত্যেক মোমেনকে তাহার নামায মে'রাজ (আল্লার দরবারে উপস্থিতি) রূপে পরিগণিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিষয়টিই ইমাম আবু হানিফার আসল উদ্দেশ্য। ইহারই প্রতি বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি ইমামের পেছনে থাকাকালীন আলহামদু ছুরা পড়িব কি? তিনি বলিলেন—ان لك فى الصلوة لشغلا "তোমার উপর নামাযের মধ্যে একটি অতি বড় বিশাল মগ্নতা ও ধ্যানের চাপ রহিয়াছে, তুমি উহাতেই নিয়োজিত থাক।"

আফছুছ! বর্ত্তমান হানফী মজহাবের নামধারীরা প্রথম বিষয়টির প্রতি খুবই আগ্রহান্বিত; কারণ উহা সহজ আরামদায়ক। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য আদৌ কোন চেষ্টা করে না, ইহাতে ইমাম আবু হানিফার মজহাবের অনুসরণ হয় না বরং অবমাননা করা হয়।

অন্য ছুরাও পড়িতেন; সময়ে কোন আয়াত সশব্দে পড়িতেন (যদ্দারা আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম)। শেষের দুই রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতে দীর্ঘ ক্বেরাত পড়িতেন। আছরের নামাযেও তদ্রূপই করিতেন। ফজরের নামাযেও প্রথম রাকাতে দীর্ঘ ক্বেরাত পড়িতেন।

৪৪৩। **হাদীছ :**—আবু মা'মার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি জোহর ও আছরের নামাযে কোরআন পড়িতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা আপনারা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? (উক্ত দুই ওয়াক্তের নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিছু পড়া হয় না।) তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ি মোবারক যে নড়াচড়া করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম।

৪৪৪। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছুরা "ওয়াল্‌-মোর্‌সালাত" তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা উহা শুনিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র! তুমি আমাকে একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। এই ছুরাটি শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালের কথা আমার মনে পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমি সর্ব্বশেষ যে নামায পড়িয়াছিলাম উহা মগরেবের নামায, সেই নামাযে তিনি এই ছুরাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

৪৪৫। **হাদীছ :**—জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মগরেবের নামায পড়িতেছিলাম, সেই নামাযে তিনি (২৭ পারার) ছুরা "ওয়াত-তুর" পড়িলেন। ঐ ছুরার নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির বিষয়বস্তু এরূপভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল যে, উহা শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেন আমার প্রাণ-পাখী উড়িয়া চলিয়া যাইবে।

أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ - أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ -

অর্থ :—(আল্লাহ তায়ালা এখানে নাস্তিকতার মতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক তিরস্কার স্বরূপ বলিতেছেন—) জগদ্বাসী কি কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি হইয়াছে? বা তাহারাই কি পরস্পর একে অন্যকে সৃষ্টি করিয়াছে? এই সমস্ত আসমান, জমিনকেও তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে কি? (এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে,) কিন্তু তাহারা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারপর আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করুন যে—যে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ তাহারা

ভোগ করিতেছে তাহা কি তাহারা তাহাদের পালনকর্ত্তার ভাণ্ডার হইতে পাইতেছে, না সক্রিয় ভাবে তাহারাই উহার উৎস? (৭২০ পৃঃ)

অর্থাৎ যাহারা নাস্তিক—যাহারা আল্লার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায় না তাহাদিগকে তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলুন। প্রথম প্রশ্ন—তাহারা কি সৃষ্ট না স্রষ্টা। যদি সৃষ্ট হয় তবে নিশ্চয় কোন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন; কারণ, কর্ত্তা ব্যতিরেকে ক্রিয়া ও কর্ম্ম হইতে পারে না। আর যদি তাহারা নিজেকেই (পরস্পর একে অন্যের) স্রষ্টা বলিয়া ধারণা করে তবে প্রশ্ন করুন যে, এই সপ্ত আকাশ ও বিশাল ভূমণ্ডলের স্রষ্টাও কি তাহারাই। আরও প্রশ্ন করুন, তাহারা জীবন ধারণের জন্য সে সমস্ত সম্পদ উপভোগ করিয়া থাকে; যেমন—অগ্নি, বায়ু, পানি, মাটি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত দৈহিক ও ইন্দ্রিয় শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে; যেমন—হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদির শক্তি এবং অর্থ-সামর্থ্য, কৃষি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে উন্নতি করার জন্য ভিতরের বা বাহিরের যে সমস্ত শক্তি ও পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে; যেমন—বুদ্ধি বিবেক, মস্তিষ্ক ও (Raw materials) উপাদান পদার্থ সমূহ। এসব সম্পদ, শক্তি ও পদার্থ সমূহের উৎস কোথায়? তোমরা কি নিজে নিজেই সক্রিয় ভাবে এ সবের অধিকারী? না তোমাদের কোন পালনকর্ত্তা আছেন যিনি তোমাদিগকে এসব যোগাইতেছেন এবং স্বীয় কৃপাবলে দান করিতেছেন?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এমন নয় যে, তাহাদের মনে উহা জাগে না। নিশ্চয় এ সবের সঠিক সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ঐ জাগ্রত ভাবকে অবহেলারূপে অবজ্ঞা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারাও নির্জ্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এই সকল প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিয়া দেখুন; আপনার মন আপনাকে যেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তার প্রতি ধাবিত করে তাঁহার কি হক্ক ও স্বত্ব আপনার উপর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাও চিন্তা করুন। দেখিবেন আপনার হৃদয়-পাখীও যেন উড়িয়া যাইতে চাহিবে। যেমন উক্ত ছাহাবীর অবস্থা হইয়াছিল।

৪৪৬। হাদীছঃ—ছাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) তাঁহাদের দেশের শাসনকর্ত্তা মারওয়ানকে বলিলেন, আপনি মগরেবের নামাযের মধ্যে শুধু ছোট ছোট ছুরাই পড়িয়া থাকেন। অথচ আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মগরেবের নামাযে অতি দীর্ঘ ছুরা (আ'রাফ)ও পড়িতে শুনিয়াছি।

৪৪৭। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে ছিলেন। আমি তাঁহাকে নামাযের মধ্যে ছুরা "ওয়াত্তীন" পড়িতে শুনিয়াছি। তিনি যেরূপ শুদ্ধ ক্বেরাত ও খোশ-এলহানে পড়িয়া ছিলেন, ঐরূপ আর কাহারও মুখে শুনি নাই।

৪৪৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নামাযের সব রাকাতেই কোরআনের অংশবিশেষ পড়িতে হয়—যে সব নামাযে রসুলুল্লাহ (দঃ) সশব্দে ক্বেরাত পড়িতেন আমরাও সেই নামাযে ঐরূপই পড়িব। যে সব নামাযে তিনি নিঃশব্দে পড়িতেন সেই নামাযে আমরাও ঐরূপই পড়িব। (তিনি আরও বলেন—) তুমি যদি (অন্য ছুরা না জানার দরুন) শুধু আলহামদু ছুরা দ্বারা নামায পড় তবুও তোমার নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু (যথা সত্বর) অন্য ছুরা (শিক্ষা করিয়া উহা) ছুরা আলহামদুর সহিত মিলাইয়া নামায আদায় করাই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

৪৪৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেকটি কাজ আল্লার হুকুম অনুসারেই করিতেন—যে স্থানে যাহা পড়িতেন (যেমন নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়িতেন) আল্লার আদেশেই তাহা পড়িতেন এবং যে স্থানে যাহা না পড়িতেন (যেমন—ফরজ নামাযে শেষ দুই বা এক রাকাতে শুধু ছুরা আলহামদু পড়িতেন, অন্য ছুরা পড়িতেন না) তাহাও আল্লার আদেশেই করিতেন। (ইহা সর্ব্বজন-বিদিত সত্য যে,) আল্লার কোন কার্য্যেই ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাই জগদ্বাসীর জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শের ন্যায় (ত্রুটিহীন) উত্তম আদর্শ আর হইতে পারে না।

ছুরার অংশবিশেষ বা এক রাকাতে দুই ছুরা পড়া

● একদা নবী (দঃ) ফজরের নামাযে ছুরা "মুমেনুন" পড়া আরম্ভ করিলেন। উক্ত ছুরায় হযরত মূছা ও হারুনের কিম্বা হযরত ঈসার আলোচনার আয়াতে পৌঁছিলে হযরতের হাঁচি আসিল। হযরত (দঃ) ওখানেই ক্বেরাত ক্ষান্ত করিয়া রুকুতে চলিয়া গেলেন।

● একদা ওমর (রাঃ) ফজরের প্রথম রাকাতে ছুরা বাকারা হইতে একশত বিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একশত আয়াত হইতে কম পরিমাণের অন্য একটি ছুরা পড়িলেন।

● একদা ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম রাকাতে ছুরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে শেষ ৪।৫ পারার মধ্য হইতে একটি ছুরা পড়িলেন।

● একটি ছুরা ভাগ করিয়া উভয় রাকাতে পড়া বা প্রথম রাকাতে যেই ছুরা পড়িয়াছে দ্বিতীয় রাকাতে পুনরায় ঐ ছুরাই পড়া সম্পর্কে তাবেয়ী কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই ; সবই আল্লাহ্ তায়ালার কেতাবের অংশ।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আহনাফ ইবনে কায়স (রঃ) প্রথম রাকাতে ছুরা কাহাফ, দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা ইউসুফ বা ছুরা ইউনুস পড়িয়াছেন ও বলিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের পেছনে এইভাবে ফজরের নামায পড়িয়াছেন।

● ক্বেরাত লম্বা করার জন্য এক রাকাতে একাধিক ছুরা পড়া জায়েয আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কোন ছুরার অংশ বিশেষ পড়ায় দোষ নাই বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ এরূপ আয়াত হইতে আরম্ভ করা যাহার বিষয়বস্তুর জরুরী অংশ পূর্ব্বের আয়াতে থাকিয়া গিয়াছে বা এরূপ আয়াতের উপর ক্ষান্ত করা যাহার বিষয়বস্তু নিতান্তই অসম্পুর্ণ থাকিয়া যায়—ইহা মকরূহ এবং স্থান নিশেষে ত এইরূপ অসম্পূর্ণতা অত্যন্ত তিক্ত ও অপ্রিয় হয় ; এরূপ ক্ষেত্রে কঠিন মকরূহ সাব্যস্ত হইবে (ফতহুল-বারী, ২-২০০)। সুতরাং অর্থ বুঝা ব্যতিরেকে যথেচ্ছাভাবে ছুরার অংশ কাটিয়া পড়া সমীচিন নহে।

প্রথম রাকাতে পরের ছুরা এবং দ্বিতীয় রাকাতে আগের ছুরা পড়া জায়েয আছে, কিন্তু মকরূহ। অবশ্য ছুরা সমূহের বিন্যাসে ছাহাবীগণের মতভেদ ছিল। পরবর্ত্তী যুগে খলীফা ওসমানের বিন্যাসনই প্রচলিত রহিয়াছে, তাই উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৫০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন আনছারী ছাহাবী কোবা নগরীর মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি যে কোন রাকাতে আল্‌হামদু ছুরার পর অন্য ছুরা পড়িতেন সেই অন্য ছুরার পুর্ব্বে ছুরা এখ্‌লাস অবশ্যই পড়িয়া লইতেন, তারপর ঐ অন্য ছুরা পড়িতেন। প্রতি রাকাতেই তিনি এরূপ করিতেন। মোক্তাদীগণ তাঁহার এই অভ্যাসের সমালোচনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আপনি ছুরা এখ্‌লাস পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়েন কেন ? হয় শুধু ছুরা এখ্‌লাস পড়ুন নতুবা শুধু অন্য ছুরাটিই পড়ুন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমি আমার এই নিয়ম ত্যাগ করিব না। তোমরা যদি ইহা ভালবাস তবে আমি তোমাদের ইমামতী করিব, নচেৎ আমি ইমামতী করিব না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্ব্বোত্তম—ইমামতীর উপযুক্ত, তাই তাঁহারা অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইতে রাজী ছিলেন না। অতঃপর সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করতঃ অভিযোগ পেশ করিলেন। নবী (দঃ) ঐ

ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সাথীদের পরামর্শ গ্রহণ কর না কেন? তুমি ছুরা এখ্‌লাসকে এরূপ আঁকড়াইরা ধরিয়াছ কেন? সে আরজ করিল, আমি এই ছুরাটিকে আমার প্রাণ দিয়া ভালবাসি। (কারণ, এই ছুরাটি আমার মা'বুদের ছানা-ছিফৎ ও গুণগানে পরিপূর্ণ।) রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন এই ছুরার প্রতি গভীর ভালবাসা তোমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইয়া দিয়াছে।

৪৫১। **ছাদীছ**ঃ—এক ব্যক্তি আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাত্রে তাহাজ্জুদ-নামাযের মধ্যে এক রাকাতেই "ছুরা কাফ" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছুরাগুলি পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন—কবিতার ন্যায় ফর ফর করিয়া পড়িয়া শেষ করিয়া থাকিবে। (মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই শুধু পড়িয়া গিয়াছ, কিন্তু এরূপ না করিয়া প্রতিটি বাক্যের মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অল্প পড়াও ভাল।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই যেই ছুরাগুলি একত্রে এক রাকাতে পড়িতেন আমি সেই ছুরাগুলি জানি। তিনি একত্রে (অর্থের দিক দিয়া) সমতুল্য দুইটি ছুরা পড়িতেন (বেশী পড়িতেন না, কারণ তিনি মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িতেন।)

মছআলাহঃ—জোহর, আছর ও এশার শেষ রাকাতদ্বয়ে এবং মাগরেবের তৃতীয় রাকাতে শুধু আলহামছ ছুরা পড়িবে; উহার সঙ্গে আর কোন ছুরা বা আয়াত পড়িবে না। সুতরাং প্রথম রাকাতদ্বয় অপেক্ষাকৃত লম্বা হইবে। সব নামাযেরই প্রথম রাকাত অধিক লম্বা করিবে। (১০৭ পৃঃ ৪৬১ হাঃ)

মছআলাহঃ—জোহর ও আছরে সম্পূর্ণ কেরাতই নিঃশব্দে পড়িবে। (১০৭পৃঃ)

মছআলাহঃ—ইমাম যদি নিঃশব্দের নামাযে (স্বেচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য বশতঃ ছোট) এক আয়াত পরিমাণ সশব্দে পড়ে তবে তাহাতে দোষ নাই; (উহাতে সেজদা-ছহু দিতে হইবে না (১০৭ পৃঃ ৪৬১ হাঃ)। কিন্তু যদি বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ নিঃশব্দের স্থানে সশব্দে কিম্বা সশব্দের স্থানে নিঃশব্দে পড়ে; ইচ্ছাকৃত কিম্বা ভুলে তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সেজদা-ছহু দিতে হইবে। আর যদি উক্ত পরিমাণ হইতে কম ঐরূপ করে ভুলবশতঃ তবে সেজদা-ছহু দেওয়া চাই। (শামী, ১—৬৯৫)

"আমীন" বলার ফজিলত ও নিয়ম

৪৫২। **ছাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ইমাম আলহামছ ছুরা শেষ করিয়া আমীন বলিবে, তুমিও তখন আমীন বলিও। (ঐ সময়) ফেরেশতাগণও আমীন

বলিয়া থাকেন। যাহাদের আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সঙ্গে সঙ্গে হইবে তাহাদের পুর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। নবী (দঃ) আমীন বলিতেন।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) ইমাম ও মোক্তাদী উভয়ের জন্য "আমীন" সশব্দে পড়ার কথা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ জেহরী নামাযে) এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেন।

"আমীন" জেহ্‌রী নামাযে সশব্দে বলায় কোন ইমামের মজহাবেই নামায দুষিত হয় না এবং গোনাহ হয় না। অবশ্য ইমাম আবু হানিফার মজহাবে "আমীন" নিঃশব্দে বলাই সুন্নত তরীকা এবং অন্যান্য ইমামের মজহাবে সশব্দে বলা সুন্নত তরীকা। উভয় নিয়ম সম্পর্কেই হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই সকলেই উভয় নিয়মকে জায়েয বলিয়াছেন।

ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্য দ্বারা ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ইমামের সহিত শরীক হইতে যদি কারণ বশতঃ বিলম্ব হইয়া পড়ে তবে যথাসাধ্য ইমামের আমীন বলার পূর্ব্বে (তথা আলহামদু সম্পূর্ণ করার পূর্ব্বে, যেহেতু উহা সম্পূর্ণ করিয়াই ইমাম আমীন বলিবে) ইমামের সহিত শরীক হইতে তৎপর হইবে। কারণ তাহা হইলে ইমামের সহিত আমীন বলার সুযোগ পাইবে যাহার অনেক ফজিলত।

কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধা

৪৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি মসজিদে পৌঁছিলেন—যখন নবী (দঃ) রুকুতে ছিলেন। (তিনি ভাবিলেন—ইমামের রুকু শেষ হইবার পুর্ব্বে শরীক হইতে না পারিলে এক রাকাত নামায ছুটিয়া যাইবে এবং পূর্ণ জমাতের সওয়াব পাওয়া যাইবে না,) তাই তিনি তাড়াহুড়ার মধ্যে কাতারে শামিল না হইয়াই নামাযের নিয়্যত করিয়া ফেলিলেন। নামাযান্তে হযরতের নিকট ঘটনা বলা হইলে হযরত (দঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন—আল্লাহ তায়ালা তোমার (অধিক সওয়াব আহরণের চেষ্টা ও) আকাঙ্খাকে বর্দ্ধিত করুন। অতঃপর বলিলেন—কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধিয়াছ—এরূপ কখনও করিও না।

নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিবে

৪৫৪। **হাদীছ ঃ**—মোতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি এবং ছাহাবী এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বছরা শহরে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে নামায পড়িলাম। তিনি প্রত্যেক সেজদায় যাইতে এবং দুই

রাকাতের পর বসা হইতে উঠিতে তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে ছাহাবী এমরান (রাঃ) আমার হাতে ধরিয়া (আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করতঃ) বলিলেন, তিনি আমাকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের রূপ স্মরণ করাইয়া দিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের প্রতিটি উঠা-বসায় তকবীর বলিতেন।

৪৫৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর শাগের্দ একরেমা (রঃ) বলেন—আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে জমাতে নামায পড়িলাম। তিনি (চার রাকাত নামাযে) বাইশটি তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, এই বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য বলিয়া মনে হয়। (কারণ এতগুলি তকবীর বলার দরকার দেখা যায় না—রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় যাইতে এবং প্রথম সেজদা হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে তকবীর না বলিলেও চলে।) ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই দুনিয়া হইতে উঠিয়া যা; এই বৃদ্ধ যাহা করিয়াছেন তাহাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত। (ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) ছিলেন, একরেমা (রঃ) তাঁহাকে চিনিতেন না। সেই কালে উমাইয়া বংশের আমীর-ওমরারা ইমামতি করিতে তকবীরের সংখ্যা কম করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।)

৪৫৬। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন তকবীর বলিতেন। যখন রুকুতে যাইতেন তখনও তকবীর বলিতেন এবং রুকু হইতে উঠিতে "ছামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ্" বলিতেন এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া "রাব্বানা ওয়া লাকাল-হামদু" বলিতেন। তারপর প্রথম সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে, তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন। নামাযের শেষ পর্য্যন্ত এরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের পর বসা হইতে উঠিবার সময়ও তকবীর বলিতেন।

রুকু অবস্থায় হাঁটুর উপর হাতদ্বয়ের ভর করিবে

৪৫৭। **হাদীছ ঃ**--মোছায়া'ব ইবনে সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে নামায পড়িতেছিলাম। আমি রুকু অবস্থায় আমার দুই হাত জোড় করিয়া হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে লটকাইয়া রাখিলাম। নামাযান্তে পিতা আমাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় প্রথমে এরূপ নিয়মই ছিল, কিন্তু (ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক) এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া দুই হাত হাঁটুর উপর রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে।

রুকু ও সেজদা ভালরূপে না করার পরিণতি

রুকু ভালরূপে করার অর্থ এই যে—এরূপ শান্তভাবে রুকূ করিবে যেন কোমর, পিঠ, মাথা সমান বরাবর হয়, এই অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার "সোব্হানা রাব্বিয়াল আজীম" বলিয়া পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইলে যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে যাইয়া পৌঁছে।

সেজদা ভালরূপে করার অর্থও তদ্রূপই যে, নিয়ম অনুযায়ী সেজদায় যাইয়া নাক ও কপাল মাটিতে লাগাইয়া রাখা অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার "সোব্হানা রাব্বিয়াল-আলা" বলিয়া সোজা হইয়া বসিবে, তারপর পুনরায় সেজদায় যাইবে।

৪৫৮। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে ভালরূপে রুকু-সেজদা করিতেছে না। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার নামায ঠিক হয় নাই। আরও বলিলেন, তুমি যদি এই অভ্যাসের উপরই থাক তবে আল্লাহ কর্তৃক রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত আদর্শ হইতে বিচ্যুত অবস্থায় তোমার জীবন অতিবাহিত হইবে।

রুকু ও সেজদাতে কত সময় অবস্থান করিবে?

৪৫৯। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রুকু, সেজদা ও দুই সেজদার মধ্যে এবং রুকু হইতে দাঁড়াইয়া—এই কয়টি অবস্থায় প্রায় সমপরিমাণ সময় ব্যয় করিতেন।

ভালরূপে রুকু ও সেজদা না করিয়া নামায পড়িলে ঐ নামায পুনরায় পড়িতে হইবে

৪৬০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (দঃ) মসজিদের এক কিনারায় বসিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া নামায আরম্ভ করিল। (নবী (দঃ) তাহার নামাযের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। সে নামাযের রুকু ও সেজদা ভালরূপে ধীরে ধীরে আদায় করিতেছিল না।) লোকটি (এইরূপে) নামায শেষ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল এবং তাঁহাকে সালাম করিল। নবী (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমার নামায হয় নাই, তুমি পুনরায় নামায পড়িয়া আস। সে দ্বিতীয়বার নামায পড়িল (কিন্তু ঐ প্রথমবারের মতই পড়িল) এবং হযরতের নিকট আসিয়া সালাম করিল। এবারও তিনি ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমার নামায হয় নাই, তুমি পুনরায় নামায পড়িয়া আস। সে এইবারও ঐরূপ নামায পড়িল। হযরত নবী (দঃ) তাহাকে ঐরূপই বলিলেন। তিনবার এরূপ করার পর লোকটি আরজ

করিল, হুজুর! যে আল্লাহ আপনাকে সত্য ধর্ম্মের বাহকরূপে রসুল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সেই আল্লার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, আমি ইহার চেয়ে উত্তমরূপে নামায পড়িতে জানি না। আপনি আমাকে নামায পড়া শিখাইয়া দিন। অতঃপর নবী (দঃ) তাহাকে নামায শিক্ষা দিতে লাগিলেন—তিনি বলিলেন, নামাযের পূর্ব্বে উত্তমরূপে অজু করিবে, তারপর কেবলাদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে, তারপর "আল্লাহু আকবার" বলিবে।* অতঃপর কোরআনের যাহা কিছু ছুরা পড়া তোমার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয় তাহা পড়িবে। তারপর আল্লাহু-আকবার বলিয়া মাথা ঝুকাইবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু করিবে।** তারপর "ছামিয়াল্লাহু-লেমান হামিদাহ" ↑ বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইবে; যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পৌঁছিতে পারে। অতঃপর আল্লাহু-আকবার বলিয়া ধীর স্থিরভাবে উত্তমরূপে সেজদা করিবে।× তারপর মাথা উঠাইয়া স্থিরভাবে বসিবে। পুনরায় ঐরূপে সেজদা করিবে এবং সেজদা হইতে উঠিবে। এইরূপে (ধীরস্থিরভাবে ভক্তি ও মহব্বতের সহিত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নামায আদায় করিবে।

রুকু ও সেজদায় মধ্যে দোয়া করা

৪৬১। **হাদীছ**:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (শেষ বয়সে অনেক সময়) রুকু এবং সেজদার মধ্যে এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ۔

---

* "আল্লাহু আকবার" এর তাৎপর্য্য এই যে—এক আল্লাহই বড়, আর কেহই বড় নাই। আমি সেই আল্লারই দাসানুদাস। এই বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করতঃ মুখে প্রকাশ করিবে এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইয়া ঐ আল্লার মাহাত্ম্য ও নিজের দাসত্বের স্বীকারোক্তিকে প্রমাণ করিবে এবং উহাকেই বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এবং "ছানা" পড়িয়া আল্লার প্রশংসা করিবে। তারপর "আউজু" পড়িয়া আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ "বিছমিল্লাহ" পড়িয়া "আলহামদু" ছুরা পড়িবে।

** উত্তমরূপে রুকু, সেজদা করার অর্থ ও নিয়ম ৪৫৮ নং হাদীছের পরিচ্ছেদে বর্ণন করা হইয়াছে। রুকু, সেজদায় سبحان ربى العظيم ও سبحان ربى اعلى পড়া হয়। উহার অর্থ—আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতার স্বীকারোক্তি ও প্রশংসা করিতেছি।

↑ ইহার অর্থ—"আল্লার প্রশংসা যে কেহই করুক, আল্লাহ তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া থাকেন"। ইহা বলার পর اللهم ربنا لك الحمد বলিবে। অর্থ—"হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকর্ত্তা! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই"।

× সেজদা আটটি অঙ্গ দ্বারা করিবে। আটটি অঙ্গ এই—দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত ও নাক এবং কপাল। এই অঙ্গগুলি জমীনের সহিত স্পর্শিত রাখিবে।

"হে খোদা—আমাদের পালনকর্ত্তা। আমরা তোমারই পবিত্রতার গুণগান করিতেছি এবং তোমারই প্রশংসা গাহিতেছি। তুমি আমার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দাও।"

প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া কোরআনের একটি আয়াতের অনুসরণ করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা নছরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মক্কা বিজয়ের বিরাট সাফল্যের এবং ব্যাপক আকারে ইসলাম বিস্তারের সুসংবাদ প্রদান ও ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি বিষয়ের আদেশ দান করেন—

"আপনি স্বীয় পালনকর্ত্তার প্রশংসা করতঃ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার জীবনের শেষ দিকে ঐ সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত দেখিয়া উক্ত আয়াতের আদেশত্রয়ের অনুসরণে ঐ দোয়া করিতেন।

রুকু হইতে উঠাকালে ইমাম কি বলিবে এবং মোক্তাদী কি বলিবে ?

৪৬২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে উঠিবার সময় "ছামিয়াল্লাহু-লিমান-হামিদাহ্" বলিতেন এবং সোজা হইয়া "আল্লাহুম্মা রাব্বানা-ওয়া-লাকাল-হামদু" বলিতেন।

৪৬৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম "ছামিয়াল্লাহু-লিমান-হামিদাহ্" বলিবেন তখন তোমরা (মোক্তাদীগণ) "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু" বলিও। কারণ, ঐ সময় ফেরেশতাগণও উহা বলিয়া থাকেন। যাহার ঐ বাক্য ফেরেশতাদের ঐ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইবে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

৪৬৪। হাদীছ ঃ—রেফাআহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে নামায পড়িতে ছিলাম। হযরত যখন ছামিয়াল্লাহু-লিমান হামিদাহ্ বলিয়া রুকু হইতে উঠিলেন, তাঁহার পেছনে একজন মোক্তাদী বলিল—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ ـ

অর্থাৎ ঃ—হে আমাদের পালনকর্ত্তা। তুমি যে, আমাকে তোমার দরবারে হাজির হইবার সুযোগ দান করিয়াছ উহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার প্রাণে তোমার প্রতি

বহু বহু আবেগ আছে যাহা প্রকাশ করিয়া শেষ করার মত নয় এবং আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে খাঁটীভাবে আমি তোমার বহু বহু প্রশংসা করিতেছি ; সেই পবিত্র প্রশংসা অফুরন্ত, যাহার অন্ত নাই।

নামাযান্তে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, (নামাযের মধ্যে পেছন দিক হইতে কতগুলি শব্দ-উচ্চারণ শ্রুত হইয়াছে ; ঐ) শব্দগুলির উচ্চারণকারী কে ? ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ঐ শব্দগুলি বলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন— ঐ শব্দগুলি এত বড় উচ্চ মর্য্যাদাপূর্ণ এবং আল্লার নিকট এত মধুর ও পছন্দনীয় ছিল যে, আমি ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছেন যে, কে ঐ শব্দগুলিকে সকলের আগে (আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌছাইবার জন্য) লিখিয়া লইতে পারেন।

রুকু হইতে উঠিয়া সোজা ও স্থিরভাবে দাঁড়াইবে
উভয় সেজদার মধ্যেও তদ্রূপে বসিবে

৪৬৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য সময় সময় নামায পড়িতেন এবং বলিতেন, নবী (দঃ)কে যেইরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছি, সেইরূপ নামায পড়িয়া দেখাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আনাছ (রাঃ)কে সেইরূপ ক্ষেত্রে এমন একটি কাজ করিতে দেখিয়াছি যাহা তোমাদিগকে করিতে দেখি না। তিনি যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতেন তখন এরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইতেন যে, আমরা মনে করিতাম যেন তিনি সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং দুই সেজদার মধ্যে এরূপ স্থিরভাবে বসিতেন ; মনে হইত যেন দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (১২০ পৃঃ)

৪৬৬। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী আবু কেলাবা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) আমাদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য ফরজ নামাযের জমাতের সময় ছাড়া অন্য সময় (নফলরূপে) নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন।

একদা তিনি আমাদের মসজিদে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নামায পড়িব ; এখন আমার শুধু নামায পড়াই উদ্দেশ্য নহে ; নবী (দঃ)কে কিরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছি তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামায পড়িব।

আবু কেলাবা (রঃ) সেই নামাযের বর্ণনা দানে বলেন, যখন তিনি দাঁড়াইলেন তখন ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দররূপে দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। তারপর রুকু খুব ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দরভাবে করিলেন, রুকু হইতে

উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, তারপর সেজদা করিলেন, অতঃপর সেজদা হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে বসিলেন তারপর পুনঃ সেজদা করিলেন।
(৯৩, ১১০, ১১৩ পৃঃ)

তকবীর বলার সঙ্গেই রুকু-সেজদার জন্য অবনত হইবে

৪৬৭। হাদীছ ঃ—আবু ছালামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) ফরজ এবং অন্য নামায, রমজান শরীফে এবং অন্য সময়ে সব রকম নামাযেই এই নিয়মে তকবীর বলিতেন—প্রথম দাঁড়াইয়া তকবীর বলিতেন, রুকুতে যাওয়াকালে তকবীর বলিতেন, তারপর ছামিআল্লাহু-লিমান-হামিদাহ্ এবং তৎপর রাব্বানা ওয়া-লাকাল হামদু বলিতেন—সেজদায় যাইবার পূর্ব্বে। অতঃপর সেজদার জন্য নত হইয়া যাইতে আল্লাহু আকবার বলিতেন, তারপর সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন, দ্বিতীয় সেজদায় যাইতেও তকবীর বলিতেন এবং উহা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। নামাযের প্রতি রাকাতেই এইরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের বসা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপে নামায শেষ করিয়া বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের সর্ব্বাধিক দৃষ্টান্তে নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগ করা পর্য্যন্ত এই আকারেই নামায পড়িতেন। (এই হাদীছে বর্ণিত আর একটি বিষয় ৫৪৭ নম্বরে অনূদিতে হইবে।)

সেজদার মহত্ব ও ফজিলত

এই পরিচ্ছেদে একটি সুদীর্ঘ হাদীছের উল্লেখ আছে; সেই হাদীছখানার পূর্ণ অনুবাদ সপ্তম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আসিবে। হাদীছ খানার বিষয়বস্তু হইল হাসর-ময়দান, পুলছেরাৎ, দোযখ ও আখেরাতের নানা অবস্থার বয়ান। উক্ত হাদীছের বয়ানে রহিয়াছে যে, হাসর-ময়দানের হিসাব-নিকাশের পর প্রাথমিক পর্য্যায়ে অনেক মোমেন-মোসলমানও বিভিন্ন গোনাহের পরিণামে দোযখে যাইবে। তারপর শাফায়াত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঐসব পাপী মোমেন-মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া হইবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা ঐ পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিতে থাকিবেন।

দোযখের মধ্যে চিরজাহান্নামী কাফেররা অগণিত সংখ্যায় হইবে। দুনিয়ায় কাফেরের অনুপাতে মোসলমান-সংখ্যা হাজারে একজন মাত্র; এই নগণ্য সংখ্যক মোসলমানও ভাগ হইয়া এক ভাগ বেহেশতে, এক ভাগ দোযখে গিয়াছে। কাফেররা ত সবই দোযখে গিয়াছে। দোযখে এই অসংখ্য কাফেরদের মধ্য হইতে

অতি নগণ্য সংখ্যক পাপী মোমেন-মোসলমানকে ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করার যে ব্যবস্থা হইবে উহার বর্ণনায় উক্ত হাদীছে আছে—

وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَاْكُلُهُ النَّارُ اِلَّا اَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيٰوةِ

"ফেরেশতাগণ দোযখের মধ্যে ঐ সব পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান বা চিহ্ন দেখিয়া চিনিবেন। আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুনের জন্য অসাধ্য করিয়া দিবেনে সেজদার নিশান ভস্ম করা। ঐ পরিচিতির দ্বারাই পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে বাহির করা হইবে। দোযখের আগুন মানুষের সবই ভস্ম করিবে, কিন্তু সেজদার নিশান ভস্ম ও বিকৃত হইবে না। তাহাদিগকে দোযখ হইতে এরূপে বাহির করা হইবে যে, আগুনে পুড়িয়া তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদের উপর জীবনী-শক্তির পানি বহাইয়া দেওয়া হইবে; ফলে তাহারা সোনালী রঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।"

মোমেন মোসলমান যাহারা নামাযী তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান থাকা সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ আছে— سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ "মোমেনদের চেহারায় সেজদার নিশান হইল তাহাদের পরিচয়।" (২৬ পাঃ ১২ রুঃ)

চেহারায় সেজদার নিশান বলিতে চেহারার উপর নূরের আভাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেজদার পরিমাণ হিসাবে এই আভার পরিমাণও কম-বেশী হয়, এমনকি যাহারা সর্ব্বদা নামাযে অভ্যস্ত তাহাদের এবং বিশেষত যাহারা তাহাজ্জুদ নামাযেও অভ্যস্ত তাহাদের চেহারার সেই আভা ত সচরাচর দৃষ্ট। সেজদার এই আভা আখেরাতের জীবনে অধিক দীপ্ত ও অক্ষয় রেখাপাতকারী হইবে। এমনকি হাসরের মাঠে মোমেনদের সেজদার আভায় তাহাদের সম্পূর্ণ মাথা সূর্য্যের ন্যায় চমকিত হইবে (তফছীর মোজেহুল-কোরআন)। এই আভার বিন্দুও যাহার চেহারায় আছে সে খোদা-নাখাস্তা দোযখের আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেলেও তাহার সেই আভাবিন্দু অক্ষয় হইয়া থাকিবে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে। এই আভাবিন্দুর পরিমাণের তারতম্যে পরিচিতির মধ্যে অবশ্যই আগ-পাছ হইবে। এই তথ্য দৃষ্টে সেজদার মহত্ত্ব সহজেই অনুমেয়। সেজদার নিশান বলিতে বস্তুতঃ নূরের আভা বটে, কিন্তু সেজদার আধিক্যে সৃষ্ট কপালের দাগও সৌভাগ্যের বস্তুই; বিদ্রূপ বা উপেক্ষার বস্তু নহে।

সেজদাবস্থায় উভয় বাহু পাঁজরা হইতে ব্যবধানে রাখিবে

৪৬৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদাবস্থায় বাহুদ্বয়কে পাঁজরা হইতে এত দুর ব্যবধানে রাখিতেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দেখা যাইত।

সাতটি অঙ্গে সেজদা করিতে হইবে

৪৬৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করিতে আদেশ করিয়াছেন। (চেহারা, অর্থাৎ) কপালের সঙ্গেই নাককেও বিশেষভাবে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের সম্মুখ ভাগ। আরও আদেশ করিয়াছেন যে—কাপড় ও মাথার চুল (সেজদার সময় এলোমেলো হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য) টানিয়া রাখিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দ্বারা কয়েকটি মছআলাহ প্রমাণিত হইল—(১) সেজদার মধ্যে কপালের সঙ্গে নাককেও মাটিতে লাগাইতে হইবে এবং উভয় পা-ও মাটিতে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। ৪৭৫ নং হাদীছে আছে যে, সেজদাবস্থায় উভয় পা মাটির সঙ্গে এরূপে লাগাইয়া রাখিবে যেন পা-দ্বয়ের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী হইয়া থাকে। (২) সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বস্ব দ্বারা আল্লার হুজুরে সেজদা করিবে—সেই সময় কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদির পারিপাট্যের প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখিবে না। নতুবা মনে হইবে যেন সেজদার চেয়ে কাপড় ও চুলের পারিপাট্যের মূল্য বেশী।

অবশ্য বোখারী (রঃ) ১১৩ পৃষ্ঠায় একটি মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছতর খুলিবার আশঙ্কায় কাপড় টানিয়া রাখা বা গিড়া ইত্যাদি দিয়া রাখা জায়েয আছে।

৪৭০। হাদীছ ঃ—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ছাহাবীর নিকট যাইয়া বলিলাম, চলুন; খেজুর বাগানে যাইয়া আমরা নবীজীর হাদীছ আলোচনা করি। সেমতে তিনি চলিলেন; আলোচনায় আমি তাঁহাকে লায়লাতুল-ক্বদর সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের প্রথম দশদিন এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তাঁহার অনুকরণে এ'তেকাফ করিলাম। (দশদিন গত হইলে পর) জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, আপনি যে রত্নের উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিয়াছেন (অর্থাৎ লাইলাতুল-ক্বদর) উহা আরও সম্মুখে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মধ্যবর্ত্তী দশদিনেরও এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তদ্রূপ করিলাম। এবারও জিব্রাঈল (আঃ) ঐরূপই বলিলেন। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজানের বিশ তারিখের সকাল

বেলা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহারা আমার সঙ্গে এ'তেকাফরত ছিল তাহারা আরও কিছু দিন এ'তেকাফরত থাকিবে, কারণ লাইলাতুল-ক্বদর শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্রি সমূহের মধ্যে হইবে। আমাকে আল্লাহ তায়ালা উহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া (স্বপ্নে) জানাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি। স্বপ্নের কথা এতটুকু আমার স্মরণ আছে যে, আমি যেন লাইলাতুল-ক্বদরের সকাল বেলা কাদার উপর সেজদা করিতেছি। হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—বিশ তারিখে সকাল বেলায় রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে এরূপ বলিলেন। ঐ দিনটি খুবই পরিষ্কার দিন ছিল, কোন প্রকার বৃষ্টি-বাদলের চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং একুশ তারিখে সারারাত্র বৃষ্টিপাত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে খেজুর পাতার চাল ছিল; তাঁহার নামায স্থানে পানি পড়ায় ঐস্থান ভিজিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামায শেষ করিলে আমি চাক্ষুশ দেখিলাম, তাঁহার কপাল ও নাকের উপর স্পষ্টতঃ কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। (তখন চাক্ষুশরূপে আমরা তাঁহার স্বপ্নকে সপ্রমাণিত বুঝিয়া নিলাম)।

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিজা জায়গার উপর পূর্ণ ও উত্তমরূপে সেজদা করিয়া কপাল ও নাককে কর্দ্দমাক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

সেজদা করার নিয়ম

৪৭১। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তোমরা সুন্দররূপে স্থিরতার সহিত সেজদা করিও। সেজদার সময় দুই হাত কুকুরের হাতের ন্যায় জমিনের উপর বিছাইয়া দিও না। (১১৩ পৃঃ)

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সেজদা হইতে দাঁড়াইবার নিয়ম

৪৭২। **হাদীছ**ঃ—মালেক ইবনুল হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপে নামায পড়িতে দেখিয়াছেন যে, তিনি প্রথম রাকাত ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবার পর না বসিয়া সোজা দাঁড়াইতেন না। (১১৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ—বয়োপ্রাপ্তি বা অন্য কোন দুর্ব্বলতার অবস্থায় এইরূপ করা সুন্নত তরীকার মধ্যে শামিল। সাধারণ অবস্থাতেও এরূপ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু না বসিয়া সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বোখারী শরীফের ৯৮৬ পৃষ্ঠার একটি হাদীছে উল্লেখ আছে এবং এতদভিন্ন ছেহাহ সেত্তার অন্যান্য কেতাবেও অনেক হাদীছ আছে। ছাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে সচরাচর সাধারণ অবস্থায় তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিয়া বসা হইত না বলিয়া বোখারী শরীফের এই ১১৩ পৃষ্ঠারই মধ্যভাগে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুই রাকাতের বৈঠক হইতে উঠিতে তকবীর বলিবে

৪৭৩। **হাদীছ** ঃ—সায়ীদ ইবনুল হারেছ (রাঃ) একদা ইমাম হইয়া নামায পড়িলেন। সেজদায় যাইতে, সেজদা হইতে উঠিতে, দুই রাকাতের বসা হইতে দাঁড়াইতে সশব্দে তকবীর বলিলেন এবং বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

নামাযের মধ্যে বসিবার নিয়ম

৪৭৪। **হাদীছ** ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি নামাযের মধ্যে আসন করিয়া বসেন। তাঁহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া আমিও এরূপ করিলাম ; তখন আমি যুবক বয়সের। আমার পিতা আমাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—নামাযের মধ্যে সুন্নত তরীকায় বসা এই যে, ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা মোড়িয়া বসিবে। আমি বলিলাম, আপনি আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, আমি ওজর বশতঃ এরূপ করিয়া থাকি, কারণ আমার পা-দ্বয় মচকিয়া যাওয়ায় উহার উপর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী বসা সম্ভব হয় না।

৪৭৫। **হাদীছ** ঃ—আবু হোমায়েদ সায়েদী (রাঃ) একদা বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা আমি তোমাদের তুলনায় বেশী জানি। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভ করার জন্য যখন তকবীর বলিতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্য্যন্ত উঠাইতেন (৪৩২ নং হাদীছের নোট দেখুন)। রুকুতে যাইয়া হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর শক্তভাবে রাখিতেন এবং পিঠকে সমতলরূপে ঝুকাইতেন (অর্থাৎ এরূপে রুকু করিতেন যেন পিঠ, কোমর ও মাথা এক বরাবর থাকে)। যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন, যেন মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যায়। যখন সেজদা করিতেন তখন উভয় হাত জমিনের উপর বিছাইয়াও দিতেন না বা শরীরের সঙ্গে চিমটাইয়াও রাখিতেন না এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মোড়িয়া কেবলামুখী রাখিতেন। যখন দুই রাকাতের পর বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া দিয়া উহার উপর বসিতেন। যখন শেষ রাকাতে বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বাহির করিয়া নিতম্ব জমিনে রাখিয়া বসিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হানফী মজহাব মতে নামাযের মধ্যে ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের উপর বসিবে, নিতম্বকে জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসিবে না, বরং বাম পা বিছাইয়া উহার উপর নিতম্ব রাখিবে—যেরূপ ৪৭৪ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ; নামাযের সব বসাতেই এই নিয়ম।

উক্ত নিয়মে বসা অপেক্ষা নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাতে শরীর অপেক্ষাকৃত একটু অধিক গুটানো ও সঙ্কুচিত থাকে বিধায় হানফী মজহাবেও মহিলাদের জন্য নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাকে উত্তম বলা হয় এবং উপরোল্লেখিত নিয়মকে শুধু পুরুষের জন্য উত্তম বলা হইয়াছে। হানফী মজহাবে নামাযের মধ্যে পুরুষ ও নারীদের জন্য বসিবার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

যেই ইমামগণের মজহাবে পুরুষদের জন্যও নিতম্ব জমিনে লাগাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, যেরূপ ৪৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের বসার নিয়ম একই হইবে। যেমন ইমাম বোখারী (রঃ) বিশিষ্টা তাবেয়ী উম্মুদ-দরদা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে পুরুষের ন্যায়ই বসিতেন এবং তিনি একজন মছলা-মছায়েল বিশেষজ্ঞা ছিলেন। ফল কথা—প্রত্যেক ইমামের মজহাবেই নারীদের জন্য নিতম্ব জমিনে ঠেকাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, অবশ্য পুরুষদের জন্য উত্তম নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ আছে।

নামাযে বসা অবস্থায় কি পড়িবে?

৪৭৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (নামাযের বৈঠকে) এরূপ বলিতাম—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে, আস্‌সালামু আ'লা জিব্রাঈল, আস্‌সালামু আ'লা মিকাঈল ইত্যাদি ইত্যাদি। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে (আল্লার জন্য শান্তির দোয়া) বলিও না। আল্লাহ তায়ালাই ত শান্তিদাতা। নামাযে তোমরা এরূপ বলিবে—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

অর্থ :—"মৌখিক ও শারীরিক এবাদৎ এবং হালাল মাল খরচ করতঃ যে সব এবাদৎ করা হয়—সব রকম এবাদৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লার রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লার সমস্ত নেক ও সৎবন্দা—মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি মনে প্রাণে অঙ্গীকার করিতেছি

ও সাক্ষ্য দিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।" ইহার পর অন্য কোন দোয়া প'ড়িবে।

এরূপ বলিলে জিব্রাঈল, মিকাঈল সকলেই (শান্তির দোয়ায়) শরীক হইয়া যাইবেন, নাম লইতে হইবে না, অধিকন্তু অন্যান্য সকল সৎ বন্দাগণও শরীক হইবেন।

৪৭৭। **হাদীছ** *ঃ—কায়া'ব ইবনে ওজরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা আরজ করিলাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম ত আল্লাহ তায়ালা (আপনার মুখে আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি আপনার আহ্‌লে বাইত সহ ছালাত বা দরুদ কিরূপে পাঠ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থঃ—হে আল্লাহ! বিশেষ বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন হযরত মোহাম্মদের উপর এবং হযরত মোহাম্মদের আহ্‌লে-বাইত—পরিবার-পরিজনের উপর যেমন আপনি বিশেষ রহমত বর্ষণ করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমের উপর এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

আয় আল্লাহ! বরকত, কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন হযরত মোহাম্মদকে এবং হযরত মোহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে, যেমন বরকত দান করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমকে এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনকে, নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

---

* এই হাদীছে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি সামান্য একটু শব্দগত বিভিন্নতার সহিত আবু সায়ী'দ খুদরী (রাঃ) আবু হোমায়েদ সায়ে'দী (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে এবং ছাহাবীত্রয়ের হাদীছ তিনিটি ইমাম বোখারী (রঃ) তিন স্থানে বয়ান করিয়াছেন। (১) নবীদের ইতিহাস অধ্যায়ে—হযরত ইব্রাহীমের বয়ান, (২) তফছীর অধ্যায়ে—ছুরা আহযাবের তফছীর (৩) দোয়ার অধ্যায়ে—হযরতের প্রতি দরুদের বয়ান।

নামাযের অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই, আমরাও চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত এস্থলে এই হাদীছখানা উল্লেখ করিয়াছিলাম না। ইতিমধ্যে কোন কোন পাঠকের পত্রে তাহার বিভ্রান্তির সংবাদে উক্ত প্রথমস্থানে বর্ণিত হাদীছখানা এস্থানে বয়ান করিয়া দেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا -

"নিশ্চয় আল্লাহ দরূদ (বিশেষ রহমত) পাঠাইয়া থাকেন এবং ফেরেশতাগণ দরূদ (বিশেষ রহমতের দোয়া) পড়িয়া থাকেন নবী—মোহাম্মদের প্রতি ; হে মোমেনগণ ; তোমরাও দরূদ (বিশেষ রহমতের দোয়া) পাঠ কর তাঁহার প্রতি এবং বিশেষ সালাম পাঠ কর।"

উক্ত আয়াতের নির্দ্দেশ মোতাবেক হযরতের প্রতি দরূদ ও সালাম অন্ততঃ একবার পাঠ করা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরজ। তার অধিক সর্ব্বদার জন্য পাঠ করা অতিশয় ফজিলতের কাজ এবং সুন্নত, বিশেষতঃ নামাযের শেষ বৈঠকে। যেহেতু স্বয়ং হযরত (দঃ) আত্তাহিয়্যাতুর সঙ্গে তাহার প্রতি সালাম পাঠ শিক্ষা দিয়াছেন এবং ঐ সালাম শিক্ষা দেওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই ছাহাবীগণ "ছালাত" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাও উল্লেখিত রূপে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সালাম ও ছালাত উভয়টিই বিশেষরূপে নামাযের মধ্যে প্রযোজ্য থাকিবে। অধিকন্তু উক্ত ছালাত বা দরূদ শিক্ষা-দান নামায সম্পর্কে ছিল বলিয়া অনেক হাদীছেও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (ফতহুলবারী ১১—১৩৬)

সালামের পূর্ব্বে দোয়া পড়িবে

৪৭৮। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের মধ্যে (আত্তাহিয়্যাত ও দরূদের পর) এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ

الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

"হে আল্লাহ! আমি কবরের আজাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, অসৎ দজ্জালের ধোকা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর সময় সর্ব্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! সমস্ত রকমের গোনাহ হইতে এবং ঋণ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর আপনি ঋণ হইতে বিশেষ ও অধিকরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বলিতে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। (অর্থাৎ ঋণ অতি জঘন্য যাহা অনেক গোনাহের কারণ হয়।)

৪৭৯। হাদীছ ঃ—আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন—আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দেন যাহা আমি নামাযের মধ্যে পাঠ করিব। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বল—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ ঃ—হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অত্যধিক অত্যাচার (গোনাহ) করিয়াছি; একমাত্র তুমি ভিন্ন কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় করুণাবলে আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর; একমাত্র তুমিই ক্ষমাকারী।

মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সঙ্গে সালাম করিবে

৪৮০। হাদীছ ঃ—এত্‌বান ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি। হযরত (দঃ) যখন সালাম ফিরিয়াছেন আমরাও তখনই সালাম ফিরিয়াছি।

ব্যাখ্যা—উক্ত হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ বলিয়াছেন যে, মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই সালাম ফিরিবে (অতিরিক্ত দোয়া-দরুদে লিপ্ত হইয়া সালাম ফিরিতে বিলম্ব করিবে না।) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমামের সঙ্গেই মোক্তাদীদের সালাম ফেরাকে তিনি মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন যে, মোক্তাদীকে দুই সালামই করিতে হইবে; যেরূপ ইমাম দুই সালাম করিয়া থাকেন।

নামাযান্তে আল্লার জিক্‌র করা

৪৮১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফরজ নামাযান্তে সশব্দে "আল্লাহু-আকবার" জিক্‌র করা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে ছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - উহা দ্বারা আমি নামায শেষ হওয়া উপলব্ধি করিতাম।

৪৮২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া এই অনুতাপ প্রকাশ করিল যে, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ধন-দৌলত আল্লার রাহে খরচ করিয়া বড় বড় মর্ত্তবা ও অফুরন্ত নেয়ামতসমুহের অধিকারী হইতেছে। কারণ, তাহারা আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, রোযা রাখে, তাছাড়া তাহাদের বেশী ধন-দৌলত আছে, যদ্দারা তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ করিয়া থাকে এবং ছদকা-খয়রাত করিয়া থাকে। রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে এমন ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিব যদ্দারা তোমরা অগ্রগামী ব্যক্তিগণের সমান হইতে সক্ষম হইবে এবং তোমরা সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐ ব্যবস্থা ও আমল অবলম্বন ব্যতীত কেহই তোমাদের বরাবর হইতে পারিবে না। (সেই আমলটি হইল—)

প্রতি নামাযের পর ছোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আল্‌হামদু-লিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়িবে।

ব্যাখ্যা :—মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই হাদীছের সঙ্গে আরও একটু অংশ উল্লেখ হইয়াছে যে, কিছু দিন পর দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ পুনরায় হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আপনি আমাদিগকে যেই বিশেষ ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, আমাদের ধনাঢ্য ভাইগণ উহার খোঁজ পাইয়া তাঁহারাও উহা অবলম্বন করিয়াছেন। তখন হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নেক আমলের তৌফিক ও সামর্থ্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ মেহেরবানী ও দয়া; আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন দান করিয়া থাকেন। (সে বিষয়ে মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নাই; মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য হইল—স্বীয় শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করিয়া যাওয়া।)

৪৮৩। হাদীছ :—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي

وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا

مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ۝

অর্থ :—একমাত্র আল্লাহ-ই মা'বুদ, তাঁহার কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, তিনিই জীবনদতা, জীবন রক্ষক ও মৃত্যুদাতা এবং সর্ব্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা দান করিবে তাহা কেহ

বন্ধ করিতে পারে না, তুমি যাহা না দিবে তাহা কেহ দিতে পারে না। তুমি দান না করিলে ভাগ্যবানের ভাগ্যও তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।

নামাযান্তে ইমামের ডান-বাম দিকে বা মোক্তাদীমুখী বসা

৪৮৪। হাদীছ ঃ—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া বসিতেন।

৪৮৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন স্বীয় নামাযের এক অংশ শয়তানকে দান না করে; এইরূপে যে, নামাযের পর ডান দিকে ঘুরিয়া যাওয়া জরুরী মনে করিয়া বসে। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনেক সময় বাম দিকেও ফিরিতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘৃণার কাজ ব্যতিত প্রত্যেক কাজেই বাম দিক অবলম্বন অপেক্ষা ডান দিক উত্তম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই "উত্তম"কে যদি কেহ জরুরী ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে তবে উহা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপের শামিল হইবে। তাই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এখানে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তদুপরি শরীয়ত যে বিষয়কে জরুরী বলিয়া ধার্য্য করে নাই যদিও উহা উত্তম হয়, কিন্তু উত্তমকে জরুরী মনে করা শরীয়তের বিধান বহির্ভূত হওয়ায় উহা শয়তানের কারসাজি বলিয়াই গণ্য হইবে।

দুর্গন্ধময় বস্তু খাইয়া মসজিদে যাওয়া নিষেধ

৪৮৬। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ বা রসুন (ইত্যাদি দুর্গন্ধময় বস্তু) ব্যবহার করিয়াছে সে যেন মসজিদের নিকটেও না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে। সে যেন মসজিদ হইতে দুরে থাকে। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, মনে হয়—এস্থলে কাঁচা পেয়াজ-রসুনই উদ্দেশ্য এবং নিষেধাজ্ঞা উহার দুর্গন্ধের কারণে। জাবের (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে একটি পাত্রে খাদ্য উপস্থিত করা হইল যাহাতে (রসুন এবং উহার ন্যায় গন্ধময় "কর্‌রাছ" ইত্যাদি) বিভিন্ন তাজা সবজি (কুচিকাটারূপে) মিশ্রিত ছিল। হযরত (দঃ) উহার গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সবজিগুলির নাম বলা হইল; তখন হযরত (দঃ) এই খাদ্য তাঁহার অন্য এক সঙ্গীর সম্মুখে দেওয়ার জন্য বলিলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ না করায় ঐ ব্যক্তি উহা গ্রহণে অসম্মত হইল। এতদদৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি খাও। আমার কথাবার্ত্তা এমন জনের সঙ্গে হয় যাহার সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা হয় না (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সঙ্গে)।

৪৮৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খায়বার যুদ্ধের সময়ে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রস্থন জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।

৪৮৮। হাদীছ ঃ—এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, রস্থন সম্পর্কে আপনি নবী (দঃ)কে কি বলিতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, এই জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইয়াছে সে যেন আমাদের নিকটে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে।

ব্যাখ্যা ঃ—৪৮৬নং হাদীছে ছাহাবী জাবের(রাঃ) স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, দুর্গন্ধের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। বিড়ি-সিগারেট ও হোক্কার দুর্গন্ধ যে কিরূপ তাহা সকলেই জানে, অতএব উহার অভ্যস্ত ব্যক্তিরা মসজিদে আসিবার পূর্ব্বে উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে।

নারীদের মসজিদে যাওয়া

৪৮৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কাহারও স্ত্রী যদি রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাহাকে অনুমতি দেওয়া চাই।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, নারীদের জন্য মসজিদে যাইতেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

৪৯০। হাদীছ ঃ—উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে নারীগণ মসজিদে উপস্থিত হইত এবং সালাম ফিরা মাত্র তাহারা বাহির হইয়া আসিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং পুরুষগণ বসিয়া থাকিতেন। (মহিলাগণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এরূপ অনুমান করিয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইলে পর পুরুষগণ দাঁড়াইতেন। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) (এবং পুরুষগণ) মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই নারীগণ নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া সারিত। (১১৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দৃষ্টে বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, নারীদের জন্য মসজিদে অবস্থানও সংক্ষিপ্ত করার এবং নামায হইতে দ্রুত বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করারও আদেশ ছিল। এই হাদীছে ইহাও সুস্পষ্ট যে, শুধু মাত্র মসজিদ-সংলগ্ন বাড়ী-ঘরের নারীরাই মসজিদে আসিত।

৪৯১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের নারীরা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা যদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জানিতেন তবে খোদার কসম—নিশ্চয় তিনি নারীগণকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন, যেরূপভাবে বনী-ইস্রাইলের নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) যেই যুগের নারীগণের প্রতি অভিযোগ করিতেছিলেন সেই নারীগণ হইলেন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার যুগের নারী, অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংলগ্ন যুগ, সেই যুগের পরেও উত্তম যুগ আরও একটি বা দুইটি বাকি ছিল। সেই যুগ হইতে দীর্ঘ তেরশত বৎসরের অধিক কাল পরের যুগ হইল বর্ত্তমান যুগ। এই যুগের নারীদের অবস্থা আয়েশা (রাঃ) দেখিলে কি বলিতেন? এবং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা জানিতে পারিলে কি করিতেন? উহা পাঠকগণের বিবেক-বুদ্ধির উপরই ছাড়া হইল।

৪৯২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের এক স্ত্রী (রাত্রের অন্ধকারে) ফজর ও এশার নামাযের জমাতে মসজিদে যাইতেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আপনি কেন মসজিদে আসেন? অথচ জানেন যে, ওমর (রাঃ) ইহা নাপছন্দ করেন এবং ইহাতে ক্ষুব্ধ হন। স্ত্রী বলিল, ওমর (রাঃ) আমাকে (নিষেধ করেন না কেন?) নিষেধ করিতে বাধা কি? ঐ ব্যক্তি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ—"আল্লার বান্দীগণকে আল্লার মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।" (এই হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ওমর (রাঃ)কে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞায় বাধা দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ছাহাবীগণ নারীদের মসজিদে যাওয়ার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার আইন প্রয়োগ করিতেন না, কিন্তু যুগের পরিবর্ত্তনে সকলেই উহাকে অবাঞ্ছিত গণ্য করিতেন। নারীদের মসজিদে বা ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কে জরুরী ও অধিক আলোচনা "ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে ও দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া" পরিচ্ছেদে ২২২নং হাদীছের ব্যাখ্যায় রহিয়াছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ঝড়-তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ইত্যাদির সময় মসজিদে বা জমাতে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নিবে (৯২ পৃঃ ৩৮৫ হাদীছ)। ● লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নামাযের নিয়ম দেখাইবার নামায পড়া জায়েয আছে (৯৩ পৃঃ ৪৬৬ হাদীছ)। এইরূপ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নামায প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যই গণ্য হইবে এবং উহাতে ছওয়াব লাভ হইবে। ● কোন মোক্তাদী যদি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ায়; (মোক্তাদীদের কাতারে শামিল হইলে সেই প্রয়োজন মিটে না,) তাহা জায়েয হইবে (৯৪ পৃঃ ৪০৩ হাদীছ)।

● রাষ্ট্রপ্রধান যেখানেই যাইবেন তথায়ই তিনি ইমামতী করিবেন (৯৫ পৃঃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, "কাহারও প্রাধান্যের স্থানে অন্য আগন্তুক ব্যক্তির ইমাম হওয়া চাই না।" উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াই বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাধান্য যেহেতু সর্ব্বত্র ও সকলের উপর, তাই তিনি সর্ব্বস্থলেই ইমাম হইবেন। সেমতে একস্থানে কাহারও প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানে যদি তাঁহার উপর প্রাধান্যের অধিকারী কেহ উপস্থিত হন, তবে ইমামতীর জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা উচিত।

● মোক্তাদী শুধু একজন পুরুষ হইলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইবে। সে ক্ষেত্রে ইমামের বরাবর সমরেখা পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকিতে হইবে (৯৭ পৃঃ ১০৯ হাদীছ)। সামান্য পরিমাণেও ইমাম হইতে অগ্রে হইলে মোক্তাদীর নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। অগ্র হওয়ার আশঙ্কামুক্ত থাকার জন্য সামান্য পেছনে থাকা ভাল। ● মোক্তাদী একজন, সে ইমামের বাম দিকে দাঁড়াইলে যদি ইমাম নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়া আসে, তাহাতে ইমাম-মোক্তাদী কাহারও নামায নষ্ট হইবে না (৯৭ পৃঃ)। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে যে, মোক্তাদীকে ইমামের পেছন দিক দিয়া আনিবে এবং এমনভাবে আনিবে যাহাতে তাহার কেবলামুখী থাকা ভঙ্গ না হয় অন্যথায় মোক্তাদীর নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। ● কোন ব্যক্তি স্বীয় নামায আরম্ভ করিয়াছে ইমামতীর নিয়্যত করে নাই, তাহার সহিত পুরুষ লোক একতেদা করিলে ইমাম-মোক্তাদী সকলেরই নামায শুদ্ধ হইবে (৯৭ পৃঃ)। অবশ্য ইমামতীর যে বিশেষ ছওয়াব আছে তাহা লাভ করার জন্য ইমামতীর নিয়্যত করা আবশ্যক ; প্রথম হইতে যদি কোন মোক্তাদী উপস্থিত না থাকে, তবে যখন মোক্তাদী আসে তখন মনে মনে ইমামতীর নিয়্যত তথা ইচ্ছা করিয়া নিবে। (শামী, ১—৩৯৪)

পুরুষ ইমামের সহিত মহিলার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ভিন্ন মছআলাহ। সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মতামত ইহাই যে, পুরুষ ইমাম বিশেষরূপে মহিলার ইমামতীর নিয়্যত যদি না করে তবে সেই ইমামের পেছনে মহিলার নামায হইবে না (শামী, ১—৫৩৯)। সেমতে মহিলারা যদি মসজিদে নামায পড়ে তবে এই ব্যাপারে তাহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ● ইমামতির সময় কেরাত, রুকু-সেজদা ইত্যাদি অতি দীর্ঘ করিবে না, কিন্তু রুকু-সেজদা পূর্ণরূপে অবশ্যই করিবে (৯৭ পৃঃ ৭৬ হাঃ)। ● (বিভিন্ন নামাযে কেরাতের যে পরিমাণ সুন্নত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার অধিক পড়িয়া বা প্রয়োজনাতিরিক্ত মন্থর ও ধীরগতিতে পড়িয়া) ইমাম নামায লম্বা করিলে মোক্তাদী ইমামের প্রতি অভিযোগ করিতে পারে (৯৭ পৃঃ)। ● ইমামের তকবীর সব মোক্তাদী শুনিতে পাইবে না বিধায় কোন মোক্তাদী কর্ত্তৃক ইমামের সঙ্গে তকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলা তথা মোকাব্বের হওয়া জায়েয আছে (৯৮ পৃঃ ৪০৩ হাঃ)।

মছআলাহঃ—যে সব মোক্তাদী এমন স্থানে দাঁড়ায় যেস্থান হইতে তাহারা ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা সরাসরি অবগত হয় না সে ক্ষেত্রে ঐ মোক্তাদীগণ পরস্পর অন্য মোক্তাদীর অনুসরণে নামায আদায় করিবে এবং তাহাদের নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে (৯৯ পৃঃ ৪০৩ হাঃ)।

অবশ্য ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে যে, আরকান-আহকাম আদায়ে ইমামের সহগমন যেন রক্ষা হয় এবং রুকু-সেজদার ব্যাপারে ইমামই একমাত্র অনুসরণীয়। সুতরাং ঐরূপ দুরের কাতারে কোন মোক্তাদী যদি এমন সময় নামাযে শরীক হইয়া রুকুতে যায় যখন ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পেছনের মোক্তাদীগণ হয়ত তখন রুকুতে ছিল ; এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি উক্ত রাকাত পাইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না। অতএব যে স্থান হইতে ইমামের অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ না হয় ঐরূপ স্থানে সঙ্কীর্ণ অবস্থায় রুকুতে শরীক হইয়া উক্ত রাকাত প্রাপ্ত গণ্য করা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় ; ইমামের সঙ্গে রুকু প্রাপ্তির সন্দেহ ক্ষেত্রে রুকুতে শামিল না হওয়া চাই। ● নামায অবস্থায় বা নামায শেষে মোক্তাদী কর্তৃক ইমামের ভুল ধরা হইলে বা কোন বিষয়ে ইমামের সন্দেহ হইলে সে ক্ষেত্রে ইমাম মোক্তাদীর কথা গ্রহণ করিবে। ● সাধারণতঃ ইমামের ডান দিক এবং মসজিদের ডান দিকের ফজিলত অধিক (১০১ পৃঃ)। আবু দাউদ শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাতার সমূহের ডান অংশের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত হয়, ফেরেশতাদেরও বিশেষ দোয়া হয়।

অবশ্য সম্মুখ কাতারের যে কোন অংশে জায়গা খালি থাকিলে পেছনে দাঁড়ান গোনাহ ; সুতরাং কাতারে খালি জায়গা দেখিয়া বাম দিকে হওয়া সত্ত্বেও উহা পূর্ণ করায় তৎপর হইলে ইহারও বিশেষ ফজিলত রহিয়াছে। ইবনে মাজা শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মসজিদের বাম দিক খালি থাকিয়া যায়। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদের বাম দিকস্থ অংশের খালি জায়গা পূরণে যে ব্যক্তি তৎপর হইবে সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে (ফতহুলবারী ২—১৬৯)।

● নামায আরম্ভ করিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং তকবীর বলা উভয়ই এক সঙ্গে পরিচালিত করিবে (১০২ পৃঃ ৪৩২ হাঃ)। ● সেজদা অবস্থায় পা এইরূপে খাড়া রাখিবে যেন পায়ের আঙ্গুল মোড়িয়া কেবলামুখী হইয়া থাকে (১১২ পৃঃ ৪৭৫ হাঃ)। ● নামাযের মধ্যে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে কাপড় সংযত রাখায় তৎপর হওয়া জায়েয (১১৩ পৃঃ ২৪০ হাদীছ)। ● নামাযের মধ্যে চুলের ভাজ ভাঙ্গিলে বা এলোমেলো হইলে নামাযের মধ্যেই উহা প্রতিরোধে লিপ্ত হইবে না (১১৩ পৃঃ ৪৬৯ হাঃ)। ● প্রত্যেক রাকাতে উভয় সেজদার মধ্যেও

শান্তভাবে বসিয়া তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইবে (১১৩ পৃঃ)। ● কপাল, নাক ইত্যাদিতে ধুলা-বালু লাগিলে নামাযের মধ্যেই উহা পরিস্কার করায় লিপ্ত হইবে না। (১১৫ পৃঃ ৪৭০ হাঃ)। ● নামায পড়িয়াই ইমামকে নামায স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এমনকি ইমাম এবং যে কোন মুছল্লী তাহার ফরজ নামাযের স্থান হইতে মোটেও না সরিয়া সেই স্থানেই সুন্নত ও নফল ইত্যাদি নামায পড়িতে পারে ; ইহাতে কোন দোষ নাই। বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফরজ পড়িয়া ঐ স্থানেই অন্য নামায পড়িতেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র বিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রঃ)ও ঐরূপ করিতেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নামে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যে, ইমাম তাহার ফরজ পড়ার স্থানে সুন্নত-নফল নামায পড়িবে না। এই হাদীছ বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নহে (১১৭ পৃঃ)। তবে এই ব্যাপারে একাধিক হাদীছ রহিয়াছে ; অবশ্য উহার প্রত্যেকটি হাদীছেরই সনদ তথা সাক্ষ্য-সূত্র দুর্ব্বল। অতএব উহাকে ভাল বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার বিপরীতটা মকরুহ সাব্যস্ত হইবে না। সুতরাং উহার জন্য অধিক তৎপরতা বা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ নিতান্তই বাড়াবাড়ি গণ্য হইবে।

● অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার উপর নামায ফরজ নহে, তদ্রূপ অজুও তাহাদের উপর ফরজ নহে (শামী, ১—৮০)। অবশ্য তাহাদেরও নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামায শুদ্ধের সমুদয় শর্ত বজায় থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে নামাযে অভ্যস্ত করা চাই ; তখন নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পালনে এবং নামায নষ্ট হওয়ার কোন কারণ হইলে তদ্দরুন ঐ নামায পুনঃ পড়ায়ও তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিবে (শামী ১—৩৮৩)। অজু গোসল একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই ফরজ হইবে (ফতহুলবারী, ২—২৭৫)। বালকদেরে মসজিদে এবং ঈদগাহে যাওয়ায়ও অভ্যস্ত করিবে। অবশ্য দুইটি বিষয় সতর্ক থাকিবে—পাক-পবিত্র হওয়া এবং মসজিদের ও ঈদগাহের আদব-কায়দা রক্ষা করা তথা খেলা-ধুলা ও হট্টগোল হইতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা। (১১৮ পৃঃ)

——(০)——

জুমার দিন ও জুমার নামাযের আহকাম

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ........

অর্থ :—হে মোমেনগণ ! জুমার দিন জুমার নামাযের আজান দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য (ইত্যাদি লিপ্ততা) ত্যাগ পূর্ব্বক আল্লার জিকর তথা নামাযের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে তবে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। (২৮ পাঃ ১১ রুকু)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত কাকা হারাম। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, জুমার আজানের পর শিল্পকার্য্যও হারাম। ইমাম যুহরী বলিয়াছেন—জুমার আজান হইলে (অবস্থান রত) মুসাফিরও জুমার নামাযে উপস্থিত হইবে। (১০৪ পৃঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় একদা জুমার দিন এক দল লোক খোৎবার সময় খাদ্য ক্রয়ের সুযোগের প্রতি ধাবিত হইলে তাহাদেরে কটাক্ষ করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছিল। নিম্নের হাদীছে উহারই বিবরণ।

৪৯৩। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জুমার দিন আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লামের সহিত নামাযের জন্য একত্রিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় একটি সওদাগরী দল আসিতে ছিল ; উপস্থিত লোকদের অনেকেই সেই দিকে ধাবিত হইল ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে শুধু বার জন লোক বাকি থাকিলেন। সেই ব্যাপারেই এই আয়াত নাযেল হইল—

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

"এক শ্রেণীর লোক তাহারা যখন ব্যবসা বা তামাশার সুযোগ দেখিল উহার প্রতি ধাবমান হইল—(খোৎবা দানে) দণ্ডায়মান অবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লার নিকট (সন্তুষ্টি ও ছওয়াব) যাহা আছে তাহা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রং-তামাশা অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং আল্লাহ সর্ব্বোত্তম আহার যোগানদাতা। (১২৮ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—জুমার আজানের সঙ্গে সঙ্গে খরিদ-বিক্রি ইত্যাদি লিপ্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এবং পূর্ণ খোৎবার সময় তথায় জমিয়া থাকার বিশেষ আদেশ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হয় নাই; সে সম্পর্কের পূর্বোল্লেখিত আয়াতও নাযেল হইয়া ছিল না। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে—আলোচ্য ঘটনার সময়কালে জুমার খোৎবা নামাযের পরে হইত—যেরূপ ঈদের নামাযে এখনও হইয়া থাকে। তাই ছাহাবীগণ মূল নামায সমাপ্ত হওয়া দেখিয়া বিলম্বে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় খাদ্য-ক্রয়ে ছুটিয়া গিয়াছিলেন; তখন মদীনায় খাদ্যের অভাব ছিল। অতঃপর খোৎবা নামাযের পূর্ব্বে হওয়ার বিধান আসে এবং আজানের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কর্ত্তন করার আদেশের আয়াতও নাযেল হয়। এই আয়াতে পূর্ব্বের ঘটনার প্রতি কটাক্ষ করা হয়; উক্ত কটাক্ষের পরে ছাহাবীরা এরূপ সংশোধনই হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদেরই অবস্থার চিত্রাঙ্কনে নেক লোকদের গুণরূপে আল্লাহ বলিয়াছেন—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكٰوةِ - يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"এমন লোকগণ যাঁহাদেরে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লার জিকর তথা স্মরণ হইতে এবং পূর্ণাঙ্গে নামায পড়া ও জাকাত দেওয়া হইতে অন্য-মনা করিতে পারে না। তাঁহারা ঐ দিনের ভয় রাখেন যেদিন লোকদের কলিজা ও চক্ষু উল্‌টিয়া যাইবে। (১৮ পারা ১১ রুকু)

৪৯৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—অন্যান্য নবীগণের উম্মতদিগকে আল্লার কেতাব আমাদের পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে—ইহুদীগণকে তওয়াত, নাছারাগণকে ইঞ্জীল। (অর্থাৎ জগতে তাহাদের আবির্ভাব আমাদের পূর্ব্বে ছিল;) আমরা দুনিয়াতে তাহাদের পর আবির্ভূত হইয়াছি, কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরা সর্ব্বাগ্রে থাকিব। আমাদের আর একটি ফজিলত এই যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বের উম্মত-গণকে প্রতি সপ্তাহে একটি দিন বিশেষরূপে এবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইবার আদেশ করিয়াছিলেন এবং আল্লার নিকট জুমার দিনটিই ঐ দিনরূপে পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মত ইহুদীগণ ইহার পরের দিন অর্থাৎ শনিবার এবং নাছারাগণ তাহার পরের দিন রবিবারকে বাছিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি মেহেরবান হইয়া স্বয়ং স্বীয় পছন্দীয় ঐ জুমার দিনটিকে আমাদের জন্য মনোনীত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত এই ছিল যে, স্বীয় পছন্দনীয় দিনটিকে তিনি নিজেই প্রকাশ্যে তাহাদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। তদুপরি এই উম্মতের বিবেক বুদ্ধিকেও তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী পরিচালিত করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের পূর্ব্বেই মদীনাবাসী কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছু মোসলমান মক্কা হইতে মদীনাতে হিজরত করিয়াও আসিয়াছিলেন। তখনও কোরআন শরীফে জুমার দিন বা জুমার নামাযের বিষয়ে কোন আয়াত নাযেল হয় নাই; কিন্তু মদীনার তৎকালীন মোসলমানগণ সপ্তাহে একটি দিনকে বিশেষরূপে এবাদতের জন্য নির্ব্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। আল্লার মেহেরবানী—তাঁহাদের পরামর্শে এই জুমার দিনটিই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

জুমার দিনে গোসল করা

৪৯৫। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেকেরই জুমার নামাযে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে গোসল করা আবশ্যক।

৪৯৬। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) জুমার নামাযের খোৎবা দিতে ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন মোহাজের ছাহাবী জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জুমায় উপস্থিত হইবার সময় কি এখন? ছাহাবী উত্তর করিলেন, আমি একটি কাজে লিপ্ত ছিলাম, তাই আজানের পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারি নাই; এই মাত্র বাড়ী ফিরিয়া আজান শুনিলাম এবং অজু করিয়া উপস্থিত হইলাম। খলীফা ওমর (রাঃ) আশ্চার্যান্বিতরূপে বলিয়া উঠিলেন, গোসল ব্যতিরেকে শুধু অজু করিয়া আসিলেন? অথচ আপনি জানেন যে, হযরত (দঃ) আমাদিগকে (জুমার দিন) গোসল করিতে আদেশ করিতেন।

৪৯৭। হাদীছ ঃ—তাউস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, লোকেরা বর্ণনা করেন—রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জুমার দিন গোসল করিবে, ভালরূপে মাথা ধুইবে যদিও ফরজ গোসলের নাপাক না হও, এবং সুগন্ধী ব্যবহার করিবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, গোসল সম্পর্কে আমারও এই আদেশ জানা আছে; সুগন্ধি সম্পর্কে আদেশ আমার জানা নাই। (১২১ পৃঃ)

৪৯৮। হাদীছ ঃ—ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (রঃ) আম্‌রাহ (রঃ)কে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, আয়েশা (রাঃ)

বলিয়াছেন, (নবী আলাইহেচ্ছালামের যুগে) লোকদের (অভাব-অনটনের দরুন চাকর রাখার সামর্থ ছিল না, তাই) পরিশ্রমের কাজকর্ম্মও নিজেদেরই করিতে হইত। (একদিকে সেই খাটুনি, অপরদিকে তাহাদের পরিধেয় ছিল দুম্বা-বকরির লোমের তৈরী মোটা কম্বল; সুতরাং তাহাদের ঘর্ম্মাক্ত শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইত;) সেই অবস্থাই তাহারা জুমার নামাযে আসিত; তাই তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল— যদি তোমরা গোসল করিয়া (জুমার নামাযে) আস তবে ভাল হয়। (১২৩ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবু দাউদ শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনাই বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বিবরণী দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, জুমার দিন গোসল করা বিধানগত ওয়াজেব নহে, বরং পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

জুমার দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা

৪৯৯। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমার দিন গোসল করা ওয়াজেব* (তথা বিশেষ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ) এবং মেছওয়াক করিবে এবং সামর্থ্য হইলে সুগন্ধি ব্যবহার করিবে।

৫০০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করিয়া যথা সত্বর আউয়াল ওয়াক্তে জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হইবে সে (এত ছওয়াবের ভাগী হইবে) যেন একটি উট কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে যে আসিবে সে যেন একটি গরু কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে সে আসিবে সে যেন একটি দুম্বা কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে যে আসিবে সে যেন একটি মোরগ কোরবাণী (অর্থাৎ আল্লার রাস্তায় ছদকা) করিয়াছে। তারপর পঞ্চমাংশে যে আসিয়াছে সে যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিয়াছে। (ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপে শ্রেণী বিভক্ত হইবে;) তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হইবেন তখন ফেরেশতাগণ (ঐ বিশেষ ছওয়াব লেখা ক্ষান্ত করিয়া খোৎবার মধ্যে) আল্লার জিকর শুনিবার জন্য মসজিদে চলিয়া আসেন।

জুমার দিন তৈল ব্যবহার করা

৫০১। **হাদীছ ঃ**—সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করিবে,

* প্রায় সকল ইমামগণই এস্থলে "ওয়াজেব" শব্দের অর্থ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ বলিয়াছেন।

সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে এবং তৈল ব্যবহার করিবে অথবা নিজ ঘরে যদি সুগন্ধির ব্যবস্থা থাকে তবে উহা ব্যবহার করিবে, তারপর মসজিদে উপস্থিত হইয়া যেখানে স্থান পায় সেখানেই বসিয়া পড়িবে, কাহাকেও কষ্ট দিয়া মধ্যস্থলে বসিবে না, তারপর যথাসাধ্য নামায পড়িবে, ইমামের খোৎবা দানকালে চুপ থাকিবে—ঐ ব্যক্তির এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

জুমার দিন ভাল জামা-কাপড় পরিধান করা

৫০২। **হাদীছঃ** ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—ওমর (রাঃ) একদা দেখিতে পাইলেন, মসজিদের নিকটে রেশমী কাপড়ের পোষাক বিক্রী হইতেছে। তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ করিলেন, আপনি উহার এক জোড়া কাপড় ক্রয় করুন; জুমার দিন এবং বিদেশী প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষাৎদান করিবার সময় উহা ব্যবহার করিবেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন—রেশমী কাপড় একমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যবহার করিবে, যে আখেরাতে সুখ-শান্তির আশা রাখে না।

ঘটনাক্রমে কিছু দিন পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে রেশমী কাপড়ের কিছু পোষাক হস্তগত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিলেন, তন্মধ্যে এক জোড়া ওমর (রাঃ)কে দিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় পাইয়া দুঃখিত মনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমাকে আজ এই কাপড় দান করিয়াছেন, অথচ রেশমী কাপড়ের বিষয় আপনি যাহা বলিবার বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন, এই কাপড় তোমাকে স্বয়ং ব্যবহার করিবার জন্য দেই নাই। সেমতে ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় জোড়া তাঁহার এক দুরসম্পর্কীয় ভ্রাতাকে দিয়া দিলেন, সে কাফের ছিল এবং মক্কায় থাকিত।

জুমার দিন ফজরের নামাযে কোন্ ছুরা পড়া উচিৎ

৫০৩। **হাদীছঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাযে ছুরা—"আলীফ-লাম-মীম তানজীল" (الم تنزيل) এবং ছুরা—হাল্-আ'তা আ'লাল-ইনসানে (هل اتى على الانسان) পড়িতেন।

গ্রাম ও শহর উভয়ের মধ্যেই জুমা জায়েয

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে জুমা আরম্ভের পর অন্য মসজিদে জুমা পড়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'জুয়াসা'

নামক স্থানে আবদুল কায়েস গোত্রীয় মসজিদে জুমা হইয়াছিল। 'জুয়াসা' এলাকাটি বাহ্‌রাইন দেশভুক্ত একটি এলাকা।

● আয়লা এলাকার শাসনকর্তা তথাকার কেন্দ্রীয় 'রোযায়ক' শহর হইতে দূরে তাঁহার খামারে এক দল শ্রমিক দিয়া কাজ করাইতে ছিলেন। তথা হইতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাম্মেদ ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ)কে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, খামার এলাকায় শ্রমিকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়িব কি? ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ) লিখিয়া ছিলেন, আপনি তথায় অবশ্যই জুমার নামায পড়িবেন।

জুমার নামাযের আদিষ্ট না হইলে সে গোসলের আদিষ্ট হইবে কি ?

মহিলাগণ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকগণ তাহাদের প্রতি জুমার নামাযের আদেশ নাই; জুমার দিনের গোসলের আদেশ তাহাদের প্রতি প্রযোয্য হইবে কি?

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার দিনের গোসলের কর্ত্তব্য শুধু তাহাদের উপরই যাহাদের উপর জুমার নামায ফরজ।

৫০৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের কর্ত্তব্য প্রতি সাতদিনে একদিন (জুমার দিন) গোসল করা। (বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী কথাটিও হাদীছেরই অংশ। ফতহুলবারী, ২—৩০৬)

এই হাদীছ মর্ম্মে মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও জুমার দিন গোসল করা কর্ত্তব্য।

জুমার জমাতে উপস্থিতি অসাধ্য হইলে জুমা মাফ

৫০৫। **হাদীছ ঃ**—একদা জুমার দিন ভীষণ বৃষ্টি ও কাদার সৃষ্টি হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং মোয়াজ্জেনকে হাইয়্যা-আলাস্‌সালাহ বলার সময়ে الصلوٰة فى الرحال "নিজ নিজ ঘরে নামায পড়িয়া নেও" বলিবার আদেশ করিলেন। ইহাতে লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার এই ব্যবস্থায় চাঞ্চল্য দেখাইতেছ! নবী (দঃ) এইরূপ করিয়াছেন। জুমার নামায অবশ্য ফরজ বটে, কিন্তু এই বৃষ্টি ও কাদার অবস্থায় তোমাদিগকে গোনাহের ভাগী করিব যাহাতে তোমরা হাটু পর্য্যন্ত কাদা জড়াইয়া এই বৃষ্টির মধ্যে মসজিদে আসিবে—ইহা আমি ভাল মনে করি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—"হাইয়্যা-আলাস্‌সালাহ" অর্থ নামাযের জন্য আস—এই আহ্বান ও আদেশ বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার—যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে উপস্থিত মুরব্বির পক্ষ

হইতে মোয়াজ্জেনের মুখে উচ্চারিত হয়। উহা লঙ্ঘন করা মামুলী কথা নহে; আজানের ঐ বাক্যে মোসলমানদের জমাতে উপস্থিতি কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ এইরূপ অবস্থায় জুমার নামাযের জন্য আসার ফরজ মাফ হইয়া গিয়াছে, তাই বাড়ীতে নামায পড়ার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। জুমা মাফ হইলে বাড়ীতে নিয়মিত জোহর-নামায পড়িতে হয়।

কতদূর ব্যবধান হইতে জুমায় উপস্থিত হওয়া উচিৎ

আ'তা (রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন—যখন তুমি এমন কোন বস্তিতে উপস্থিত থাক, যেই বস্তিতে জুমা হইয়া থাকে এবং সেখানে জুমার আজান দেওয়া হয় তখন জুমার নামাযে শরীক হওয়া তোমার উপর অবশ্য কর্ত্তব্য। আজানের আওয়াজ শুনিতে পাও অথবা না পাও।

বছরা শহর হইতে ছয় মাইল দুরে "যাবিয়া" নামক খুব নগণ্য বসতির স্থানে আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল; তথায় অবস্থান কালে তিনি কোন দিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া বছরা শহরে জুমার নামায পড়িতেন এবং কোন কোন দিন আসিতেন না।

৫০৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ মদীনা হইতে দুরপ্রান্তে অবস্থিত নিজ নিজ বাড়ী হইতে এবং মদীনার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে জুমার নামাযের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহারা ধূলা-বালী মাখা অবস্থায় আসিতেন, তদুপরি তাঁহাদের শরীরে ঘর্ম্মও নির্গত হইত। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট ছিলেন তখন ঐরূপ একজন লোক তাঁহার নিকট আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন—জুমার দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিলে ভাল হয়।

জুমার নামাযের ওয়াক্ত

৫০৭। হাদীছ : আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর জুমার নামায পড়িতেন।

৫০৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জুমার নামায যথাসম্ভব শীঘ্র পড়িতাম এবং দ্বিপ্রহরের শয়নও জুমার নামাযের পরেই হইত।

অর্থাৎ জুমার নামাযের জন্য বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা হইত; জুমার নামায না পড়িয়া কোন প্রকার আরামও করা হইত না। অবশ্য জুমার ওয়াক্ত হওয়ার পর তথা সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর যথাসম্ভব শীঘ্রই জুমার নামায পড়িয়া লওয়া হইত।

৫০৯। **হাদীছ**ঃ—ছালামাতুব্‌নুল আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জুমা এমন সময় পড়িতাম যে, নামায শেষ করার পরেও দেওয়ালের ছায়া এতটুকুও হইত না যাহাতে রৌদ্র হইতে আশ্রয় নেওয়া যায়। (৫৯৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ—জুমা অপেক্ষাকৃত প্রথম ওয়াক্তে যথা-শিঘ্র পড়া হইত; ইহাই এই বর্ণনার মর্ম্ম।

৫১০। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঠাণ্ডার দিনে জুমার নামায অগ্রভাগে পড়িতেন এবং উত্তাপের দিনে বিলম্বে পড়িতেন।

জুমার অন্য ধাবিত হওয়ার আদেশ এবং পদব্রজে উপস্থিত হওয়া

৫১১। **হাদীছ**ঃ—আবায়া ইবনে রেফায়া (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জুমার নামাযের জন্য হাঁটিয়া যাইতে ছিলাম, এমতাবস্থায় আবু আবস্‌ (রাঃ) ছাহাবী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যাহার পা আল্লার রাস্তায় ধূলা মাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ দোযখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

জুমার দিন মসজিদে কাহাকেও উঠাইয়া তাহার স্থানে বসিবে না

কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসা কোন সময়ই বাঞ্চনীয় নহে; বিশেষতঃ জুমার দিন।

৫১২ **হাদীছ**ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—কেহ যেন অন্য মোসলমান ভাইকে তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজে ঐ স্থানে না বসে, তাহা জুমার দিন হউক বা অন্য কোন দিন এবং মসজিদে হউক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে।

জুমার আজান

৫১৩। **হাদীছ**ঃ—সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে জুমার নামাযের জন্য শুধু মাত্র এক আজান দেওয়া হইত যাহা খোৎবার পূর্ব্বে ইমাম মিম্বরে বসিলে দেওয়া হয়। খলীফা ওসমান (রাঃ)-এর সময়ে যখন মোসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া গেল (এবং মদীনার চতুস্পার্শে বস্তি অনেক দুরে পর্য্যন্ত বাড়িয়া গেল) তখন ওসমান (রাঃ) "যাওরা" নামক একটি উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া ঐ খুৎবার আজানের পূর্ব্বে আর এক আজান দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—প্রত্যেক নামাযের যে আজান দেওয়া হয় তাহা উক্ত নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার জন্য, তাই সেই আজান জমাত আরম্ভের অনেক পূর্ব্বে হয় এবং হইত। আর জুমার নামাযের আজান যাহা খোৎবা আরম্ভে দেওয়া হইত তাহা অবশ্যই নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার জন্য ছিল না, নতুবা উহাও জমাত আরম্ভের অনেক পূর্ব্বেই হইত। ঐ আজান জমাত-আরম্ভ জ্ঞাত করার জন্য ছিল, তাই উহা খোৎবার আরম্ভে দেওয়া হইত। কারণ, জুমার খুৎবা উহার নামাযের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত। প্রথম দিকে মোসলমান কম সংখ্যায় ছিলেন এবং তাঁহারা জুমার দিন বিশেষভাবে অনেক পূর্ব্ব হইতেই নামাযের প্রস্তুতিতে তৎপর হইতেন, তাই ঐ নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার জন্য আজানের প্রয়োজন তখন ছিল না। যখন মোসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়া মদীনা শহরের দুর এলাকা পর্য্যন্ত মোসলমানদের বস্তি স্থাপিত হইল তখন জুমার জন্যও নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার আজান দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সমস্ত ছাহাবীদের বর্ত্তমানে অন্যান্য নামাযের ন্যায় জুমার নামাযেরও ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার আজান খোৎবা আরম্ভের অনেক পূর্ব্বে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল (ফতহুল-বারী, ২—৩১৫)।

উক্ত আজানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে খলীফা ওসমানের আমল হইতেই জুমার নামাযের মূল আজান (যাহা নবী (দঃ)-এর সময়ে খোৎবা-আরম্ভে দেওয়ার প্রচলন ছিল—সেই আজান) ইমাম মিম্বরে বসাবস্থায় ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় বলিয়া ফতহুল-বারী কেতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

ان عثمان احدثه لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة قياسا
على بقية الصلوات فالحق الجمعة بها وابقى خصوصيتها بالاذان
بين يدى الخطيب - (٢—٣١٥)

আর খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক এই রীতি প্রবর্ত্তন সমস্ত ছাহাবীগণের বর্ত্তমানেই ছিল। খলীফা ওসমানের রীতি অনুসারেই জুমার একটি আজান বর্দ্ধিত-করণ গৃহিত হইয়াছে—যে আজান নবীজীর আমলে ছিল না। তদ্রূপ খোৎবার আজান ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতিও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ উভয় রীতিই এক সঙ্গে জড়িত ভাবে সমস্ত ছাহাবীগণের বর্ত্তমানে খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কিন্তু স্মরণ রাখিবে, ইমামের সম্মুখে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, মিম্বর ঘেষিয়া আজান দিবে। সাধারণ মুসল্লিদের প্রথম কাতারে ইমামের সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইয়া আজান দিবে।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও লিখিয়াছেন যে, খোৎবা আরম্ভের আজানের সময় ইমাম মিম্বারে বসা থাকিবেন ! অর্থাৎ আজান আরম্ভের পূর্ব্বেই ইমাম মিম্বারে উঠিয়া বসিবেন এবং খোৎবা আরম্ভ লগ্নে আজান দেওয়া হইবে।

ইমাম মিম্বরের উপর বসিয়া আজানের উত্তর দিবেন

৫১৪। হাদীছ ঃ—আবু উমামাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি শুনিয়াছি, ছাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বরের উপর বসিয়া মোয়াজ্জেনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আজানের শব্দসমূহকে উচ্চারণ করিলেন এবং আজান শেষে বলিলেন—হে লোক সকল। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বসা অবস্থায় মোয়াজ্জেনের আজান শ্রবণে এইরূপই বলিতে শুনিয়াছি।

মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিবে

৫১৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মসজিদের মধ্যে একটি খেজুর গাছের থাম ছিল যাহার সংলগ্নে দাঁড়াইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিয়া থাকিতে। যখন তাঁহার জন্য মিম্বর তৈয়ার করা হইল এবং তিনি ঐ খেজুর গাছের থাম ছাড়িয়া দিয়া মিম্বরের উপর খোৎবা দান আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা নিজ কানে ঐ থামের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, যেরূপে সদ্য প্রসবিতা উট স্বীয় বাচ্চার জন্য কাঁদিয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বর হইতে নামিয়া আসিয়া উহার উপর হাত বুলাইলে সে শান্ত হইল।

৫১৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দাঁড়াইয়া খোৎবা দিয়া থাকিতেন এবং মধ্যস্থলে একবার বসিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খোৎবা প্রদান করিতেন ; যেরূপ বর্ত্তমানেও হইয়া থাকে।

খোৎবা বা ভাষণ আল্লার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিবে

৫১৭। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে কিছু ধন-দৌলত বা অন্য কোন বস্তু আমদানী হইল। তিনি তৎক্ষাণাৎ উহা বিতরণ করিয়া দিলেন। (প্রত্যেককে দেওয়ার পরিমাণ মাল ছিল না, তাই সকলকে না দিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে দিলেন।) তারপর হযরত (দঃ) শুনিতে পাইলেন যে, যাহারা উহার অংশ পায় নাই তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি ভাষণ দান করিলেন— প্রথমে আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন, তারপর বলিলেন, আমি

অনেক সময় একজনকে দান করি অন্য আর একজনকে দান করি না, অথচ যাহাকে দান করি না সে-ই আমার নিকট বিশেষ সন্তুষ্টিভাজন। এরূপ করার একমাত্র কারণ এই যে, একদল লোক এমন আছে যাহাদের মন এখনও ইসলামের প্রতি কাঁচা—তাহারা চঞ্চল; এখনও তাহাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি স্থিরতা আসে নাই, তাই তাহাদিগকে দান করিয়া থাকি। আর একদল লোক এমনও আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ় মনোবল দান করিয়াছেন এবং তাহাদের মনে-প্রাণে ঈমান সুদৃঢ়রূপে পাকা-পোক্তা হইয়াছে; সেই ভরসায় আমি তাহাদিগকে দান করি না।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী শপথ করিয়া বলনে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ কথাটি আমার নিকট দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন-দৌলত হইতেও অধিক সন্তুষ্টির বস্তু ছিল। (কারণ, যাহাদিগকে দান করেন নাই তাহারা দৃঢ় ঈমানদার ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার উপর হযরতের এই কথাটি সনদ ও সাক্ষ্য স্বরূপ।)

দুই খোৎবার মধ্যে বসিতে হইবে

৫১৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন দুইটি খোৎবা দিতেন এবং খোৎবাদ্বয়ের মধ্যভাগে বসিতেন।

মনোযোগের সহিত খোৎবা শুনিবে

৫১৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—জুমার দিন একদল ফেরেশতা মসজিদের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া ধারাবাহিকরূপে আগন্তুক মুছল্লিগণের নাম লিখিতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে আসিল সে যেন একটি উট ছদকা করিল। তারপরের সময়ের আগন্তুক যেন একটি গরু, তারপর যেন একটি দুম্বা, তারপর যেন একটি মোরগ, তারপর যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিল। তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হন তখন ফেরেশতাগণ সব কিছু গুছাইয়া খোৎবার মধ্যে আল্লার জেক্‌র শুনিবার জন্য চলিয়া যান।

ব্যাখ্যা :—জুমার ওয়াক্তের সর্ব্বপ্রথম অংশ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর হইতে ইমামের খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়া পর্য্যন্ত সময়টুকুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সে অনুপাতে উল্লিখিত পর্য্যায়ে শ্রেণী স্থির করা হয়।

খোৎবার সময় আগত ব্যক্তির দুই রাকাত নামায পড়া

৫২০। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জুমার দিন এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হইল যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

খোৎবা দিতেছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি নামায পড়িয়াছ? সে আরজ করিল, না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—একমাত্র এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যে, খোৎবা দানকালীন ঐ এক ব্যক্তিকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় বা খেলাফায়ে-রাশেদীনগণের যমানায় এইরূপের ঘটনা দ্বিতীয় আর দেখা যায় নাই। অথচ খোৎবা প্রদানকালীন কাহারও উপস্থিত হওয়া একটি মামুলী ও অতি স্বাভাবিক বিষয় বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হইয়াছে, কিন্তু আর কখনও ঐরূপে নামায পড়ার আদেশ করা হয় নাই। এতদ্দৃষ্টে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, এই ঘটনাটি কোনও বিশেষ কারণমূলক ছিল ঃ বস্তুতঃ মছআলাহ এই যে—খোৎবা দানকালে নামায পড়া নিষিদ্ধ।

খোৎবার সময় হাত উঠানো

অনেক বক্তা বক্তৃতার সময় উগ্রমূর্ত্তি বা ক্ষিপ্ততা প্রকাশার্থে মুহুঃ মুহুঃ হস্ত উত্তোলন করিয়া থাকে; মোসলেম শরীফে এক হাদীছে এই অভ্যাসের প্রতি নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। বোখারী (রঃ) অত্র পরিচ্ছেদে একটি হাদীছ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এমন কোন বিষয়ের উপর যদি ভাষণদাতা হাত উঠায় যাহা শরীয়তে অনুমোদিত তবে তাহা নিন্দণীয় নহে। জুমার খোৎবায়ও এই মছআলাহ প্রযোয্য। যেমন—খোৎবার সময় উপস্থিত কোন বিশেষ দোয়া করা ক্ষেত্রে যদি খোৎবার মধ্যে হাত উঠানো হয় তবে তাহা নিন্দণীয় হইবে না। এ সম্পর্কীয় হাদীছখানার অনুবাদ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

খোৎবার মধ্যে বিশেষ কোন দোয়া করা

৫২১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষ পড়িল। ঐ সময় নবী (দঃ) এক জুমার দিন খোৎবারত ছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে আসিল এবং হযরতের বরাবরে দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! অনাবৃষ্টির দরুণ (ঘাসের অভাবে) পশুপাল মৃতপ্রায়, (দুধের অভাবে) বাচ্চা-কাচ্চা অনাহারী এবং মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি আল্লার নিকট দোয়া করুন, আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করেন। তৎক্ষণাৎ হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং দোয়া করিলেন— اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا "হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন।" উপস্থিত লোকগণও আল্লার রসুলের সঙ্গে হাত উঠাইল এবং দোয়া

করিল। ঐ সময় আকাশে মেঘের চিহ্নও ছিল না, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখনও হাত নামান নাই, ইতিমধ্যেই পর্ব্বতাকৃতির মেঘমালা মদীনা এলাকার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। হযরত (দঃ) মিম্বার হইতে নীচে আসিবার পূর্ব্বেই এমন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল যে, মসজিদের খেজুর পাতার ছাদ হইতে পানি পড়িয়া হযরতের দাড়ি মোবারক হইতে পানি বহিতে লাগিল। বৃষ্টির দরুন আমাদের বাড়ীতে পৌঁছা কষ্টকর হইয়া পড়িল। পরবর্ত্তী জুমার দিন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইল; সাত দিন সূর্য্য দেখা গেল না। পরবর্ত্তী জুমার দিন খোৎবার সময়েই ঐ ব্যক্তিই কিম্বা অন্য ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল এবং তাহার সঙ্গে সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! (অধিক বৃষ্টিপাতে) বাড়ী-ঘর ধ্বসিয়া যাইতেছে, পশুপাল পানিতে ডুবিয়া যাইতেছে, রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চলাচলের অসুবিধা হইয়াছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। হযরত (দঃ) স্মিত হাসিলেন এবং উভয় হাত উত্তোলন পূর্ব্বক দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

"হে আল্লাহ! আমাদের হইতে দুরের পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা সমূহে বর্ষিত হউক, আমাদের উপরে নয়; বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতের উপর, ছোট ছোট পাহাড়ে পার্ব্বত্য সমতল ভূমিতে এবং বাগ-বাগিচা ও খেত-খামারে বর্ষিত হউক। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের ইশারার সাথে সাথে মেঘ-খণ্ডগুলি মদীনার আকাশ হইতে পার্শ্ববর্ত্তী দিকে চলিয়া গেল এবং দুরবর্ত্তী এলাকায় বর্ষিল। মদীনার আকাশে মেঘের চিহ্নও থাকিল না এবং এক ফোটা বৃষ্টিও আর রহিল না। নামাযান্তে আমরা রৌদ্রের মধ্যে বাড়ী ফিরিলাম। দুরবর্ত্তী এলাকার বৃষ্টিপাতে "কানাত" নামক গিরি-প্রণালিকা এক মাস পর্য্যন্ত প্রবাহমান থাকিল। দুরবর্ত্তী এলাকার প্রত্যেক আগন্তুকই বৃষ্টিপাতের সংবাদ দিতেছিল। (১২৭, ১৩৭, ১৪০ পৃঃ)

খোৎবা দানকালীন সকলকে চুপ থাকিতে হইবে

সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম খোৎবা প্রদান করে তখন সকলের চুপ থাকা উচিত।

৫২২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জুমার দিন খোৎবা দানকালীন তুমি যদি কাহাকেও (মুখে শব্দ করিয়া) বল "চুপ কর" তবে তুমিও নিয়ম লঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হইবে (এবং এই কারণে তোমারও জুমার ছওয়াব কম হইয়া যাইবে)।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত বিষয়টি বড়ই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রথমে যে ব্যক্তি কথা বলে তাহাকে বাধাদানের জন্য অধিক হট্টগোলের সৃষ্টি করা হয় ; ইহা বোকামী ছাড়া আর কি হইতে পারে।

জুমার দিনে একটি মুল্যবান সময় আছে

৫২৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—এই দিনের মধ্যে এমন একটি মূল্যবান সময় আছে যে, সেই সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হউক আল্লাহ তায়ালা উহা কবুল করিয়া থাকেন। অবশ্য ঐ সময়টুকু খুবই অল্প—অধিক প্রশস্ত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ সময়টুকু জুমার দিনেই অনির্দ্দিষ্টরূপে রহিয়াছে, যেমন লায়লাতুল-কদর রমজান মাসে অনির্দ্দিষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ঐ সময়টুকুর অভিলাষী তাহাকে পূর্ণ দিনটিই তৎপরতার সহিত কাটাইতে হইবে। অবশ্য ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়াকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ মূল্যবান সময়টি পাইবার সম্ভাবনা অধিক।

জুমার নামাযের পূর্ব্বে ও পরে সুন্নত পড়া*

৫২৪। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের পূর্ব্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, মগরেবের পরে স্বীয় গৃহে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন এবং জুমার নামাযের পর স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

মছআলাহ ঃ—জুমার ফরজের পূর্ব্বের চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত এক সালামে পড়া ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, যেরূপ জোহরের ফরজের পূর্ব্বে চার রাকাত। (দোররুল মোখঃ)

জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া আমোদ-আনন্দে বিচরণ

জুমার দিন জুমার নামাযের প্রতি তৎপরতায় অন্য তৎপরতা ও লিপ্ততা যথাসাধ্য কম করিতে হয়। অবশ্য জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া অনুমোদিত লিপ্ততার অনুমতি রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

"যখন নামায সমাপ্ত হইয়া যায় তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে পার।" নিম্নে এই শ্রেণীরই একটি হাদীছ উল্লেখ হইতেছে।

---

* জুমার নামাযের পূর্ব্বে সুন্নত পড়া বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিলেন, দলীল উল্লেখ করেন নাই। ফতহুল-মোলহেম দ্বিতীয় খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠায় ইহার দলীল বর্ণিত আছে।

৫২৫। হাদীছঃ—ছাহাবী সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমাদের মধ্যে এজকন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে পানি প্রবাহিত হইবার নালী সমূহের কিনারায় তিনি "চুকান্দার" নামক সজ্বী বপন করিতেন। জুমার দিন তিনি ঐ চুকান্দরের মুলগুলি উঠাইয়া আনিতেন এবং উহার সঙ্গে আটা মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈয়ার করিতেন। আমরা জুমার নামাযান্তে তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম, তিনি আমাদিগকে উহা খাইতে দিতেন। আমরা আনন্দের সহিত উহা চাটিয়া চাটিয়া খাইতাম। আমরা তাঁহার ঐ খাদ্যের আগ্রহে জুমার দিনের প্রতীক্ষায় থাকিতাম।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● জুমার দিন বিশেষভাবে মেছওয়াক করিবে। (১১২ পৃঃ ৫০০) ● মসজিদে এক জোটের দুইজন একত্রে বসা থাকিলে তাহাদের মধ্যে তৃতীয় পর ব্যক্তির বসা উচিৎ নহে। (১২৪ পৃঃ ৫০২ হাঃ) ● খোৎবা দানকালে মুছল্লীদের লক্ষ্য ও ধ্যান ইমামের (খোৎবার) প্রতি হইয়া চাই। (১২৫ পৃঃ) ● জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনজনের জমাত শর্ত্ত; ইমামের সঙ্গে তিনজন পুরুষ মোক্তাদী হইলে জুমার নামায হইবে অন্যথায় জুমার নামায হইবে না, সে ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া জোহরের নামায পড়িতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে জুমার নামায আরম্ভ করার পর পেছন হইতে মোক্তাদীগণ নামায ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—যদি তিনজন পুরুষ বাকি থাকিয়া থাকে তবে ইমাম সহ সকলেরই জুমা শুদ্ধ হইয়া যাইবে (১২৮ পৃঃ)। আর যদি তিন জনও বাকি না থাকে এবং তাহারা প্রথম রাকাতের সেজদার পূর্ব্বেই চলিয়া যায় তবে ইমামের জুমাও ফাছেদ হইয়া যাইবে, পুনঃ নিয়্যত বাঁধিয়া জোহর পড়িতে হইবে। আর যদি সেজদার পরে যায় তবে ইমাম জুমারূপেই স্বীয় নামায পুরা করিবে। (শামী, ২—৭৬১)

শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনাবস্থায় জমাতে নামায পড়ার নিয়ম

জমাত ব্যতিরেকে একাকী ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে নামায পড়াকে শরীয়ত মোটেই পছন্দ করে না; একস্থানে উপস্থিত সমস্ত মোসলমান এক জমাতে নামায পড়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শত্রুর মোকাবেলায় একতা ও শৃঙ্খলা শত্রুপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু এদিকে সকলে একত্রে নামাযরত হইলে শত্রুপক্ষের সুযোগ পাওয়ার আশঙ্কা ও ভয় আছে, তাই শরীয়ত এমন ক্ষেত্রে জমাত কায়েমের বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সুদীর্ঘ বয়ান বিদ্যমান রহিয়াছে। (৫ পাঃ ১২ রুঃ দ্রষ্টব্য)

এতদ্দৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম ধর্ম্ম কিরূপ পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, ব্যাপক ও জীবন্ত ধর্ম্ম—যাহার মধ্যে নিছক ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পরিস্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং আপদ-বিপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি-কাটাকাটির অবস্থায়ও জীবনকে কিরূপে দ্বীন ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা যায় তাহার সহজ পথও প্রদর্শন করা হইয়াছে।

৫২৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নজ্‌দ এলাকার কোনও জেহাদে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা শত্রুপক্ষের নিকটবর্ত্তী অবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন এবং আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। এক দল শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখার কাজে নিযুক্ত রহিল, আর এক দল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায আরম্ভ করিল। এইরূপে এক রাকাত নামায হইলে পর নামাযরত দল শত্রুর প্রতি চলিয়া গেল এবং শত্রুর প্রতি নিযুক্ত দল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হইল। যেহেতু (কছর হিসাবে বা বস্তুতঃই দুই রাকাতওয়ালা নামায ছিল, তাই) দ্বিতীয় দলকে লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্বিতীয় রাকাত পড়ার পর রসুলুল্লার (দঃ) নামায পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি সালাম ফিরিলেন। কিন্তু মোক্তাদীগণের প্রত্যেক দলেরই এক এক রাকাত নামায হইল এবং এক এক রাকাত বাকী রহিল; ঐ এক রাকাতকে (প্রথম দল লাহেকের ন্যায়, দ্বিতীয় দল মসবুকের ন্যায়) তাহারা নিজে নিজে পড়িল।

৫২৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শত্রু দল যদি এত অধিক হয় যে, তাহাদের মোকাবিলায় মোসলমান সৈন্যদল বিভক্ত করিলে আত্মরক্ষায় যথেষ্ট হইবে না, তবে প্রত্যেকে মাটিতে দাঁড়ানো বা বাহনে আরোহিত নিজ নিজ অবস্থায়ই ভিন্ন ভিন্ন নামায আদায় করিবে। (এমনকি কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হইলে যেই দিকে সম্ভব সেই দিকেই এবং রুকু সেজদা সম্ভব না হইলে শুধু মাথার ইশারায় রুকু-সেজদার কাজ করিয়া নামায আদায় করিবে। ফতহুলবারী, ২—৩৪৬)

৫২৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোনও এক জেহাদের ঘটনায় আমরা নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইলেন, আমরা সকলেই একত্রে তাঁহার পেছনে এক্তেদা করিয়া নামাযে দাঁড়াইলাম। যখন তিনি রুকুতে গেলেন তখন প্রথম কাতারের লোকগণ তাঁহার সঙ্গে রুকু করিল, সেজদার সময় সেজদা করিল, কিন্তু পেছনের কাতারের লোকগণ সেই রুকু-সেজদা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লাম এবং প্রথম কাতারের লোকগণ সেজদা হইতে উঠিবার পর পেছনের কাতারের লোকগণ রুকু-সেজদা করিল। (এইরূপে সকলেরই এক রাকাত হইল,) দ্বিতীয় রাকাতের সময় (প্রথম কাতারের লোকগণ পেছনে এবং) পেছনের কাতারের লোকগণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ব্বের ন্যায়ই দ্বিতীয় রাকাত পড়া হইল। (এইরূপে সকলেরই সমরূপে দুই রাকাত পুরা হইলে পর একত্রে সালাম করিল।) সকলেই এক জমাতে শরীক ছিল, কিন্তু একে অন্যকে পাহারাও দিতেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—শত্রুর ভয় ও আশঙ্কাবস্থায় নামায এক জমাতে পড়ার বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিভিন্নতা এই জন্য যে, শত্রুপক্ষের অবস্থান বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন ছিল এবং শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিপ্রক্ষিতেই জমাতের নিয়ম ধার্য্য করা হইত। যেমন ৫২৬ নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ মোসলমানদের সম্মুখদিকে তথা কেবলার দিকে ছিল না বরং অন্যদিকে ছিল, তাহাদের মোকাবিলায় দাঁড়াইয়া থাকার জন্য যে দল নিযুক্ত হইল তাহারা ঐ অবস্থায় নামায আরম্ভ করিতে পারিল না. কারণ তাহারা কেবলা দিকে নয়। ৫২৮নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ কেবলা দিকে ছিল, তাই সকলে একত্রেই নামায আরম্ভ করিল। রুকু-সেজদার সময় আশঙ্কা ; তাই পেছনের কাতার পাহারায় রহিল। এইভাবে যখন যেইরূপে জমাত করা সম্ভব হইয়াছে, তখন সেই নিয়মেই করা হইয়াছে।

ইহা অতি স্পষ্ট যে, এসব নিয়ম নামাযের সাধারণ নিয়ম হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র ও পৃথক, কিন্তু যেহেতু এই স্বাতন্ত্র্য প্রবর্ত্তনের জন্য ইহার বিস্তারিত বিবরণ দান করতঃ কোরআন শরীফের প্রায় একটি রুকু নাজেল হইয়াছে এবং বহু হাদীছে ইহা বর্ণিত ; তাই এই স্বতন্ত্রতাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া এক ইমাম ও এক জমাতকে যথাসম্ভব রক্ষা করা হইয়াছে। কারণ, ইহা আল্লার নিকট অতি পছন্দনীয় এবং মোসলেম সমাজের জন্য আবশ্যকীয় বস্তু, তদুপরি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

যুদ্ধ চলাকালীন বা বিজয় সংগ্রাম অবস্থায় নামাযের নিয়ম

ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি বিজয়ের সূচনা ও সম্ভাবনা সন্নিকটে দেখা যায় এবং এমতাবস্থায় কোন মতেই রুকু-সেজদা করিয়া জমাতে নামায পড়া সম্ভব না হয় তবে প্রত্যেকেই নামায শুধু মাথার দ্বারা ইশারায় পড়িবে, তাহাও সম্ভব না হইলে নামায কাজা করিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে) আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে স্তুস্তর শহরের দুর্গ আক্রমণ করা হইল; আমি সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম।

ভোর বেলায় আক্রমণ চলিল, যুদ্ধের এরূপ তীব্রতা ছিল যে, আমরা কোন মতেই ফজরের নামায পড়িতে সক্ষম হইলাম না। অধিক বেলা হইলে আমরা ফজরের নামায পড়িবার সুযোগ পাইলাম এবং অধিনায়ক আবু মূছা (রাঃ) ছাহাবীর সহিত নামায পড়িলাম। শহর আমাদের জয় হইল। (জেহাদের সঙ্কটময় অবস্থায় যে নামায পড়িয়াছিলাম যদিও উহা কাজা নামায ছিল তবুও উহাতে এতই অনুরক্তি লাভ করিয়াছিলাম যে,) ঐ নামাযের বিনিময়ে সমগ্র জগতের রাজত্ব ও ধন-সম্পদ আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

৫২৯। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ক্রুদ্ধাবস্থায় কাফেরদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, কিন্তু অদ্য আছরের নামায পড়িতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমিও ত এখন পর্য্যন্ত নামায পড়িতে পারি নাই। এই বলিয়া হযরত (দঃ) একটি সমতল ভূমিতে গেলেন এবং অজু করিয়া সূর্য্যাস্তের পরেই আছরের নামায পড়িলেন তারপর ঐ ওয়াক্তের মগরেবের নামায পড়িলেন।

মছআলাহ ঃ—জেহাদের সময় শত্রুকে ধাওয়া করা বা শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হওয়াকালে যদি নামাযের সঙ্কীর্ণ সময় উপস্থিত হয় তবে আরোহিত অবস্থায় ধাবমান রূপেই মাথার ইশারায় নামায আদায় করিবে (১২৯ পৃঃ)। আর যদি পদব্রজে ছুটিতে থাকে তবে কোন কোন ইমামের মতে সেই দৌড়ের অবস্থায়ই মাথার ইশারার সহিত নামায আদায় করিবে; হানফী মজহাবের মত এই যে, এই অবস্থায় নামায কাজা করিবে।

মছআলাহ ঃ—ভোর বেলা শত্রুর শহর বা দুর্গের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা হইলে সুযোগ প্রাপ্তে ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়িয়া নিবে। (১২৯ পৃঃ)

——(০)——

ঈদের দিন ও উহার নামায

ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদ করা

৫৩০। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোরবাণী বা রোজার এক ঈদের দিন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আমার গৃহে আসিলেন।

وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار
يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين وتدففان وتضربان (১৩০ ও ৫০০ পৃঃ)

ঐ সময় আমার নিকটে দুইটি মদীনাবাসী বালিকা সেই সব তারানা গাহিতে ছিল যেই সব তারানা মদীনাবাসীরা তাহাদের ইসলাম পূর্ব্ব ঐতিহাসিক বোয়াছ-যুদ্ধে উভয় পক্ষ গাঁথিয়া ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, বালিকাদ্বয় কোন গায়িকা ছিল না। বালিকাদ্বয় দফ্ বা ডুগিও বাজাইতেছিল, লাফালাফিও করিতে ছিল। নবী (দঃ) তখন বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) আমাকে এবং বালিকাদ্বয়কে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে শয়তানের বাঁশি? তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া আবু বকরের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়, তাহাদিগকে ছাড়; প্রত্যেক জাতিরই খুসির দিন আছে; আজিকার দিন আমাদের খুসির দিন। অতঃপর হযরত (দঃ) এই দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া নিলে আমি বালিকাদ্বয়কে টিপুনি দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম, তাহারা চলিয়া গেল।

আরও একটি ঘটনা—একদা ঈদের দিন কতিপয় হাব্শী লোক মসজিদে ঢাল-খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল। আমি নিজে বলিলাম কিম্বা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, খঞ্জর-খেলা দেখিতে চাও? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) আমাকে আড়াল করিয়া রাখিতে ছিলেন। আমার গণ্ডদেশ হযরতের গণ্ডের সহিত লাগাইয়া আমি হাব্শীদের অস্ত্র চালনা দেখিতে ছিলাম; ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে ধমকাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়; আর ঐ খেলোয়ার হাব্শীদেরকে বলিলেন, ভয় নাই—তোমাদের কাজ করিয়া চল।

আমি নিজেই অবসাদ অনুভব করিলে হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মন ভরিয়াছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে চলিয়া যাও।

● ঈদের দিন আমোদ প্রমোদের দিন; মোসলমানদের আমোদ-প্রমোদ কি আকারের হইবে তাহাই এই হাদীছের ঘটনাদ্বয়ে দেখান হইয়াছে; একটি কচিকাঁচাদের, অপরটি বুড়দের।

প্রথম ঘটনায় বালিকাদ্বয় সুরের সহিত তারানা গাহিতেছিল ; আবু বকর (রাঃ) ধারণা করিলেন, সুরের সহিত যাহাই গাওয়া হইবে তাহাই শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত-নিষিদ্ধ, তাই তিনি বাধা দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আরবীতে সুরকেই "গেনা" বলা হয় যাহার অর্থ সুরের সহিত আবৃত্তি করা ; এই জন্যই সুন্দর সুরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকেও আরবীতে "গেনা" বলা হয়। সুর বিভিন্ন প্রকারের; গানের সুর, তারানার সুর, কাব্যের সুর, কোরআন তেলাওয়াতের সুর। এর মধ্যে গানের সুর হইল শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ। উক্ত ঘটনায় বালিকাদ্বয়ের সুরে গান ছিল না, বরং যুদ্ধের তারানা ছিল যাহার স্পষ্ট উল্লেখ হাদীছে রহিয়াছে। এবং বালিকাদ্বয় সুর-শিল্পীও ছিল না বলিয়া আয়েশা (রাঃ) নিজেই স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, তাই ঈদের আমোদ ক্ষেত্রে বালিকাদ্বয়ের কার্য্যের প্রতি হযরত (দঃ) সমর্থন জানাইয়াছেন। এই ত হইল সুর ও গাওয়া সম্পর্কে।

উক্ত ঘটনায় দ্বিতীয় জিনিষটি ছিল "تدففان" বালিকাদ্বয় দফ্ বাজাইতেছিল। "দফ্" মাটি, কাঠ ইত্যাদির খোলের একদিকে চামড়া অপর দিক খোলা—যাহাকে বাংলায় ডুগি বা বাঁয়া বলে ; বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতের আঙ্গুল পিটাইয়া উহা বাজান হয়। আনন্দ উপলক্ষে অন্য কোন বাদ্যের সঙ্গে মিলাইয়া নয় ; শুধু দফ্ বা ডুগি বাজান শরীয়তে জায়েয রহিয়াছে।

চলতি যুগের এলমহীন জ্ঞানবাগীশরা বলিতে চান, রসুলুল্লার যুগ ও দেশ তথা অনুন্নত যুগ ও দেশে এই এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রই ছিল, তাই এই শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র শরীয়তের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান আবিস্কারের যুগের বাদ্যযন্ত্র-সমূহ রসুলের যুগে থাকিলে এইগুলিও তাঁহার অনুমোদন লাভ করিত—ইহা হইল জ্ঞানবাগীশদের কেয়াছ। এই শ্রেণীর লোকদের জানা উচিৎ—ঢোল, সারিন্দা, বেহালা, দোতারা, ছেতারা এবং নানা রকমের বাঁশি তখনও প্রচলিত ছিল। নতুবা তৎকালীন আরবী ভাষায় এই সবের নাম আরবী অভিধানে বিদ্যমান থাকিত না। হাদীছেও বিভিন্ন নামের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী রহিয়াছে। যথা—

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة

"রসুলুল্লাহ (দঃ) মদ, জুয়া এবং ঢোল বা সারিন্দা জাতীয় বাদ্য যন্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন"। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় ছাহাবী হইতে উক্ত বিষয়ের হাদীছ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঢোল এবং সারিন্দা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র উভয় অর্থেই আরবী ভাষায় كوبة — কূবা শব্দ ব্যবহৃত হয় (মেরকাত দ্রষ্টব্য)। আর এক হাদীছে আছ—

قال النبي صلى الله عليه وسلم امرني ربي عزوجل بمحق
المعازف والمزامير

"নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে আদেশ করিয়াছেন—সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং সকল প্রকার বাঁশীর উচ্ছেদ করিতে।" (মেশকাত—৩১৮)

উক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা ঢোল, সারিন্দা ও বাঁশী স্পষ্টরূপেই নিষিদ্ধ হইল।

এতদ্ভিন্ন "معازف—মায়া'যেফ" বহু বচন শব্দ দ্বারা সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উচ্ছেদের কথাই বলা হইয়াছে। যেরূপ দ্বিতীয় হাদীছে উল্লেখ আছে। আরও এক হাদীছে কেয়ামতের আলামত রূপে বিভিন্ন অপরাধ-প্রবণতার উল্লেখে বলা হইয়াছে—

ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور (মেশকাত—৪৭০)

"গায়িকা এবং বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইবে, মদ্য পানের চর্চ্চা হইবে।" ফেকাহশাস্ত্রে ত প্রত্যেক শ্রেণীর বাদ্যন্ত্রের নাম উল্লেখ করতঃ নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে।

উক্ত ঘটনায় তৃতীয় একটি কার্য্য ছিল تضربان যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে "লাফা-লাফি" করিতে ছিল; এই শব্দের মধ্যে নাচ-নৃত্যের অর্থ মোটেই নাই। "নাচ বা নৃত্য" অর্থে আরাবী ভাষায় অতি প্রসিদ্ধ বিশেষ শব্দ রহিয়াছে, رقص; এস্থলে ترقصان "তাহারা নাচ ও নৃত্য করিতে ছিল" বলা হয় নাই। ضرب শব্দের অর্থ পদ-ক্ষেপণ, অতএব ترقصان না বলিয়া تضربان বলার তাৎপর্য্য ইহাই যে, সেস্থলে নাচ-নৃত্য ছিল না; ছিল শুধু এলোমেলো পদ-ক্ষেপণ তথা বাল্যসুলভ লাফালাফি।

যাহারা গান-বাদ্য, নাচ-নৃত্য করিতে এবং করাইতে অভিলাষী, তাহারা লাগামহীন স্বাধীনতার যুগে তাহা করিবেন, কিন্তু এই সব আবর্জনার মধ্যে হাদীছকে টানিয়া আনিয়া হাদীছকে অপবিত্র করতঃ ঈমান হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন! বিষ খাইতে ইচ্ছা হয় খাইবেন, কিন্তু ডাক্তারের নামে বিষ খাইবেন কেন? ডাক্তারের প্রিসক্রিপ্সনে যে, বিষ ছিল না; বরং যাহার দ্বারা বিভ্রান্তি হইয়াছে উহা ছিল শুধু (Colour) রং—তাহা প্রতিপন্ন করতঃ যাহারা মোসলমান থাকিতে চান তাঁহাদের ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় ঘটনায় হাবশীরা অস্ত্র চালনার খেলা করিতে ছিল; ওমর (রাঃ) উহাকে শুধু খেলাই গণ্য করিয়া মসজিদে উহার অনুষ্ঠানে বাধা দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত খেলায় জেহাদের প্রশিক্ষণ ছিল, তাই উহা এবাদতও ছিল। মসজিদের মূল উদ্দেশ্য নামাযের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া সব রকম এবাদতই তথায় করা যায়, তাই উহা হযরতের সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

ঈদুল-ফিৎরের দিন ঈদগাহে যাইবার পূর্ব্বে কিছু খাওয়া উচিৎ

৫৩১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফেৎরের দিন অন্ততঃ কয়েকটি খুরমা না খাইয়া সকালে বাহির হইতেন না এবং তিনি বে-জোড় সংখ্যায় খুরমা খাইতেন।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোরবানীর ঈদের দিনও নামাযের পূর্ব্বে সকাল বেলা খাওয়া জায়েয আছে।

ঈদগাহের ময়দানে মিম্বরের ব্যবস্থা আবশ্যক নহে

৫৩২। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোরবানী বা রোযার ঈদের দিন ঈদগাহে যাইয়া সর্ব্বপ্রথম নামায পড়াইতেন। নামাযান্তে সব লোক নিজ নিজ স্থানেই বসিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ-নছীহত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বয়ান করিতেন। তারপর কোথাও কোন সৈন্যদল প্রেরণের প্রয়োজন হইলে উহার ব্যবস্থা করিতেন বা কোন আদেশ জানাইবার দরকার হইলে জানাইতেন, তারপর বাড়ী চলিয়া যাইতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর এই ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকে। কোন এক ঈদের দিন আমি মাওয়ানের সঙ্গে ময়দানে গেলাম, মারওয়ান তখন মদীনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমরা ময়দানে আসিয়া দেখি, কাছীর-ইবনে-ছল্‌ৎ নামক এক ব্যক্তি একটি মিম্বর তৈয়ার করিয়া উপস্থিত রাখিয়াছে এবং মারওয়ান নামায পড়িবার পূর্ব্বেই উহার উপর আরোহণের জন্য উদ্যত হইতেছে। আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম, যেন সে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু সে ক্ষান্ত না হইয়া ঐ মিম্বরের উপর আরোহণ করিল (এবং নামাযের পূর্ব্বেই খোৎবা প্রদান করিল)। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমরা সুন্নত তরীকা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছ। সে উত্তর করিল, হে আবু সায়ীদ! তোমরা যাহা শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছ এখন তাহা চলিবে না। তখন আমি বলিলাম, খোদার কসম—আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহাই উত্তম উহার তুলনায় যাহা আমরা শিক্ষা করি নাই। তারপর মারওয়ান বলিল, জনসাধারণ নামাযের পরে বসিয়া থাকিয়া আমাদের খোৎবা শোনে না, তাই নামাযের পূর্ব্বেই খোৎবা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি।

মছআলাহ ঃ—ঈদগাহে মিম্বর ব্যবহার জায়েয, তথায় মিম্বর তৈরী করা উত্তম।

ঈদের খোৎবা নামাযের পরে হইবে এবং ঈদের নামাযে আজান বা একামত বলা হইবে না

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন সময়ই কোন ঈদের নামাযের জন্য আজান দেওয়া হইত না।

৫৩৩। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফেৎরের দিন ঈদগাহে যাইয়া প্রথমে নামায পড়িয়াছেন—খোৎবার পূর্ব্বেই ।

৫৩৪। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ঈদের নামায পড়িয়াছি । তাঁহারা প্রত্যেকেই ঈদের নামায খোৎবার পূর্ব্বে পড়িতেন।

৫৩৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলেই ঈদের নামায খোৎবার পূর্ব্বে পড়িতেন।

৫৩৬। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঈদুল-ফেৎরের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িলেন। ঐ দুই রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন (সুন্নত, নফল) নামায পড়েন নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে আসিলেন যে স্থানে নারীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ছদকা করার আহ্বান জানাইলেন, তখন নারীগণ নিজ নিজ কানের ও নাকের অলঙ্কারাদি ছদকা স্বরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিতে আরম্ভ করিল।

ঈদের দিন্ অস্ত্র বহন

ঈদের দিন ঈদগাহে বা পথে-ঘাটে যেখানে অধিক মানুষের সমাগম বা গমনাগমন হইবে এইরূপ স্থানে অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ ; যাহাতে আঘাত লাগার ঘটনা না ঘটে। হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, ঈদের দিন অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ, যদি মোসলমানদের উপর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে।

৫৩৭। হাদীছ :—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় মিনার মধ্যে আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে ছিলাম ; হঠাৎ এক ব্যক্তির হাতের বর্শার লৌহ-ফলক তাঁহার পারে বিদ্ধ হইল। আমি উহা তাঁহার পা হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, কে এই কাজ করিল জানিতে পারিলে শাস্তি দিতাম। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনিই আমাকে আঘাত দিয়াছেন। হাজ্জাজ বলিলেন, তাহা কিরূপে ? তিনি বলিলেন ? এই দিনে অস্ত্র-বহন করা হইত না, আপনি তাহা করিয়াছেন ; (আপনাকে দেখিয়া অন্যেও করিয়াছে।) হরম শরীফে অস্ত্র লইয়া প্রবেশ করা হইত না, আপনি তাহাও করিয়াছেন।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন এবাদত করার ফজিলত

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, واذكروا الله فى ايام معلومات "কতিপয় সুপরিচিত দিনে বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার জিকর ও এবাদত কর" এই আয়াতে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনই উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত আয়াতের উপর আমল করনার্থে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন সময় সময় বাজারে যাইয়া তকবীর বলিতে থাকিতেন; জনগণও তাঁহাদের সঙ্গে তকবীর বলিয়া যাইত।

৫৩৮। ছাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের এবাদত হইতে অধিক ফজিলতওয়ালা অন্য কোন দিনের কোন এবাদতই হইতে পারে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—জেহাদও নয় কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—জেহাদও নয়। অবশ্য কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির জেহাদ যে স্বীয় জান-মাল ও সর্ব্বস্ব লইয়া জেহাদের ময়দানে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথা হইতে তাহার কিছুই ফেরত আসে নাই।

ঈদগাহে এক পথে যাওয়া অন্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন করা

৫৩৯। ছাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন এক পথে যাইতেন এবং অন্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন;

মছআলাহ ঃ—ঈদের দিন যথাসাধ্য ভাল পোষাক পড়া উত্তম (১৩০ পৃঃ ৫০৩ হাঃ)।

মছআলাহ ঃ—ঈদের নামায শীঘ্র পড়া উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) এশরাক নামাযের সময়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ সময়ে আমরা (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে) ঈদের নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতাম।

মছআলাহ ঃ—জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর-নামায হইতে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ আছর তথা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তকবীর বলিতে হয়।

পবিত্র কোরআনে আছে, واذكروا الله فى ايام معدودات "আল্লার জিক্‌র বিশেষভাবে কর কতিপয় নির্দ্ধারিত দিনে।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত তারিখগুলিই এই কতিপয় নির্দ্ধারিত বিশেষ দিনের উদ্দেশ্য।

এই তকবীরের একটি পর্য্যায় হইল ওয়াজেব; উক্ত পাঁচ দিন প্রত্যেক ফরজ নামাযের সংলগ্নে তকবীর বলিবে। অগ্রগণ্য ফতওয়া অনুসারে ইহা জমাতের মুছল্লী, একা মুছল্লী, নারী-পুরুষ; এমনকি মুসাফির—সকলের উপরই ওয়াজেব (শামী, ১—৭৮৭)। আর এক পর্য্যায় হইল মোস্তাহাব; চলায়-ফেরায়, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, শয়নে, উঠনে, বসনে, নফল নামাযের পরে তকবীর বলা। ● খলীফা ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে উক্ত দিনসমূহে স্বীয়

তাবুতে থাকিয়া তকবীর বলিতেন ; নিকটবর্ত্তী মসজিদের লোকেরা সেই তকবীরের শব্দ শুনিয়া তকবীর বলিত এবং সেই সঙ্গে বাজারের লোকেরাও তকবীর বলিয়া উঠিত ; এইভাবে একত্রে সকলের তকবীরে সারা মিনা এলাকা গুঞ্জিত হইত। আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত দিনসমূহে প্রত্যেক নামাযের পর এবং বিছানায় থাকিয়া, তাবুতে বসিয়া, উঠা-বসায়, চলা-ফেরায় পূর্ণ দিন-গুলিতেই তকবীর বলিতেন। ● উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) তকবীর বলিতেন; অন্যান্য মহিলারাও তকবীর বলিতেন। তকবীর যে কোন আকারে বলিলেই হয় তবে উত্তম এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

মছআলাহ ঃ—ঈদের নামাযেও ইমামের সম্মুখে ছোতরার ব্যবস্থা রাখা চাই।

মছআলাহ ঃ—নারীদের এমনকি ঋতু অবস্থার নারীরও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া—এই মছআলার পূর্ণ বিবরণ ২২২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

মছআলাহ ঃ—বালকদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া জায়েয ; প্রমাণে ইমাম বোখারী (রঃ) ৮১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। বালকদের ঈদগাহে যাওয়া বরকত লাভের জন্য এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য ; সুতরাং যে সব বালক নামায পড়ার উপযুক্ত নহে তাহারাও যাইতে পারিবে, অবশ্য তাহাদের সঙ্গে এরূপ লোক থাকা বিশেষ প্রয়োজন যে তাহাদিগকে খেলা-ধূলা, হট্টগোল ইত্যাদি হইতে বিরত রাখিবে। (ফতহুল-বারী ২—৩৩৭)

মছআলাহ ঃ—ঈদগাহে মিম্বর থাকার প্রয়োজন নাই, এমতাবস্থায় ঈদের নামাযের স্থান-পরিচিতিরূপে ঈদগাহে কোন নিশান বা পতাকা উড্ডীন করা জায়েয। (১৩৩ পৃঃ ৮১ হাঃ)

মছআলাহ ঃ—যাহার ঈদের জমাত ছুটিয়া যায় ; কোথাও যাইয়া জমাতে শামিল হওয়ার সুযোগ না থাকে এবং যাহাদের প্রতি ঈদের নামাযের হুকুম নাই, যেমন—মেয়েলোক বা যে এলাকায় শুধু ২।৪ জন মুসলমান আছে ; এইরূপ লোকদের জন্য ঈদের দিন সূর্য্য মধ্যাকাশে আসিবার পূর্ব্বে দুই রাকাত (হানফী মজহাব মতে চার রাকাত শামী ১—৮৭৩) নফল নামায সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তকবীর ব্যতিরেকে পড়িয়া নেওয়া ভাল। মহিলাদের জন্য এই নামায ঈদের জমাত শেষ হইলে পর পড়িতে হইবে (শামী, ১—৭৭৭)।

● সাধারণভাবে ঈদের জমাতের ব্যবস্থা না থাকার এলাকায় কিছু সংখ্যক মুসলমান

একত্রিত হইলে তাহারা ঈদের জমাত করিতে পারে। আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল বছরা শহর হইতে ছয় মাইল দুরে "যাবিয়া" নামক স্থানে, সেখানে নগণ্য বসতি ছিল; ঈদের জমাতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না। (আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ; ১৬৬ পৃষ্ঠার একটি হাদীছ দ্রষ্টব্য।) তিনি তাঁহার ছেলেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে নিয়া তথায় ঈদের জমাত করিয়াছেন (১৩৪ পৃঃ।)

মছআলাহ ঃ— ঈদের নামাযের পূর্ব্বে বা পরে নফল নামাম পড়িবে না (১৩৫ পৃঃ ৫৩৬ হাঃ)। ঈদের নামাযের পূর্ব্বে ঈদগাহ বা অন্যত্র কোথাও নফল নামায পড়িবে না, আর পরে ঈদগাহে পড়িবে না; অন্যত্র পড়াতে কোন দোষ নাই (শামী ১—৭৭৮)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বোখারী (রঃ) ঈদের বিবরণে কোরবাণী সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কোরবাণী সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ অন্যত্র আছে, তথায়ই উহার অনুবাদ হইবে।

বেতের-নামাযের বিবরণ

৫৪০। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দুই রাকাত করিয়া তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে থাকিবে। যখন ছোবহে-ছাদেক নিকটবর্ত্তী হইবে তখন এক রাকাত পড়িয়া লইবে যদ্দারা তাহার নামায বেতের হইয়া যাইবে।

ইবনে ওমরের খাদেম 'নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বেতের নামাযের দুই রাকাত এবং ঐ এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাইতেন, এমনকি কথাবার্ত্তাও বলিতেন।

ইবনে ওমরের শাগের্দ ও বিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যত লোকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ছাহাবীগণ) তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোককে দেখিয়াছি, (এক সঙ্গে) তিন রাকাত বেতের পড়িয়া থাকেন। এবং বেতের নামাযের উভয় নিয়মই শুদ্ধ; আমি আশা করি উহার কোনটিই দোষণীয় নহে।

৫৪১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামায (বেতের সহ) এগার রাকাত পড়িতেন। এক একটি সেজদা এত দীর্ঘ করিতেন যত সময়ে আমরা কোরআনের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে পারি এবং ফজরের সুন্নত দুই রাকাত পড়িতেন, তারপর ডান পার্শ্বে শায়িত থাকিতেন; মোয়াজ্জেন খবর দিলে ফজরের নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

বেতের-নামায পড়িবার সময়

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, বেতের-নামায নিদ্রার পূর্ব্বেই পড়িবার জন্য।

৫৪২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির বিভিন্ন অংশে (—প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে) বেতের-নামায পড়িয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশেষ আমল ছিল শেষ রাত্রে বেতের পড়া।

৫৪৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, রাত্রির সমস্ত নামাযের শেষে বেতের পড়িবার জন্য।

মছআলাহ ঃ—বেতের-নামাযের পর নফল নামায পড়া নাজায়েয নহে, অতএব কেহ এশার নামাযের সহিত বেতের পড়িয়া তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হইলে তাহাজ্জুদ পড়িবে ইহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। অবশ্য যাঁহারা তাহাজ্জুদ নামাযে পাকা-পোক্তা অভ্যস্ত তাঁহাদের জন্য উত্তম হইল এশার সহিত বেতের নামায না পড়িয়া তাহাজ্জুদের শেষে বেতের নামায পড়া—উল্লেখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই (ফতহুলবারী, ২—৩৮৫)। এতদ্ভিন্ন বেতের-নামাযের পর দুই রাকাত নফল যাহা নবী (দঃ) বসিয়া পড়িয়াছেন ; মোসলেম শরীফের হাদীছে উহার উল্লেখ আছে—বেতের নামাযের পর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া সেই দুই রাকাত পড়ায়ও দোষ নাই ; ঐ রাকাতদ্বয় বেতের নামাযের আনুষাঙ্গিকরূপেই গণ্য।

যান-বাহনের উপর থাকিয়া বেতের নামায পড়া

ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারী পশুর পিঠের উপর বসিয়া থাকিয়া রুকু-সেজদার স্থযোগ অভাবে শুধু মাথার ইশারায় রুকু-সেজদা করিয়া, এমনকি কেবলা দিক ছাড়া নিজের স্থযোগের দিকেই মুখ কয়িয়া স্থন্নত-নফল নামায পড়া যায়। রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও ছাহাবীগণ তাহাজ্জুদ নামায পড়া অতি দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকিতেন। আরব দেশ যে দেশে অধিক উত্তাপ ও গরমের কারণে শুধু রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করা হয় সেই ভ্রমণ অবস্থায়ও তাহাজ্জুদ নামায ছাড়িতেন না ; সব ক্ষেত্রে ভ্রমণ স্থগিত করাও কঠিন হইত এমতাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায পশুর পিঠে বসিয়া উহার গতিমুখী মাথার ইশারায় আদায় করিতেন ; তবুও তাহাজ্জুদ নামায নাগা করিতেন না। সব স্থন্নত-নফল নামাযের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা জায়েয রহিয়াছে। মোটর বাস, রেল, প্লেন, লঞ্চ জাহাজ ইত্যাদিতেও স্থযোগের অভাব ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থায় স্থন্নত-নফল নামায পড়া যায়। যাঁহারা তাহাজ্জুদ

চাশ্‌ত, এশরাক, আওয়াবীন নামাযের অভ্যস্ত তাঁহারা স্বীয় আমল ভঙ্গ না করিয়া উক্ত সুযোগ ব্যবহার করিতে পারেন।

বেতের নামায সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে বলিয়াছেন, প্রাথমিক যুগে উহা সুন্নত ছিল, পরে নবী (দঃ) কর্তৃক উহা ওহাজেব ঘোষিত হইয়াছে। উহা আর রুকু সেজদা ও কেবলামুখী ছাড়া আদায় হইবে না। সেই প্রয়োজনে উহা আদায়ের জন্য যান-বাহন হইতে অবতরণ করিতে হইবে, যেরূপ ফরজ নামায আদায়ের জন্য করিতে হয়। বেতের নামায ওয়াজেব হওয়ার পূর্বে উহাও অন্যান্য সুন্নত-নফলের ন্যায় পশুর পিঠের উপর আদায় করা হইত। অবশ্য অন্যান্য ইমাম এবং অনেক ছাহাবীগণ বেতের নামাযকে সুন্নতই সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৫৪৪। **হাদীছ ঃ**—সায়ীদ ইবনে ইয়াছার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত মক্কার পথে ভ্রমণে ছিলাম। প্রভাত নিকটবর্ত্তী হইলে আমি যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ বেতের নামায পূর্ণভাবে আদায় করিয়া দ্রুত তাঁহার সহিত শামিল হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি বলিলাম, প্রভাত নিবটবর্ত্তী ; তাই অবতরণ করিয়া বেতের নামায পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ যথেষ্ট মনে কর না ? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) উটের উপর বেতের নামায পড়িয়াছেন।

৫৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপরে যেদিকে উহার গতি হইত সেই দিকেই মাথার ইশারায় তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, কিন্তু ফরজ নামায ঐরূপে পড়িতেন না বেতের নামাযও সোয়ারীর উপর পড়িতেন।

দোয়া কুনুৎ পড়ার স্থান

৫৪৬। **হাদীছ ঃ**—আ'ছেম (রঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে দোয়া কুনুতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দোয়া কুনুৎ পড়া পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রুকুর পূর্ব্বে কি পড়ে ? তিনি বলিলেন, রুকুর পূর্ব্বে। আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তি বলিয়া থাকে, রুকুর পরে। তিনি বলিলেন, সে ভুল বলিয়া থাকে ; অবশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এক মাসকাল রুকুর পরে দোয়া কুনুৎ পড়িয়াছিলেন, (কিন্তু উহা বেতের নামাযের কুনুৎ ছিল না বরং অন্য বিষয়ের কুনুৎ ছিল, যাহা কারণ-বিশেষে পড়া হইয়াছিল—) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তরজন কোরআনের সুদক্ষ ছাহাদীকে কোন এক এলাকায় শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। 'রেয়েল' ও 'জাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের এক দল কাফের বিশ্বাসঘাতকতা

করিয়া পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকদের কার্য্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক দুঃখিত হইয়া তাহাদের প্রতি বদদোয়া (ও অভিশাপ) করতঃ এক মাসকাল মগরেব ও ফজরের নামাযে ঐ কুনুৎ পড়িয়াছিলেন। (ইহাকে "কুনুতে—নাযেলাহ্" বলা হয়।)

মছআলাহ ঃ—কাফেদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সংগ্রাম অবস্থায় বা কাফেরদের আক্রমণ আশঙ্কায় কিম্বা কাফের দল কর্তৃক মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার বা ক্ষয়ক্ষতি সাধন ঘটনা উপলক্ষে মোসলমানদের ঈমান, সংহতি অটুট থাকার এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় লাভ ইত্যদির দোয়া করা, আর কাফেরদের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, পদস্খলন, ধ্বংস, আল্লাহ তায়ালার আজাব ও পাকড়াও ইত্যাদির বদদোয়া করা—এই দোয়া ও বদদোয়াকে কুনুতে-নাযেলাহ্ বলা হয়। "নাযেলাহ্" অর্থ বিপদ ; মোসলমানদের বিপদে ইহা পড়া হয়। ফজর নামাযে পড়া হয় ; কাহারও মতে মগরেব-এশায়ও পড়া যাইবে। এই কুনুৎ শেষ রাকাতে রুকুর পরে পড়া হয়। পক্ষান্তরে বেতের নামাযের কুনুৎ সর্বাবস্থায় এবং রুকুর পূর্বে পড়া হইবে।

৫৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) কোন কোন দিন (ফজর বা এশার নামাযের) শেষ রাকাতের রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া—ছামিআল্লাহু-লেমান হামিদাহ, আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল-হাম্‌দ বলার পর মক্কায় আবদ্ধ ও অত্যাচারিত দুর্বল মোসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া দোয়া করিতেন এবং অত্যাচারী কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করিতেন। সেই দোয়া বদদোয়ার অনুবাদ এই—

"হে আল্লাহ! (কাফেরদের কবল হইতে) আইয়্যাশ ইবনে আবু রবিয়াকে পরিত্রাণ দাও, সালামাহ ইবনে হেশামকে পরিত্রাণ দাও, ওলীদ ইবনুল ওলীদকে পরিত্রাণ দাও এবং দুর্বল মোসলমানদিগকে পরিত্রাণ দাও। হে আল্লাহ! (ঐ সব মোসলমানদের প্রতি অত্যাচারী কোরায়েশদের মূল) মোজার গোত্রের উপর বিনাশ ও ধ্বংসের তীব্রতা বাড়াইয়া দাও। আয় আল্লাহ! ইউসুফ আলাইহে-চ্ছালামের যুগে যেরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সাত বৎসর হইয়াছিল ঐরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোজার গোত্রের উপর চাপাইয়া দাও।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন সময় ফজর নামাযে কাফেরদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়াও হযরত (দঃ) বদদোয়া করিতেন। যখন এই আয়াত নাযেল হইল—لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ "নির্দ্দিষ্টরূপে কাহারও প্রতি বদদোয়া করা আপনার জন্য শোভা পায় না" তখন হযরত (দঃ) উহা ত্যাগ করিলেন।

মছআলাহ ঃ—দোয়া করিতে নির্দ্দিষ্ট নাম উল্লেখ করায় দোষ নাই, কিন্তু বদদোয়ায় নির্দ্দিষ্ট নামের উল্লেখ করিবে না।

এস্তেছকা-নামাযের বিবরণ

"এস্তেছকা" অর্থ বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। সুতরাং এস্তেছকার মূল বিষয় হইল দোয়া; উহা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান বা বিশেষ নামাযের উপরই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামায ব্যতিরেকে শুধু বৃষ্টির জন্য কান্নাকাটা এবং দোয়া করিয়াও উহা সম্পন্ন করা যায়। এই বিষয়টি বোখারী (রঃ) কতিপয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জুমার খোৎবার মধ্যে এস্তেছকা সম্পন্ন হইতে পারে", "মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া এস্তেছকা হইতে পারে", "বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া জুমার নামাযেই এস্তেছকা হইতে পারে"; এই সব পরিচ্ছেদের জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) ৫২১ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য বৃষ্টির অভাবের দরুন বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামাযের সহিত এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাও স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) হইতে এবং ছাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। এস্তেছকার অনুষ্ঠানের দৃশ্য সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) এস্তেছকার নামাযের জন্য বাহির হইলেন; অতি সাধারণ ও নগণ্যের বেশে, বিনয়ী নম্র হইয়া, আল্লার হুজুরে কান্নাকাটি ও রোদনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। এই অবস্থায় হযরত (দঃ) ময়দানে পৌঁছিলেন। (ফতহুলবারী, ২—৪০০)

এস্তেছকার নামাযের জন্য কোন দিন বা সময় নির্দ্ধারিত নাই; তবে যেই যেই সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ বা নফল নামায নিষিদ্ধ ঐ সময়গুলি অবশ্যই এড়াইতে হইবে।

৫৪৮। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার জন্য লোকদেরকে নিয়া ঈদগাহে গেলেন। হযরত (দঃ) লোকদের সম্মুখে থাকিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতে থাকিলেন; এই সময় গায়ের চাদর উল্টাইলেন এবং উহার দিক বদলাইলেন। অতঃপর জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন; উহাতে কেরাত সশব্দে পড়িলেন।

● এস্তেছকার নামাযে আজান একামত হইবে না। আবু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) (কুফার গভর্ণর ছিলেন, তিনি) একবার এস্তেছকার জন্য ময়দানে গেলেন; তাঁহার সঙ্গে ছাহাবী বরা ইবনে আযেব (রাঃ) এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)ও ছিলেন। ইমামরূপে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) পায়ের উপর দাঁড়াইলেন—মিম্বর ব্যতিরেকে। এবং বৃষ্টির জন্য

দোয়া করিলেন। তারপর সশব্দে কেরাতের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িলেন। আজান একামত দেওয়া হয় নাই। (১৩৯ পৃঃ)

বৃষ্টির অভাবে যেরূপ বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোয়া করা যায় যাহাকে এস্তেছকা বলে; তদ্রূপ অতি বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি আরম্ভ হইলে তখন বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য এবং প্রয়োজন এলাকায় বৃষ্টি হওয়া ও অধিক বৃষ্টির এলাকায় না হওয়ার জন্যও দোয়া করা যায়। (১৩৮ পৃঃ ৫২১ হাঃ)

৫৪৯। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের আমলে অনাবৃষ্টির দরুন জনগণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইলে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) দ্বারা দোয়া করাইতেন। ওমর (রাঃ) আল্লার দরবারে এইরূপ বলিতেন—হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টির দোয়া করিতাম আপনি আমাদিগকে বৃষ্টির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন; এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় আপমার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি; আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন। (অতপর আব্বাস (রাঃ) দোয়া করিতেন এবং) সকলের জন্য পরিতৃপ্তির বৃষ্টি হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলার দোয়ায় বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা হযরতের নবুওতের পূর্ব্বে হযরতের বাল্য বেলায়ও ঘটিয়া ছিল।

একবার মক্কায় অনাবৃষ্টিতে লোকগণ বৃষ্টির জন্য একত্রিত হইল, আবু তালেব হযরত (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৃষ্টি হইল, হযরত (দঃ) তখন বালক ছিলেন। হযরতের প্রশংসায় আবু তালেবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কবিতার মধ্যে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

৫৫০। **হাদীছ** ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বৃষ্টির দোয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। হযরত (দঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া দোয়া করেন; আমি তখন আবু তালেবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কবিতার এই বয়েতটি স্মরণ করি—

وابيض يستسقى الغمام بوجهه - ثمال اليتامى عصمة للارامل

"তিনি এরূপ নূরানী যে, তাঁহার নূরানী চেহারার অছিলায় মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং অনাথ বিধবাদের রক্ষক।"

বয়েতটি স্মরণ করিয়া আমি হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইতে থাকি। হযরত (দঃ) দোয়া শেষ করিয়া মিম্বর হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এমন বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, সকল ছাদ হইতে প্রবল বেগে পানি বহিতে আরম্ভ করে।

মছআলাহ ঃ—এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করায় মোক্তাদীগণও ইমামের সঙ্গে হাত উঠাইয়া দোয়া করিবে। (১৪০ পৃঃ ৫২১ হাদীছ)

৫৫১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার দোয়ার মধ্যে হাত এত অধিক উঠাইতেন যে, তাঁহার নুরানী বগল দেখা যাইত ; অন্য কোনও দোয়ার মধ্যে হযরত (দঃ) হাত এতদুর উঠাইতেন না।

৫৫২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মেঘ দেখিলেই এই দোয়া পড়িতেন—اللهم صيبا نا فعا "হে আল্লাহ! আমাদের উপর সুফলদায়ক বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

বৃষ্টি বর্ষণ শরীরে বরণ করা

বৃষ্টির জন্য দোয়া করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইলে হযরত নবী (দঃ) নিজ শরীরে সেই বৃষ্টি বরণ করিয়াছেন। যেরূপ ৫২১ নং হাদীছের ঘটনায় দেখা যায়। দোয়ার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার ছিল, ছাদ হইতে বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ির উপর বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; হযরত (দঃ) উহা ইচ্ছা পূর্ব্বক বরণ করিতেছিলেন, নতুবা উহা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতেন। (ফতহুল-বারী, ১—৪১৬)

মোসলেম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়ের কাপড় গুটাইয়া শরীরে বৃষ্টি বরণ করিলেন এবং বলিলেন, এই পানি সবে মাত্র প্রভু-পরওয়ারদেগারের (কুদরতের) সংস্পর্শ হইতে আসিয়াছে।

অধিক বেগে বায়ু বহিবার সময় দোয়া

৫৫৩। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অধিক বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারায় ব্যাকুলতার লক্ষণ দেখা যাইত।

ব্যাখ্যা ঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক উম্মত প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার আজাবে ধ্বংস হইয়াছে ; তাই ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্ব্বাভাস প্রবল বেগের বায়ু-বাতাস দেখিলে আল্লাহ তায়ালার আজাব স্মরণে হযরতের অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হইত ; এই দোয়াও পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ

"হে আল্লাহ! এই বাতাস তোমার তরফ হইতে উপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে আমি সেই উপকার তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং অপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে সেই অপকার হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাই।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ভূকম্প ইত্যাদি দুর্যোগের ঘটনা সম্পর্কেও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়া যেরূপ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়া চাই যাহাকে এস্তেছকা বলা হয়। তদ্রূপ প্রতিটি দুর্যোগ দুর্ভোগের সময়ই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়া চাই।

বৃষ্টি পাইয়া উহাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি সম্পৃক্ত করা বস্তুতঃ আল্লার নাশোকরী

৫৫৪। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিক হোদায়বিয়ার ময়দানে অবস্থান করা কালীন একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল। ফজরের নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি (এই বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি বলিয়াছেন? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভাল জানেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিয়াছেন, সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া আমার বন্দাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক আমার প্রতি ঈমান রাখার উপযোগী উক্তি করিবে, কিন্তু আর একদল লোক আমার প্রতি অস্বীকারোক্তিজনক কথা বলিবে। যাহারা বলিবে—আল্লার রহমত ও মেহেরবানীর বদৌলতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি ঈমানদার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যাহারা বলিবে—অমুক অমুক নক্ষত্রের দরুণ বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী প্রতিপন্ন হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের মধ্যে সচরাচর বল হয়, অমাবশ্যার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে বা পূর্ণিমার দরুণ র্ষষ্টি হইয়াছে—এইরূপ উক্তিতে সঙ্কুচিত থাকা কর্ত্তব্য।

চন্দ্রগ্রহন ও সূর্য্যগ্রহণকালীন নানায

৫৫৫। হাদীছ ঃ— আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদের প্রতি রওয়ানা হইলেন। তাড়াতাড়ির কারণ তিনি নিজের শরীরের চাদরখানা পর্য্যন্ত ঠিকভাবে গায়ে না দেওয়াতে উহা মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। লোকগণও হযরতের প্রতি দ্রুত ছুটিয়া আসিল। হযরত (দঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন, এদিকে সূর্য্যের গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। নামাযান্তে তিনি বলিলেন, কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয় না; যখনই

চন্দ্র বা সূর্য্যের এই অবস্থা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামাযরত হও, যাবৎ এই বিপদাবস্থা দুরীভূত না হয় সেই পর্য্যন্ত দোয়া করিতে থাক।

৫৫৬। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণে হয় না। বস্তুতঃ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নামাযের প্রতি ধাবিত হইও।

৫৫৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন—নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর বা জন্মের প্রভাবে সংঘটিত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানসমূহেরই দুইটি নিশান। যখনই তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখ নামায পড়।

৫৫৮। হাদীছ ঃ—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রিয় পুত্র হযরত ইব্রাহীম (আলাইহে ওয়া আলা আবীহেছ-ছালাম) এন্তেকাল করিলেন সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইল। সকলে এরূপ বলাবলি করিতে লাগিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পুত্রের মৃত্যুতেই ইহা হইয়াছে। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার কুদরতের বিশেষ দুইটি নিশান ; উহাদের গ্রহণ কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও সংঘটিত হয় না। যখনই উহা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে আরম্ভ কর। যাবৎ গ্রহণ অবস্থা দুরীভূত হইয়া পরিষ্কার না হইয়া যায় নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে থাক।

৫৫৯। হাদীছ ঃ— আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সূর্য্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের দুইটি নিদর্শন। উহা কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালা (এত বড় বৃহৎ ও তেজোময় আলোক দীপ্ত বস্তুদ্বয়কে এইরূপে কালিমাযুক্ত করিয়া) স্বীয় বন্দাদিগকে ভয় দেখাইয়া (ও সতর্ক করিয়া) থাকেন। (১৪৩ পৃঃ)

৫৬০। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় এখনই সংঘটিত হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি মসজিদে আসিলেন এবং অধিক লম্বা কেরাত, রুকু, সেজদা দ্বারা নামায পড়িলেন ; এরূপ লম্বা আর কখনও করিতে দেখি নাই। তারপর বলিলেন, এইসব ঘটনা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ সংঘটিত করিয়া থাকেন। কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে এই সব

কখনও ঘটে না, এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাগণকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করিয়া থাকেন। তাই যখন এরূপ কোন ঘটনা দেখ, তৎক্ষণাৎ ভয়-ভীতির সহিত আল্লার জিক্‌র, দোয়া ও এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি ধাবিত হও।

৫৬১। হাদীছ :— আবছুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা কয়িয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল। রস্থলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভ করিলেন; (আড়াই পারা যুক্ত) ছুরা বাকারার ন্যায় লম্বা কেরাত পড়িলেন। তারপর অত্যধিক লম্বা রুকু করিলেন, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পুনরায় অতি লম্বা রুকু করিলেন; প্রথম রুকু হইতে একটু ছোট, তারপর সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় রাকাতও ঐরূপে পড়িলেন, এইরূপে ছুই রাকাত নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য গ্রহণও শেষ হইল। নামাযান্তে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন সূর্য্য ও চন্দ্র (এবং উহাদের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন) আল্লার কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না।* অতএব যখন ঐরূপ কিছু দেখ, তৎক্ষণাৎ আল্লার জেকরের প্রতি ধাবিত হইও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, এইস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় আমরা আপনাকে দেখিয়াছি—আপনি যেন হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু ধরিতে উদ্যত হইতেছেন; তারপর আবার দেখিলাম, আপনি পেছনে হটিতেছেন। (এসবের কারণ কি ছিল?) হযরত (দঃ) ফরমাইলেন (আল্লার কুদরতে) আমি বেহেশতকে অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাইয়া উহা হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যদি উহা আনিতাম তবে তোমরা উহা ছুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে পারিতে (কারণ, বেহেশতের সমুদয় বস্তু অফুরন্ত)। দোযখকেও ঐরূপ নিকটবর্ত্তী স্থানেই দেখিয়াছি; উহার মত এত বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই এবং উহার অধিকাংশ বাসিন্দা নারী জাতি দেখিয়াছি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন নারী জাতির এই অবস্থা কি কারণে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাদের কুফরীর কারণে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য কি আল্লার সঙ্গে কুফরী করা? রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—(এখানে কুফরীর অর্থ নেমক-হারামি ও না-শোকর গোজারীর স্বভাব। তাহারা তাহাদের স্বামীদের নাশোকরী করিয়া থাকে, এহসান তথা উপকারের নেমক-হারামি করিয়া থাকে। জীবনভর তাহাদের কাহারও প্রতি যে ব্যক্তি উপকার করিয়াছে তাহার একটি মাত্র ক্রটি দেখিলেই বলিয়া ফেলে—সারা জীবনে তোমার কোন ভাল ব্যবহার পাই নাই।

---

* অন্ধকার যুগে লোকদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণযুক্ত হইয়া থাকে। হযরত (দঃ) সেই আকিদারই খণ্ডন করিয়াছেন।

৫৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় একদা সূর্য্য গ্রহণ হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্য একত্রিত হওয়ার আহ্বানকারী দিকে দিকে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর সকলকে লইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। লম্বা কেরাত পড়িলেন, রুকুও লম্বা করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় লম্বা কেরাত পড়িলেন—প্রথম কেরাত হইতে একটু ছোট। তারপর সেজদায় না যাইয়া পুনরায় রুকু করিলেন—প্রথম রুকু হইতে ছোট, তারপর অনেক লম্বা সেজদা করিলেন, এইরূপে দ্বিতীয় রাকাত পড়িলেন; এইভাবে চার রুকু ও চার সেজদায় দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। নামায পড়িতে পড়িতে সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ভাষণ দান করিলেন—আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান পূর্ব্বক বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার অসীম কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও গ্রহণযুক্ত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ (আল্লাহই তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করার জন্য) ঘটাইয়া থাকেন। যখন ঐরূপ অবস্থা দেখ, তখন আল্লার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা আরম্ভ কর, তকবীর বল এবং নামায পড় ও দান খয়রাত কর—যাবৎ না তোমাদের সম্মুখ হইতে সূর্য্যের এই অবস্থা দূরীভূত না হয়।

(পরকালের) যত কিছুর সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছে; আমি আমার এই নামাযের মধ্যে ঐসবকে চাক্ষুষরূপে অবলোকন করিয়াছি। এমনকি আমি বেহেশত (দেখিয়া উহা) হইতে আঙ্গুর ছড়া হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়া ছিলাম যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছ। আমি দোযখকেও দেখিয়াছি—উহার অগ্নি-শিখাগুলি কিলবিল করিতে ছিল; তখন তোমরা আমাকে পেছনে হটিতে দেখিয়াছ। সেই দোযখের মধ্যে আমি আম্‌র ইবনে লুহাই (মক্কাস্থিত আদিকালের এক কাফের)কে দেখিয়াছি; সে-ই ঐ ব্যক্তি যে সর্ব্বপ্রথম দেবদেবী ইত্যাদি কারাহও নামে কোন পশু ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল।

হে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতগণ। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কোন বন্দা-বান্দীকে যেনায় (ব্যাভিচারে) লিপ্ত দেখিলে যেরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, অন্য আর কেহই কোন বস্তুকে ঐরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। হে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতগণ। (মানবের সম্মুখে যেই কঠিন সময়, কঠিন পথ, কঠিন সমস্যাবলী রহিয়াছে) যদি তোমরা জানিতে যেরূপ আমি জানি; শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তবে নিশ্চয় তোমরা হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী। (১৪২ ও ১৬১ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—অন্ধকার যুগে লোকদের বিশ্বাস ও মতবাদ এই ছিল যে, কোন মহা মানবের মৃত্যু বা জন্ম-লগ্নে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল উহা হযরতের তৎকালীন একমাত্র পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সংঘটত হইয়াছিল। সেমতে লোকদের উপর তাহাদেরই মতবাদ ও বিশ্বাস সূত্রে হযরতের একটা বিরাট প্রভাব লাভের সুবর্ণ সুযোগ ছিল; লোকদের মুখে তাহা আসিয়াও ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মিথ্যা সুযোগকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যে অধিক তৎপরতার সহিত উক্ত গর্হিত মতবাদকে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া বার বার ইহা প্রচার করিলেন যে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কখনও কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে বা কাহারও জন্ম-লগ্নে হয় না। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানরূপে উহার বিকাশ হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মহা কুরদত ও সর্ব্বশক্তির নমুনা দেখাইয়া মানবকে সতর্ক করিতে চান। মানব যেন আল্লার ভয় অন্তরে জাগরিত রাখিয়া জীবন-যাপন করে।

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে আরও একটি অনেক বড় নিদর্শন এই রহিয়াছে যে, সূর্য্য ও চন্দ্র অতি বড় বিরাট বস্তু ও মহা উপকারী বটে, কিন্তু ইহা পূজনীয় হইতে পারে না; ইহা মহান আল্লাহ তায়ালার নগণ্য সৃষ্ট। ইহার আলো ও জ্যোতিই ইহার অস্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—সেই আলোটুকুও উহার আয়ত্বে নহে, উহা সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীনে; এইরূপ বস্তু পূজনীয় কিরূপে হইতে পারে? পবিত্র কোরআনে আছে—

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ٥

"আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসংখ্য নমুনারই অন্তর্ভুক্ত রাত্র এবং দিন; (অধিকন্তু দিবারাত্রের বিবর্তনের মূল বস্তুদ্বয়—) সূর্য্য এবং চন্দ্রও সেই কুদরতের নমুনারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা চন্দ্র-সূর্য্যের সেজদা বা পূজা করিও না, সেজদা ও পূজা কর ঐ আল্লার যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা বস্তুতঃ আল্লারই পূজারী হইয়া থাক (২৪ পাঃ ১৯ রুঃ; ইহা সেজদার আয়াত)। অর্থাৎ অনেকে বলিয়া থাকে চন্দ্র-সূর্য্যের পূজার মাধ্যমে আল্লারই পূজা মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, আল্লার পূজারী সাব্যস্ত হইতে চাহিলে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা কোন স্তরেই করিবে না। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দ্বারা চাক্ষুষ ও সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হয় যে—উহা আল্লাহ তায়াল্লার সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রনাধীন বস্তু; এই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার এবাদতে লিপ্ত হইয়া উক্ত আয়াতের কতইনা সামঞ্জস্যপূর্ণ!

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আরও একটি বিষয়ের নিশান ও নিদর্শন—তাহা হইল সারা বিশ্ব, বরং সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন অন্য সব কিছুর লয় তথা মহাপ্রলয়ের নিদর্শন। চন্দ্র ও

সূর্য্যের বিভিন্ন বৈশিষ্টে এক শ্রেণীর মানুষ উহার পূজারী হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রলয় লগ্নে আল্লাহ তায়ালা উহার বৈশিষ্ট্য ছিনাইয়া নিয়া চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন যে, চন্দ্র-সূর্য্য ও উহার বৈশিষ্ট্য সবেরই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রনকারী আল্লাহ তায়ালা ; সেই সূত্রেই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে সারা সৌরজগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সূর্য্যের জ্যোতি ও কিরণমালাকে আল্লাহ তায়ালা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন ; সূর্য্য একটি সাধারণ গোলাকার বস্তু হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরআনে ৩০ পারায় উল্লেখ আছে— اذ الشمس كورت "(মহাপ্রলয়ের সময় তখন) যখন সূর্য্যের কিরণ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।" চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপই ; পবিত্র কোরআনে ২৯ পারায় আছে—

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ......

"বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে আসিবে ? যখন অবস্থার ভয়াবহতায় ত্রাসের দরুণ চক্ষু তাক লাগাইয়া যাইবে এবং চন্দ্র আলোহীন হইয়া যাইবে……তখন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার জায়গা আছে কি ?" সাধারণ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সেই মহা গ্রহণেরই নমুনা। এই জন্যই ৫৬০নং হাদীছে আছে যে, সূর্য্যগ্রহণ হইলে পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আতঙ্কিত হইলেন যে, কেয়ামত আসিয়া গেল নাকি ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নামায সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে আদেশবোধক শব্দের উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে। অধিকাংশ ইমাম এই নামাযকে ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন এবং কেহ ওয়াজেব বলিয়াছেন। (ফতহুল-বারী, ২—৪২১)

সূর্য্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একাধিক রুকু করা হযরত নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ; কেহ সেইরূপ করিলে তাহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। হানফী মজহাবে বলা হয় যে, হযরত (দঃ) কোন সাময়িক কারণে ঐ সময়ে উহা করিয়াছিলেন। যেরূপ উক্ত নামাযে হযরত (দঃ) এক সময় নিজের স্থান হইতে পেছনে হটিয়া ছিলেন, এক সময় হাত বাড়াইয়া কিছু ধরিতে চাহিয়াছিলেন (৫৬১ হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

উক্ত নামাযান্তে স্বয়ং হযরত (দঃ) লোকদিগকে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ অবস্থায় ফজর নামাযের ন্যায় নামায পড়িতে বলিয়াছেন—তাহা হাদীছে বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমল বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সূর্য্য গ্রহণের নামায ফজরের নামাযের ন্যায়ই পড়িয়াছেন (১৪২ ও ১৪৫ পৃঃ)। তাই হানফী মজহাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের নামায প্রচলিত নিয়ম তথা প্রতি রাকাতে এক রুকু দ্বারাই পড়িতে বলা হয়।

৫৬৩। হাদীছ :— আবু বকর তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। (কেরাত পড়িতে)

দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করিলেন ; রুকু হইতে উঠিয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন (এবং পুনঃ কেয়াত পড়িলেন ।) তারপর পুনরায় সুদীর্ঘ রুকু করিলেন ; রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় গেলেন এবং দীর্ঘ সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় সেজদা হইতে দাঁড়াইয়া গেলেন ; এইবারও দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দীর্ঘ দুই রুকু ও দুই সেজদা করিয়া নামায শেষ করিলেন। নামায শেষে লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন যে, বেহেশতকে আমার এত নিকটবর্ত্তী দেখান হইয়াছে যে, পূর্ণ সাহস করিলে বোধ হয়, উহার একটি আঙ্গুর ছড়া আনিতে পারিতাম। দোযখও অতি নিকটবর্ত্তী দেখান হইয়াছে ; এমনকি আশঙ্কাভিভূত হইয়া আমি (আল্লার রহমত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে) বলিয়াছি, হে পরওয়ারদেগার ! আমি লোকদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই……(দোযখ তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিবে) ? আমি দোযখের শাস্তিভোগে লিপ্ত একটি নারীকে দেখিয়াছি—একটি বিড়াল তাহাকে নখ দ্বারা আঁচড় দিতেছে। তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে ঐ বিড়ালটাকে বাধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলিয়াছিল ; উহাকে খাদ্যও দেয় নাই, আবার ছাড়িয়াও দেয় নাই যে, সে নিজে খাদ্য যুটাইতে সক্ষম হয়। (১১৩ পৃঃ) এতদ্ভিন্ন ১৩৮ নম্বরেও এই হাদীছখানা অনূদিত হইয়াছে। তথায় আরও কিছু তথ্য উল্লেখ রহিয়াছে।)

৫৬৪। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যখন সূর্য্যগ্রহণ হইল, তখন সর্ব্বত্র এই ধ্বনি দেওয়া হইল—নামাযের জন্য প্রস্তুত হও।

৫৬৫। ছাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদি ভিখারিনী তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল এবং—أَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ “আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন।” এই দোয়া করিল। (ইতিপূর্ব্বে আয়েশা (রাঃ) কবরের আজাবের কথা শুনেন নাই, তাই) তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষদিগকে তাহাদের কবরে আজাব দেওয়া হইবে কি ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (হাঁ—) আমি উহা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তারপর একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকালবেলা কোন কাজে যানবাহনে চড়িয়া যাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বিবিগণের (চেতনা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে তাহাদের) কক্ষসমূহের মধ্য দিয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং নামায আরম্ভ করিলেন। লোকেরা তাঁহার

পেছনে কাতার বাঁধিয়া নামাযে শরীক হইল। তিনি (পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে দুই রাকাত) নামায শেষ করিয়া আল্লার আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার আদেশ করিলেন।

৫৬৬। **হাদীছ ঃ**—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, সূর্য্য গ্রহণের সময় ক্রীতাদাস মুক্ত করিতে।

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে করণীয় আমলসমূহ ঃ

● নামাযের ব্যবস্থা করিবে—নিজেও নামায পড়িবে এবং লোকদিগকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করিবে, এমনকি আহ্বানকারী পাঠাইয়া লোকদিগকে ডাকিয়া আনিবে, নিজের পরিবার-পরিজনকেও নামাযের জন্য সচেতন করিবে। নামায জমাতের সহিত মসজিদে পড়িবে—ইহা উত্তম ; সেরূপ ব্যবস্থা না হইলে নিজ গৃহেই পড়িবে। যথাসাধ্য এই নামাযের কেরাত এবং রুকু-সেজদা সুদীর্ঘ করিবে। প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ করিবে। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের নামাযের ন্যায় এত দীর্ঘ সেজদা আর কখনও করি নাই (১৪৩ পৃঃ)। সূর্য্যগ্রহণের নামায এত দীর্ঘ করিবে যে নামায শেষ হইতে গ্রহণ ছুটিয়া যায়। নামাযান্তে যদি দেখা যায় গ্রহণ ছুটে নাই তবে অবশিষ্ট সময় দোয়া করিয়া কাটাইবে (ফতহুলবারী ২—৪২১)। সূর্য্য গ্রহণের নামায শেষে ইমাম চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া ভাষণ দিবেন। সূর্য্যগ্রহণের নামাযে পুরুষদের জমাতে মহিলাদের শামিল হওয়া—এ সম্পর্কে পূর্ণ মছআলাহ এই যে, যদি নিজ গৃহে পরিবারবর্গের জমাত হয় তবে শামিল হইতে পারে। মসজিদের জমাতে শামিল হওয়ার মছআলাহ উহাই যাহা "মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া" পরিচ্ছেদে এবং ২২২নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

● বিভিন্ন দোয়ায় আত্মনিয়োগ করিবে। ● "আল্লাহু-আকবর" এবং বিভিন্ন রকমে আল্লার জেকর করিবে। ◎ বিশেষভাবে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিবে। ● গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট কান্নাকাটা করিবে।

● চন্দ্র গ্রহণেও নামায পড়িবে (১৪৫ পৃঃ)। অবশ্য সূর্য্য গ্রহণের নামায জমাতে পড়া মোস্তাহাব ; চন্দ্র গ্রহণের নামাযে জমাত মোস্তাহাব নহে (শামী, ১—৭৭৮)। সূর্য্য গ্রহণের নামায রসুলুল্লাহ (দঃ) জমাতে পড়িয়াছেন ; চন্দ্র গ্রহণের কোন ঘটনা হযরতের আমলে বর্ণিত নাই, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের গ্রহণের তাৎপর্য্য সমপর্য্যায়ের বর্ণনা করিয়া উভয়েরই গ্রহণে নামায, জিকর, দোয়া-এস্তেগফার ও দান-খয়রাতের আহ্বান জানাইয়াছেন।

কোরআন শরীফে সেজদার আয়াতসমূহ

৫৬৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন—"ছুরা ছোয়াদ" এর মধ্যে একটি সেজদার আয়াত আছে, উহার উপর সেজদা করা ফরজ ওয়াজেব না হইলেও আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিতে দেখিয়াছি।

৫৬৮। হাদীছ ঃ—আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "ছুরা-নাজম" তেলাওয়াত করিলেন ; উহার একটি আয়াতের উপর তিনি সেজদা করিলেন এবং উপস্থিত সকলে (এমনকি কাফেররা পর্য্যন্ত) সেজদা করিল ; এক বৃদ্ধ (কাফের সে অতিশয় মোটা ছিল) সেজদা করিতে পারিল না, কিন্তু সেও এক মুঠি মাটি উঠাইয়া কপালে ছোঁয়াইল এবং বলিল, আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট । এই লোকটি কাফের থাকাবস্থায়ই মোসলমানদের হাতে নিহত হয়।

৫৬৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরা নাজম তেলাওয়াত কালে সেজদা করিলেন। উপস্থিত মোসলমান, মোশরেক, জ্বিন ও সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহার সঙ্গে সেজদা করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ ক্ষেত্রে বহু কাফের সেজদা করিয়াছিল, এমনকি এরূপ গুজব রটিয়া গেল যে, মক্কাবাসীরা মোসলমান হইয়া গিয়াছে। কাফেরদের এই সেজদার মূলে কি হেতু ছিল সে বিষয়ে কোন কোন ভিত্তিহীন ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময় বিশেষ একটি ঐশ্বরিক প্রভাব সকলকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলে, যদ্দরুণ সকলে সেজদা করিতে বাধ্য হয় ; তাই অন্য এক হাদীছে আছে, ঐ সময় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত পর্য্যন্ত (নিজ নিজ পদ্ধতিতে) সেজদা করিয়াছিল।

এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও স্বেচ্ছাধীন কুদরতের বিকাশ হইয়া থাকে ; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ولو شئنا لاتينا كل نفس هدها "আমি ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলক সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারি।"

এই কুদরতের নমুনাই আল্লাহ তায়ালা সময় সময় দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বদার জন্য ও ব্যাপকভাবে আল্লাহ তায়ালা এই ইচ্ছাকে প্রয়োগ করেন না, কারণ উহাতে ছুনিয়ার সৃষ্টি রহস্য তথা "পরীক্ষা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

৫৭০। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাতে ছুরা নাজম তেলাওয়াত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তখন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে) সেজদা করেন নাই।

৫৭১। **হাদীছ ঃ**—আবু ছালামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি "ছুরা এন্‌শাক্‌ক্বাত" তেলাওয়াত করিলেন এবং সেজদা করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এখানে সেজদা করিতে না দেখিলে সেজদা করিতাম না।

৫৭২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমাদের উপস্থিতিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিতেন এবং সেজদা করিতেন, আমরাও সেজদা করিতাম ; যাহাতে এত ভীড় হইয়া যাইত যে, আমরা প্রত্যেকে মাথা রাখিবার স্থান পাইতাম না।

৫৭৩। **হাদীছ ঃ**—আবু রাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে নামায পড়িলাম, তিনি "ছুরা এন্‌শাক্‌ক্বাত" পড়িলেন এবং নামাযের মধ্যেই উহার সেজদাও করিলেন। নামাযান্তে আমি তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামাযের মধ্যে এইরূপে সেজদা করিয়াছি, তাই আমি আজীবন ইহা করিয়া যাইব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, সেজদার আয়াত পড়িয়া বা শুনিয়া সেজদা করা ফরজ-ওয়াজেব নহে ; মোস্তাহাব। অবশ্য এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদীছ দেখা যায় না ; বিভিন্ন হাদীছে শুধু এই বর্ণিত আছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) সেজদা করিতেন। হানফী মজহাবে সেজদার আয়াত যে পড়ে বা শুনে উভয়ের উপর সেজদা করা ওয়াজেব ; অবশ্য তৎক্ষণাৎ না করিয়া পরে করিলেও চলে, একেবারেই না করিলে ওয়াজেব তরকের কঠিন গোনাহ হইবে।

মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

৫৭৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থানে নামায কছর পড়িয়াছেন। সুতরাং আমরা ভ্রমন অবস্থায় কোথাও উনিশ দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিলে কছরই পড়িব ; অধিক অবস্থান করিলে পূর্ণ নামায পড়িব।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে মুছাফির ব্যক্তি (ঘণ্টার হিসাবে) পূর্ণ পনর দিন কোন একস্থানে অবস্থানের নিয়্যত করিলে তখন হইতেই তাহাকে নামায পূর্ণ পড়িতে হইবে। এক ঘণ্টা কম পনর দিন এক শহরে অন্যান্য দিন অন্য এলাকায় কিম্বা স্থির নিয়্যত ব্যতিরেকে যত দিনই অবস্থান করিবে সে ক্ষেত্রে নামায কছরই করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীছের ঘটনা সূত্রে বিভিন্ন বর্ণনায় এই অবস্থাই অবধারিত।

৫৭৫। হাদছী ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনা হইতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত নামায দুই দুই রাকাত পড়িয়াছি। আনাছ (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমরা মক্কা শরীফে দশ দিন অবস্থান করিয়া ছিলাম।

৫৭৬। হাদীছ ঃ—হারেছা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মিনায় (চার দিন) অবস্থান কালে (কছর—চার রাকাত) নামায দুই রাকাত পড়িতেন। ঐ সময় মোসলমানদের পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা বিরাজমান ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোসলমানদের জন্য নিজদের এলাকা হইতে দূরে সাধারণতঃ নিরাপত্তার অভাব বিরাজমান ছিল; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথমতঃ কছরের বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, যেন ভয়-সঙ্কুল স্থানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করা হয়; পবিত্র কোরআনে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু পরে কছরের বিধান ভয়ের অবস্থায় সীমিত থাকে নাই, বরং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রত্যেক ছফর ক্ষেত্রের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে উহারই উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের সুদীর্ঘ জীবনে নিরাপদ ও শান্ত অবস্থায় ছফরে কছর পড়ার ভুরি ভুরি নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৭৭। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে নামাযের জমাত পড়াইলেন; তিনি নামায চার রাকাত পড়াইলেন (কছর করিলেন না)। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট এই বিষয় উল্লেখ করা হইলে তিনি অত্যন্ত বিস্ময় ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত (হজ্জের ছফরে) মিনায় নামায (চারি রাকাতের কছর) দুই রাকাত পড়িয়াছি। খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও তদ্রূপই এবং খলীফা ওমরের সঙ্গেও তদ্রূপই; এমনকি খলীফা ওসমানের খেলাফতের প্রথম আমলেও তদ্রূপই। সুতরাং চার রাকাত স্থলে আল্লার দরবারে কবুল দুই রাকাতই আমার জন্য উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক খেলাফতের শেষ আমলে হজ্জের ছফরে কছর না করায় সমালোচনার ঝড় উঠিয়া ছিল; তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কছর-পড়ার বিধান অলঙ্ঘনীয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছফর অবস্থায় কছরকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) স্বীয় কার্য্যের রহস্য উদঘাটনে নিজেই বলিয়াছেন, আমি মক্কার শহরে বিবাহ করিয়াছি এবং আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে

বলিতে শুনিয়াছি, কেহ কোন এলাকায় বিবাহ করিলে তথায় সে তথাকার বাসিন্দারূপে নামায পড়িবে। মক্কায় বিবাহ করার পূর্ব্বে খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের ছফরে মিনার মধ্যে কছরই পড়িতেন। বোখারী (রঃ) ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) ছফর অবস্থায় কছর করিতেন না, পূর্ণই পড়িতেন। খলীফা ওসমানের ন্যায় তাঁহাকেও কৈফিয়ত দিতে হইয়াছে।

৫৭৮। **হাদীছ ঃ**—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলা তিন দিন ভ্রমনের পথ ছফর করিতে পারিবে না যদি না তাহার সঙ্গে কোন মাহরম (বা নিজ স্বামী) থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মাহরম বা স্বামী ছাড়া তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমনের পথ ছফর করা মহিলাদের জন্য হারাম। এই মছআল্লাহ হইতেই নামায কছরের জন্য তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমনের পথ ছফর করা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে শ্রেণীর ভ্রমন উদ্দেশ্য সেই ভ্রমণ অনুপাতে তিন দিনের ভ্রমণ-পথ ৪৮ মাইল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চার "বরীদ" পথ ভ্রমণে নামায কছর করিতেন এবং রমজানের রোজা ভঙ্গ করিতেন। (এক "বরীদ" ১২ মাইল, অতএব চার বরীদ ৪৮ মাইল।)

মছআলাহ ঃ—৪৮ মাইল ভ্রমণ উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় গ্রাম বা শহর অতিক্রম করিয়া গেলেই কছর করা আরম্ভ করিতে হইবে।

খলীফা আলী (রাঃ) একদা ছফর উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানী শহর কূফা ত্যাগ করতঃ অনতী দুরে যাইয়াই (নামাযের ওয়াক্ত হইলে) নামায কছর করিলেন; অথচ শহরের বাড়ী-ঘর তখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচরে ছিল। তদ্রূপ প্রত্যাবর্ত্তনকালে কূফা শহরের অনতী দুরে থাকাবস্থায় (নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে) নামায কছররূপে আদায় করিলেন। তাঁহাকে বলাও হইল—এই ত কূফা শহর। অর্থাৎ কূফা শহর যেখানে আপনার বাড়ী উহা ত নিকটবর্ত্তীই। তিনি বলিলেন, আমাদের নামায পুরা পড়িতে হইবে না যাবৎ না ছফর হইতে কূফা শহরে প্রবেশ করি।

এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণের হাদীছটি হজ্জের অধ্যায়ে অনুদিত হইবে। উহার মর্ম্ম এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জের ছফরে মদীনা ত্যাগ করিয়া উহার নিকটবর্ত্তী "জুল-হোলায়ফা" নামক স্থানে আছর নামায কছর করিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ! আলোচ্য হাদীছের মূল বিষয় তথা মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের ছফর তিন দিনের ভ্রমণ-পথ তথা ৪৮ মাইল হইলে ত তাহা হারাম। আর দুই দিনের পথ তথা ৩২ মাইল হইলে তাহাও নাজায়েয; এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ

(৬৩৩ নং) বিদ্যমান আছে ; বরং এক দিনের পথ তথা ১৬ মাইল ছফর করাও মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের জন্য মোটেই সমীচীন নহে। নিম্নের হাদীছে উহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারীদের জন্য মাহরম বা স্বামী ছাড়া সব ছফরই নিষিদ্ধ বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি দ্বিতীয় খণ্ডে "নারীদের হজ্জ করা" পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

৫৭৯। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মহিলা আল্লার উপর এবং পরকালের দিনের উপর ইমান রাখে তাহার জন্য হালাল নহে—মাহরম (বা স্বামী) সঙ্গে না থাকা অবস্থায় এক দিন এক রাত্রের ভ্রমণ-পথ ছফর করা।

৫৮০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, যখন তাঁহার তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রমের আবশ্যক হইত তখন তিনি (পথিমধ্যে মাগরেবের নামাযের শেষ ওয়াক্তে অবতরণ করিয়া) তিন রাকাত মগরেবের নামায পড়িতেন এবং সামান্য অপেক্ষা করিয়া (এশার নামাযের প্রথম ওয়াক্তে) দুই রাকাত এশার নামায পড়িতেন। এশার নামাযের পর কোন ছুন্নত-নফল পড়িতেন না, মধ্যরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

৫৮১। **হাদীছ ঃ**— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহিত থাকিয়া, কেবলার দিক ছাড়াই (ভ্রমণ দিকে) নফল নামায পড়িয়াছেন।

৫৮২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর থাকিয়া ভ্রমণের দিকেই শুধু মাথার ইশারা দ্বারা নফল পড়িতেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

৫৮৩। **হাদীছ ঃ**—আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সওয়ারীর উপর ভ্রমণ দিকে শুধু ইশারা করিয়া নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি ফরজ নামাযে এরূপ কখনও করিতেন না।

৫৮৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আনাছ (রাঃ) সিরিয়া হইতে বছরায় প্রত্যাবর্তনকালে আমরা তাঁহাকে স্বাগত জানাইতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সোয়ারী গাধার পিঠে বসিয়া নামায পড়িতেছেন—কেবলার বাম দিক হইয়া। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কেবলা ভিন্ন অন্য দিকে নামায পড়িতেছিলেন—দেখিলাম। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে না দেখিলে আমি এরূপ করিতাম না।

৫৮৫। **হাদীছ ঃ**—তাবেয়ী হাফ্‌ছ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লামের সাহচর্য্যে রহিয়াছি; তাঁহাকে দেখি নাই, ছফর অবস্থায় ছুন্নত-নফল (সর্ব্বদা ও তৎপরতার সহিত) পড়িতে।

মছআলাহ:—ফরজের পুর্ব্বে বা পরে যে সুন্নত-মোয়াক্কাদা নামায আছে উহার মধ্যে কছর নাই, কিন্তু ছফর অবস্থায় উহা সুন্নত-মোয়াক্কাদা থাকে না; সাধারণ নফলে পরিগণিত হয়। সুতরাং উহার জন্য মোটেই কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় না। তদুপরি নফল নামায সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, সোয়ারীতে আরোহিত যাত্রাভিমুখী অবস্থায় মাথার ইশারায় উহা পড়া যাইতে পারে। অতএব ফরজের সহিত সুন্নত পড়ায় লিপ্ত হইয়া নিজের বা সঙ্গীদের ব্যতিব্যস্ততার কারণ হওয়া কিম্বা কাহাকেও অধিক সময় সঙ্কীর্ণতায় পতিত রাখা মোটেই সমীচীন নহে। অবশ্য ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সম্পর্কে বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছফর অবস্থায়ও এই দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া থাকিতেন।

মছআলাহ:- ছফর অবস্থায়, কিন্তু ভ্রমণে নহে—অবস্থানকালে যে কোন সুন্নত-নফল পড়ায় দোষ নাই। হযরত নবী (দঃ) মক্কা বিজয়ের ছফরে মক্কায় প্রবেশ করার পর আট রাকাত চাশ্‌তের নামায পড়িয়াছিলেন। তদ্রূপ ভ্রমণ অবস্থায়ও কাহারও কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেরূপ ভাবে সুন্নত-নফল পড়া যায়। নবী (দঃ) ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপর চলিতে থাকিয়া নফল নামায পড়িয়া থাকিতেন।

৫৮৬। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় জোহর ও আছরের নামায এবং মগরেব ও এশার নামাযকে এক সঙ্গে পড়িতেন।

৫৮৭। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর অবস্থায় মগরেব ও এশা এই দুইটি নামায একত্রে পড়িতেন।

৫৮৮। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যদি সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার তথা জোহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভের পুর্ব্বেই যাত্রা করিতেন তবে তিনি জোহর নামায পড়িতে আছরের সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতেন। তারপর অবতরণ করিয়া উভয় নামায এক সঙ্গেই পড়িতেন। আর যাত্রার পূর্ব্বে সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিয়া গেলে যাত্রার পূর্ব্বেই জোহরের নামায পড়িয়া অতঃপর যাত্রা করিতেন।

ব্যাখ্যা:—ইমামগণ এই সব হাদীছের কার্য্যধারার ব্যাখ্যা দুই প্রকার করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ইহার অর্থ বস্তুতঃ জোহরকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ আছরের ওয়াক্তে একত্র করা এবং মগরেবকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ এশার ওয়াক্তে একত্র করা। সফর অবস্থায় বিশেষ সুযোগ দানার্থে এরূপ অনুমতি আছে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, এরূপ করিলে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করা হইবে ; আল্লাহ পাক বলিয়াছেন— ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "নিশ্চয় জানিও, নামায মোমেনদের উপর নির্দ্ধারিত সময়ের সহিত ফরজ হইয়াছে।"

সেই জন্য উক্ত হাদীছের কার্য্যধারা এইরূপ যে—ভ্রমণ অবস্থায় পথিমধ্যে জোহরের নামাযের ব্যবস্থা উহার ওয়াক্তের শেষ ভাগে করিবে, যেন জোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরের নামাযও আছরের ওয়াক্তেই প্রথম ভাগে পড়িয়া লওয়া যায়। মগরেব ও এশার নামাযের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবে। যেমন, এই পরিচ্ছেদের ৫৮০ নং হাদীছ যাহা এই বিষয়ে আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত ; উক্ত হাদীছে এরূপ ব্যাখ্যাই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর প্রত্যক্ষ আমলও এই ব্যাখ্যানুরূপই ছিল। নেছায়ী শরীফের হাদীছে উহার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মগরেবের নামায উহার ওয়াক্ত থাকিতে—এশার ওয়াক্ত আরম্ভের পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন এবং এশার নামায উহার ওয়াক্তে—মগরেবের ওয়াক্ত গেলে পরেই পড়িয়াছেন।

তদুপরি উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুসারে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন হয় না, অথচ সুযোগ সুবিধাও ঠিক মতেই লাভ হয় যে—বারংবার নামাযের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইতে হইল না। সফর অবস্থায় সকলে একত্রিতরূপে জমাতের সহিত নামাযের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নহে এবং বারংবার ঐরূপ করায় অনেক সময় ব্যয় হয় যাহা ভ্রমণ অবস্থায় ক্ষতিকরও বটে।

৫৮৯। হাদীছ ঃ—এম্‌রান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার অর্শ রোগ ছিল, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নামাযের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—প্রথমতঃ নামায দাঁড়াইয়া পড়ারই চেষ্টা কর, সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়, তাহাও সম্ভব না হইলে শোয়া অবস্থায় পড়।

৫৯০। ছাদীছ ঃ—এম্‌রান ইবনে হোসাইন (রাঃ) অর্শ রোগে আক্রান্ত ছিলেন ; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বসিয়া নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, দাঁড়াইয়া পড়া উত্তম ; বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে, আর শুইয়া পড়িলে বসিয়া পড়ার অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দাঁড়াইবার পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল বসিয়া পড়িলে নামায শুদ্ধ হয়, অবশ্য উহাতে অর্দ্ধেক ছওয়াব হয়, কিন্তু দাঁড়াইবার বা বসিবার সামর্থ থাকিলে শুইয়া নফল নামাযও শুদ্ধ হয় না। ফরজ নামায দাঁড়াইয়া পড়ার সামর্থ না থাকিলে বসিয়া (রুকু সেজদায় সামর্থ না হইলে মাথার

ইশারায়) শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে, বসিয়া পড়ার সামর্থ (অন্যের সাহায্যেও) না থাকিলে শুইয়া পড়িবে তাহাতেও পূর্ণ ছওয়াবই হইবে।

আর এক অবস্থা এই যে, দাঁড়াইয়া পড়ার সাধারণ সামর্থ নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে দাঁড়াইয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্য শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে বসিয়া ফরজ বা নফল নামায শুদ্ধ হইবে এবং ছওয়াবও পূর্ণ হইবে। অবশ্য ঐ অবস্থায় যদি অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়ে তবে অধিক কষ্ট স্বীকার করার অধিক ছওয়াব যোগ হইয়া দ্বিগুণে পরিণত হইবে, ফলে ঐ অবস্থায় বসিয়া নামায পড়ার পূর্ণ ছওয়াবই এই দ্বিগুণ ছওয়াবের অর্দ্ধেকে পরিণত হইবে। তদ্রূপই যদি বসিয়া নামায পড়ার সাধারণ সামর্থ নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে বসিয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্য শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে শুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে; কিন্তু অধিক কষ্ট সহ্য করিয়া বসিয়া পড়িলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। আলোচ্য হাদীছে এই অবস্থার নামাযই উদ্দেশ্য।

শুইয়া নামায পড়িলে প্রথমতঃ কেবলামুখী কাত হইয়া শোয়ার চেষ্টা করিবে; সেই সামর্থ্য না হইলে কেবলা দিকে পা (সামর্থ্য হইলে হাটু খাড়া রাখিয়া) এবং পূর্ব্ব দিকে মাথা এইভাবে চিত হইয়া শুইবে (ফতহুল-বারী, ২—৪৭০)। কিন্তু রুকু-সেজদার ইশারা মাথা দ্বারা করিতে হইবে, শুধু চোখে ইশারা করিলে তাহাতে নামায হইবে না।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোগ ইত্যাদি কান কারণে কেবলামুখী হওয়ার সামর্থ বা সুযোগ মোটেই না থাকিলে যেই দিকমুখী আছে সেই দিকেই নামায পড়িবে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এইরূপ হয়।

● দাঁড়াইতে অসমর্থ ব্যক্তি বসিয়া রুকু-সেজদার সহিত নামায আদায় করিতেছে; নামাযের মধ্যে দাঁড়াইতে সামর্থবান হইয়া গেল—তাহাকে অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার নামায হইবে না। রুকু-সেজদায় অসমর্থ ব্যক্তি বসিয়া ইশারায় নামায আদায় করিতেছে, রুকুর পূর্ব্বে যদি সে রুকু-সেজদায় সামর্থবান হইয়া যায় তবে সে ঐ নামায ভঙ্গ না করিয়াই রুকু-সেজদার সহিত উহা আদায় করিবে। আর যদি ইশারায় রুকু আদায় করার পর সামর্থবান হইয়া থাকে তবে সেই নামায ভঙ্গ করিয়া নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায রুকু-সেজদার সহিত আদায় করিতে হইবে। বসার অসমর্থ ব্যক্তি শুইয়া নামায পড়িতেছে; এইরূপ ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় বসিতে বা দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়া গেলে তাহাকে নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায আদায় করিতে হইবে।

তাহাজ্জুদ-নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদ-নামায সুন্নত, কিন্তু অতি মঙ্গল ও কল্যাণময় নামায। তাহাজ্জুদ নামাযের বৈশিষ্ট্য অগণিত ও অপরিসীম। ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত পছন্দীয় এবাদত। ইসলামের প্রথম যুগে এই নামায ফরজ ছিল এবং পরিমাণও নির্দ্ধারিত ছিল—রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধ কিম্বা তৃতীয়াংশ; ইহার কম নহে। পবিত্র কোরআন ২৯ পারা ছুরা মোজাম্মেলে এই আদেশই অবতীর্ণ হয়—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

"হে কমলীওয়ালা! নামাযে দাঁড়াইয়া রাত্র যাপন কর—রাতের অর্দ্ধ বা উহা হইতে কিছু কম, কিম্বা অর্দ্ধেকের বেশী এবং কোরআন সুস্পষ্ট ও ধীরভাবে পড়িও।"

এই পরিমাণকে পুর্ণ ও অক্ষুণ্ণ রাখাও কম কঠিন নহে, বিশেষতঃ ঘড়ি-ঘণ্টাবিহীন যুগে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ সতর্কতা-মূলকভাবে রাত্রের অধিক অংশই তাহাজ্জুদে কাটাইয়া দিতেন। এইরূপ কষ্ট ও যত্নের সহিত দীর্ঘ এক বৎসরকাল তাহাজ্জুদ-নামাযের ফরজ কর্ত্তব্য আদায় করিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হইয়া বান্দাদের কষ্ট লাঘবের জন্য তাহাজ্জুদ-নামায ফরজ হওয়া রহিত করিয়া দেন এবং উহার নির্দ্ধারিত পরিমাণের বাধ্যবাধকতাও রহিত করিয়া দেন। উল্লেখিত ছুরারই শেষভাগে এই রহিতের বিধান সম্বলিত আয়াত রহিয়াছে; যাহা এক বৎসর পর অবতীর্ণ হইয়াছিল।

তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়া রহিতের পরও আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অতি আদরের ও সন্তুষ্টির নামায তাহাজ্জুদের প্রতি বান্দাদিগকে আকৃষ্ট ও যত্নবান রাখিবার জন্য স্বীয় রসুলকে সম্বোধন করার মাধ্যমে আদেশবোধক শব্দের সহিত এই আয়াতটি নাযেল করেন—(১৫ পাঃ ৯ রুঃ)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ - عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

"আর রাত্রের অংশ-বিশেষে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন,—যাহা (পাঁচ ওয়াক্তের উপর) অতিরিক্ত (নামায); আপনারই মঙ্গল ও লাভের জন্য। আশান্বিত থাকুন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে "মাকামে মাহমুদ" দানে গৌরবান্বিত করিবেন"

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা প্রিয়তম হাবীব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ চুড়ামণি "মাকামে মাহমুদ" লাভের আশা দান ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের সাহায্য-গ্রহণ উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরকালের উন্নতি ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে তাহাজ্জুদের ন্যায় অধিক ফলদায়ক এবাদত আর নাই। তাহাজ্জুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا......

"নিশ্চয় (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠা নফছ বা রিপুকে আল্লাহ পানে বশ করিতে শক্ত প্রতিক্রিয়াবান এবং ঐ সময় মুখের বাক্যও অতি মার্জিত ও ক্রীয়াশীল হয়; (গভীর অন্তর হইতে বাহির হয়, মনের উপর রেখাপাত করে এবং দেহের ও চোখের উপরও ক্রিয়া করে)। দিনের বেলা বিভিন্ন লিপ্ততা থাকে; রাত্রে উহা থাকে না, তাই তখন আল্লার জিকর করতঃ সব কিছু হইতে কাটিয়া এক আল্লাহতে মগ্ন হও (ইহা তখন সহজ)।"

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, তাহাজ্জুদের যে সময় তথা রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগ ঐ সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নূর এবং রহমতের বিশেষ দৃষ্টি বন্দাদের অতি নিকটবর্ত্তী হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মাফ করিবার জন্য, মনোবাঞ্ছা দানের জন্য, দোয়া করার জন্য বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকেন (৬০৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

এবাদতের জন্য নিশি-রাত্রের নিদ্রাত্যাগীদের প্রশংসায় আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যথা—

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ......فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ...

"আমার বিশিষ্ট বন্দাগণ এইরূপ হন—মধুর নিদ্রা ভঙ্গকরতঃ তাঁহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা পরিত্যাগ করে। তখন তাঁহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুরে অর্চনা-আরাধনায় নিমগ্ন হন আশা এবং ভয়ের মধ্যে। আর আমার দেওয়া ধন হইতে আমার জন্য ব্যয় করেন। অতএব আমি তাঁহাদের জন্য চোখ-জুড়ানো নেয়ামত কি, কি এবং কি পরিমাণ রাখিয়া দিয়াছি (মানবীয় দৃষ্টি ও অনুমানের) অন্তরালে—তাহা কাহারও বোধগম্য নহে।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ -

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥

"নিশ্চয় খোদাভীরু লোকগণ পরকালে বাগ-বাগিচা ও ঝরণা-ফোয়ারার মধ্যে স্থান লাভ করিবেন; উপভোগ করিতে থাকিবেন অসংখ্য নেয়ামত যাহা তাঁহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাদিগকে দিবেন। তাঁহারা জাগতিক জীবনে নেক্‌কার ছিলেন, রাত্রের কম অংশই তাঁহারা ঘুমাইতেন ও ভোর রাত্রে তাঁহারা তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।" (২৬ পাঃ ১৮ রুঃ)

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -

"বেহেশতের অধিকারী খোদাভীরু লোকদের পরিচয়—তাঁহারা ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণু সত্য ও খাঁটী এবং এবাদত-বন্দেগীরত ও নেক কাজে ব্যয়কারী হন। আর তাঁহারা শেষ রাত্রে তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত হন।" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ-নামায অত্যন্ত পছন্দনীয় নামায ছিল। হযরত (দঃ) শেষ জীবন পর্য্যন্ত ভ্রমণ বা ছফর অবস্থায়ও এই নামাযের প্রতি তৎপর ছিলেন। হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ-নামায এত দীর্ঘ ও অধিক পড়িতেন যে তাঁহার পাদ্বয় ফুলিয়া যাইত; কোন সময় ফাটিয়াও যাইত। মোসলেম শরীফে হাদীছ আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ফরজের পর সর্ব্বাধিক ফজিলতের নামায তাহাজ্জুদ নামায (শামী, ১-৬৪০)।

৫৯১। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া প্রথমে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ - وَلِقَاءُكَ حَقٌّ - وَقَوْلُكَ حَقٌّ - وَالْجَنَّةُ حَقٌّ - وَالنَّارُ حَقٌّ - وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ - وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ - وَالسَّاعَةُ حَقٌّ - اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ

وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

● তাহাজ্জুদের সময় নবী (দঃ) বিশেষরূপে মেছওয়াক করিতেন। (১৫৩ পৃঃ ১৭৬ হাঃ)

৫৯২। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যে কোন ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দেখিলে তাহা হযরতের নিকট বয়ান করিত। আমার অন্তরে সর্ব্বদাই এই আকাঙ্খা ছিল যে, আমি যেন কোন স্বপ্ন দেখি এবং উহা হযরতের নিকট বয়ান করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, আমার কোন সংসার ছিল না; আমি মসজিদেই ঘুমাইতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম—আমার হাতে যেন একটি রেশমী কাপড়ের টুক্রা, আমি বেহেশতের যে কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি ঐ রেশমী কাপড়ের টুকরাটি আমাকে লইয়া উড়িয়া যায়। আমি আরও দেখিলাম, যেন দুই জন ফেরেশতা আমাকে ধরিয়া দোযখের নিকট লইয়া গেল। আমি দেখিলাম—দোযখ অতি গভীর, চতুপার্শ্বে ঘেরাও করা কুপের ন্যায় এবং উহার দুই দিকে দুইটি খুঁটিবিশেষ আছে। উহার মধ্যে কতিপয় মানুষ দেখিতে পাইলাম যাহাদিগকে আমি চিনি। তখন আমি বলিতে লাগিলাম— اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ "আমি দোযখ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" পরে তৃতীয় এক ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, আপনি ভীত হইবেন না।

আমি এই স্বপ্ন (আমার ভগ্নি হযরতের বিবি) হাফছাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তিনি উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বয়ান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ অতি ভাল লোক; যদি সে তাহাজ্জুদ-নামাযের অভ্যস্ত হয় (তবে আরও অধিক উত্তম গণ্য হইবে)। এই ঘটনার পর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খুব কম সময়ই ঘুমাইতেন; অধিকাংশ রাত্র তাহাজ্জুদ-নামাযেই কাটাইতেন।

তাহাজ্জুদের প্রতি লোকদিগকে আগ্রাহান্বিত করা চাই

৫৯৩। হাদীছ :—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অধিক রাত্রিকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ও জামাতা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তশরীফ আনিলেন এবং তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহাজ্জুদ পড়না? আলী (রাঃ) বলেন—আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমাদের আত্মা আল্লাহ তায়ালার হাতে; তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন আমাদিগকে জাগাইয়া দিবেন। এই উত্তর শুনিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আর কোন প্রতিউত্তর না করিয়া চলিয়া

গেলেন এবং চলিয়া যাওয়াকালীন অনুতপ্ত হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন—
وكان الانسان اكثر شيئ جدلا "মানুষ বড়ই তর্কবাজ।"

৫৯৪। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এতেকাফ অবস্থায় একদা রাত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে নামায আরম্ভ করিলেন, কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার নামাযে শামিল হইল। ভোর হইলে লোকগণ এই নামাযের আলোচনা করিল, ফলে দ্বিতীয় রাত্রেও রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়িলে তখন অধিক লোক সমবেত হইল। আজও ভোর হইলে পর লোকদের মধ্যে আলোচনা হইল, ফলে তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোকের সমাগম হইল এবং তাহারা হযরতের নামাযে শামিল হইয়া নামায পড়িল। চতুর্থ রাত্রে এত অধিক লোকের সমাগম হইল যে, মসজিদে লোকের সঙ্কুলান হয় না। এই রাত্রে হযরত (দঃ) আর নামাযের জন্য আত্মপ্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিলেন; ফজরের নামাযের জন্যই এতেকাফ-খানা হইতে বাহির হইলেন। ফজর নামায শেষে হযরত (দঃ) লোকদের মুখী হইলেন এবং ভাষণের আরম্ভে কলেমা শাহাদত পড়িয়া বলিলেন, অতঃপর—তোমাদের সমবেত হওয়া আমি অবগত ছিলাম, তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিল না। আমার আত্মপ্রকাশ করায় ইহাই একমাত্র বাধা ছিল যে, আমি আশঙ্কা করিয়াছি, তাহাজ্জুদ-নামায ফরজ করিয়া দেওয়া হয় নাকি! তখন তোমরা সর্ব্বদা উহার পাবন্দী করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িবে; (ফরজ হইলে ত সর্ব্বদা পাবন্দী করা অপরিহার্য্য হইবে।) এই ঘটনা রমজান শরীফে ঘটিয়াছিল!

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—তাহাজ্জুদ-নামায আল্লাহ তায়ালার অতি পছন্দীয় নামায; পূর্ব্বে উহা ফরজই ছিল। মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তায়ালা ইহার ফরজ হওয়া রহিত করিয়া ছিলেন। এখন সেই লোকদেরই এই অপূর্ব্ব আগ্রহ এবং তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত আল্লাহ তায়লো পুনঃ তাঁহার পছন্দীয় তাহাজ্জুদকে ফরজ করিয়া দিতে পারেন, ফলে পরবর্ত্তী লোকদের জন্য অধিক কষ্টের কারণ হইবে। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার তৎপরতাকে ওহী অবতীর্ণের সময়ে বারণ করিয়াছেন। হযরতের পরে ওহী চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; নূতনভাবে কিছু ফরজ হওয়ার অবকাশ থাকে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কত বেশী তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৫৯৫। **হাদীছ**ঃ—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে অধিক দাঁড়াইয়া থাকায় তাঁহার পা-দ্বয় ফুলিয়া যাইত (আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা অনহার বর্ণনায় আছে—পদদ্বয় ফাটিয়া যাইত।)

এই বিষয় তাঁহাকে কিছু বলা হইলে তিনি এই উত্তর দিতেন। আমি কি আল্লার শোকর-গোজার—কৃতজ্ঞতা পালনকারী বন্দা হইব না?

৫৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লার নিকট সর্ব্বাধিক পছন্দনীয় নামায দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নামায এবং সর্ব্বাধিক পছন্দনীয় রোযা দাউদ আলাইহে-চ্ছালামের রোযা। দাউদ (আঃ) প্রথমে অর্দ্ধ রাত্রি ঘুমাইতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ নামায পড়িতেন, তারপর বাকি ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমাইতেন এবং একদিন রোযা রাখিতেন আর একদিন আহার করিতেন। (ইহাতে তাঁহার দৈহিক শক্তি অটুট থাকিত;) তিনি জেহাদে দৃঢ় থাকিতেন—পশ্চাদপদ হইতেন না।

৫৯৭। হাদীছ ঃ—মসরুক (রঃ) আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কেমন আমলকে অধিক পছন্দ করিতেন? তিনি বলিলেন, যে আমল সর্ব্বদা করা হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের জন্য কোন সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন? তিনি উত্তর করিলেন, মোরগের (প্রথম) বাঁঙের সময়।

তাহাজ্জুদ-নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়া

৫৯৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামায আরম্ভ করিলাম। তিনি নামাযের মধ্যে (দীর্ঘ কেরাত পড়িতে) এত অধিক সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, আমার এই অশুভ ইচ্ছা উদিত হইতে লাগিল যে, আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ি।

নবী (দঃ) কত রাকাত তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৫৯৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বেতের ও ফজরের সুন্নত সহ) তাহাজ্জুদের নামায তের রাকাত পড়িতেন।

৬০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বেতের সহ) তাহাজ্জুদের নামায সাত রাকাত, নয় রাকাত বা এগার রাকাত পড়িতেন; ইহা ফজরের সুন্নত দুই রাকাত ব্যতীত। (উহা সহ মোট তের রাকাত হইত।)

৬০১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া সর্ব্বমোট) তের রাকত নামাত পড়িতেন; বেতের এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ইহারই মধ্যে শামিল।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ মূল তাহাজ্জুদ-নামায আট রাকাত পড়িতেন—উহা অনেক লম্বা হইত যেমন ৫৭৮ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রুকু-সেজদাও দীর্ঘ হইত যেমন ৫৪১ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপ দীর্ঘ রাকাত এবং রুকুর কারণেই হযরতের পা ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। এই আট রাকাতের পর বেতের তিন রাকাত পড়িতেন—মোট এগার রাকত হইল; ৫৪৯ নং হাদীছে এই সংখ্যাই উল্লেখ আছে। ফজরের দুই রাকাত ছুন্নতও এর পরেই পড়িতেন—মোট তের রাকাত হইল; ৫৯৯ নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ হইয়াছে; আলোচ্য হাদীছে তের সংখ্যার এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বেতের নামায সলংগ্নে দুই রাকাত নফল বসিয়া পড়িতেন; ৬১৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য—মোট ১৫ রাকাত হইল। মোসলেম শরীফে আয়েশা (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে সুদীর্ঘ নামাযের প্রথমে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ারও উল্লেখ আছে; সেমতে সর্ব্বমোট ১৭ রাকাত হইল। কোন কোন সময় মূল তাহাজ্জুদ চার রাকাত, ছয় রাকাতও পড়িতেন; বার্দ্ধক্য বা অসুস্থতার দরুন অবসাদ অনুভবে এইরূপ করিতেন। কোন সময় নবী (দঃ) একই রাত্রে একাধিক বারও তাহাজ্জুদ পড়িয়াছেন।

৬০২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন মাসে একধারে বে-রোযা দিন কাটাতেন; আমরা ধারণা করিতাম, এই মাসে তিনি রোযা রাখিবেন না (কিন্তু শেষে রোযা রাখিতেন)। কোন মাসে একাধারে রোযা রাখিতে থাকিতেন; আমরা ধারণা করিতাম, এই মাসে বে-রোযা থাকিবেন না, (শেষে বে-রোযাও হইতেন।) এবং তাঁহাকে রাত্রিকালে (ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) নিদ্রিতও দেখা যাইত, নামায পড়িতেও দেখা যাইত।

তাহাজ্জুদের পর নিদ্রা যাওয়া

৬০৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমার গৃহে থাকার প্রতি দিনই দেখিয়াছি, তিনি রাত্রের শেষ অংশে নিদ্রা যাইতেন। (১৫২ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—তাহাজ্জুদের পর ফজরের নামাযের পূর্ব্বে একটু সময় নিদ্রা গেলে শরীরের অবসাদ দুর হয়; হযরত (দঃ) অনেক সময় তাহা করিতেন। তবে ফজরের জমাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে সেই লক্ষ্য ও ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে। কোন সময় হযরত (দঃ) স্বীয় বিবির সহিত কথাবার্ত্তায়ও এই সময়টুকু কাটাইতেন। (৬১৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

রমজান মাসে হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ পড়িয়া সেহরী খাইতেন, তৎপর না ঘুমাইয়া অনতিবিলম্বেই ফজর নামায পড়িতেন—৩৫৪ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে।

তাহাজ্জুদ না পড়িলে শয়তানের কু-মন্ত্র ক্রিয়া করে

৬০৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিদ্রিত ব্যক্তির ঘাড়ের উপর শয়তান এই মন্ত্র পড়িয়া তিনটি গিরা লাগায়—

عليك ليل طويل فارقد এখনও রাত্রি অনেক বাকী আছে, তুমি নিদ্রায় থাক।

প্রত্যেকটি গিরা লাগাইবার সময় উক্ত মন্ত্র পড়িয়া থাকে। যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া আল্লার নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি সে অজু করে তবে আর একটি গিরা খুলিয়া যায়, তারপর যদি নামায পড়ে তবে অবশিষ্ট গিরাটিও খুলিয়া যায় এবং হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে, পুলকিত মনে ও আনন্দের সহিত তাহার ভোর হয়। নতুবা কলুষিত অবস্থায় তাহার ভোর হয়।

● যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাক ইয়াদ ও হেফজের দৌলত দান করিয়াছেন তাহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য তাহাজ্জুদ পড়া এবং তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওত করা। অন্যথায় যদি তাহারা বিভিন্ন বড় গোনাহের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয় তবে সেই সঙ্গে তাহাজ্জুদ না পড়ারও এক বিশেষ আজাব তাহাদের উপর হইবে যে—কবরের মধ্যে একটি পাথরের আঘাতে তাহাদের মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ হইতে থাকিবে। এই তথ্য সুদীর্ঘ হাদীছের অংশবিশেষ। হাদীছটি কবরের আজাব পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

যে ব্যক্তি সারারাত্র নিদ্রামগ্ন থাকে শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করে

৬০৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির আলোচনা হইল। একজন তাহার প্রতি অভিযোগ করিল, সে সারারাত্র নিদ্রায় কাটাইয়াছে, নামাযের জন্য জাগ্রত হয় নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শয়তান তাহার কানে প্রসাব করিয়া দিয়াছে।

শেষ রাত্রে নামায পড়া ও দোয়া করা

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ○

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা (বেহেশত লাভকারী মোত্তাকিগণের বিশেষ গুণ বর্ণনায়) বলিয়াছেন—"তাঁহারা রাত্রে অতি কম নিদ্রা যাইয়া থাকিত এবং শেষ রাত্রে তাঁহারা গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফরিয়াদ করিয়া থাকিত।" (২৬ পাঃ ১৮ রুঃ)

৬০৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাত্রেই যখন উহার শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকিয়া যায় তখন আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা (আল্লাহ তায়ালা বন্দাদের অতি নিকটবর্ত্তী হন, এমনকি জমিনের) সর্ব্বাধিক নিকটস্থ আসমানে তাঁহার অবতরণ তথা বিশেষ তাজাল্লী হয়; (যাহা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোন সময় হয় না।) স্বয়ং তিনি স্বীয় বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকেন এবং ঘোষণাযুক্ত এই আহবান জানাইতে থাকেন—

مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ -

"কে আমাকে ডাকিবে? আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার নিকট প্রার্থী হইবে? আমি তাহাকে দান করিব। কে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।"

ব্যাখ্যা ঃ—প্রত্যেক ক্রিয়াপদের আকার, রূপ ও কৌশল প্রণালীর ধরণ ও রকম উহার কর্ত্তাপদের উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই অবধারিত। এখানে ক্রিয়াপদ হইল يَنْزِل অর্থ অবতরণ করা, কর্ত্তাপদ হইল رَبُّنَا, অর্থ পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা! আল্লাহু তায়ালা নিরাকার, নিরাধার, অতুলন; তাই তাঁহার সঙ্গে যে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক হইবে সেই ক্রিয়াপদও অনুরূপই হইবে।

ইমাম মালেক (রঃ) এ বিষয়ে বলিয়াছেন—উঠা, বসা, অবতরণ করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যখন আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তখন লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এসব ক্রিয়াপদের মূল অর্থ সুস্পষ্ট, কিন্তু নিরাকার নিরাধার অতুলন কর্ত্তাপদের সংযোগ হিসাবে উহার ধরণ ও রকম অবোধ্য; এই বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ বা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অবৈধ।

তাই মোসলমানগণ যেরূপ নিরাকার নিরাধার অতুলন আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে, তদ্রূপ এসব ক্রিয়াপদও যখন কোরআন বা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইবে তখন এই সবের প্রতিও অনুরূপ ঈমান রাখা মোসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।

তাহাজ্জুদ-নামাযের সময় শেষ রাত্রে

৬০৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রাত্রের প্রথম দিকে ঘুমাইতেন এবং শেষের দিকে তাহাজ্জুদ-নামায পড়িতেন, তারপর বিছানায় আসিতেন। (কোন দিন এইরূপ হইত যে, ঐ সময় হযরত (দঃ)

স্ত্রী ব্যবহার করিতেন,) অতএব মোয়াজ্জেন ফজরের আজান দেওয়ার সাথে সাথে হযরত (দঃ) উঠিয়া যাইতেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল করিতেন, নতুবা শুধু অজু করিয়াই নামাযের জন্য যাইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায সমাপ্তের পর জমাতে যাওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যক্রম শারীরিক অবস্থা, রাত্রের ঠাণ্ডা-গরম, নিদ্রা-অনিদ্রা এবং ছোট-বড় রাত্র ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ছিল। অধিকাংশ সময় হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে-ছাদেকের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সমাপ্ত করিতেন এবং ফজরের আজান হইলে পরই ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত পড়িতেন; আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৩৮১ ও ৬১৮নং হদীছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত ৬২৫নং হাদীছে ইহাই উল্লেখ হইয়াছে। অতঃপর সাধারতঃ গৃহিণী জাগ্রত থাকিলে বসা বা ডান কাতে শায়িত অবস্থায় তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতেন, নতুবা ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। আয়েশা (রঃ) বর্ণিত ৬১৫নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক সময় এই অবকাশে হযরত (দঃ) নিদ্রাও যাইতেন; আরেশা (রাঃ) বর্ণিত ৬০৩নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কদাচিত হযরত (দঃ) এই সময় স্ত্রী-ব্যবহারও করিতেন; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। সময়ে এরূপও হইয়াছে যে, হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে-সাদেক নিকটবর্ত্তী হওয়ার পূর্ব্বেই সমাপ্ত করিয়াছেন, এবং ফজরের ছুন্নত পড়ার পূর্ব্বেই গভীর নিদ্রারত হইয়াছেন, অতঃপর ফজরের আজান দেওয়ার পর মোয়াজ্জেন হযরত (দঃ)কে ডাকিবার জন্য আসিলে হযরত (দঃ) নিদ্রা হইতে উঠিয়া ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত পড়িয়া জমাতের জন্য গিয়াছেন; ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৯নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। নিদ্রার পরে ফজরের নামাযের জন্য কোন কোন সময় হযরত (দঃ) পুনঃ নূতন অজু করা ব্যতিরেকে নিদ্রার পূর্ব্বের অজু দ্বারাই ফজর নামায পড়িতেন, কারণ নবীদের নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয় না; ১০৯নং হাদীছে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। কোন কোন সময় নিদ্রার পর ফজরের নামাযের জন্য নূতন অজু করিতেন, আর গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল অবশ্যই করিতেন; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ আছে। রমজানের সময় হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের হইতে অবসর হইয়া শেষ সময়ে সেহরী খাইতেন এবং সেহরী খাওয়ার অল্প পরেই ফজরের নামাযে যাইতেন; আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ৩৫৪নং হাদীছে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে।

মছআলাহ ঃ—তাহাজ্জুদ-নামাযের সময় সাধারণতঃ শেষ রাত্রেই বটে, কিন্তু শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ বা ভরসা না থাকিলে এশার নামাযের পরে বেতেরের পূর্ব্বে কিছু নফল পড়িবে ; এই নফল পড়িলে তাহাজ্জুদের ফজিলত হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে না।

মছআলাহ ঃ—কোন দিন শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছুটিয়া গেলে সূর্য্য উদয়ের পর জোহর-নামাযের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহাজ্জুদের কাজা স্বরূপ স্বীয় অভ্যাসের পরিমাণে এবং অভ্যাস পরিমাণ কেরাতে নফলের নিয়্যতে নামায পড়িয়া নিবে ; আশা করা যায় এই নামায তাহার অভ্যস্ত তাহাজ্জুদের সমতুল্য পরিগণিত হইবে। (এলাউস-সুনান, ৭—৭৮)

রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৬০৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান শরীফের রাত্রে নামায কিরূপ পড়িতেন ? আয়েশা (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি রমজান শরীফে এবং রমজান ছাড়া অন্য সময়ে (শেষ রাত্রে) এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না ! প্রথম ধাপে (দুই দুই রাকাত করিয়া) চার রাকাত পড়িতেন যাহা বর্ণনাতীত সুন্দর ও লম্বা হইত। তারপর আবার (ঐরূপেই) চার রাকাত পড়িতেন, তারপর তিন রাকাত (বেতের) পড়িতেন । আয়েশা (রাঃ) বলেন—একদা আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রসুল্লাল্লাহ ! আপনি বেতের না পড়িয়া শুইয়া পড়েন ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হয়, কিন্তু ক্বাল্‌ব (দিল) জাগ্রতই থাকে।

● ঐ সময় জামাতের সহিত নিয়মিতরূপে তারাবীহ পড়া হইত না। তাই হযরত (দঃ) রমজান শরীফেও বেতের তাহাজ্জুদের সঙ্গে পড়িতেন।

পাঠকবৃন্দ ! লক্ষ্য রাখিবেন, ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য হাদীছকে তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন।

৬০৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কখনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামাযে বসিয়া কেরাত পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য বার্দ্ধক্যে পতিত হওয়ার পর হযরত (দঃ) বসিয়া কেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন, কিন্তু যখন ত্রিশ-চল্লিশ আয়াত বাকি থাকিত তখন দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং উহা পড়িয়া রুকু করিতেন।

প্রত্যেক অজুর পরে নামায পড়ার ফজিলত

৬১০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) ফজরের নামাযান্তে বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল! বল ত, তোমার নিকট সর্ব্বাধিক আশার যোগ্য আমল কি আছে? আমি বেহেশতে আমার আগে আগে তোমার পদ চালনার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, ঐরূপ আমল আমার ধারণায় এই যে, আমি রাত্রে বা দিনে যে কোন সময় অজু করি তখনই ভাগ্যানুরূপ কিছু নামায পড়িয়া থাকি।

নফল এবাদতে প্রাবল্য ও কঠোরতা অবলম্বন করিবে না

৬১১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি রশি টাঙ্গানো দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রশি এখানে টাঙ্গানো কেন? সকলেই উত্তর করিল, যয়নব (রাঃ) ইহা টাঙ্গাইয়াছেন; তিনি নামায পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ শ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করার কোনই প্রয়োজন নাই; রশি খুলিয়া ফেল। প্রত্যেকের উচিৎ, যতক্ষণ মনের প্রফুল্লতা থাকে, ততক্ষণ (নফল) নামায পড়িতে থাকা। যখন ক্লান্তি বোধ হয় তখন বিশ্রাম লইবে। (এখানে ৩৯ নং হাদীছও উল্লেখ আছে।

তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা চাই না

৬১২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! অমুক ব্যক্তির ন্যায় কখনও হইও না; সে তাহাজ্জুদ পড়িয়া থাকিত, কিন্তু এখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রিবেলা নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বা নিদ্রা না আসিলে নামাজ পড়া

৬১৩। হাদীছ ঃ—ওবাদাহ্ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এই দোয়া পড়িবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ অতঃপর বলিবে "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ"

(ঐ ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায় পাক-সাফ হইয়া যাইবে। ফতহুল-বারী, ৩—৩১)। আর ঐ সময় যে কোন দোয়া করিলে তাহার দোয়া কবুল হইবে। তারপর অজু করিয়া নামায পড়িলে তাহার নামায বিশেষ ভাবে কবুল ও আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হইবে।

বেতেরের পর দুই রাকাত নামাজ বসিয়া পড়া ; ফজরের সুন্নত না ছাড়া

৬১৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) এশার নামায ছাড়া রাত্রি বেলা আরও নামায পড়িয়াছেন। (তাহাজ্জুদ) আট রাকাত নামায পড়িয়াছেন, (অতঃপর বেতের তিন রাকাত পড়িয়া—ফতহুল-বারী, ৩—৩৩) দুই রাকাত (নফল) বসিয়া পড়িয়াছেন। ফজরের আজানের পর একামতের পূর্ব্বে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নত) পড়িয়াছেন এবং এই রাকাতদ্বয় কখনও ছাড়িতেন না।

ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্ত্তা বলা বা আরাম করা

৬১৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের সুন্নত পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন নচেৎ ডান পার্শ্বের উপর কাত হইয়া থাকিতেন—নামাযের জামাতে যাওয়ার সংবাদ আসা পর্য্যন্ত।*

এস্তেখারার নামায

বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষে উহা আরম্ভ করার পূর্ব্বে দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতার সহিত নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িবে। তারপর উক্ত কার্য্য সমাধা করা বা না-করা যাহার প্রতিই অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে উহাতেই খায়ের-বরকত হইবে এবং এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকেই "এস্তেখারাহ" বলা হয়। এস্তেখারাহ শব্দের অর্থ আল্লার নিকট কার্য্যের ভাল দিক প্রার্থনা করা।

---

* এই হাদীছে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া ডান কাতের উপর শোয়া ইহা নির্দ্ধারিত সুন্নত তরিকা নহে। কারণ, ইহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দিষ্ট অভ্যাস ছিল না। ৬০৭ নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যেও এ ক্ষেত্রে হযরতের বিভিন্ন রকম কার্য্যক্রম প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র শোয়া-কার্য্যকে নিয়মিতরূপে অবলম্বন করা সুন্নত তরিকা গণ্য হইবে না। বিশেষতঃ মসজিদে ঐরূপ শোয়া মোটেই সুন্নত তরিকা নহে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে ঐরূপ শুইয়াছেন এরূপ একটি ঘটনাও প্রমাণিত নাই।

৬১৬। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে এস্তেখারাহ করার বিশেষ তাকিদ করিতেন এবং বিশেষ তৎপরতার সহিত এস্তেখারার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেরূপ পবিত্র কোরআনের ছুরাসমূহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজের প্রতি অগ্রসর হইতে চায় তখন তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য এই—প্রথম দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে, অতঃপর এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ
وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ۔

দুই স্থানে "هٰذَا الْاَمْرَ" উচ্চারণের সময় স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে।

দোয়াটির অর্থ—হে আল্লাহ! তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান উহাই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার কুদরত ও শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার মেহেরবানীর কিছু অংশ ভিক্ষা চাই। নিশ্চয় তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আমার কোন শক্তি নাই, ভাল-মন্দ একমাত্র তুমিই জান, তুমিই সব গোপন অদৃশ্য বিষয়বস্তু ভালরূপে জান, আমি কিছুই জানি না।

হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীনের দিক দিয়া, দুনিয়ার দিক দিয়া ও শেষ ফলের দিক দিয়া এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্যই ভাল হইবে তবে এই কার্য্যটি সমাধা হওয়া আমার জন্য ধার্য্য করিয়া দাও এবং ইহাকে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং ইহার মধ্যে আমাকে বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমার

জন্য দ্বীন-দুনিয়া, শেষ ফল এবং ইহকালের ও পরকালের দিক দিয়া ভাল নয় তবে এই কাজকে আমার হইতে দুরে রাখ, আমাকেও ইহা হইতে দুরে রাখ এবং যে স্থানের যাহা আমার জন্য ভাল হয় উহাকেই আমার জন্য নির্দ্ধারিত কর, অতঃপর উহার উপরই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।

ফজরের সুন্নতের প্রতি বিশেষ তৎপরতা

৬১৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ ভিন্ন অন্য নামাযের মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের প্রতি সর্ব্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ফজরের সুন্নতে কেরাত কিরূপ ?

৬১৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদ ও বেতের) তের রাকাত নামায পড়িতেন, তারপর ফজরের আজান শুনিলে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িতেন। (উহাতে ছুরা কুলইয়া এবং কুলহু আল্লাহু পড়িতেন। মোসলেম শরীফ)

৬১৯। হাদীছ ঃ—আনাছ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফজরের ফরজের পূর্ব্বে সুন্নত নামাযের রাকাতদ্বয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়িলে কিরূপ মনে করেন ? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামায) দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন, (সর্ব্বশেষ দুই রাকাতের সঙ্গে) এক রাকাত (মিলাইয়া) বেতের নামায পড়িতেন এবং ফজরের ফরজের পূর্ব্বে দুই রাকাত সুন্নত এরূপ সংক্ষিপ্ত পড়িতেন যেন তাঁহার কানে একামতের শব্দ পৌঁছিয়াছে। (১৩৫ পৃঃ)

৬২০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত সংক্ষিপ্ত কেরাতে পড়িতেন, এমনকি আমি ধারণা করিতাম যে, বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত আলহামদু ছুরাও শেষ করেন নাই।

চাশতের নামায

৬২১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় কোন একটা আমল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভালবাসিতেন, কিন্তু নিজে বিশেষ তৎপরতার সহিত উহা করিতেন না, এই ভয়ে যে লোকেরা উহার প্রতি তৎপরতা অবলম্বন করিবে, ফলে হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহাকে ফরজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি নবী (দঃ)কে চাশতের নামায পড়িতে দেখি নাই, কিন্তু আমি উহা অবশ্যই পড়ি এবং পড়িব।

ব্যাখ্য ঃ—এই হাদীছে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) চাশতের নামাযকে উত্তম আমলই গণ্য করিতেন। অবশ্য এই নামাযের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করার কোন প্রমাণ নাই, তাই চাশতের নামায ঐরূপ ব্যবস্থার সহিত গর্হিত নীতি সাব্যস্ত; এই হিসাবেই ২৩৮ পৃষ্ঠায় "ওমরার বয়ান" পরিচ্ছেদে এক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) এই নামাযকে বেদআ'ত বলিয়াছেন।

৬২২। **হাদীছ ঃ**—মোয়াররেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি চাশতের নামায পড়িয়া থাকেন কি? তিনি বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওমর (রাঃ) পড়িয়া থাকেন কি? বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু বকর (রাঃ)? বলিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম? বলিলেন, তাঁহার পড়াও আমার খেয়ালে পড়ে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর উদ্দেশ্য মূল চাশতের নামায অস্বীকার করা নয়, বরং উহার জন্য অধিক তৎপরতা, এমনকি ভ্রমণ অবস্থায় সঙ্গীদেরকে বিচলিত রাখিয়াও চাশতের নামাযে লিপ্ত হওয়া—উহার জন্য এইরূপ তৎপরতাকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

৬২৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পরম প্রিয় নবী (দঃ) আমাকে তিনটি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি আজীবন উহা পালন করিয়া যাইব—(১) প্রতি মাসে তিনটি রোযা। (২) চাশতের নামায পড়া। (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্বেই বেতের পড়া।*

৬২৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক আনছারী ছাহাবী অধিক মোটা ছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমি সব সময় আপনার সহিত জামাতে নামায পড়িতে সক্ষম হইনা, (তাই কোন সময় গৃহে নামায পড়িতে হয়, আপনি আমার গৃহে এক জায়গায় নামায পড়িয়া আসিলে আমি উহাকেই আমার নামাযের স্থান বানাইতাম।) সে মতে ঐ ছাহাবী হযরতের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া হযরত (দঃ)কে স্বীয় গৃহে দাওয়াত করিয়া আনিল এবং একটি বিছানার এক অংশ ধৌত করিয়া রাখিল, হযরত (দঃ) আসিয়া উহার উপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন। এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, হযরত (দঃ) কি চাশতের নামায পড়িতেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, এই দিন ছাড়া অন্য কোন দিন তাহা আমি দেখি নাই।

---

* আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীছ কণ্ঠস্থ করিতে অধিক রাত্র জাগিতেন; তাহাজ্জুদের জন্য শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়া তাঁহার পক্ষে আশঙ্কাজনক ছিল; অতএব বেতের ও রাত্রের নফল পড়ায় এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

অন্যান্য সুন্নত নামায

৬২৫। হাদীছঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি লক্ষ্য রাখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিভিন্ন নামাযের সঙ্গে) দশ রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন—জোহরের পূর্ব্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত মাগরেবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত—এই চার রাকাত গৃহে আসিয়া পড়িতেন এবং ফজরের পূর্ব্বে (ঘরের ভিতরে) দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই সময়টি এমন সময় ছিল যে, তখন কোন লোক হযতের নিকট ঘরের ভিতর যাইত না, কিন্তু আমার ভগ্নি, হযরতের বিবি হাফছাহ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছোবহে-ছাদেকের সময় মোয়াজ্জেন আজান দিবার পরক্ষণেই হযরত (দঃ) এই দুই রাকাত নামায পড়িতেন (ইহা ফজরের সুন্নত)।

৬২৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্ব্বদা জোহরের পূর্ব্বে চার রাকাত ও ফজরের পূর্ব্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যাঃ—বিভিন্ন হাদীহ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) জোহরের পূর্ব্বে চার রাকাত সুন্নত পড়িতেন, হয়ত কোন সময় দুই রাকাতও পড়িয়াছেন।

৬২৭। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মগরেবের পূর্ব্বে (নফল) নামায পড়, এইরূপ তিনবার বলিলেন, তৃতীয়বার ইহাও বলিলেন যে, যাহার ইচ্ছা হয় পড়িতে পার। ইহা এই জন্য উল্লেখ করিলেন, যেন মাগরেবের পূর্ব্বের নামাযকে অন্যান্য নামাযের সুন্নতের ন্যায় গণ্য না করা হয়।*

---

* মগরেবের ওয়াক্তে ফরজ নামায পড়িবার পূর্ব্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার বিষয়টি হযরত (দঃ) নিজেই বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মগরেবের ফরজ নামায উহার ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই পড়িয়া নেওয়া আবশ্যক, বিলম্ব করা মকরূহ; অথচ সকলেই যদি এই নফলে লিপ্ত হয় তবে ফরজ পড়িতে বিলম্ব ঘটিবেই। তাই হযরত (দঃ) এই নফল পড়ার অনুমতিদানে এরূপ সতর্কতা ও সংকোচবোধ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদদৃষ্টে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সাধারণ লোকদের অসাবধানতা লক্ষ্য করিয়া মগরেবের ফরজের পূর্ব্বে নফলে লিপ্ত হওয়া মকরূহ বলিয়াছেন।

৬২৮। হাদীছঃ-আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাগরেবের সময় মোয়াজ্জেন আজান দেওয়ামাত্র ছাহাবাদের কিছু লোক তাড়াতাড়ি মসজিদের থাম সমূহের বরাবর দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ হইতে আসিবার পূর্ব্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই ওয়াক্তে আজান ও একামতের মধ্যে সময় অতি সামান্য থাকিত। (৮৭ পৃঃ)

মছআলাহঃ—নফল নামায রাত্রে এবং দিনে দুই দুই রাকাতরূপে পড়া উত্তম। (১৫৫ পৃঃ)। হানফী মজহাবের ফেকাহ-কেতাবে দিনের বেলা নফল চার রাকাতরূপে উত্তম বলা হইয়াছে।

মছআলাহঃ—নফল নামায জামাতের সহিত শুদ্ধ হয়। (১৫৮ পৃঃ ৫৭৪, ২৫৪ ও ২৭৬ হাঃ)

মছআলাহঃ—নিজ নিজ গৃহে নফল নামায পড়া চাই। আবাসিক গৃহকে নামায হইতে বঞ্চিত রাখা চাইনা। (১৫৮ পৃঃ ২৮০ হাদীছ)

মক্কা ও মদীনার হরমের মসজিদে নামাযের ফজিলত

৬২৯। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, অধিক ফজিলত ও ছওয়াবের আশায় কোন বিশেষ মসজিদের প্রতি ছফর করিয়া যাইবে না। (কারণ, সব মসজিদই আল্লার ঘর, সবেরই সমান ফজিলত) কিন্তু তিনটি মসজিদ এমন আছে যাহার ফজিলত বিশ্বের সমস্ত মসজিদ হইতে অধিক; (তাই সুযোগ পাইলে) উহার প্রতি ছফর করিবে। (১) মক্কা শরীফের মসজিদুল-হারাম। (২) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ। (৩) মসজিদে-আকছা—বায়তুল-মোকাদ্দাস মসজিদ।

ব্যাখ্যাঃ—মসজিদুল-হারামে অর্থাৎ কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করিয়া যেই মসজিদ তৈরী আছে উহাতে নামাজের ছওয়াব এক লক্ষ গুণ বেশী। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এক হাজার গুণ এবং বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদে পাঁচ শত গুণ। (ফতহুল বারী, ৩—৫২)

৬৩০। **হাদীছঃ**-আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে একটি মাত্র নামায (মসজিদুল-হারাম ব্যতীত) অন্য মসজিদের এক হাজার নামায হইতে উত্তম। মসজিদুল-হারাম অবশ্য আরও বেশী ফজিলত রাখে।

৬৩১। **হাদীছঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রতি শনিবার হাঁটিয়া বা সওয়ার হইয়া কোবার মসজিদে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

৬৩২। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن زيد ان رسول الله (ص)

قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার গৃহ ও মসজিদস্থিত আমার মিম্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানের একটি খণ্ড। (আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত স্থান বা জায়গাটি বেহেশতের বাগানের অংশ বা খণ্ড হওয়ার তৎপর্য্যে দুইটি বিষয় রহিয়াছে। একটি এই যে, এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশত হইতে ইহজগতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপরটি এই যে, পর-জগত প্রতিষ্ঠিত হইলে এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশতের বাগানে স্থাপিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার হের-ফের না করিয়া সরলভাবে উহার বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করাই উত্তম। কারণ আল্লাহ তায়ালার কুদরত অসীম এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মর্য্যাদা অতি মহান।

বেহেশত হইতে হযরত আদম (আঃ)-এর জন্য পাথর (—কা'বা শরীফে স্থাপিত হজরে আসওয়াদ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য (অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে) পোষাক আসিতে পারিলে হযরত মোহাম্মদোর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য বেহেশতের বাগানের একটি টুকরা আসিতে পারিবে না কেন? মদীনা শরীফে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এই অংশটুকু এখনও চিহ্নিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬৩৩। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে অতি সুন্দর চারটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন—(১) কোন মহিলা দুই দিন ভ্রমণ পরিমাণ (তথা ৩২ মাইল) পথ ছফর করিতে পারিবে না সঙ্গে স্বামী বা কোন মাহরম না থাকিলে। (২) রোযার ঈদ এবং কোরবাণীর ঈদের দিনে রোজা রাখা যাইবে না। (৩) ফজর-নামাযের পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত (নফল) নামায পড়া যাইবে না। (৪) অধিক ছওয়াব ও বৈশিষ্ট্যের আশায় কোন মসজিদের প্রতি ছফর করা যাইবে না, তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল-আক্‌ছা এবং আমার (তথা মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) মসজিদ। (প্রথম বিষয়টির জন্য ৫৭৮নং হাদীছের বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

নামাযের বিবিধ আহকাম

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ

৬৩৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায ফরজ হওয়ার প্রথমাবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায অবস্থায় সালাম করিতাম এবং তিনি উত্তরও দিতেন। আমরা আবিসিনিয়া হইতে (মদীনায়) আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে সালাম করিলাম ; তিনি উত্তর দিলেন না। বরং নামাযান্তে তিনি বলিলেন, নামাযের মধ্যে (আল্লার প্রতি) মগ্নতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৬৩৫। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলিতাম ; পরস্পর দরকারী কথা জানাইতাম। যখন এই আয়াত নাযেল হইল—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি, বিশেষরূপে আছরের নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নামাযের মধ্যে (কথাবার্ত্তা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া) আল্লার প্রতি ধ্যানমগ্ন হও।" তখন আমরা কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলাম।

৬৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে কোন ঘটনায় ইমামকে সতর্ক করা আবশ্যক হইলে মহিলাগণ হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিবে এবং পুরুষ "সোবহানাল্লাহ" বলিবে।

নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাক শুনিলে কি করিবে ?

৬৩৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পূর্ব্বকালের একটি ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন। জোরায়েজ নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বদা লোকালয় হইতে দূরে এবাদৎখানার মধ্যে থাকিয়া এবাদতে মশগুল থাকিত। একদা সে নামায পড়িতেছিল, তাহার মাতা তাহাকে ডাকিল, হে জোরায়েজ! সে মনে মনে ভাবিল, হে খোদা! একদিকে তোমার নামায, অন্য দিকে মাতার ডাক, এখন কি করিব ? এই ভাবিয়া সে উত্তর দিল না, তাহার মাতা পুনরায় ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে ঐ ভাবিয়াই উত্তর দিল না। তৃতীয়বার আবার তাহার মাতা ডাকিল, হে

জোরায়েজ! এবারও সে উত্তর দিল না। এবার তাহার মাতা বিরক্ত হইয়া বদ-দোয়া করিল, হে আল্লাহ! জোরায়েজ (যখন আমার ডাকে সাড়া দিয়া আমার চেহারা দেখিল না, সে) যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে বদকার নারীর চেহারা চোখে দেখে। (মাতার বদ-দোয়া আল্লার নিকট কবুল হইল।)

তারপর ঘটনা এই ঘটিল যে জোরায়েজের এবাংখানার নিকটবর্ত্তী এক রাখালিনী নারী বকরি চরাইত এবং সেখানেই অবস্থান করিত। তাহার (স্বামী ছিল না, এমতাবস্থায় তাহার) একটি সন্তান জন্মিল। সকলেই তাহাকে ধরিল যে, বল্ কোন ব্যক্তির কু-কর্ম্মে এই সন্তান জন্মিয়াছে? (খোদার কুদরত—) রাখালিনী মিথ্যারোপ করতঃ বলিল, জোরায়েজের; সে তাহার এবাদৎখানা হইতে নামিয়া আসিত। (জোরায়েজ বস্তুতঃ খাঁটী বুজুর্গ ছিলেন, কেবল একটি ত্রুটির দরুন মাতার বদ-দোয়ার কারণে এই অপবাদের সম্মুখীন হইলেন। মাতার বদ-দোয়া পুরা হইয়া গেল, এখন আল্লাহ তায়ালা জোরায়েজের ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।) সকলে যখন জোরায়েজকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিল, (এমনকি তাঁহার বাসস্থানের উপর আক্রমণ চালাইল) তখন জোরায়েজ বলিলেন, কোথায় সে নারী যে এই কথা বলিয়াছে? তখন সন্তান সহ ঐ রাখালিনীকে উপস্থিত করা হইল, জোরায়েজ ঐ সদ্য প্রসূত কচি শিশুকে জিজ্ঞাসা কলিলেন, হে বালক! তোমার পিতা কে? শিশুটি বলিয়া উঠিল, অমুক রাখাল।

নামায অবস্থায় সেজদার স্থান পরিষ্কার করা

৬৩৮। হাদীছ ঃ—মোয়া'য়কীব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি সেজদায় যাইতে সেজদার স্থানকে সুসমতল করিত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, প্রয়োজন হইলে একবার করিতে পার। (বার বার করিও না।)

বিশেষ প্রয়োজনে নামায অবস্থায় সামান্য কোন কাজ করা

৬৩৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন, গত রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় একটি শয়তান (তথা অতি দুষ্ট জিন) আমার নামায নষ্ট করার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি উহাকে কাবু করিয়া ফেলিলাম এবং শক্তভাবে ধরিয়া খুব জব্দ করিলাম। ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, উহাকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখি, যেন ভোর বেলা তোমরা উহাকে দেখিতে পার। কিন্তু তখন আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)-এর এই দোয়াটি স্মরণ হইল—رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

"হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে এমন রাজত্ব ও আধিপত্য দান কর যাহা আমি ভিন্ন অন্য আর কেহ পাইতে না পারে।"*

(উপরোক্ত দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সোলায়মান (আঃ)কে মানুষ, জ্বিন ইত্যাদি দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর উপর আধিপত্য দান করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য ঘটনায় ভাবিলেন যে, শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলে জ্বিনের উপর আধিপত্য চালান হয়, অথচ ইহা সোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের জন্য বিশেষ বস্তু ছিল,) তাই আমি শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলাম না; ছাড়িয়া দিলাম। আল্লাহ তায়ালা উহাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাড়াইয়া দিলেন।

নামাযের সময় যানবাহন—পশু ভাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে?

৬৪০। হাদীছ ঃ—আযরাক ইবনে কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহওয়ায এলাকায় গিয়াছিলাম; খারেজী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য। আমি একটি নহর বা খালের নিকটে ছিলাম; এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া (আছরের) নামায পড়া আরম্ভ করিলেন। (নামায অবস্থায়) তাঁহার যানবাহনের রজ্জু তাঁহার হাতেই ছিল। পশুটির টানাটানিতে ঐ ব্যক্তি স্থানচ্যুতও হইয়া যাইত। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ঐ লোকটি ছাহাবী আবু বরযাহ আসলামী (রাঃ)। (পশুর লাগাম তাঁহার হাতে রাখিয়াছেন দেখিয়া) এক খারেজী ব্যক্তি (যাহারা প্রকাশ্যে অতি ভক্ত মোসলমান দেখায়, আর বস্তুতঃ হয় মোনাফেক বা ভ্রষ্ট মতাবলম্বী—সে) ঐ ছাহাবীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, আল্লাহ এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করুন। (আমি খারেজী ব্যক্তিকে বলিলাম চুপ থাক; আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন; তুমি জান ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি কে? তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু বরযাহ (রাঃ)। আমার বিশ্বাস—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দীন-দুনিয়ায় অপমান করিবেন; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন ছাহাবীকে মন্দ বলিয়াছ। ফতহুল-বারী, ৩—৩৬)

বৃদ্ধ ছাহাবী নামাযান্তে ঐ কটাক্ষের উত্তরে বলিলেন, আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাত-আটটি জেহাদে উপস্থিত রহিয়াছি। (এই অধিক সাহচর্য্যের মধ্যে) আমি হজরতের সহজ ও অনায়াসসাধ্য নীতি দেখিয়াছি এবং লক্ষ্য করিয়াছি। যানবাহন পশুটির

* হযরত সোলায়মান (আঃ) এই দোয়া স্বীয় ভোগ-বিলাস বা স্বার্থের জন্য করিয়াছিলেন না, বরং ঘটনার পূর্ণ বিবরণে জানা যায় যে, আল্লার দীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে সেনা বাহিনীর লোকদের গড়িমসি দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া এই দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাঁহার দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন।

টানাটানিতে নড়-চড় হওয়া আমার পক্ষে উত্তম—ইহা অপেক্ষা যে, আমি উহাকে ছাড়িয়া দিতাম; সে তাহার ইচ্ছামতে ঘাস-ক্ষেত্রে চলিয়া যাইত, ফলে আমি কষ্টে পড়িতাম। (আমার বাড়ী অনেক দুরে;) আমার ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে রাত্রে আমার বাড়ী পৌছাই সম্ভব হইবে না।

মছআলাহ্‌ঃ—এরূপ ঘটনায় যদি নামাযের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বক্ষদেশ পূর্ণরূপে কেবলাদিক হইতে ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যদি অনেক পরিমাণ হাটা চলা করে তবুও নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (ফতহুল-বারী, ৩—৬৬)

মছআলাহ্‌ঃ—কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, নামায অবস্থায় যদি চোর কাহারও কাপড় লইয়া পালাইতে উদ্যত হয় তবে নামাযের নিয়্যত ছাড়িয়া চোরকে ধাওয়া করিবে। (১৬১ পৃঃ)

তদ্রূপ যানবাহন ভাগিয়া যাওয়ার বা চার-ছয় আনা মূল্যের নিজস্ব কিম্বা অন্যের কোন বস্তুর ক্ষতির আশঙ্কা-ক্ষেত্রে উহা রক্ষার্থে নামাযের নিয়্যত ত্যাগ করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—অত্র পরিচ্ছেদে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বিধান ও মছআলার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যে, নামায বহির্ভূত কোন কাজ নামাযের মধ্যে করা হইলে যদি সেই কাজ সামান্য হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে না, আর যদি সেই কাজ বেশী হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে। "সামান্য" ও "বেশীর" তাৎপর্য্য এই—যে পরিমাণ বা যে শ্রেণীর কার্য্যরত ব্যক্তিকে সাধারণ দর্শক নামাযরত নয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকে উহাকে "বেশী" কার্য্য গণ্য করা হইবে এবং উহাতে নামায ভঙ্গ হইবে। অনেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করার জন্য এই ব্যাখ্যা করেন যে, যে কার্য্য সম্পাদনে সাধারণতঃ উভয় হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় উহাই "বেশী" এবং শুধু এক হাতে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে উহা "সামান্য" পরিগণিত। অবশ্য এই তাৎপর্য্যের সঙ্গে প্রথম তাৎপর্য্যটিও লক্ষণীয় থাকিবে।

নামাযের মধ্যে সালামের উত্তর দেওয়া চাই না

৬৪১। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে কোন একটি কাজে পাঠাইলেন। আমি সেই কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সালাম করিলাম; তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনে চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় আমার বিলম্ব হওয়ায় হযরত (দঃ) আমার উপর রাগান্বিত

হইয়াছেন। পুনরায় সালাম করিলাম; এবারও তিনি উত্তর দিলেন না। আমার অন্তরে অধিক চিন্তার উদয় হইল। তৃতীয়বার সালাম করিলাম; এবার সালামের উত্তর করিলেন এবং বলিলেন—প্রথম দুইবার উত্তর দিতে পারি নাই, কারণ আমি নামাযে ছিলাম।

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা

৬৪২। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায অবস্থায় কোমরের উপর হাত রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

নামাযের মধ্যে নামায ভিন্ন কোন বিষয়ের ধ্যান করা

জাগতিক অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কীয় কোন বিষয় নহে এইরূপ কোন বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যান নামাযের মধ্যে টানিয়া আনা কিম্বা আসিয়া গেলে উহাতে মগ্ন হওয়া অত্যন্ত দোষনীয়; উহাতে নামায ফাছেদ ও বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঐরূপ নামাযের বিশুদ্ধতা শুধু আইন ও নিধানগত ব্যাপার; উহাতে নামাযের রুহ বা আত্মা ক্ষুণ্ন হয়। ঐরূপ নামায পরিত্যাগের বস্তু অবশ্যই নহে, কিন্তু ঐ দোষ সংশোধনের চেষ্টা একান্তই কর্ত্তব্য। আর দ্বীনের কোন বিষয়, যথা—শরীয়তের কোন মছআলাহ, কোরআন-হাদীছের কোন তথ্য বা দ্বীনের কোন কর্ত্তব্যের—যেমন, জেহাদের কোন বিশেষ পরিকল্পনা—এই সব এবাদতই বটে, কিন্তু নামায বহির্ভুত এবাদত। এই শ্রেণীর কোন বিষয়েরও খেয়াল বা ধ্যান নামাযে থাকিয়া নিজে টানিয়া না আনা এবং আসিয়া গেলে কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামায রত অবস্থার সময় উহাতে ব্যায় না করাই উত্তম। আর যদি প্রয়োজন বোধ হয়, যেমন—মছআলাহ বা তথ্য কিম্বা পরিকল্পনাটি এইরূপ যে ঐ সময় উহাকে পূর্ণরূপে ধরিয়া ও মনে গাঁথিয়া না লইলে হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যইবে এবং পরে আর উহা মনে না-ও আসিতে পারে, অথচ দ্বীনের কিম্বা দ্বীনের জেহাদের জন্য উহা উত্তম বস্তু। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যানের জন্য নামায রত অবস্থার সময় ব্যয় করা উত্তমের পরিপন্থি নহে, এমনকি "খুশু-খুযু" তথা নামাযে আল্লাহনুরুক্তি ও আল্লাহতে মগ্নতার বিপরীতও হইবে না। (মাওঃ আশ্রফ আলী (রঃ) থানভীর বক্তব্য—আশ্রাফুস-সাওয়ানেহ ১—১৩৬ পৃঃ।)

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নামাযের মধ্যে জেহাদে সৈন্য প্রেরণের পরিকল্পনা করি। (খলীফা ওমরের কার্য্যক্রম ঐ শ্রেণীরই যাহা উত্তম ও খুশু-খুযুর পরিপন্থী নহে।)

অবশ্য এইরূপ খেয়াল ও ধ্যানের কারণে যদি নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটিয়া বা বিলম্বিত হইয়া যায় তবে সেজদা ছুহু দিতে হইবে এবং কোন ফরজ ছুটিয়া গেলে নামায পুনঃ পড়িতে হইবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঐরূপ

ঘটনায় একবার মগরেবের নামাযে প্রথম রাকাতের ক্বেরাত ছুটিয়া গিয়াছিল; সেই নামায তিনি পুনরায় পড়িয়াছিলেন। (ফতহুল-বারী ৩—৬৯)

৬৪৩। হাদীছ ঃ—ওক্ববা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আছরের নামায পড়িতেছিলাম। নামাযের সালাম ফেরা মাত্রই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতপরঃ পুনরায় মসজিদে আসিলেন। তাঁহার তাড়াহুড়ার দরুন মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব সৃষ্টি হইল। তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়া বলিলেন—নামাযের মধ্যে আমার স্মরণ হইল যে, আমার ঘরে একটু স্বর্ণের টুকরা আছে; উহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকা আমি পছন্দ করি না, তাই আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।

৬৪৪। হাদীছ ঃ—সায়ীদ মাকবুরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বর্ণনা করে! তাই আমি (ঐরূপ অভিযোগকারী) এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গত রাত্রে এশার নামাযে রসুলুল্লাহ (দঃ) কি ছুরা পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি হযরতের সহিত এশার নামাযের জমাতে উপস্থিত ছিলেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ—উপস্থিত ছিলাম। আমি বলিলাম, আমি তাহা বলিতে পারি; নবী (দঃ) সেই নামাযে অমুক অমুক ছুরা পড়িয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, সকলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে যত্নবান হয় না, তাই অনেকে হাদীছ বেশী বর্ণনা করিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে আমি হযরতের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে সর্ব্বদা যত্নবান থাকি।

আলোচ্য হাদীছে প্রমাণিত হইল, মোক্তাদীগণ নামাযের মধ্যে ইমামের কেরাতের প্রতি ধ্যান জমাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার মহত্বের ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় অভ্যস্ত হইতে না পারিলে উক্ত মগ্নতাই উত্তম।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজনে হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে তাহার যে কোন অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। আবু ইসহাক (রঃ) নামায অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে স্বীয় টুপি মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়াছেন

এবং উঠাইয়া দিয়াছেন। আলী (রাঃ) নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় এক হাতের কব্জি অপর হাতের কব্জির উপর রাখিতেন ; অবশ্য প্রয়োজন বোধে হাত দ্বারা শরীর চুলকাইতেন এবং কাপড় সংযত করার প্রয়োজন হইলে তাহাও করিতেন (১৫৯ পৃঃ)। হাদীছে আছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে হযরতের সহিত একতেদা করিয়া তাঁহার বামদিকে দাঁড়াইলে হযরত (দঃ) হাত দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়াছিলেন।

নামাযে কোন প্রয়োজনে হাত ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিশেষ শর্ত্ত ইমাম বোখারী (রঃ) সংযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত প্রয়োজন অবশ্যই নামাযের খাতিরে হওয়া চাই। অন্য কোন উদ্দেশ্যে হওয়া চাই না ; যেমন— কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদিকে এলোমেলো হওয়া হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য টানিয়া রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে ঃ (৪৬৯ নং হাদীছ) অথবা বাহুল্য রূপেও হওয়া চাই না। নামাযের উদ্দেশ্যে হওয়া যেমন—মাথায় অধিক গরম অনুভবে অস্থিরতার দরুণ নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ায় টুপি নামানো বা চুলকানির অধিক প্রয়োজনে অশান্তি ও গাত্রদাহ সৃষ্টি হওয়ায় নামাযে মনোযোগ রক্ষার জন্য চুলকানো, কিম্বা ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় সংযত করা ইত্যাদি। অনর্থক বা বদভ্যাসের দাস হইয়া হাত পা চালনা করা নামাযের মধ্যে অত্যন্ত অশোভনীয়। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ৬৩৮ নং হাদীছে বর্ণিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আর একটি বিশেষ কথা—প্রয়োজন ক্ষেত্রে হাত ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপরে উল্লেখিত সামান্য কাজ ও বেশী কাজের তাৎপর্য্য স্মরণ রাখিবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যদি বেশী কাজ অনুষ্ঠিত হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে ; সেই নামায পুনঃ পড়িতে হইবে।

● নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি আল্লার কোন জিকির উচ্চারণে নামায নষ্ট হয় না। (১৬০ পৃঃ)

● কোন উপস্থিত লোককে সম্বোধনরূপে নয়—কাহাকেও সম্বোধন ছাড়া শুধু দোয়ারূপে সালাম উচ্চারণ করিলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ ৪৭৬ হাদীছ)। অবশ্য উপস্থিতকে সম্বোধন উদ্দেশ্যে সালাম করা বা তদ্রূপ সালামের উত্তর প্রদান নিষিদ্ধ ; করিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ● নামাযের মধ্যে বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মুখের বা পেছনের দিকে স্থানচ্যুত হইলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ) ; তবে সামান্য ও বেশীর তাৎপর্য্য লক্ষ্য রাখিবে। ● নামাযের মধ্যে প্রয়োজন হইলে থুথু ফেলা জায়েয আছে। কিন্তু নামাযের স্থান ও কেবলা দিক চ্যুত হইয়া নহে, বরং ১৭২ ও ২৬৮ নং হাদীছে বর্ণিত বিধান মতে।

মছআলাহ ঃ—নামাযের মধ্যে মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া—যদি উ···হ্ আ···হ্ শব্দের সহিত বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভাবনা-চিন্তায় বা কোন দুঃখ-দরদ ইত্যাদির কারণে হয় তবে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি বেহেশত-দোযখ স্মরণে বা আল্লাহ তায়ালার ভয়ের প্রতিক্রিয়ায় ঐরূপ হয় তবে নামায নষ্ট হইবে না (শামী, ১—৫৭৯)। সূর্য্য গ্রহণের নামায অবস্থায় হযরত (দঃ) বেহেশত-দোযখ দেখিয়া ছিলেন বলিয়া ৫৬১নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে; এক হাদীছে বর্ণিত আছে, সেই নামাযের সেজদার মধ্যে হযরত (দঃ) কাঁদিয়াছিলেন এবং উ··হ্, উ··হ্ শব্দের সহিত মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ছিলেন (ফতহুল-বারী, ৩—৩৬)।

ফরজ নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গেলে সেজদা-ছুহু দিবে

৬৪৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক (চার রাকাতওয়ালা) নামাযের দুই রাকাত পড়িয়া, না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। নামায যখন শেষ হইয়া আসিল—সকলে সালাম ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছিল এমন সময় হযরত (দঃ) বসা অবস্থাই সালাম ফিরিবার পূর্ব্বে দুইটি সেজদা করিলেন। প্রত্যেকটি সেজদা তকবীরের সহিত করিলেন; মোক্তাদীগণও সেজদা করিল। ভুলে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গিয়াছিল! উহারই পরিবর্ত্তে এই সেজদা ছিল।

ভূলবশতঃ যদি পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলে*

৬৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিকট আরজ করা হইল, নামাযের রাকাত কি বাড়িয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইহার কি অর্থ? তখন আরজ করা হইল যে, আপনি নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়াছেন, এতদ্শ্রবণে হযরত (দঃ) সালাম ফিরার পর দুইটি সেজদা করিলেন। তারপর আবার সালাম (করিয়া নামায সমাপ্ত) করিলেন**। নামাযান্তে বলিলেন, নামায সম্পর্কে নূতন কোন কিছু হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে উহা বলিয়া দিতাম। কিন্তু আমি মানুষই—আমারও ভুল হয় যেরূপ তোমাদের ভুল হইয়া থাকে। অতএব কোন সময় আমি ভুলিয়া গেলে

---

* চতুর্থ রাকাতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া অতঃপর দাঁড়াইয়া পঞ্চম রাকাত পড়িয়া থাকিলে সেজদা-ছুহু দ্বারা নামায শুদ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় ষষ্ঠ রাকাতও পড়িয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু চতুর্থ রাকাতের পর না বসিয়া পঞ্চম রাকাত পড়িলে পূর্ণ নামাযই ফাছেদ হইয়া যাইবে।

** ইহা নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয সময়ের ঘটনা। নতুবা ইমাম কথা বলার পর সেজদা-ছুহু দেওয়ার অবকাশ থাকে না। এই হাদীছটি ৫৮ পৃষ্ঠায়ও আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। আর তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইলে তাহার কর্ত্তব্য হইবে চিন্তা করিয়া সঠিক দিক নির্দ্ধারিত করা এবং সে উহার ভিত্তিতেই নামায পূর্ণ করিবে, অতঃপর সালাম করিয়া দুইটি সেজদা করিবে।

ভুলক্রমে শুধু দুই রাকাত পড়িয়াই যদি সালাম করে

৬৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আছরের নামায দুই রাকাত পড়িয়াই সালাম ফিরিলেন, তৎপর মসজিদের সম্মুখভাবে একটি কাষ্ঠ লাগান ছিল ঐ স্থানে যাইয়া উহার উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তাড়াহুড়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া মসজিদ হইতে চলিয়া গেল যে, নামাযের রাকাত কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল--যাহাকে "জুল-ইয়াদাইন" বলা হইত ; সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ভুল করিয়াছেন, না—নামাযই কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে ? রসুল (দঃ) বলিলেন, কোনটাই হয় নাই। সে আরজ করিল নিশ্চয়—হুজুর আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নবী (দঃ) এ বিষয়ে অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই আরজ করিল, এই ব্যক্তি ঠিকই বলিতেছে। তখন নবী (দঃ) বাকি দুই রাকাত নামায পড়িলেন ও সালাম ফিরিয়া দুই সেজদা করিলেন।+

৬৪৮। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরয়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—তোমাদের মধ্যে কেহ যখন নামাযে খাড়া হয় তখন শয়তান আসিয়া নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, এমনকি কত রাকাত নামায পড়িয়াছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। কেহ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে, শেষ বৈঠকে দুইটি সেজদা করিবে।↑

মছআলাহ ঃ--নামাযরত ব্যক্তিকে যদি কোন কথা বলা হয় এবং সে লক্ষ্য করিয়া শুনিয়া শুধু হাতের বা মাথার ইশারায় কোন বিষয় বুঝাইয়াও দেয় তবুও উহাতে সেজদা-ছুহু দিতে হইবে না। (১০৪ পৃষ্ঠা)

+ ভুলবশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায শেষ করিয়া যদি কথাবার্ত্তা বলিয়া ফেলে বা নামায ভঙ্গকারী অন্য কোন কার্য্য করে তবে হানফী মজহাব মতে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে ; সেজদা-ছুহু দিলে চলিবে না। উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাকে মনছুখ বলা হইয়া থাকে ; নামাযের মধ্যে যখন কথাবার্ত্তা বলা জায়েয ছিল উক্ত ঘটনা সেই কালের।

সেজদা-ছুহু সালামের পরে হইবে বটে, কিন্তু ঐ সালাম নামায সমাপ্তির সালাম নহে। নামায সমাপ্তির দুই সালাম সেজদা-ছুহুর পরেই হইবে, যেইরূপ পূর্ব্বের হাদীছে উল্লেখ আছে।

↑ রাকাতের সংখ্যা যে ভুলিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে কি করিবে সেই মছআলাহ সুদীর্ঘ।

অষ্টম অধ্যায়

—--(+)-----

জানাযার বয়ান

"জানাযাহ" অর্থ শব, মৃতদেহ বা মৃত ব্যক্তি। এই অধ্যায়ে মানুষের মুমূর্ষু কাল হইতে পুনর্জন্মকাল পর্য্যন্ত সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও মছআলাহ-মছায়েল বর্ণিত হইবে।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছের মর্ম্ম এই—যে ব্যক্তির ইহজীবনের শেষ বাক্য কলেমা-শাহাদাৎ হইবে সে বেহেশতে যাইবে। অন্য এক হাদীছের মর্ম্মও অনুরূপই—কলেমা-শাহাৎ বেহেশতের চাবি। (ফতহুল-বারী)

এই সমস্ত হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ দৃষ্টিতে ভুল ধারণা বা প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে যে, তবে শরীয়তের অন্যান্য আদেশ ও বিধি-বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা কি থাকিতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তর দানেই ইমাম বোখারী (রঃ) একজন বিশিষ্ট তাবেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—

ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ্ (রঃ)কে উক্ত প্রশ্নই করা হইলে তিনি সংক্ষেপে ইহার উত্তর দান করিলেন—চাবি মাত্রই উহার কয়েকটি দাঁত থাকে; কোন দরওয়াজার তালা খুলিতে হইলে দন্তযুক্ত চাবি আনিতে হইবে, দন্তহীন চাবি দ্বারা তালা খোলা যাইবে না।

অর্থাৎ কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত ঐ চাবির দন্ত। বেহেশতের তালা খুলিতে হইলে তথা বেহেশতে যাইতে হইলে শরীয়তের বিধানাবলী সহ কলেমা-শাহাদাৎ লইয়া যাইতে হইবে, নতুবা বেহেশতের দরওয়াজা খুলিবে না।

৩৪৭। হাদীছঃ— عن ابى ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَتَانِىْ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهٗ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ -

অর্থ :—আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এক বিশেষ দুত আসিয়া এই শুভ সংবাদের ঘোষণা শুনাইলেন—যে ব্যক্তি মৃত্যু

পর্য্যন্ত শেরেকী গোনাহ হইতে পাক-পবিত্র থাকিবে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঈমানের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে) সে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে? রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে (তবুও সে বেহেশতে যাইতে পারিবে)।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ধরণের হাদীছের একমাত্র তৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল—শেরেক বর্জ্জন তথা তৌহীদ ও ঈমানের মহত্ব ও গুণাগুণ প্রকাশ করা যে, ইহা দ্বারা মানুষ বেহেশত লাভ করিতে পারে। যদি গোনাহের দ্বারা কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় তবে কোন প্রকার আজাব ভোগ না করিয়া প্রথম হইতেই সে বেহেশতবাসী হইবে, নচেৎ গোনাহ পরিমাণ আজাব ভোগ করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে শেরেক বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈমান অবলম্বন না করিয়া হাজার নেক আমল, যেমন—কোটী কোটী টাকা দান-খয়রাত করিলেও তাহার পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, অনন্তকাল সে আজাব ভোগ করিবে—চিরকাল সে দোযখেই থাকিবে।

৬৫০। হাদীছ ঃ—عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন শেরেকী গোনাহের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে সে দোজখী হইবে।

জানাযার সঙ্গে যাওয়া

৬৫১। হাদীছ ঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে বিশেষরূপে সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন এবং সাতটি বস্তু নিষেধ করিয়াছেন। আদেশকৃত সাতটি কাজ এই—(১) জানাযার সঙ্গে যাওয়া, (২) রোগীকে দেখিতে যাওয়া এবং তাহার খোঁজ-খবর নেওয়া, (৩) কাহারও (ঠেকা উদ্ধারের বা সাদর) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৪) মজলুম-নির্য্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৫) শপথকারীর শপথ রক্ষা করা,* (৬) সালামের উত্তর দেওয়া, (৭) হাঁচিদাতার আলাহামদু লিল্লাহ শ্রবনে يرحمك الله

* অর্থাৎ কোন মোসলমান ভাই যদি এরূপ কোন কার্য্যের উপর শপথ করে, যাহা সমাধা হওয়া তোমার উপর নির্ভরশীল, তবে যদিও ঐ কার্য্যে তোমার কোন স্বার্থ না থাকে তবুও ঐ মোসলমান ভাই-এর শপথ রক্ষার্থে ঐ কার্য্য সমাধা করা তোমার কর্ত্তব্য।

(ইয়ারহামু-কাল্লাহ্) "আল্লাহ তোমার উপর (আরও) রহমত নাযেল করুন" এই বলিয়া তাহাকে দোয়া কর।↑ যেই সাতটি বস্তু (ব্যবহার) নিষিদ্ধ করিয়াছেন, উহা এই—(১) রৌপ্য (বা স্বর্ণ) নির্ম্মিত অঙ্গুরী, (৩) সাধারণ রেশমী বস্ত্র, (৪) মিহি রেশমী বস্ত্র, (৫) তসর, (৬) মোটা রেশমী বস্ত্র, (৭) লাল রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন।

৬৫২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহেঅসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর পাঁচটি হক আছে—(১) সালামের উত্তর দেওয়া, (২) রোগী দেখা ও তাহার হাল-পুরছী করা (৩) শব যাত্রায় যোগদান করা, (৪) (দাওয়াত বা ঠেকা উদ্ধার) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৫) হাঁচিদাতার "আলহামদু-লিল্লাহ" শ্রবণে يرحمك الله "ইয়ারহামু-কাল্লাহ" বলা।

মৃতকে কাফন পরাইবার পূর্ব্বে এবং পরেও দেখা যায়

কোন কোন আলেম বলেন মৃত ব্যক্তিকে গোসলদাতা ও তাহার সহকর্মিগণ ব্যতীত কাহারও দেখা চাইনা। বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে উহা খণ্ডন করিতেছেন। (ফতহুলবারী)

৬৫৩। হাদীছ :—উম্মুল আ'লা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে যে সব মোসলমান নিঃসম্বলরূপে হিজরত করিয়া মদীনায় উপস্থিত হইতেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের জন্য মদীনাবাসী মোসলমানদের ঘরে ঘরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মদীনাবাসীগণ এ বিষয়ে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুণ ব্যালটের ব্যবস্থা করা হইত। উম্মুল-আ'লা (রাঃ) বলেন—একদা ব্যালটের দ্বারা আমাদের জন্য ওসমান ইবনে মজউ'ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম উঠিল। আমরা তাঁহাকে সাদরে ও সযত্নে আমাদের গৃহে স্থান করিয়া দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অন্তিম রোগে

↑ হাঁচি আসা বস্তুতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলদায়ক, তাই ইহা আল্লার একটি বড় নেয়ামত, এই নেয়ামতের উপর আলহামদু লিল্লাহ বলিয়া যে ব্যক্তি আল্লার প্রশংসা করিল সে স্বীয় পালনকর্ত্তার শোকরগুজারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। যে ব্যক্তি নেয়ামত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নেয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে অধিক নেয়ামত পাইবার উপযোগী। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—لئن شكرتم لازيدنكم "তোমরা যদি আমার নেয়ামতের প্রকৃত শোকরগুজারী কর তবে তোমাদের জন্য নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করিয়া দিব।" তাই তোমার জন্য এই দোয়া করা হয়।

আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ও কাফন পরানের পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার নিকটবর্ত্তী আসিলেন।*

উম্মুল-আ'লা (রাঃ) বলেন—তখন আমি মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আবুছ-ছায়েব (ওসমান)। আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতেছি এবং শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্মানিত (অর্থাৎ বেহেশতবাসী) করিয়াছেন। এতদ শ্রবণে নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি কিভাবে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছ, সে বেহেশতবাসী হইবে? আমি আরজ করিলাম, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গ, ইয়া রসুলল্লাহ (দঃ)! এই ব্যক্তি বেহেশতবাসী না হইলে আর কে বেহেশতবাসী হইবে? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, (এই সম্পর্কে) নিশ্চিতরূপের সঠিক অবগতি এই ব্যক্তিরই লাভ হইয়াছে এবং আমি আশা করি, সে খুব ভালই পাইয়াছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লার রসুল, তথাপি আমি (অধিকাররূপে এবং অকাট্য ও অখণ্ডনীয়ভাবে) বলিতে পারিনা যে, আমার প্রতি আল্লাহ কিরূপ করিবেন।

উম্মুল-আলা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া আমি পণ করিলাম, কাহারও ভাল-মন্দের বিষয়ে নিশ্চিতরূপে আর কখনও কোন উক্তি করিব না।

ব্যাখ্যা ঃ—সর্ব্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা ; তিনি مالك يوم الدين "কর্ম্মফল প্রদানের একচ্ছত্র মালিক।" لمن الملك اليوم لله الواحد القهار, "সেদিন সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই সর্ব্বশক্তিমান হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, এমনকি ইহকালের ন্যায় বাহ্যিক ক্ষমতাটুকুও কাহারও হাতে থাকিবে না।" তাই সেই কর্ম্মফলের দিনের তথা পরকালের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ও দৃঢ়রূপে কোন কিছু বলিবার অধিকারী কেহই নহে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্য্যাদা ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন ; তিনি নিষ্পাপ, তদুপরি আল্লার ঘোষণা যে, মানুষ হিসাবে যদি আপনার কোনও ত্রুটি হয় আপনি পূর্ব্বাহ্নেই সে সব হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনাতীত শান ও মান-মর্য্যাদা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে। কিন্তু জলীল ও জব্বার, সর্ব্বাধিকারের অধিকারী সর্ব্বক্ষমতায় ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়ালার অধিকার ও ক্ষমতা দৃষ্টে সব কিছুই বিলীন ও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তদুপরি কাহারও

* এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুম্বন করিয়াছেন ; মৃতের মুখের উপর তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছে ((তিরমিজি)

কোন সক্রিয় অধিকারও নাই। এসব অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই রস্থলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অচ্ছালাম উপরোল্লিখিত তথ্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

বোখারী শরীফে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় হাদীছ বর্ণিত আছে, রস্থলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কোন ব্যক্তি আমল-এবাদতের দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনিও পারিবেন না; ইয়া রস্থলূল্লাহ (দঃ)? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না যাবৎ আল্লার রহমত আমাকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া না লইবে।

আল্লাহ তায়ালাও হযরত (দঃ)কে এরূপ বলিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন, যথা—

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ -

(কাফেরদের নানা প্রকার কুউক্তির প্রতিবাদে) আপনি বলিয়া দিন, আমি অতীতের রস্থলগণ হইতে পৃথক ধরনের নহি, (তাঁহারা মানুষ ছিলেন, কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, আমিও তদ্রুপই। এমনকি) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার প্রতি বা তোমাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহাও আমি (নিশ্চিত ও দাবী স্বরূপ কিছুই) বলিতে পারি না। (সব কিছু তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারই বাণীর উপর নির্ভর করিয়া হয়ত শুধু আশা রাখা যাইতে পারে, তদতিরিক্ত কাহারও কিছুই অধিকার নাই)। (২৬ পাঃ ১ রুঃ)

৬৫৪; **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ চাদরে আবৃত করিয়া রাখা হইল, আমি উহার নিকটবর্ত্তী আসিয়া চেহারার উপর হইতে কাপড় সরাইলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম। সকলেই আমাকে নিষেধ করিতেছিল, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিলেন না। আমার ফুফু ফাতেমাও আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা ক্রন্দন কর বা না কর, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি উচ্চ মর্ত্তবা পাইয়াছে, এমনকি রণক্ষেত্রে শহীদ অবস্থায় পতিত থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহাকে স্বীয় ডানা দ্বারা ছায়া দিতেছিলেন—যাবৎ তোমরা তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া না আনিয়াছ।

আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদিগকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

কোন কোন হাদীছে আছে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) মৃত্যু সংবাদ দান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহটির বিশ্লেষণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। অন্ধকার তথা কুফুরী যুগে এই রীতি ছিল যে, শুধু বড়-মানুষী প্রকাশার্থে

ঢোল-শোহরত দ্বারা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হইত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ রীতির প্রতিই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন। নতুবা জানাযায় শরীক হইবার জন্য বা দোয়া-এস্তেগফার ইত্যাদির আশায় মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদেরে সংবাদ দান করাতে কোন দোষ নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ উদ্দেশ্যে মৃত্যু-সংবাদ দান করিয়াছেন।

৬৫৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে দিন আবিসানিয়ার অধিপতি নাজাশীর মৃত্যু হইল ঠিক সেদিনই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ (অহীর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া) সকলকে জানাইলেন এবং তাঁহার জন্য এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) (জানাযা বা ঈদের নামায পড়ার) ময়দানে গেলেন এবং সকলকে লইয়া চার তকবীরের সহিত জানাযা পড়িলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবিসানিয়ার প্রত্যেক অধিপতিই "নাজাশী" উপাধিতে পরিচিত হইত; আলোচ্য ঘটনার অধিপতির নাম ছিল "আছহা'মাহ"। তিনি ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন, তিনি বড়ই সৌভাগ্যশালী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আল্লাহ তায়ালা মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জ্ঞাত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত ছাহাবীগণকে জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার প্রতি এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেন যাহা চিরকাল তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতীক হইয়া থাকিবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ –

"অদ্য আবিসিনিয়া নিবাসী একজন নেক বান্দা ইহকাল ত্যাগ করিয়াছেন, (যাহার নাম আছহা'মাহ) তোমরা সমবেতভাবে তোমাদের সেই ভ্রাতার জানাযার নামায আদায় কর।*

আল্লার রসুলের মুখে কাহারও নেক বন্দা বলিয়া আখ্যায়িত হওয়া পরম সৌভাগ্যজনক ও একটি মূল্যাবান সম্মানসূচক উপাধি। তদুপরি সুদুর মদীনা হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহার জানাযার নামায পড়িলেন ইহাও অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এমনকি আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, এইরূপে দুর প্রান্ত হইতে জানাযার নামায তাঁহার জন্য এক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। কারণ এরূপ ঘটনা একমাত্র

* মূল বাক্যটি বোখারী শরীফ ১৭৬ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত. এই হাদীছটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে ; অনুবাদের মধ্যে উহার বিবরণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ। অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের সময় অনেক মোসলমান ও মর্য্যাদাসম্পন্ন বক্তিবর্গ মদীনার বাহিরে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) বা খোলাফাগণ সচরাচর কাহারও উদ্দেশ্যে দুরপ্রান্ত হইতে জানাযার নামায পড়েন নাই। কদাচিৎ এরূপ আরও দুই একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে কিনা, তাহা সন্দেহযুক্ত। আরও একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং আরও ছাহাবী মদীনায় প্রাণত্যাগ করাকালীন অন্যান্য ছাহাবীগণ ও মোসলমানগণ দুর দুর প্রান্তে অবস্থানরত ছিলেন, কিন্তু কোথাও হইতে কেহ ঐ মহান ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে গায়েবানা-জানাযার নামায পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একটি দুইটি ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় শরীয়তের সাধারণ বিধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং প্রথারূপে ইহাকে অবলম্বন করা ত মোটেই সমিচীন নহে।

অবশ্য জানাযার নামাযের মূল বিষয়বস্তু হইল মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও এস্তেগকার করা, যাহা যে কোন স্থান হইতে করা যাইতে পারে এবং করিলে তাহা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা বিফলে যাইবে না, তাই এই বিষয় লইয়া বিবাদ সৃষ্টি করা পরিতাপের বিষয়।

জানাযার সৎকারে যোগদান করার জন্য সংবাদ দেওয়া

৬৫৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার অন্তিম শয্যাবস্থায় দেখা-শুনা করিতেন। ঐ ব্যক্তি একদা রাত্রিকালে প্রাণত্যাগ করিল। সেই রাত্রেই সকলে তাহার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বিষয় জ্ঞাত করান হইলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন ? তাহারা আরজ করিল—অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্র ছিল ; তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া ভাল মনে করি নাই। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কবরের নিকটবর্ত্তী আসিয়া দোয়া করিলেন বা পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা হযরতের পেছনে কাতার বাঁধিলাম ; আমিও উহাতে শামিল ছিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ ব্যক্তির নাম ছিল তাল্‌হা' (রাঃ)। তিনি মদীনবাসী ছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য সকলের নিকট বলিয়া গেলেন, তাল্‌হার অবস্থা ভাল নয়, তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী মনে হইতেছে। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ জ্ঞাত

করিও। কিন্তু যখন রাত্রি হইল তখন তাল্‌হা (রাঃ) তাঁহার আপন লোকদিগকে বলিলেন, যদি আমি রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি তবে রাত্রেই আমার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিও, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ডাকিও না। কারণ, ইহুদীগণ তাঁহার পরম শত্রু; অন্ধকার রাত্রে তিনি আমার জন্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন। সেই রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এবং দাফনকার্য্য সমাধা করা হইল। সকাল বেলা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে সম্পূর্ণ খবর অবগত করান হইলে তিনি সকলকে লইয়া তাঁহার কবরের নিকট আসিলেন এবং সমবেতভাবে হাত উঠাইয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন, দোয়াটি সংক্ষিপ্ত ছিল বটে, কিন্তু বড়ই তাৎপর্য্যপূর্ণ। হযরত (দঃ) বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ وَتَضْحَكُ اِلَيْهِ -

"হে খোদা! তাল্‌হার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ এরূপভাবে হউক যেন সেও সন্তুষ্টচিত্তে হাসিয়া উঠে এবং তুমিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ফতহুলবারী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় নবী (দঃ) কবরের নিকটবর্ত্তী আসিয়া শুধু দোয়া করিয়াছিলেন; না—পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) স্থিরভাবে এই মতই পোষণ করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় নবী (দঃ) পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামাযই পড়িয়াছিলেন। সেমতে বোখারী (রঃ) এই হাদীছের উপর কতিপয় মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য্য ধারণ ও ছওয়াবের আশা রাখার ফজিলত

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ

رَاجِعُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ......

অর্থ—আপনি সুসংবাদ দান করুন ঐ সমস্ত ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিবর্গকে যাহারা আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির অবস্থায় (ধৈর্য্য ধারণ করতঃ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া) এরূপ বলে যে—আমরা (ও আমাদের সর্ব্বস্ব) আল্লার। এবং আমাদের সকলেরই আল্লার নিকট যাইতে হইবে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিশেষ রহমত এবং তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

৬৫৭। হাদীছ ঃ— عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُّسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلَّا

اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهٖ اِيَّاهُمْ ـ

অর্থ—আনাছ হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলনানের তিনটি শিশুসন্তান মারা যাইবে।* ঐ শিশুদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে (ঐশিশুর মাতা ও পিতাকে) বেহেশত দান করিবেন।

৬৫৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশুসন্তান মারা যাইবে সে দোযখে যাইবে না ; অবশ্য সকলের ন্যায় তাহারও দোযখের উপর প্রতিষ্ঠিত পোল-ছেরাত পার হইয়া যাইতে হইবে। কারণ, ইহা একটি অনিবার্য্য ও অবধারিত বিষয় যাহা ব্যতিরেকে কোন উপায়ন্তর নাই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ـ

"তোমাদের প্রত্যেকেরই দোযখ অতিক্রম করিতেই হইবে, ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও অকাট্যরূপে অবধারিত।" (১৬ পাঃ ৮ রুঃ)

এখানে ৮২ নং হাদীছও উল্লেখ আছে।

মৃতকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

৬৫৯। হাদীছ ঃ—উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক কন্যার মৃত্যু হইল ; আমরা তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। রসুলুলাহ (দঃ) আসিয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন—(১) কুলপাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল দিবে। (২) তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার করিয়া গোসল দিবে ; আবশ্যক হইলে আরও অধিকবার গোসল দিবে, কিন্তু বেজোড় হওয়া চাই। (৩) শেষবার কর্পুর মিশ্রিত পানি ঢালিবে। (৪) ডান দিকের অঙ্গ এবং অজুর অঙ্গসমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিবে। গোসল সমাপনান্তে আমাকে সংবাদ দিবে।

---

* দুইটি বা একটি সন্তান মারা গেলে কি হইবে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায় ৮২ নং হাদীছে দেখুন।

গোসল সমাপনে আমরা রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে খবর দিলাম। তিনি তাঁহার একখানা লুঙ্গি আমাদের নিকট দিলেন এবং বলিলেন, সর্ব্বপ্রথম তাহাকে এই কাপড়টিতে আবৃত কর; যেন এই কাপড়টি তাহার শরীর স্পর্শ করিয়া থাকে। (বরকতের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন।)

উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবী-কন্যাকে গোসল দেওয়াকালীন প্রথমে তাঁহার কেশগুচ্ছ বা কবরী ও খোঁপা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চুল আঁচড়াইয়া গোসলান্তে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া (পেছনের) দিকে রাখিয়া দিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নবী-কন্যার গোসলদানে অন্যতমা অংশ গ্রহণকারীণী উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) মৃত নবী-কন্যার চুল সম্পর্কে তিনটি কথা বলিয়াছেন—আমরা নবী-কন্যার চুল আঁচড়াইয়াছিলাম (১৬৭ পৃঃ), দুই পার্শ্বের চুলে দুইটি, মধ্য মাথার চুলে একটি—তিনটি বেণী করিয়া দিয়াছিলাম (১৬৮ পৃঃ,) বেণীত্রয় পেছনের দিকে তথা পিঠের নীচে রাখিয়া দিয়াছিলাম (১৬৯ পৃঃ)।

মোসলমানদের শব দেহের প্রতি সসম্মানে বিদায় দানের ভূমিকা প্রদর্শনই শরীয়তের নীতি। রোগশয্যায় সাধারণতঃ অযত্নের দরুণ মহিলাদের এবং পুরুষেরও বাবরি চুল জটলা ধরিয়া যায়। গোসলদানে পরিচ্ছন্নতার জন্য সেই জটলা ছিন্ন করিতে হইবে; সেই জন্য আবশ্যক হইলে চিরুণীও ব্যবহার করা জায়েয আছে; কিন্তু চুল ছিন্ন না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিবে। চুল এলোমেলো ও অসুন্দররূপে থাকিতে দিবে না, সুবিন্যস্ততার সহিত চুল রাখিবে; উহার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে মোলায়েমভাবে বেণী করিয়া দিবে। হানফী মজহাবের ফেকার কেতাবেও বেণীর উল্লেখ আছে—ফতওয়া শামী, ১—৮০৪ দ্রষ্টব্য। বেণীর সংখ্যা ও রাখার স্থান সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও জায়েয, তবে শব দেহকে যথাসম্ভব নাড়া-চাড়া উলট-পালট কম করার ব্যবস্থাই সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য; সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া হানফী ফেকার কেতাবে মহিলা মৃতের চুলকে দুই খণ্ডে বা দুইটি বেণী আকারে দুই পার্শ্ব দিয়া বক্ষের উপর রাখিয়া দেওয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া

৬৬০। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহা সূতী, সাদা এবং ইয়ামান দেশের তৈরী ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ— রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য ব্যবহৃত কাফনই আল্লাহ তায়ালার নিকটও পছন্দনীয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে—হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সাদা পোষাক ব্যবহার কর; ইহা পাক-পবিত্রতার দিক দিয়া উত্তম। (কারণ, রঙ্গিন কাপড়ে কোন

কিছু লাগিলে তাহা সহজে নজরে পড়ে না) এবং সাদা কাপড়েই মৃতদিগকে কাফন দান কর। (তিরমিজি শরীফ)

মছআলাহ ঃ—মহিলাদিগকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। চতুর্থটি হইল সিরবন্দ এবং পঞ্চমটি হইল সিনাবন্দ। সিনাবন্দ বগল হইতে কোমর ও রান বা জানুদ্বয় সহ দীর্ঘ্য হইবে ; (কাফন পড়াইবার সময়) উহা পিরহানের নীচে থাকিবে ; (ফলে পেচাইবার সময় পিরহানের উপরে থাকিবে।) ১৬৮ পৃঃ

মছআলাহ ঃ—মৃতের মাথায় এবং দাঁড়িতে সুগন্ধি দিবে, আর শরীরের যে সব স্থান সেজদার সময় ব্যবহৃত হয় ঐ স্থানসমূহে কর্পুর দিবে (১৬৯ পৃঃ)।

এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন

৬৬১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জকরাকালীন এহ্রাম অবস্থায় আরাফার ময়দানে স্বীয় সওয়ারী হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে কুলপাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাহার (এহ্রামের) চাদরদ্বয় দ্বারা কাফন দাও ; তাহাকে সুগন্ধি লাগাইও না, তাহার মাথা আবৃত করিও না, (যেরূপ জীবিত ব্যক্তি এহরামাবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে না, মাথা আবৃত করে না।) কারণ, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কবর হইতে (হাজীদের ন্যায় এহ্রাম অবস্থায়) তল্‌বিয়া (লাব্বাইক) পড়িতে পড়িতে উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হানফী ও মালেকী মজহাব মতে এহ্রাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন ইত্যাদি সাধারণ মৃতের ন্যায়ই দিতে হইবে, কোন প্রকার ব্যবধান ও তারতম্য করার বিধান নাই। কারণ, কোরআন ও হাদীছ দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, মৃত্যুর দ্বারা প্রত্যেক আমলেরই সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার নামায পরিত্যক্ত হইয়া গেল ; তাহাকে কেবলামুখী ইত্যাদি অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না। তদ্রূপ মোহ্‌রেম ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার এহ্রাম পরিত্যক্ত হইয়া গেল, তাই তাহাকে এহ্রামকালীন অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না।

উল্লিখিত যুক্তিবিদগণ আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য সম্পর্কে এই উক্তি করেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়সমূহ একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই বিশেষত্ব ছিল, সর্ব্বক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই হাদীছের বিষয়াবলী বর্ণনা কালে রসুলুল্লাহ (দঃ) যে ধরনের বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহা (আরবী ভাষার বিধান মতে) একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই ইহা শরীয়তের সাধারণ বিধান ও নিয়মরূপে বিবেচিত হইবে না।

সাধারণ তৈরী জামা কাফনে দিবে না, দিলে গোনাহ হইবে না

৬৬২। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহার মধ্যে তৈরী জামা বা পাগড়ী ছিল না।

৬৬৩। **হাদীছ** ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মোনাফেক দলের প্রধান) আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী যখন মারা গেল তখন তাহার ছেলে (যিনি অতি খাঁটি মোসলমান ও বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন, স্বীয় পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নাজাতের অছিলার ব্যবস্থা স্বরূপ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া এই আবেদন জানাইলেন যে, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি স্বীয় জামাখানা আমার পিতার কাফনের জন্য দিবেন এবং আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন এবং তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। নবী (দঃ) তাঁহার আবেদন রক্ষা করতঃ স্বীয় জামা দিয়া দিলেন (বা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন) এবং বলিলেন, সময় হইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি জানাযার নামায পড়াইয়া দিব। যখন জানাযা তৈয়ার হইল এবং নবী (দঃ) জানাযার নামাযের জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পেছন হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন—এবং আরজ করিলেন, আপনি কি জানেন না? যে, (সে আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক দিন এই এই বিষোদ্গার ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং সে ছিল সমস্ত মোনাফেকদের প্রধান।) আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের উপর জানাযার নামায পড়িতে তথা দোয়া-এস্তেগফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নবী (দঃ) কোন বাধা-বিপত্তি না শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই বিষয়ে স্পষ্টতঃ নিষেধ করেন নাই, বরং বাহ্যতঃ অবকাশ সূচক অর্থের বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

"মোনাফেকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন আল্লাহ তায়ালা কস্মিনকালেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।" (১০ পাঃ ১৬ রুঃ)

এই বলিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ জানাযার নামায পড়িলেন। তৎপরেই স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াত নাযেল হইল —

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

"মোনাফেকদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনি কখনও তাহার উপর জানাযার নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটবর্ত্তী দাঁড়াইবেনও না।" (১০ পাঃ ১৭রুঃ)

ব্যাখ্যা—আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়ী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল; এই শত্রুতায় সে যে সমস্ত কুকীর্ত্তি ও জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার সমালোচনায় বহু হাদীছ এবং কোরআনের বহু আয়াত নাযেল হইয়াছে। আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইবার জন্য একবার সে যে সমস্ত চক্রান্ত করিয়াছিল তাহার সমালোচনায় "ছুরা মোনাফেক্বুন" নামক একটি ছুরা নাযেল হয়। সে সর্ব্বদাই কুচক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি আঁটিতে থাকিত; এমনকি সেই দুরাচার শয়তান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মান-মর্য্যাদার উপর আক্রমণ করা হইতেও বিরত থাকে নাই; আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উপর মানহানীকর ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ রটাইবার ষড়যন্ত্রকারীও একমাত্র সেই ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ তাহার এসব কুকীর্ত্তি অক্ষরে অক্ষরে অবগত ছিলেন। তাহার এক পুত্র ছিল, তাঁহার নামও ছিল আবদুল্লাহ, তিনি খাঁটি মোসলমান ছিলেন, তিনি স্বীয় পিতার কার্য্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত অনুতপ্ত, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ছিলেন, এমনকি অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইতেন, কিন্তু পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে নিষেধ করিতেন।

যেহেতু সে মোনাফেক অর্থাৎ প্রকাশ্যে মোসলেম দলভুক্তরূপে পরিচিত ছিল, তাহার মৃত্যু হইলে পর মোসলমানদের ন্যায় তাহার দাফন-কাফন ও জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পুত্র আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বাভাবিক পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া নাজাতের শেষ অছিলা ও চেষ্টা স্বরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে তাঁহার স্বীয় জামা প্রদানের ও জানাযার নামায পড়াইবার আবেদন করিলেন। দয়ার সাগর এবং স্নেহ মমতার মূর্ত্তপ্রতীক রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রে অসীম ও তুলনাবিহীন দয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ঐ মোনাফেক সরদারের সমস্ত অপকর্ম্ম হজম করিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রের আবেদনে তাহার জানাযার নামায পড়াইতেও সম্মত হইলেন। কারণ, তখনও আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হয় নাই। প্রথম আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল এবং উহাতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ ছিল না। অবশ্য উহার মূল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোনাফেকদের জন্য জানাযার নামায তথা এস্তেগফার করা বাহুল্য বুঝা যাইতেছিল এবং বাহুল্য কাজ না করাই চাই; তাই ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর প্রতি দ্বীনী ও ইসলামী আক্রোশে ক্রুদ্ধ হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন এবং এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু যেহেতু এই আয়াতে স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞার কোন শব্দই ছিল না বরং আয়াতের বাহ্যিক মর্ম্ম শুধু এতটুকু ছিল যে, মোনাফেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বিফল হইবে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্ষান্ত না হইয়া নামায পড়ার প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার দয়ার সাগরে বান ডাকিয়া উঠিল—তিনি ইহাও বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তিনি ইহাদেরে ক্ষমা করিবেন না।" অতএব আবশ্যক হইলে আমি সত্তর বারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি কোনরূপ সাফল্যের আশা দেখা যায়। এই বলিয়া তিনি নামায পড়িলেন, তৎপর দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হইল এবং মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে জানাযার নামায, দোয়া-এস্তেগফার স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইল।

৬৬৪। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর মৃতদেহ তাহার গর্ত্তে নামাইবার পরক্ষণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় পৌঁছিলেন এবং তাহাকে গর্ত্ত হইতে উঠাইবার আদেশ করিলেন। তাহাকে উঠান হইল; হযরত (দঃ) তাহাকে স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার উপর থুতনী দিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় জামাও তাহাকে কাফনে পরাইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিধানে একত্রে দুইটি জামা ছিল; আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে বলিয়াছিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার চর্ম্ম স্পর্শিত জামাখানা আমার পিতাকে (কাফনে) পরাইবার জন্য দিবেন।

বদর যুদ্ধে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) বন্দী হইয়াছিলেন; তাঁহার গায়ে কাপড় ছিল না; আবদুল্লাহ ইবনে উবাই স্বীয় জামা তাঁহার গায়ে পরাইয়াছিল, (অন্য কাহারও জামা আব্বাসের গায়ের পরিমাপে ছিল না।) তাহার সেই উপকার পরিশোধেই হযরত (দঃ) স্বীয় জামা তাহার কাফনে দিয়াছিলেন; যেন তাহার উপকারের বোঝা হযরতের উপর থাকিয়া না যায়।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে যে সব সহানুভূতি-সুলভ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার কারণ এক ত হযরতের স্বাভাবিক অসাধারণ অমায়িকতা ও উদারতা, আর দ্বিতীয়তঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ছেলে একনিষ্ঠ মোসলমান আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনস্তুষ্টি সাধন।

প্রয়োজনে এক কাপড়েই দাফন দিবে

৬৬৫। হাদীছ :—আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) ধনাঢ্য ছাহাবী ছিলেন, একদা তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতার সমাপনান্তে তাঁহার সম্মুখে খাবার উপস্থিত করা হইলে, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মোছয়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) যিনি আমার চেয়ে বড় মর্ত্তবার ছিলেন, যখন তিনি শহীদ

হইলেন তখন তাঁহার একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্দারা তাঁহার পূর্ণ শরীর আবৃত হইত না; পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত, মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত; সেই চাদরেই তাঁহার কাফন-দাফন করা হয়। হামযাহ (রাঃ) যিনি অনেক মর্য্যাদাবান ছিলেন; তাঁহার কাফন-দাফনও একটিমাত্র ছোট চাদরে করা হইয়াছে।

তিনি আরও বলিলেন, এসব উচ্চ শ্রেণীর ছাহাবীগণ ঐরূপ দরিদ্রাবস্থায় জীবন-যাপন করিতে ছিলেন, তৎপর এখন আমাদের জন্য কত বড় লম্বা-চৌড়া সুখ-শান্তির সুযোগ-সুবিধা দান করা হইয়াছে এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত, দ্রব্য-সামগ্রী অনেক কিছু দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে আমার ভয় ও আশঙ্কা হয় যে, আমাদের সুখ-ভোগের অংশ জাগতিক জীবনেই পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে না-কি? এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এমনকি রোযা থাকা সত্ত্বেও ইফতারের পরে আর ঐ খাদ্য গ্রহণ করিলেন না।

৬৬৬। হাদীছ ঃ—খাব্বাব (রাঃ) একদা বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে স্বীয় ঘর-বাড়ী, ধন-জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়াছি শুধু আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আশা করি আমাদের সেই আমলের ছওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কোন কোন ভাই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সেই ছওয়াবের কোন অংশই ইহজীবনে ভোগ করিয়া যান নাই, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়াই এই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম। আর কোন কোন ব্যক্তির জন্য ঐ আমলের প্রতিফল যেন পাকিয়া গিয়াছে এবং সে ইহজীবনেই উহার কিছু কিছু ভোগ করিতেছে; অর্থাৎ ধন-দৌলতের সুখ-সম্ভোগের জীবন লাভ করিয়াছে।

অতঃপর খাব্বাব (রাঃ) মোছয়া'ব ইবনে ও'মায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি যখন ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন তখন তাঁহার কাফনের জন্য একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্দারা মাথা আবৃত করিলে পা খুলিয়া যায় এবং পা আবৃত করিলে মাথা খুলিয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই আদেশ করিলেন যে, চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করিয়া দাও এবং পায়ের উপর এজ্‌খের (এক প্রকার ঘাস) বিছাইয়া ঢাকিয়া দাও।

মছআলাহ ঃ—দুইটি কাপড়ের সংস্থান হইলে দুই কাপড়েই কাফন দিবে।

জীবিতকালে স্বীয় কাফন তৈয়ার করিয়া রাখা

৬৬৭। হাদীছ ঃ—ছাহ্‌ল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা একজন নারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর লইয়া আসিল এবং

আরজ করিল, এই চাদরটি আমি নিজ হস্তে বুনন করিয়া আপনাকে হাদিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছি। নবী (দঃ) চাদরটি গ্রহণ করিলেন; তখন তাঁহার কাপড়ের আবশ্যকও ছিল। অতঃপর তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনীলেন, তাঁহার পরিধানে ঐ চাদরটি ছিল। এক ব্যক্তি চাদরটি দেখিয়া উহা পছন্দ করিল এবং বলিল, হুজুর। চাদরটি খুবই সুন্দর, ইহা আমাকে দান করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—তোমাকে দিয়া দিব। অতঃপর তিনি মজলিশ শেষে গৃহে যাইয়া চাদরটি ভাঁজ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলে ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি ভাল কাজ কর নাই; কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রয়োজন ও আবশ্যকাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন তবুও তুমি তাঁহার নিকট উহা চাহিয়াছ; (অথচ তুমি নিজেও ইহা জান যে, তিনি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। তখন) সে তাহার মনোগত মূল উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিল যে, চাদরটি পরিধান করার জন্য আমি প্রার্থী হই নাই, বরং এই জন্য ইহার প্রার্থী হইয়াছি যেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যবহৃত বস্ত্রে আমার কাফন তৈরী হয়।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তাহার উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; তাহার মৃত্যু হইলে ঐ চাদর দ্বারাই তাহার কাফন দেওয়া হয়।

নারীদের জন্য শবযাত্রায় যোগ দেওয়া

৬৬৮। হাদীছ ঃ—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ জোর তাকিদের সহিত না হইলেও (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়) আমাদিগকে (নারীগণকে) শববাহকের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করা হইত।

নারীদের জন্য শোক প্রকাশের নিয়ম

৬৬৯। হাদীছ ঃ—মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মে-আ'তিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহার একটি ছেলের মৃত্যু হইল, ঘটনার তিন দিন পর তিনি জরদ রঙ্গের এক প্রকার সুগন্ধি আনাইয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের (নারীদের) জন্য একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন নিষিদ্ধ।

৬৭০। হাদীছ ঃ—যয়নব বিনতে উম্মে ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবি উম্মে-হাবিবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পিতা আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। সংবাদ পাওয়ার তৃতীয় দিনে তিনি জরদ রঙ্গের সুগন্ধি আনিয়া হাতে ও মুখে মাখিলেন, এবং

বলিলেন, এখন সুগন্ধি ব্যবহারের আবশ্যক আমার ছিল না, কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে নারী আল্লার উপর ও কেয়ামতের উপর ঈমান রাখে, তাহার কর্ত্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া না থাকে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী বলেন, অতঃপর একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্য এক বিবি—যয়নব বিনতে ছাহ'শ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছিল। তিনিও ঐরূপ করিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে ঐরূপ হাদীছ বর্ণনা করিলেন।

কবর জেয়ারত করা

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পূর্ব্বে আমি (বিশেষ কারণ বশতঃ) কবর যেয়ারত করা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন কবর যেয়ারত করার আদেশ করিতেছি। কারণ, ইহা মানুষকে আখেরাত তথা পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অন্য এক হাদীছে আছে—ইহা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি মগ্নতা হইতে বিরত রাখে। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কবর যেয়ারত করিও; কারণ ইহা মানুষকে মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবশ্য নারীদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতা ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, তিরমিজি শরীফের হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কবর যেয়ারতে যাতায়াতকারিণী নারীদের প্রতি আল্লার লা'নত ও অভিশাপ রহিয়াছে।

কাজেই নারীদের কবর যেয়ারতে আদৌ তৎপর হওয়া চাই না। যদি কোন আপনজনের কবর যেয়ারতের প্রতি বিশেষ আবেগ জন্মে, তবে প্রথমতঃ—কদাচিৎ এবং অতি অল্প সময়ের জন্য যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ণমাত্রায় ধৈর্য্য ও ছবরের সহিত যাওয়া চাই। তৃতীয়তঃ—পর্দ্দা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। নতুবা উল্লিখিত হাদীছ অনুসারে আল্লাহ তায়ালার অভিশাপে অভিশপ্ত হইতে হইবে।

৬৭৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথাও যাইতে ছিলেন; পথিমধ্যে দেখিলেন—একটি স্ত্রীলোক একটি কবরের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে

বলিলেন, খোদাকে ভয় কর এবং ধৈর্য্যধারণ কর। স্ত্রীলোকটি (রসুলুল্লাহ (দঃ) কে চিনিত না, তাই সে) উত্তর করিল, আপনি আমাকে কিছু বলিবেন না; কারণ, আপনি ত আমার দুঃখপ্রাপ্ত হন নাই এবং উহা অনুভব করিতে পারিবেন না। অতঃপর কোন এক ব্যক্তি স্ত্রীলোকটিকে বলিল, তুমি যাহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়াছ তিনি নবী (দঃ)। (এতদশ্রবণে সে ভীষণ চিন্তিতা, ভীতা ও লজ্জিতা হইল।) অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে আসিল। সেখানে অন্যান্য রাজা-বাদশাদের ন্যায় দারওয়ান ও পাহারাদার ছিল না। সে হযরতের খেদমতে আরজ করিল, (আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম, আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম;) ঐ সময় আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, (আচ্ছা যাও, আমাকে চিনিতে না পারিয়া প্রতিউত্তর করাতে অসন্তুষ্ট নহি; কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ যাহাকে বলে উহার সময় চলিয়া গিয়াছে।) দুঃখপ্রাপ্তির প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলে উহাকেই প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ বলা যাইতে পারে। (কারণ, পরবর্ত্তীকালে স্বাভাবিক ভাবেই শোকাবেগ স্তিমিত হইয়া আনপা হইতেই ধৈর্য্য আসিয়া যায়)।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী (দঃ) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকটে উপস্থিত হওয়া তথা কবর যেয়ারত করায় নিষেধ করিয়াছিলেন না; সে কাঁদিতে ছিল, তাই ধৈর্য্যধারণের আদেশ করিয়াছিলেন।

কাহারও মৃত্যুতে ক্রন্দন করা

ক্রন্দন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার এই যে, দুঃখিত প্রাণের বেদনা ও যাতনায় চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু (মুখে শব্দ হয় না, হইলেও শুধু ক্রন্দনেরই শব্দ তা-ও উচ্চৈঃস্বরে নয় এবং) কোনরূপ বিলাপ খেদোক্তি বা মৃতের নানাপ্রকার গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করা হয় না। দ্বিতীয় প্রকার হইল উহার বিপরীত, অর্থাৎ বিলাপ ও খেদোক্তি করতঃ ক্রন্দন করা, মৃতের গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করতঃ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা।

প্রথম প্রকারের ক্রন্দনে কোন দোষ নাই, বরং উহা হৃদয়ের নম্রতা ও দয়ালু হওয়ার পরিচায়ক; যাহা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিয়া থাকেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় (৬৭২, ৬৭৩নং) হাদীছদ্বয়ে উল্লিখিত ক্রন্দনের উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর ক্রন্দনই।

দ্বিতীয় প্রকারের ক্রন্দন নাজায়েয ও হারাম, এমনকি যদি মৃত ব্যক্তির দ্বারা এই প্রথা তাহার পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে, অথবা সে নিজের জন্য ঐরূপ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়া থাকে, কিম্বা তাহার জীবিতকালে তাহার

পরিবারবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তবুও সে উহা নিষেধ করিয়া যায় নাই ; তবে এরূপ ক্রন্দনের দরুণ ঐ মৃত ব্যক্তিও বিশেষভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে এবং আজাব ভোগ করিবে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম (৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬ নং) হাদীছত্রয়ের তাৎপর্য্য ইহাই। তদুপরি এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য বোখারী (রঃ) আরও তিনটি দলীলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(১) আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (২৮পাঃ ১৯রুঃ)—قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

"হে মোমেনগণ! তোমাদের নিজকে এবং পরিবারবর্গকে দোযখ হইতে রক্ষা কর।"

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোযখে যাওয়ার কারণসমূহ তথা কুকর্ম্ম ও কুপ্রথা হইতে নিজে বিরত থাকা যেরূপ ফরজ ও অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্রূপ স্বীয় পরিবারবর্গকেও বিরত রাখার চেষ্টা করা ফরজ। সাধ্যানুযায়ী এই চেষ্টা না করিলে উক্ত ফরজ তরককারী পরিগণিত হইয়া শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

(২) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—......كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ

"তোমাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কর্তৃত্বের অধিকারী হয় ; স্মরণ রাখিও— প্রত্যেক কর্ত্তাকেই স্বীয় অধীনস্থদের কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী হইতে হইবে। গৃহস্বামী পরিবারবর্গের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী, তাই পরিবারবর্গের কার্য্যকলাপের জন্য তাহার দায়ী হইতে হইবে।"

(৩) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামাত পর্য্যন্ত সারা বিশ্বে যত না-হক খুন ও অন্যায় হত্যা অনুষ্ঠিত হইবে, আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল প্রত্যেকটি হত্যার জন্য গোনাহের ভাগী হইবে। কারণ, তাহার দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম অন্যায় নরহত্যা প্রথার সুত্রপাত হইয়াছিল।

উল্লিখিত দলীলত্রয়ের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে হারাম তরীকার ক্রন্দনের প্রথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে স্বীয় পরিবারবর্গকে উহা হইতে নিয়ত করিয়া না যাইয়া থাকে বা তাহার দ্বারা কিম্বা তাহারই সম্মতিক্রমে ঐ প্রথা পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে তবে মৃত ব্যক্তি ঐ হারাম কার্য্যের গোনাহের ভাগী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে।

৬৭২। হাদীছ ঃ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কন্যা (যয়নব) (রাঃ) তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমার একটি ছেলে অন্তিম অবস্থায় পতিত হইয়াছে ; আমার অনুরোধ—আপনি একটু তশরীফ আনিবেন। নবী (দঃ) তদুত্তরে সালাম বলিয়া

পাঠাইলেন যে, সব কিছু একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই দান করিয়া থাকেন, উহা হইতে যতটুকু উঠাইয়া নেন তাহা তাঁহারই প্রদত্ত বস্তু উঠাইয়া নেন। তদুপরি জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবই (নির্দ্ধারিত) সময় অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, এ-বিষয়ে (মনক্ষুণ্ণ বা শোক-বিহ্বল না হইয়া) ধৈর্য্যধারণ কর এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুঃখ-বেদনার ছওয়াবের প্রতীক্ষা কর। নবী-কন্যা স্বীয় পিতাকে পুনরায় এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আসিবেন। এবার রসুলুল্লাহ (দঃ) কয়েকজন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষাণাৎ শিশুটিকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন তাহার আত্মা ধড়ফড় করিতেছিল যেন এখনই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন হযরতের সঙ্গী সায়া'দ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, ইহা কি? ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)। রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, ইহা দয়া; আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে "দয়া" প্রদান করিয়াছেন; যাহারা খোদাপ্রদত্ত ঐ দয়াকে স্বীয় চরিত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিকশিত করিয়া থাকে সেই দয়ালু ব্যক্তিগণের প্রতিই আল্লাহ তায়ালাও দয়াবান হইয়া থাকেন।

৬৭৩। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা এক নবী-নন্দিনীর দাফন কার্য্যে উপস্থিত ছিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কবরের কিনারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অদ্য রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গম করে নাই। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, আমি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকেই কবরে নামিতে বলিলেন। তিনি শব রাখিতে কবরে নামিলেন।

৬৭৪। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের ক্রন্দনের দরুন মৃত ব্যক্তি আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

৬৭৫। **হাদীছ:**—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি স্বীয় পরিবারবর্গের কোন কোন ক্রন্দনের দরুণ আজাব ভোগ করে।

৬৭৬। **হাদীছ:**—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, স্মরণ রাখিও, আমার প্রতি মিথ্যারোপ অন্য কাহারও প্রতি মিথ্যারেপের ন্যায় নহে; যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার প্রতি মিথ্যারোপ করিবে অনিবার্য্যরূপে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

মুগিরা (রাঃ) বলেন, (উক্ত হাদীছ জানা ও শুনা সত্ত্বেও বলিতেছি—) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার মৃত্যুতে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা হইবে তাহাকে ঐ ক্রন্দনের দরুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আলোচিত ক্রন্দনের দুই প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার ক্রন্দনের বিষয়ে যদি মৃত ব্যক্তি কোন প্রকার দোষী হয় অর্থাৎ তাহার দ্বারা ঐ প্রথা তাহার পরিবারবর্গে প্রচলিত হইয়াছিল বা সে তাহার জন্য এইরূপ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়াছিল কিম্বা তাহাদের পরিবারে এই প্রচলন ছিল তবুও সে উহা নিষেধ করে নাই ইত্যাদি; তবে সে বস্তুতঃ গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি সে এ বিষয়ে দোষক্রটি হইতে মুক্ত হয়, তবে সে গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে না বটে, কিন্তু স্বীয় পরিবারবর্গের হারাম তরীকায় ক্রন্দনের দরুণ তাহার আত্মা অনুতপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিবে। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে এরূপও হয় যে, ক্রন্দনকারীণীগণ যখন বিলাপ-সুরে মৃত ব্যক্তির গুণ-গান করিতে থাকে এবং স্বভাবতঃই অনেক কিছু অত্যুক্তি, অতিরঞ্জিত এবং অসম্ভব উক্তিও করিয়া ফেলে, তখন ফেরেশতাগণ ধমক ও ভৎর্সনা স্বরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন সত্যই কি তুমি এরূপ ছিলে? এভাবের নিন্দাসূচক প্রশ্নবলীর দ্বারা মৃত ব্যক্তি দুঃখ অনুভব করিবে। তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ ইত্যাদি কিতাবের কয়েকখানা হাদীছ দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে। (ফতহুল-বারী)

এতদ্দৃষ্টে মৃত ব্যক্তির প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল তাহাদের জন্য এসব কার্য্যকলাপ হইতে দূরে থাকাই প্রকৃত সহানুভূতির পরিচায়ক হইবে।

৬৭৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদী নারীর কবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি তাহার আত্মীয়বর্গের ক্রন্দন শুনিয়া বলিলেন, ইহারা তাহার জন্য কাঁদিতেছে, অথচ সে কবরের মধ্যে ভীষণ আজাবে আক্রান্ত হইয়াছে।

মছআলাহ ঃ— নাজায়েষ রূপে ক্রন্দনরত ব্যক্তিকে সাধ্যমতে নিষেধ করা এবং বাধা দেওয়া কর্তব্য। (২৭৪ পৃঃ ৬৭১ হাদীছ)

শোক প্রকাশে কয়েকটি অপকর্ম্ম

৬৭৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শোক প্রকাশে মুখের উপর, কপালের উপর থাপ্পর মারিবে (খাম্‌চি কাটিবে) বা খেদোক্তি, বিলাপ—

অন্ধকার যুগের রীতি-নীতিতে নিজের মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদির অশুভ আহ্বান করিবে সে আমাদের তথা ইসলামের তরীকা বহির্ভূত।

● কোন কোন হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এসব অপকর্ম্মকারিণীদের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন। (ফতহুল বারী)

● খালেদ ইবনে ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার আত্মীয়বর্গ কাঁদিতেছিলেন তখন কোন এক ব্যক্তি আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ)কে জানাইল এবং ক্রন্দনকারিণীগণকে নিষেধ করিতে বলিল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, তাহাদিগকে কাঁদিতে দাও, যাবৎ ধুলা-বালী না ছিটায় বা চীৎকার ও হুঙ্কার না দেয়।

কাহারও মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করা

৬৭৯। **হাদীছঃ**—সায়া'দ ইবনে আবি ওয়াকাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালীন মক্কা শরীফে থাকাবস্থায় আমি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকিতেন। একদা আমি আরজ করিলাম, আমার রোগ সঙ্কটময়, আমার অনেক ধন-সম্পত্তি আছে, আমার কোন ছেলে সন্তান নাই; আমার ইচ্ছা হয়, আমি স্বীয় ধন-সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ ছদকা (করার অছিয়ত) করিয়া যাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিলেন। আমি আরজ করিলাম, অর্দ্ধাংশ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না, বরং এক তৃতীয়াংশ—ইহাই অধিক। তুমি স্বীয় ওয়ারেসদিগকে স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাও, ইহা তাহাদিগকে দুরাবস্থার সম্মুখীন রাখিয়া যাওয়া হইতে উত্তম। (ছদকা করাতেই ছওয়াব সীমাবদ্ধ নহে;) স্মরণ রাখিও—আল্লার সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কিছু খরচ করিবে উহাতেই তোমার ছওয়াব হাসিল হইবে, এমনকি (আল্লাহ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য—স্বীয় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খাতিরে) স্ত্রীর মুখের প্রতিটি লোকমার সংস্থান করাতেও তোমার ছওয়াব হইবে।

অতঃপর আমি আক্ষেপ করিয়া বলিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)। মনে হয়, আমি আমার সঙ্গীগণের সহিত প্রিয় মদীনায় আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না, (স্বীয় দেশ মক্কাকে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন এখানে মৃত্যু হইয়া এখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে।) রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—না (এখন তোমার মৃত্যু হইবে না,) তুমি আরও বাঁচিয়া থাকিয়া যত অধিক নেক আমল করিবে তদ্দারা তোমার মর্ত্তবা বাড়িতে থাকিবে। আমি আশা করি তুমি আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবে। তোমার দ্বারা অনেক লোকের (তথা মোসলমনদের) সাহায্য হইবে এবং অনেক লোকের (তথা কাফেরদের) ধ্বংস সাধিত হইবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীগণের জন্য দোয়া করিলেন—اللهم امض لاصحابى هجرتهم। "হে আল্লাহ! ছাহাবীগণের হিজরত (—তোমার সন্তুষ্টির জন্য দেশত্যাগ)কে চিরতরে বজায় রাখ, (কোন সময় ও কোন রকমেই) তাহাদের হিজরত বানচাল না হয়—তাহাদের অবস্থার অবনতি না ঘটে।"

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সা'য়াদ ইবনে খাওলা (রাঃ) ছাহাবীর মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মক্কা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—যেই দেশ (মক্কা নগরী)কে একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ছাহাবীগণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই দেশকে পুনরায় গ্রহণ করা দুরের কথা প্রয়োজনের অধিক এক মূহূর্ত্ত সেখানে অবস্থান করাও ছাহাবীগণ কোন মতেই পছন্দ করিতেন না। এমনকি ক্ষমতা বহির্ভূত মৃত্যু-আক্রান্ত হইয়া সেখানে থাকিয়া যাওয়াকে পর্য্যন্ত মনক্ষুণ্ণকারী গণ্য করা হইত।

শোক প্রকাশে মাথার চুল ফেলিয়া দেওয়া নিষেধ

৬৮০। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) রোগাক্রান্ত হইয়া একদা মুর্চ্ছিত অবস্থায় কোনও এক আত্মীয়ের কোলে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, এই সময় তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সেই অবস্থায় তিনি বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেরূপ ব্যক্তির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন আমিও তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করি; (শোকাভিভূত হইয়া) যে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কাঁদে, মাথা মুড়িয়া ফেলে, জামা-কাপড় ফাড়িয়া ফেলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার প্রতি স্বীয় সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।

কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া

৬৮১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর শাহাদাৎ-সংবাদ পাইলেন তখন তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন; আমি (আয়েশা) দরওয়াজার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জানাইলেন যে, জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মহিলাগণ কাঁদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। দ্বিতীয়বার আসিয়া ঐ ব্যক্তি অভিযোগ করিল, তাহারা আমার নিষেধ মানিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও বলিয়া দিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় আমল দেয় নাই।

(যেহেতু তাহারা কোনরূপ সীমা অতিক্রম করে নাই, অথচ সদ্য শোকাবিষ্টা ছিল—যখন ক্রন্দন আসা অতি স্বাভাবিক, তাই ঐ ব্যক্তির এরূপ পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) (বিরক্তি স্বরূপ) বলিলেন— (যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে) তাহাদের মুখ মাটি-চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আস।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শোকাবস্থায় বার বার বিরক্ত করায় আমার ক্রোধ আসিয়া গেল। আমি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম, আল্লার রসুল যাহা বলেন তাহা পূর্ণ করার ক্ষমতা হয় না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি হইতে অব্যাহতিও দিতেছ না!

৬৮২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ঘটনায় সত্তর জন কোরআন বিশারদ ছাহাবী একদল বিশ্বাসঘাতক দস্যুর হাতে শহীদ হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত ঐ দস্যুদের প্রতি অভিশাপ করতঃ নামাযের মধ্যে দোয়া কুনুত পড়িলেন এবং এত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, অন্য কোন সময় তাঁহাকে ঐরূপ দেখি নাই।

শোকাবস্থায় শোকপ্রকাশ হইতে না দেওয়া

মোহাম্মদ ইবনে কায়া'ব (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি খারাব ধারণা পোষণ এবং মুখে খারাব কথা বলা—ইহা শোক নহে, বরং ইহা ত অধৈর্য্য ; যাহা গোনাহ। (বস্তুতঃ "শোক" হইল—শুধু মনের বেদনা ও ব্যথা।)

৬৮৩। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ছেলে অসুস্থ ছিল। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহিরে কোথাও গিয়াছিলেন—এমতাবস্থায় ছেলেটি প্রাণ ত্যাগ করিল। আবু তালহার (রাঃ) স্ত্রী (ভাবিল, স্বামী রোযা অবস্থায় বাহিরে গিয়াছেন, ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিবেন সেই মুহূর্ত্তে ছেলের মৃত্যুর কথা জ্ঞাত হইলে কোন ক্রমেই খানা-পানি গ্রহণ করিবেন না ; বেহাল হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি) মৃত ছেলেটির গোসল দান ও কাফন পরান সম্পন্ন করিয়া উহাকে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটির অবস্থা কিরূপ? তাঁহার স্ত্রী উত্তর করিলেন—সে এখন সুস্থির ও শান্ত আছে ; আশা করি সে এখন আরামেই আছে। আবু তাল্‌হা (রাঃ) স্ত্রীর উত্তরকে বাহ্যিক অর্থে সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণ শান্তির সহিত রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গম করতঃ ভোরবেলা গোসল করিয়া যখন ঘর হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ স্পষ্টরূপে জানাইলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িলেন

এবং ছেলে ও স্ত্রীর সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) (তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধি ও সীমাহীন ধৈর্য্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া দোয়া করিলেন এবং) বলিলেন —আশা করি আল্লাহ তোমাদের এই রাত্রি-যাপনে বিশেষ বরকত দান করিবেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়া ও সুসংবাদ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল; সেই উপলক্ষেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু তাল্‌হা জন্মগ্রহণ করিলেন। একজন মদীনাবাসী ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—ঐ স্ত্রীর পক্ষে আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৯টি সন্তান হইয়াছিল; তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কোরআন বিশারদরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

শোক প্রাপ্তির প্রথম ভাগে ছবর ও ধৈর্য্যের ফজিলত

শোক ও দুঃখ-কষ্টে ছবর ও ধৈর্য্যধারণের ফজিলত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ٥

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ - وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ٥

"যাহারা শোক ও দুঃখ-কষ্ট পৌঁছিলে এই ভাবিয়া ধৈর্য্যধারণ করে যে, আমরা সকলেই আল্লার এবং আমাদের সকলেরই আল্লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে—ঐ সকল লোকদের প্রতি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ (Thanks) এবং বিশেষ রহমত ও করুণা, আর (এই স্বীকৃতি যে,) তাহারাই হেদায়েত ও সৎপথের উপর।" (২ পাঃ ৩ রুঃ)

এই আয়াতে ছবর ও ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য তিনটি সুসংবাদ রহিয়াছে— (১) আল্লার তরফ হইতে ধন্যবাদ (Thanks)। (২) আল্লার বিশেষ রহমত ও করুনা। (৩) হেদায়েত ও সৎপথের উপর হওয়ার স্বীকৃতি। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথম দুইটি ত উত্তম সংবাদ আছেই তৃতীয়টি তথা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক স্বীকৃতি সৎপথের পথিক হওয়ার—ইহাও আর একটি উত্তম সুসংবাদ।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ......

"দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সহজ সুলভ হওয়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ কর ছবর—ধৈর্য্য ও নামাযের; নিশ্চয় ছবর ও নামায কঠিন কাজ, কিন্তু যাহারা আল্লার সম্মুখে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখিয়া আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগরিত রাখে

তাহাদের জন্য উহা কঠিন থাকে না” (১ পাঃ ৫ রুঃ)। এই আয়াতের মর্ম্ম এই যে, ছবর ও ধৈর্য্য এত বড় রত্ন যে, ইহার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সহজ ও সুলভ হয়।

এইভাবে কোরআন হাদীছে ছবর ও ধৈর্য্যের যত ফজিলত ও উপকার বর্ণিত হইয়াছে—সবই একমাত্র ঐ ছবর ও ধৈর্য্যের যাহা শোকের প্রথম আঘাতেই অবলম্বন করা হয়। বস্তুতঃ ছবর এবং ধৈর্য্য একমাত্র উহাই ; কারণ সময়ের অতিক্রমে স্বভাবতঃই শোক স্তিমিত হইয়া আসে, এমনকি বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তখন আর ছবর ও ধৈর্য্য অবলম্বনের কোন অর্থ থাকে না। অতএব একমাত্র শোকের প্রথম আঘাত হইতে ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ করিলেই ফজিলত ও উপকার লাভ হইতে পারে। আনাছ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ৬৭১ নং হাদীছে হযরত নবী (দঃ) اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى “ছবর হয় শোকের প্রথম আঘাতে” বলিয়া উক্ত তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শোক শব্দ মুখে উচ্চারণ করা

৬৮৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু সাইফ্ কাইনের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তির গৃহেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশু পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) প্রতিপালিত হইতে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পুত্র ইব্রাহীমকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন এবং বিশেষরূপে আদর করিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় একদিন ঐরূপে উপস্থিত হইলেন, ঐ দিন ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। আবদুর রহমান ইবনে আ’উফ ছাহাবী বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনিও······(কাঁদেন)? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, হে ইবনে আ’উফ! ইহা দয়ার নিদর্শন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় অশ্রু বর্ষণপূর্ব্বক বলিলেন, নয়নে অশ্রু, প্রাণে বেদনা ; কিন্তু মুখে আল্লার অসন্তুষ্টির কোনও শব্দ উচ্চারিত হইবে না। হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত।

রোগীর নিকট বসিয়া কাঁদা

৬৮৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়া’দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) অন্তিমশয্যায় পতিত হইলেন। একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিনজন ছাহাবীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, না—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরতকে কাঁদিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—স্মরণ রাখিও, নয়নের অশ্রু ও প্রাণের বেদনার দরুণ আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না, কিন্তু মুখের দরুণ শাস্তি দিবেন (যদি ক্রন্দনে বা খেদ প্রকাশে শরীয়ত বিরোধীরূপে উহাকে পরিচালনা করা হয়) বা রহমত নাযেল করিবেন (যদি উহার দ্বারা ভাল কথা বাহির হয়, যেমন—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন" বলা।)

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—স্মরণ রাখিও, (শরীয়ত বিরোধীরূপে) ক্রন্দনকারী শুধু নিজেই শাস্তি পাইবে না, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিও (ঐরূপ) ক্রন্দনে শাস্তি ভোগ করিবে।

৬৮৬। **হাদীছ**ঃ—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (কতিপয় মহিলা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বায়আ'ত তথা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকালে তিনি বিশেষরূপে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমরা কাহারও মৃত্যুতে বিলাপের ক্রন্দন করিব না।

জানাযা আসিতে দেখিলে দাঁড়াইয়া যাইবে

৬৮৭। **হাদীছ**ঃ—আমের ইবনে রবিয়া (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি জানাযা আসিতে দেখে তখন যদি সে উহার সঙ্গে যাইতে না পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে দাঁড়াইয়া থাকা, যাবৎ উহা অতিক্রম করিয়া না যায় বা নামাইয়া রাখা না হয়।

৬৮৮। **হাদীছ**ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন জানাযা দেখ তখন দাঁড়াইয়া যাও এবং যে ব্যক্তি উহার সঙ্গে চলিবে, উহা নামাইয়া না রাখা পর্য্যন্ত সে বসিবে না।

৬৮৯। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি জানাযা আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল; উহা দেখিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা আরজ করিলাম—ইহা ইহুদীর জানাযা, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! তিনি বলিলেন, যখন কোন জানাযা দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে।

৬৯০। **হাদীছ**ঃ—আবদুর রহমান ইবনে লায়লা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাহ্‌ল ইবনে হোনাইফ (রাঃ) এবং কায়স ইবনে সায়াদ (রঃ) একদা একস্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল, ইহা একজন (অমোসলেম) জিম্মির জানাযা। তাঁহারা উভয়েই বর্ণনা করিলেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল—ইহা একজন ইহুদীর জানাযা; তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, প্রাণী নয় কি?

ব্যাখ্যা ঃ—কোন অমোসলমানের জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার হেতু কি তাহার প্রতিই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইহুদী হইলেও সে একটি প্রাণী ছিল এবং প্রাণী মাত্রের মৃত্যুই একটি ভয়-ভীতির বিষয়; অতএব উহা দেখিয়া অটলভাবে ধীরস্থির হইয়া থাকা পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বরং যে কোন প্রাণীর মৃত্যু দেখিয়া স্বীয় মৃত্যুকে স্মরণ করতঃ শিহরিয়া উঠা উচিত। যেমন ইবনে মাজা শরীফের হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে—ان للموت فزعا মৃত্যু একটি ভয়জনক এবং শিহরিয়া উঠার বস্তু।

এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের জানাযা দেখিয়া উহার সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য; প্রত্যেক মুসলমানই জীবিতাবস্থায় সম্মানের পাত্র ও মৃত্যুর পরও সম্মানের অধিকারী।

জানাযার সহযাত্রীরা বাহকদের স্কন্ধ হইতে জানাযা নামাইবার পূর্ব্বে বসিবে না; কেহ বসিলে দাঁড়াইতে বলিবে

৬৯১। **হাদীছ ঃ**—সায়ীদ মাক্‌বুরীর পিতা কাইসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একটি জানাযার সহযাত্রী ছিলাম। আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং (মদীনার শাসনকর্ত্তা) মারওয়ান একত্রে হাত ধরিয়া ঐ সঙ্গে চলিতে ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে জানাযা রাখিবার পূর্ব্বেই বসিয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ আবু সায়ীদ (রাঃ) (শাসনকর্ত্তা) মারওয়ানের হাত ধরিয়া বলিলেন, উঠুন—দাঁড়াইয়া পড়ুন এবং আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, কসম খোদার—তিনি জানেন, নবী (দঃ) আমাদিগকে এইরূপ বসা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ)ও বলিলেন, আবু সায়ীদ (রাঃ) সত্যই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—অধিকাংশ আলেমের মতে জানাযা নামাইয়া রাখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহযাত্রীদের দাঁড়াইয়া থাকা মোস্তাহাব; বসিয়া পড়া মকরূহ। কোন কোন আলেম ওয়াজেবও বলিয়াছেন। এই সবই মৃত মোমেন ব্যক্তির সম্মানার্থে। মোমেন মোসলমান মৃত্যুর পরও সম্মান পাইবার অধিকারী। (ফতহুল-বারী, ৩—১৩৯)

জানাযা লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিবে

৬৯২। **হাদীছ ঃ**—عن ابی هريرة ان النبی صلی الله عليه وسلم قال

اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَاِنْ تَكُ

سِوَى ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জানাযা লইয়া দ্রুত চলিবে। কারণ, মৃত ব্যক্তি যদি নেক্কার হয় তবে তাহার জন্য নেয়ামত সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে; যথাসত্বর তাহাকে উহার জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। আর যদি সে বদ্‌কার হয় তবে ইহা একটি অতি জঘন্য বস্তু; যথাসত্বর উহাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে অপসারিত করিয়া দিতে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মছআলাহ :—শুধু পুরুষই সব বহন করিবে; নারীরা করিবে না। (১৭৫ পৃঃ)

মছআলাহ :—জানাযা নিয়া চলার সময় উহার সঙ্গীগণ জানাযার পেছনে চলিবে ইহাই অধিক উত্তম। অবশ্য (দ্রুত চলার কর্ত্তব্যে ব্যঘাত ঘটিলে) কিছু সংখ্যক লোক সম্মুখেও চলিলে উহাতে দোষ হইবে না। (শামী, ১—৮৩৪)

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে জানাযার সঙ্গীগণ! তোমরা জানাযার বিদায়-সম্মান প্রদর্শনকারী। (প্রয়োজনে) তোমরা উহার সামনে-পিছে, ডানে-বামে চলিতে পার।

অন্য একজন ছাহাবী বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গীগণ জানাযার কাছাকাছি চলিবে; এরূপ দুরে দুরে চলিবে না যে, উহার সঙ্গী বলিয়া মনে না হয়। (১৭৫ পৃঃ)

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযাকে তোমার সম্মুখে রাখ, তোমার দৃষ্টি উহার প্রতি নিবদ্ধ কর; উহা তোমার জন্য উপদেশ ও আখেরাতের স্মারক এবং তোমাকে শিক্ষাদানকারী।

মৃত ব্যক্তি কি বলিয়া থাকে?

৬৯০। **হাদীছ** :—ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ - فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ -

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, যখন মৃতদেহ শবাধারে রাখিয়া অন্যান্য পুরুষগণ উহাকে কাঁধের উপর বহন করিয়া চলিতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি যদি নেক্‌কার হয় তবে বলিতে থাকে— আমাকে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর কর। আর যদি সে বদ্‌কার হয় তবে সে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বিকট চীৎকারের সহিত বলিতে থাকে ইহারা এই নরাধমকে কোথায় লইয়া যাইতেছে ?

তাহার এই চীৎকার মানুষ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রাণীই শুনিতে পায়, মানুষ ঐ চীৎকার শুনিলে স্থির থাকিতে সক্ষম হইত না, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইত।

জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

● সাধারণ নামাযে মোক্তাদীগণ যেরূপ সুবিন্যস্ত ও সোজা কাতার বাঁধে জানাযার নামাযেও তদ্রূপ কাতার বাঁধিবে; এলোমেলোভাবে দাঁড়াইবে না। উপস্থিত লোকদের দ্বারা তিনটি বা তদুর্দ্ধে বেজোড় সংখ্যায় কাতার বাঁধিবে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছে বর্ণিত আছে, তিন কাতার লোক যাহার জানাযার নামায পড়ে, সেই নামাযীদের দোয়া তাহার জন্য অবশ্যই কবুল হয় এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া যায় (ফতহুল-বারী, ৩—১৪৫)।

● নাবালেগ ছেলেরাও জানাযার নামাযের জমাতে শামিল হইয়া নামায পড়িবে (১৭৭ পৃঃ)। ছেলেরা সকলের সঙ্গেই কাতারে দাঁড়াইতে পারে (১৭৬ পৃঃ)।

● জানাযার নামাযে রুকু-সেজদা নাই, কিন্তু ইহা নামাযই বটে; (নামাযের বিশেষ বিশেষ সাধারণ বিধান ইহাতেও প্রযোয্য। যথা—কথা বলা নিষিদ্ধ, তকবির বলিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং সালাম ফিরিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে। অজু ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না,) সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময় পড়া যাইবে না, তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে (প্রথম তকবীরে ত অবশ্যই উঠাইবে; অপর তিন তকবীরে ইচ্ছাধীন)।

● পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ইমামই জানাযার নামাযে ইমামতী করা উত্তম। জানাযার নামায এবং ঈদের নামায ঐরূপ নামায যাহার জমাত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং যদি আশঙ্কা হয় যে, অজুতে লিপ্ত হইলে জানাযার বা ঈদের নামাযের জমাত শেষ হইয়া যাইবে এমতাবস্থায় পানি থাকা সত্ত্বেও দ্রুততার জন্য তায়াম্মুম করিয়া জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য সম্পূর্ণ জমাত ছুটিবার আশঙ্কায় তাহা করা জায়েজ; অজু করিয়া কিছু অংশও পাওয়ার আশা থাকিলে অজু করিয়া শামিল হইবে। (শামী ১—২২৩)

● জানাযার নামাজের জমাত কিছু অংশ হইয়া যাওয়ার পর কেহ শামিল হইতে চাহিলে ইমামের তকবীরের অপেক্ষা করিবে; ইমাম যে কোন তকবীর

বলার সঙ্গে এই ব্যক্তি তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে এবং ইমামের ইহা কোন তকবীর তাহা জ্ঞাত থাকিলে সে অনুপাতেই দোয়া-দরুদ পড়িবে আর তাহা জ্ঞাত না থাকিলে তাহার তকবীরকে প্রথম গণ্য করিয়া ছানা তারপর দরুদ তারপর দোয়া পড়িবে। ইমামের সালামান্তে সে তাহার বাকী তকবীর আদায় করিবে। আর যদি ইমামের চার তকবীর শেষ করার পর সালামের পূর্ব্বক্ষণে উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তকবীর বলিয়া শামিল হইবে এবং ইমামের সালামান্তে তিন তকবীর বলিয়া সালাম করিবে (শামী ১—৮৩০, ৮৩১)। ইমামের সালা-মান্তে যে তকবীর আদায় করিবে উহাতে দোয়া-দরুদ পড়িবে যদি শবদেহ উঠাইয়া নেওয়ার আশঙ্কা না হয়। সেই আশঙ্কা হইলে শুধু তকবীর পূর্ণ করিবে (শামী, ১—৮১৪)।

ইবনুল-মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, রাত্রে-দিনে ছফরে ও বাড়ীতে সর্ব্বাবস্থায়ই জানাযার নামাযের চার তকবীর। ● জানাযার নামায ঈদগাহে জায়েয আছে এবং মসজিদেও জায়েয (১৭৭ পৃঃ ৬৫৫ হাঃ)। অবশ্য হানফী মজহাব মতে কোন রকম ওজর ব্যতিরেকে মসজিদে জানাযার নামায মকরূহ—অনেকে মকরূহ তানযীহ বলিয়াছেন। বৃষ্টিকে ওজর বলা হইয়াছে এবং জানাযার জন্য ভিন্ন জায়গা না থাকা বা সহজ সাধ্য না হওয়াকেও ওজর সাব্যস্ত করা হইয়াছে। চলাচলের সড়ক বা রাস্তা জানাযার নামাযের জায়গা গণ্য হইবে না যেহেতু উহা পাক-পবিত্র হওয়ার নিশ্চয়তা নাই, বরং নাপাক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; এমতাবস্থায় উহাতে জানাযার নামায শুদ্ধও নহে। শবদেহ মসজিদের বাহিরে রাখিয়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া হইলে হানফী মজহাব মতেও অনেকে মকরূহ নয় বলিয়াছেন। (শামী ১—৮২৭ + ৮২৯)

● হোমায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আনাছ (রাঃ) আমাদিগকে নিয়া জানাযার নামায পড়িলেন; তিনি ভুলবশতঃ তিন তকবীর বলিয়াই সালাম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্ঞাত করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কেবলামুখী অবস্থায়ই চতুর্থ তকবীর বলিলেন, তারপর পুনঃ সালাম ফিরিলেন। (১৭৬ পৃঃ) ● শবদেহ দাফন হওয়ার পর কবরের নিকটবর্ত্তী জানাযার নামায আদায় করা যায়; যদি নামায ছাড়া দাফন করা হইয়া থাকে। আর যদি জানাযার নামায হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মৃতের অলী তথা গার্জিয়ান শামিল ছিল না তবে গার্জিয়ান ইচ্ছা করিলে কবরের নিকট পুনঃ জানাযার নামায পড়িতে পারে। নবী (দঃ) প্রত্যেক মোসলমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গার্জিয়ান, তাই তিনি ক্ষেত্র বিশেষে ঐরূপ করিয়াছেন যেমন ৬৫৬নং হাদীছে এবং ৩০০নং হাদীছে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের নিকটবর্ত্তী নিয়মিত জানাযার নামায আদায় করার জন্য শর্ত্ত এই যে, শবদেহ ফাটিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই এরূপ অবস্থায় হইতে হইবে। দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে আর নিয়মিত জানাযার নামায আদায় হইতে পারে না।

দাফন কার্য্যে যোগদানের ছওয়াব

এই বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা ৪৩নং হাদীছে হইয়াছে। ● যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযার নামাযে শামিল হইলে তোমার কর্ত্তব্য আদায় হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলমান মৃতের জানাযার নামায এবং তাহার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ফরজে-কেফায়াহ—কিছু লোকে আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় হইয়া যায়। কিন্তু জানাযা আসিলে উপস্থিত লোকদের উপর মৃত মোসলমান ভাইয়ের প্রাপ্য হক তাহার জানাযার নামাযে শামিল হওয়া। নামাযে শামিল হইলে সেই বিশেষ হক আদায় হইয়া যায়। দাফনের জন্য জানাযার সঙ্গে যাওয়াও একটি হক বটে যাহার বয়ান ৬৫১ ও ৬৫২ নং হাদীছে হইয়াছে, কিন্তু এই হক নামাযে শামিল হওয়া অপেক্ষা হাল্‌কা। অবশ্য উহাতেও অনেক ছওয়াব রহিয়াছে যাহার বয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৪৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

● হোমায়দ ইবনে হেলাল (রঃ) বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই; অবশ্য শুধু নামায আদায় করিয়া চলিয়া গেলে সঙ্গে যাইয়া দাফন সম্পন্ন করা অপেক্ষা অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে।

জানাযার নামাযে ইমামের দাঁড়াইবার স্থান

৬৯৪। **হাদীছ ঃ**—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে একটি মহিলার জানাযার নামায পড়িয়াছি। সন্তান প্রসব সংক্রান্তে মহিলাটির মৃত্যু হইয়াছিল। নবী (দঃ) মহিলাটির মধ্য বরাবরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মছআলাহঃ—নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযার নামাযে ইমাম মৃতের বক্ষ্য বরাবর দাঁড়াইবেন।

জানাযার নামাযে আল-হামদু ছুরা পড়া

৬৯৫। **হাদীছ ঃ**—তাল্‌হা ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে জানাযার নামায পড়িলাম। তিনি উহাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের জানা উচিৎ, ইহা সুন্নতই বটে।

ব্যাখ্যা ঃ—জানাযার নামাযে প্রথম তকবীর বলিয়াই "ছানা" তথা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার দোয়া পড়া সুন্নত। ছুরা ফাতেহার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ

তায়ালা কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া প্রশংসার বর্ণনা রহিয়াছে, তাই উহাও অতি উত্তম "ছানা"। অতএব উহা পাঠে ছানা পড়ার সুন্নত অবশ্যই আদায় হইবে।

মছআলাহ ঃ—জানাযার নামাযের প্রথম তকবীরের পর "ছানা" পড়িতে হয়। ছানা অর্থ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা। ছুরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সুদীর্ঘ প্রশংসা রহিয়াছে, অতএব প্রথম তকবীরের পর ছানারূপে ছুরা ফাতেহা পাঠ করিলে দোষ নাই।

● হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, শিশুর জানাযার নামাযেও ছুরা ফাতেহা (বা ছানা) পড়িবে এবং (তৃতীয় তকবীরের পর) এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّاَجْرًا -

কবরকে সম্মুখে রাখিয়া বা কবরের উপর নামায পড়া কিম্বা কোন কবরকে কেন্দ্র করিয়া উহার প্রতি তা'জীম ও শ্রদ্ধা উদ্দেশ্যে উহাকে নামায স্থান করিয়া নেওয়া বা উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা

এই মছআলার বিষয়ে ইমাম বোখারী (রঃ) নামায অধ্যায়ে ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ২৭৭, ২৭৮ ও ২৭৯ নম্বরে তিনটি হাদীছ অনুদিত হইয়াছে। বক্ষমান অধ্যায়েও ইমাম বোখারী (রঃ) ১৭৭ এবং ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টিকে এস্থলে একটি পরিচ্ছদরূপে দেওয়া হইল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছ ছাড়াও এই বিষয়ে এস্থানে উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছও লক্ষ্যনীয়।

৬৯৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছেন, ইহুদ-নাছারাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকে সেজদার স্থান বানাইবার আশঙ্কা না থাকিলে উহা উম্মুক্ত রাখা হইত। আশঙ্কা হয়, উহাকে সেজদার স্থান করা হইবে! (লোকেরা উহাকে সেজদা করিবে, তাই উহাকে আবদ্ধ রাখা হয়।) ১৭৭ পৃঃ

পবিত্র ও বরকতের স্থানে সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করা

৬৯৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,) মূসা আলাইহেচ্ছালামের প্রতি মউতের ফেরেশতা আয্‌রাঈল (আঃ) প্রেরিত হইলে মূসা (আঃ) তাঁহাকে এমনি এক চপেটাঘাত করিলেন যাহাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। আয্‌রাঈল (আঃ) আল্লাহ

তায়ালার নিকট ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বন্দার প্রতি পাঠাইয়াছিলেন যিনি মৃত্যুবরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিয়া পুনরায় যাইবার আদেশ করিলেন এবং মূসা (আঃ)কে এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন যে, আপনি একটি বলদের পৃষ্ঠে হাত রাখুন, আপনার হাতের নীচে যতগুলি লোম ঢাকা পড়িবে ঠিক তত বৎসরের বয়স আপনাকে প্রদান করা হইবে।

আয্রাঈল ফেরেশতা তাহাই করিলেন। মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রব্ব! তত বৎসর বয়সের পর কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। তখন মূছা (আঃ) আরজ করিলেন, অবশেষে মৃত্যু যখন অনিবার্য্যই তাহা হইলে এখনই মৃত্যু সংঘটিত হউক। মূসা (আঃ) তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে বাইতুল-মোকাদ্দাসের অতি নিকটবর্ত্তী করিয়া দিন।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ)-এর উক্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহার সমাধি বাইতুল-মোকাদ্দাসের নিকটেই।) আমি তথায় থাকিলে তোমাদিগকে তাঁহার সমাধিস্থলটি দেখাইতে পারিতাম; রাস্তার এক পার্শ্বে লাল বর্ণ একটি টিলার নিকটে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা ঃ—নবীগণের মর্তবা অতিশয় উচ্চ ও অতি উর্দ্ধে, এমনকি বড় বড় ফেরেশতাগণও তাঁহাদের খাদেম স্বরূপ। বিশেষতঃ হযরত মূসা (আঃ) জালালী তবীয়তের অতি বিশিষ্ট নবী ও রসুল ছিলেন। বিশেষ কোন কারণেই তিনি আয্রাঈল ফেরেশতার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আয্রাঈল ফেরেশতা তাঁহার ঐ ব্যবহারে ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, প্রকৃত কথা তাহা নহে। সুতরাং এই বিষয়টিকে প্রকাশিত করিবার জন্যই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় আয্রাঈলকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং এত অসংখ্য বৎসর বয়সের সুযোগ দান করা সত্ত্বেও মূসা (আঃ) উহাকে তুচ্ছ মনে করতঃ নিজেই উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন এবং স্বেচ্ছায় তখনই মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মূসা (আঃ) আযরাঈলের সহিত কেন ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে কৈফিয়ত আল্লাহ তায়ালাই যখন তলব করেন নাই তখন সে বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া অনধিকার চর্চ্চা বই নহে।

শহীদের জন্য জানাযার নামায

৬৯৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কাফনের কাপড়ের অভাবে) ওহোদ-জেহাদের শহীদগনের দুই দুই

জনকে এক এক কবরে একটি চাদরের নীচে দাফন করিয়াছিলেন। দুই জনের মধ্যে যাহার কোরআন শরীফ অধিক কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইত তাঁহাকে প্রথমতে কবরে রাখিতেন। এইরূপে সকলের দাফন সমাপ্ত করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কেয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে রক্তাক্ত শরীরেই দাফন করার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে গোছল দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হয় নাই।* জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ও চাচাকে এক সঙ্গে একটি চাদরের নীচে দাফন করা হইয়াছিল, উভয়েই ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতার সঙ্গে এক কবরে যিনি দাফন হইয়া ছিলেন তিনি বস্তুতঃ তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন না, বরং তাঁহার পিতার বিশেষ বন্ধু ও ভগ্নিপতি ছিলেন। এখানে জাবের (রাঃ) মুরব্বি হিসাবে তাঁহাকে চাচা বলিয়াছেন, তাহার নাম আম্‌র ইবনুল জামুহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মছআলাহ ঃ—প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন কবর না করিয়া প্রশস্ত এক কবরে একাধিক সবদেহ রাখা যায়, তখন কোরআনের এল্‌ম যাঁহার বেশী তাঁহাকে প্রথমে রাখা হইবে।

৬৯৯। হাদীছ ঃ—ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ইহকাল ত্যাগের নিকটবর্ত্তী সময়ে) একদা ওহোদের শহীদানগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং জানাযার নামাযের ন্যায় তাঁহাদের কবরের নিকটবর্ত্তী নামায পড়িলেন (শহীদের মৃতদেহ অবিকৃতই আছে।)** অতপর মসজিদে আসিয়া মিম্বরে উপবিষ্ট হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষ হইতে (আখেরাতের পানে) তোমাদের অগ্রদুত স্বরূপ যাইতেছি; আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হইব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, (কেয়ামতের ভীষণ ময়দানে আমার উম্মতকে সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হাওজে-কাওছার বিশেষরূপে দান করিয়াছেন সেই) হাওজে-কাওছারকে বর্ত্তমান অবস্থাতে এখান হইতেই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি আরও বলিলেন, (স্বপ্নযোগে এবং নবীর স্বপ্ন অহী)

---

* হানফী মজহাব মতে শহীদের উপর জানাযার নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে; এ সম্পর্কে হাদীছে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জানাযার নামায পড়া হইয়াছিল না। রণাঙ্গণে মৃতের সংখ্যা বেশী থাকায় দশ দশ জনের নামায এক সঙ্গে পড়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

** কাহারও মতে হযরত (দঃ) নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদেই ওহোদের শহীদানগণের জন্য শুধু বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন, অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

আল্লার তরফ হইতে বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে। (অর্থাৎ অনতিকালের মধ্যেই বিশ্বের আধিপত্য এই উম্মতের করতলগত হইবে ;) তাই পুনঃ শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা করি না যে, তোমরা (অর্থাৎ মোসলেম সমাজ) ইসলাম ত্যাগ করতঃ মোশরেক— পৌত্তলিক হইয়া যাইবে। পরন্তু এই আশঙ্কা আমার ভিতরে অতি প্রবল যে, (দুনিয়ার ধন-সম্পদ তোমাদের উপর বিস্তৃত হইলে) তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া উহাতে মত্ত ও লিপ্ত হইতে থাকিবে, (এবং ধন-সম্পদে মত্ত হইয়া আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে, উহাতেই তোমাদের ধ্বংস সাধিত হইবে।)

মছআলাহঃ—শহীদ মৃতকে গোসল দিবে না ; রক্তাক্ত দেহে এবং রক্তাক্ত কাপড়েই দাফন করিবে। তাঁহার সম্মানার্থে কিছু নূতন কাপড়ও কাফনে দিবে।

কারণ বশতঃ মৃতদেহকে কবর হইতে বাহির করা

৭০০। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ওহোদের জেহাদের প্রস্তুতি হইল, আমার পিতা (জেহাদ আরম্ভবের পূর্ব্বেই) রাত্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার মনে হইতেছে, আমি এই জেহাদের সর্ব্বপ্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইব। তিনি আরও বলিলেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র আমার নিকট আর কেহ নাই। অতএব, আমার উপর যে সকল ঋণ আছে সেগুলি তুমি পরিশোধ করিবে ↑ এবং আমি তোমাকে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি, তুমি তোমার ভগ্নিদের প্রতি ভাল দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

পরদিন জেহাদ আরম্ভ হইলে সত্য সত্যই আমার পিতা প্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইলেন এবং তখনকার উপস্থিত ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাকে অন্য একজন শহীদের সঙ্গে এক কবরে দাফন করা হইল।

(জাবের (রাঃ) বলেন—) আমি ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না যে, আমার পিতা এক কবরের মধ্যে অন্যের সঙ্গে থাকুন ; তাই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পর কবর খুঁড়িয়া আমি আমার পিতাকে বাহির করিয়া লইলাম। দীর্ঘ ছয় মাস পর তাঁহার শব বাহির করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার দেহ দাফন করার দিন যেরূপ ছিল তখনও ঠিক তদ্রূপই আছে, কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই ; শুধু মাত্র এক কানের লতির মধ্যে সামান্য একটু দাগের ন্যায় দেখা যায়। অতঃপর আমি তাঁহাকে ভিন্ন একটি কবরে পুনরায় দাফন করিয়া দিলাম।

↑ জাবের (রাঃ) স্বীয় পিতার আদেশ ও অছিয়ত পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মো'জেযাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—আল্লার রাস্তায় জেহাদে যাঁহারা শাহাদৎ বরণ করেন তাঁহারা সাধারণ মৃতের ন্যায় নহেন, এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - بَلْ اَحْيَاءٌ.....

অর্থ—যাঁহারা আল্লার রাস্তায় শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, তোমরা কখনও তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিও না, বরং তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা বিশেষরূপে নেয়ামত ও সামগ্রী উপভোগ করিতেছেন।

আল্লার রাস্তায় শহীদগণ যে মৃত নহেন, তাহার একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে, শহীদের দেহ মাটিতে নষ্ট হয় না। যেমন কোনও জীবিত ব্যক্তি মাটির উপর শুইয়া থাকিলে তাহার দেহকে মাটি গ্রাস করিবে না। উক্ত প্রতিক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ নমুনা ছহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত আলোচ্য ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হইল।

জাবের (রাঃ) ছাহাবীর পিতা আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং তাঁহার বন্ধু সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (রঃ) "মোয়াত্তা" নামক কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এই শহীদদ্বয়কে দাফন করার দীর্ঘ ছয়চল্লিশ বৎসর পর পার্ব্বত্য বন্যার স্রোত হইতে রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার তাঁহাদিগকে কবর হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল; তখনও তাঁহাদিগকে এইরূপ পাওয়া গিয়াছিল যেন এইমাত্র দাফন করা হইয়াছে।

নাবালেগ বালক ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহা শুদ্ধ

● নাবালেগ বালক ইসলামকে বুঝিয়া গ্রহণ করিলে তাহার ইসলাম শুদ্ধ হইবে; সর্ব্বক্ষেত্রে সে মোসলমান গণ্য হইবে। এমতাবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইলে তাহার নিয়মিত কাফন-দাফন এবং জানাযার নামায পড়া হইবে। এজন্যই যেখানে অমোসলেমদেরকে ইসলাম বুঝাইয়া ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান হয় সেখানে বুঝমান নাবালেগ বালককেও ইসলামের আহ্বান জানাইতে হইবে। বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, মাতা-পিতার একজন মোসলমান হইয়াছেন, অপর জন অমোসলেম—তাহাদের মধ্যে নাবালেগ সন্তানরা আইনগত অধিকারে মোসলমান জনের প্রাপ্য হইবে এবং সেই নাবালেগদের কেহ মারা গেলে তাহার প্রতি মোসলমান মৃতের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইসলামের বিধান।

ইমাম ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, মোসলমান মাতার অবৈধ গর্ভজাত সন্তানও মোসলমান পরিগণিত; সেই সন্তানও জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে। তদ্রূপ অমোসলেম মাতার গর্ভে জন্ম

লাভকারী সন্তান মোসলমান গণ্য হইবে যদি পিতা মোসলমান হয় (১৮১ পৃঃ)। কারণ, ইসলামের প্রাবল্য ও উপরিস্থতা সর্ব্বক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এমনকি ইমাম যুহরী ও ইমাম মালেকের মতে কোন মোসলমান পুরুষ অমোসলমান নারীর সহিত জেনা করায় সন্তানের জন্ম হইলে সেই সন্তানও মোসলমানদের মধ্যে পরিগণিত হইবে (ফতহুল-বারী, ৩—১৭২)।

মোসলমান পরিগণিত শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইলে যদি আত্মার সহিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোনও নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহার জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফন অবশ্যই করিতে হইবে। আত্মার সহিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোনই নিদর্শন অনুভূত না হইয়া থাকিলে তাহার জানাযার নামায পড়া হইবে না (এবং নিয়মিত কাফনের প্রয়োজন নাই ; একটি কাপড়ে জড়াইয়া দাফন করা হইবে, চাপামাটি দেওয়া যাইবে না) (১৮১ পৃঃ)।

৭০১। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এক ইহুদী বালক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিত। সে অন্তিমশয্যায় পতিত হইলে নবী (দঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি মোসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার প্রতি তাকাইল, তাহার পিতাও তাহাকে এই পরামর্শই দিল যে হযরতের আদেশ গ্রহণ কর। সে ইসলাম কবুল করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, الحمد لله الذى انقذه من النار "আল্লাহ তায়ালার শোকর ও প্রশংসা তিনি তাহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করিলেন" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় কাফের কলেমা পড়িলে গ্রাহ্য হইবে

৭০২। **হাদীছ** ঃ—মোছাইয়্যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আবু তালেবের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই আবু জহ্‌ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী-উমাইয়া কাফের সরদারদ্বয়ও তাহার নিকটে বসিয়া ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, চাচাজান! আপনি لا اله الا الله কলেমার স্বীকারোক্তি করুন, তবেই আমি উহা লইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার জন্য দাঁড়াইতে পারিব এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইব। তখন আবু জহ্‌ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া বলিল, হে আবু তালেব! তুমি কি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে স্বীয় পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে পুনঃ পুনঃ দ্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কাফেরদ্বয় বার বার তাহাকে ঐ কথা বলিতে লাগিল। এমনকি আবু তালেবের

শেষ বাক্য এই ছিল যে, সে আবতুল মোত্তালেবের ধর্ম্মের উপরেই আছে এবং لا اله الا الله কলেমা বলিতে অস্বীকার করিল। আবু তালেবের এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম—যাবৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিষেধ না করিবেন আমি পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাইব। এই উপলক্ষেই এই আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ......

অর্থ—নবী এবং মোমেনদের জন্য অনুমতি নাই, তাহারা কাফের মোশরেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়—তাহার জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার (তথা কাফের অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার) পর (১১ পারা ৩ রুকু)

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি সারা জীবন কাফের-মোশরেক থাকিয়া মৃত্যুক্ষণে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক কলেমার (বা উহার মর্ম্মের) স্বীকৃতি জানাইলে সে মোসলমানরূপে জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে।

● ঈমান ও ইসলামহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জন্য জানাযার নামায পড়া নিষিদ্ধ; ঐরূপ ব্যক্তির জন্য কোন ভাল দোয়া করাও নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বিবৃতি। আয়াতটি উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের উপর ডালা ইত্যাদি গাড়িয়া দেওয়া

বোরায়দা আসলামী (রাঃ) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, তাঁহার কবরে যেন দুইটি ডালা পুঁতিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়টি ১৫৯নং হাদীছেও প্রমাণিত আছে।

আত্মহত্যাকারীর অবস্থা কি হইবে ?

৭০৩। **হাদীছ ঃ**—ছাবেত ইবনে জাহ্‌হাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্ম্মী হওয়ার শপথ করিবে (তাহার এত বড় গোনাহ হইবে যেন) সে প্রকৃতই বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছে* এবং যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবে সে তাহার এই কর্ম্মের দরুন জাহান্নামের অগ্নিতে শাস্তি ও আজাব ভোগ করিবে।

৭০৪। **হাদীছ ঃ**—জুন্দুব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির শরীরে ঘা ছিল; যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিল। তাহার এই কার্য্যে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

* যেমন—কেহ বলিল, আমি অমুক কাজ করি নাই; যদি করিয়া থাকি তবে আমি ইহুদী বা নাছরানী বা হিন্দু বা কাফের, অথচ সে উহা করিয়াছে এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করিতেছে।

বন্দা (তাহার চেষ্টা ও কার্য্যে) স্বীয় প্রাণ বাহির করায় যেন আমার হইতে অগ্রগামী হইয়াছে ; অতএব আমি তাহার জন্য বেহেশতকে হারাম করিয়া দিলাম।

৭০৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিবে সে দোযখের মধ্যেও গলায় ফাঁসি দেওয়ার আজাব ও যাতনা ভোগ করিবে এবং যে ব্যক্তি বর্শা (ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, সে দোযখের মধ্যেও বর্শাঘাতের আজাব ও যাতনা ভোগ করিবে।

মৃতের প্রতি সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা

৭০৬। **হাদীছ ঃ**— عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ

خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ -

অর্থ—আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবীগণ একটি জানাযার নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন, তাঁহারা মৃত ব্যক্তির প্রশাংসা করিলেন ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর অন্য আর একটি জানাযার নিকট দিয়া চলার সময় ছাহাবীগণ মৃত ব্যক্তির নিন্দা করিলেন ; এইবারও নবী (দঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়াগিয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নির্দ্ধারিত হইয়াগিয়াছে ? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথম মৃতের প্রতি তোমরা প্রশংসা করিয়াছ, সে অনুযায়ী তাহার জন্য বেহেশত নির্দ্ধারিত হইয়াগিয়াছে। দ্বিতীয় মৃতকে তোমরা খারাব বলিয়াছ, সে অনুযায়ী তাহার জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত হইয়াগিয়াছে। তোমরা (সর্ব্বসাধারণ নেক্‌কার মোসলমান) দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী স্বরূপ। (অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সাক্ষ্য অনুপাতেই আল্লাহ তায়ালা ফয়ছলা করিয়া থাকেন)।

৭০৭। **হাদীছ ঃ**—আবুল আসওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদীনা শরীফে আসিলাম, তখন সেখানে এক প্রকার মহামারী দেখা দিয়াছিল।

আমি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বসিয়াছিলাম, আমাদের নিকট পথে একটি জানাযা যাইতেছিল ; ঐ মৃতের প্রতি প্রশংসা করা হইল ; ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতিও প্রসংশা করা হইল ; ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতি খারাব মন্তব্য করা হইল ; ওমর (রাঃ) এবারও বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! কি নির্দ্ধারিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিলাম। নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ

قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ -

অর্থ—যে কোন মোসলমান মৃত ব্যক্তির পক্ষে চারজন লোক তাহার সৎ বা নেক হওয়ার সাক্ষ্য দান করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। আমরা জিজ্ঞসা করিলাম, যদি তিনজন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, তিনজন হইলেও তদ্রূপই হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি দুই জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, দুই জন হইলেও তদ্রূপই হইবে। অতঃপর আমরা একজন সাক্ষীর বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত সাক্ষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা স্বার্থ বিবর্জ্জিত সাধারণ সৎ লোকগণ, এমনকি ঐরূপ দুই-চার জনও মৃত ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ও গুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাহার জন্য বেহেশতের ফয়ছলা করিবেন। তাহার দোষ-ত্রুটি থাকিলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারে সর্ব্বসাধারণ সৎ লোকদের ক্ষতি হয় বা মনে কষ্ট হয় যদ্দরুন তাহার নাম আসিলেই লোক মুখে তাহার কুৎসা বর্ণিত হয় সে বস্তুতঃই অসৎ সাব্যস্ত ; সে আল্লার প্রিয় হইতে পারে না।

আলোচ্য হাদীছসমূহে একটি বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ রহিয়াছে যে, সৎ-চরিত্র, সৎ-স্বভাব, সদ্ব্যবহার ও পরোপকারিতার মূল্য ইসলামে অনেক বেশী। মানবের উচিৎ জীবিতকালে উহার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া, যেন তাহার মৃত্যুর পর মানুষের মুখে স্বতঃস্ফূর্ত তাহার সুকীর্তি ও নেক্‌নামী ফুটিয়া উঠে। এই সুখ্যাতি ও নেক্‌নামীর সাক্ষ্য মানুষের জন্য নাজাতের অছিলাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অছিলা।

কবরের আজাব

বাহ্যিক ও স্থূল যুক্তিবাদী লোকদের স্বভাব এই যে, তাহারা সাধারণ দৃষ্টি ও স্থূল যুক্তির গণ্ডির বাহিরের বিষয়বস্তুর প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে। তাহাদের এই স্বভাব জাগতিক বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে সহনীয় হইত। কিন্তু তাহাদের আস্ফালন সীমার ধার ধারে না বলিয়া তাহারা ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য অ-জড় জগতের বিষয়াবলীকেও ঐ একই স্থূল যুক্তি এবং বাহ্যিক দৃশ্য বস্তুর মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে চায়; ইহা অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কবরের আজাব বা সুখ-শান্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহকেও যুক্তির পূজারীগণ পূর্ণরূপে তাহাদের স্বীয় যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার দাবী জানাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, কবর তথা আলমে-বরযখ (বরযখী জগৎ) ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি অ-জড় জগৎ—যাহা আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। আখেরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ শুধু "আখেরাত" শব্দটিকে অনুধাবন করা নয়, বরং আল্লার ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছ দ্বারা আখেরাতের যে সব হাল-অবস্থা ও বিষয়াবলী প্রমাণিত হইয়াছে ঐ সবকে পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়াই আখেরাতের উপর ঈমান আনার প্রকৃত অর্থ। কোরআন ও হাদীছ অবশ্য অবশ্যই খাঁটী যুক্তি ও বিজ্ঞানের বরখেলাফ নহে, কিন্তু ইহা ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন ও হাদীছের মধ্যে এমন বহু বিষয়াবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে-সবকে আমাদের মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি আয়ত্বে আনিতে ও জয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, আমরা ইহজগতের প্রাণী, তাই অনিবার্য্যতঃ আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞান কেবলমাত্র ইহজগতের বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে কোরআন ও হাদীছ ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগতের বিষয়াবলীর আলোচনা করে। পরজগৎ তথা আখেরাত আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের উর্দ্ধে ও অজেয়। সেই জগৎ সম্পর্কে হাল্কা যুক্তি ও বিজ্ঞানের নিস্ফল হাতড়ানি নিছক অবান্তর।

আখেরাতের বিষয়াবলীর সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছের সহিত। তাই বোখারী (রঃ) "কবরের আজাব"কে প্রমাণিত করার জন্য প্রথমতঃ কোরআনের কতিপয় আয়াত, তৎপর কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে ভূমিকা স্বরূপ তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ—কবর বলিতে ইসলামী পরিভাষায় "আলমে-বরযখ" বুঝায়, কেবলমাত্র মৃতদেহকে পুঁতিয়া রাখার গর্ত্তই বুঝায় না। "আলমে-বরযখ" ইহজগত হইতেও

অসংখ্য গুণ প্রশস্ততর একটি আলম বা জগৎ; ইহজগৎ ও হাশরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মানব ইহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। মানবের মৃত্যুর অর্থ এই যে, সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আলমে-বরযখে চলিয়া গিয়াছে। ইহজগতে থাকাকালীন সে যেরূপ জীবিত এবং তাহার সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাহার উপর সৃষ্টিকর্ত্তার সমুদয় আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফত) কার্য্যকরী হইয়া থাকে; তদ্রূপ আলমে-বরযখবাসীগণও তথাকার জীবনে জীবিত। তথায় তাহাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফৎ) কার্য্যকরী হইতে থাকে।*

দ্বিতীয়তঃ—মানুষ তিনটি বস্তুর সমষ্টি, (১) জিছমে-ওন্‌ছুরী বা চারী পদার্থে গঠিত দেহ, (২) জিছমে-মিছালী বা মধ্যবর্ত্তী দেহ, (৩) রূহ্‌ বা আত্মা। রূহ্‌ বা আত্মা পদার্থীয় দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কুদরতী বস্তু। পদার্থীয় দেহের সহিত উহার সম্পর্কের জন্য মধ্যস্থলে জিছমে-মিছালী রহিয়াছে, যেরূপ মানব দেহের হাড্ডি অতিশয় শক্ত এবং মাংস অতি কোমল; উভয়ের সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার জন্য মধ্যস্থলে মাংসপেশী অবস্থিত। জিছমে-মিছালী মানব দেহের সমপরিমাণ ও সমাকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক পদার্থীয় নহে বলিয়া সাধারণ দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। মানবের মৃত্যু হইলে তাহার

---

* এখানে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা মোটেই কোন জটিলতার সৃষ্টি করিবে না যে আলমে-বরযখ নামক জগৎটি কোথায় অবস্থিত এবং উহার ভৌগলিক বিবরণ কি?

ইসলামের মূল—কোরআন-হাদীছের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর সম্মুখে এরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, বেহেশত-দোযখ যাহা এই ইহজগৎ হইতে কোটি কোটি গুণ বড়, কোরআন-হাদীছের স্পষ্টতর প্রমাণাদি দৃষ্টে পূর্ব্ব হইতেই স্বষ্ট। আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের হাতড়ানি সেই বেহেশত-দোযখের ভৌগলিক সমস্যার কি সমাধান করিতে পারিয়াছে? এসব ত ইহজগৎ হইতে পৃথক পরজগতের কথা; কিন্তু কোরআন-হাদীছে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ যাহাদের সংখ্যা সমুদয় মানব জাতির সংখ্যা হইতে প্রায় হাজার গুণ উর্দ্ধে তাহাদের বাসস্থান এবং কোরআন শরীফে বর্ণিত জুল-করনাঈন বাদশা কর্ত্তৃক তাহাকিগকে অবরুদ্ধ করার লৌহ ও তাম্র নির্ম্মিত প্রাচীর ইত্যাদি সবই ইহজাগতিক স্থান ও বস্তু; কিন্তু ভৌগলিক-জ্ঞান ঐ সবকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে কি?

আর কোরআন-হাদীছে অবিশ্বাসীরা বলুন—১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভূগোল-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকার ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের খোঁজ রাখিত কি? ইতিপূর্ব্বে (Antarctica) অ্যাণ্টার্কটিকার ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের বিষয় তাহারা কি জানিত? চন্দ্রে বিশাল জগতের খোঁজ করা হইতেছে, পূর্ব্বে এই চিন্তা ছিল কি? এতদ্দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, যেই মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন এত ক্ষুদ্র; সেই মানব সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার বাণী কোরআন ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি রসূলের হাদীছে বর্ণিত স্থান, বস্তু ও বিষয়সমূহকে কোন যুক্তি বলেই অস্বীকার করিতে পারে না।

পদার্থীয় দেহ হইতে রূহ্‌ ও জিছমে-মিছলীর প্রধান সম্পর্ক তথা দেহকে সক্রিয় ও সজীব রাখার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং আত্মা ও জিছমে-মিছালী আলমে-বরযখে স্থানান্তরিত হয়। পদার্থীয় দেহটি পঁচিয়া-গলিয়া বা ভস্ম হইয়া বা কোনও জন্তুর পেটে হজম হইয়া মল আকারে বাহির হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া, অণু-পরমাণু ও কণায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন যে, উহার মৌলিক অস্তিত্ব কখনও কোন অবস্থাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—মানুষ ইহজগতে থাকাকালীন সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বা আরাম ইত্যাদি হাল-অবস্থা তাহার পদার্থীয় দেহের উপর প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয়, আর ইহার সহিত সম্পর্কের দরুন রূহ্‌ এবং জিছমে-মিছালীও শান্তি প্রাপ্ত বা ব্যথিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর আলমে-বরযখের অবস্থা ইহার বিপরীত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ এমনকি উঠা-বসা ইত্যাদি হাল-অবস্থা বস্তুতঃ রূহ্‌ ও জিছমে-মিছালীর উপরই প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয়। অবশ্য পদার্থীয় দেহের অণু-পরমাণু ও কণারাশি যেখানে যতটুকু যে অবস্থায়ই থাকে ঐগুলির সঙ্গে আত্মার ও জিছমে-মিছালীর প্রধানতম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরও এমন একটি সুক্ষ্মতম সম্পর্ক বজায় থাকে যদ্দ্বারা রূহ্‌ ও জিছমে-মিছালীর সুখ-দুঃখের অনুভূতিসমূহ পদার্থীয় দেহের অংশরাশি পর্য্যন্তও সংক্রমিত ও অনুভূত হইয়া থাকে।**

** আলমে-বরযখের সমুদয় অবস্থা সরাসরিভাবে শুধু রূহ ও জিছমে-মিছালীর উপরে প্রবর্ত্তিত হওয়া—ইহা ছুফিয়া তথা তাছাওফবাদীদের সিদ্ধান্ত (ফয়জুলবারী, ২—৪৯২)।

মানুষের এই ভৌতিক দেহ ছাড়াও তাহার অপর একটি দেহ আছে—এই তথ্য মোসলেম দার্শনিক সাধক মনীষীদেরই আবিষ্কার; এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কারের যোগ্যতা অন্য কাহারও হইতে পারে না। কারণ, আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্য যেরূপ চর্ম্ম-চোখের আওতা বহির্ভূত তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত আত্মার গভীর যোগ-সূত্র ব্যতীরেকে উহা জ্ঞান-চোখের পক্ষেও অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়। দার্শনিক সাধক মহা মনীষী মাওলানা রুমী (রঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই জিনিষটিই ভিক্ষা চাহিতেন—

قطرهٔ دانش که بخشیدی ز پیش + متصل گردان بدریاهائے خویش

"প্রভু হে। যে জ্ঞানবিন্দু তুমি আমাকে সৃষ্টিগতভাবে বা বাহ্যিক শিক্ষা চর্চ্চায় দান করিয়াছ উহাকে তুমি তোমার অকূল সমুদ্রের সহিত যোগ করিয়া দাও।"

সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের সহিত যোগসূত্র-কেন্দ্রের প্রবেশ-পথ হইল একমাত্র ইসলাম; সেই পথ অবলম্বনে বিরামহীন সাধনা-ভজনা ও আল্লাহ-ধ্যানের অতল সমুদ্রে লুপ্ত থাকার মাধ্যমে লাভ হয় সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত যোগসূত্র। এইরূপ যোগসূত্র সৃষ্টিকারী অসংখ্য মহা মনীষীর আবির্ভাব মোসলেমদের মধ্যে হইয়াছিল; যেমন—ইবনে আরবী,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আলমে-বরযখে ঐ অবস্থায়ই কাল অতিক্রম হইবে। অতঃপর মানবের পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত সময়টি উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ইস্রাফীল (আঃ) ফেরেশতা দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। তখন প্রত্যেকটি মানব দেহের সমুদয় কণারাশি মুহূর্ত্তের মধ্যে একত্রিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতী বৃষ্টিপাতের দ্বারা প্রত্যেক দেহের সঙ্গে উহার রূহ্ ও জিছমে-মিছালীর পূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহজগতের ন্যায় মানুষের মধ্যে যে তিনটি বস্তুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বস্তুত্রয় একত্রিতরূপে পুনর্জীবিত হইয়া পূর্ণ জীবন্ত অবস্থায় মানুষ হাশর-ময়দানের দিকে ধাবিত হইবে।

শা'রাণী, জিলানী, জোনায়েদ, শিবলী, রুমী, গাজালী (রহমতুল্লাহে আলাইহিম)। তাঁহারা উক্ত যোগসূত্র লাভে কিরূপ ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন উহার প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থরাজী জ্ঞানসিন্ধুসমূহের মধ্যেই প্রস্ফুটিত; শুধু মুখের দাবী নহে। ঐ শ্রেণীর মনীষীবৃন্দই উক্ত যোগসূত্রে আহরিত জ্ঞান ও আলোর সাহায্যে "তাছাওফ বা ছুফিবাদ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য আধ্যাত্মিক তথ্যাবলীর খোঁজ দিয়াছিলেন। দার্শনিক মহাসাধক বিশিষ্ট মনীষী শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ) ঐ শ্রেণীর বহু তথ্যাবলীর উদঘাটনে "হুজ্জাতুল্লাহিল্-বালেগাহ" নামক এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; যাহা ইংরাজী সহ বহু ভাষায় অনুদিত হইয়া বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

মোসলমান মনীষীগণের আবিষ্কৃত ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ শাহ ওলীউল্লাহের গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ" ইংরাজী অনুবাদ হইল। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান আহরণ-প্রিয় শ্বেতাঙ্গ জাতির অনেক লোক আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী (Study) অধ্যয়ন করিল এবং উক্ত গ্রন্থাবলীর একটি নগণ্য অংশ আহরণ করিল।

ছুফীবাদ গ্রন্থাবলীর মূল বিষয় হইল—আত্মাকে মার্জ্জিত ও উন্নত করার এবং আল্লাহ পানে উহাকে দ্রুতগামী করার উপায় ও পন্থা। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত যোগসূত্রলব্ধ জ্ঞানে আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্যাবলীও উক্ত গ্রন্থাবলীতে আছে। ইংরেজরা প্রথম বিষয় তথা মূল বিষয়টি বাদ দিয়া শুধু দ্বিতীয় তথা নগণ্য বিষয়টিকে আহরণ করে। উহা হইতেই কিছু দিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশে "থিওসফী" নামক নূতন এক অধ্যাত্ম-বিদ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে। সেই পাশ্চাত্যবিদ্যা াগীশদের আলোচনায়ও আমাদের উল্লেখিত "জিছমে-মিছালী" তথ্যটি স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে "মোস্তফা চরিত", ২—১০০ হইতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

থিওসফীর মতে মানুষের এই জড়দেহই (Physicaul body) একমাত্র দেহ নয়, স্থুল দেহ ছাড়া তাহার জ্যোতির্দেহ (Astral body) রহিয়াছে।...এই অ-জড় দেহকে "Etheric double" (ইথারিক ডবল) বলা হয়। স্থুল দেহের সঙ্গে ইথারিক দেহ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রথম ও তৃতীয় বিষয়রূপে যাহা বলা হইয়াছে উহা মৃত্যুর পরের সাধারণ অবস্থা। কদাচিৎ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জগদ্বাসীকে সতর্ক বা উৎসাহিত করার জন্য কবর নামীয় গর্ত্তের মধ্যে এই পদার্থীয় দেহের উপরও শাস্তি বা আজাবের কোন দৃশ্য প্রকাশিত করেন—উহা খর্কে-আদৎ বা অদৃশ্য কুদরতের নিদর্শন।

কবরের আজাব এবং কোরআন হাদীছে বর্ণিত উহার অবস্থাসমূহ দৃষ্টে যে সমস্ত প্রশ্নাবলীর উদয় হয়, উল্লিখিত বিষয়দ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সে ধরণের বহু প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। যথা—যে সমস্ত মৃতদেহ সমাহিত না হয়; যেমন ময়না তদন্তের জন্য বা মেডিকেল ছাত্রদের প্রাক্‌টিসের জন্য রক্ষিত

মিশিয়া থাকে। স্থূল দেহ জড় জগতের উপাদান দ্বারা গঠিত (—যেমন মাটি, পানি, আগুন, বাতাস)। আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতি বা ইথার দ্বারা। সার্ট, কোট যেমন আমাদের দেহের পোশাক, দেহগুলি তেমনই আমাদের আত্মার পোশাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোশাক ছাড়িয়া পাতলা পোশাক পরি; আত্মাও তেমন জড়দেহ ছাড়িয়া শুধু ইথারিক দেহ ধারণ করিতে পারে।

মানুষের আত্মিক শক্তি প্রবল হইলে সে সহযেই দেহগুলিকে বশ করিয়া লইতে পারে। জড়দেহের অক্ষুন্নতা বজায় রাখিয়াও অপর দেহকে উহা হইতে ভিন্ন করিয়া উহা বহনে সে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। এমনকি সে এই সূক্ষ্ম দেহকে অপরের দৃষ্টি গোচরও করিতে পারে। এই জন্যই একই মানুষ একই সময়ে একাধিক স্থানে দেখা যাইতে পারে। এই তথ্য থিউসফীর ভাষাতেই শুনুন—

If any person be observed who is much more developed, say one who is accustomed to function in the astral world and to use the astral body for that purpose, it will be seen that when the physical body goes to sleep and the astral body sleeps out of it, we have the man himself before us in full consciousness; the astral body is clearly outlined and definitely organised, bearing likeness of the man and the man is able to use it as a vehicle a vehicle for more convenient than the physical.

(Man and His Bodies, by Annie Besant, P. 49)

অর্থাৎ—জ্যোতির্দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কার্য্যক্ষম যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থূল দেহ যখন ঘুমায় এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষেরই হুবহু প্রতিকৃতি হইয়া পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তাহার বাহন স্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থুল-দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।

বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন স্থুলদেহেরও তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, স্থুল দেহের সহিত তাহার যোগসূত্র অক্ষুন্ন থাকে। এই জ্যোতির্দেহ লইয়া মানুষ যে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখে উদয় হইতে পারে। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

মৃতদেহ এবং যে সমস্ত মৃতদেহের অস্থি-মাংস পর্য্যন্ত হঠাৎ বিলীন হইয়া যায়; যেমন বম, গোলা-বারুদ ইত্যাদিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হিংস্র জীব জন্তুর ভক্ষিত ইত্যাদি অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াল-জওয়াব ইত্যাদি কিরূপে করা হয়?

উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর সহজ, যে—মৃত্যুর পর ছওয়াল-জওয়াব ইত্যাদির স্থান কবর বলিতে সমাধিস্থল গর্ত্ত উদ্দেশ্য নহে, বরং কবরের অর্থ আলমে-বরযখ বা বরযখী-জগৎ। এবং বরযখী-জগতের সমুদয় বিষয়াবলীর সরাসরী সম্পর্ক রুহ্—আত্মা ও জিছমে-মিছালীর সঙ্গে। রুহ্ ও জিছমে-মিছালী যে কোন প্রকার মৃত্যুর দরুণ পদার্থীয় দেহ হইতে ছিন্ন হইয়া ইহজগৎ ত্যাগ করতঃ বরযখী-জগতে চলিয়া যায়। রুহ্ ও জিছমে-মিছালী ভক্ষিত বা ভস্ম হয় না এবং পদার্থীয় দেহ হইতে ছিন্ন হওয়ার পর কোন প্রকারেই ইহজগতে রক্ষিত বা আবদ্ধও হয় না, বরং অক্ষত ও অক্ষুন্ন অবস্থায় বরযখী-জগতে পৌঁছিয়া সমুদয় বিষয়াবলীর সম্মুখীন হয়।

কবর তথা বরযখী-জগতের অবস্থা ও বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে। তাই উহা ভস্ম, ভক্ষিত ইত্যাদি হওয়ায় কোন সমস্যারই সৃষ্টি হয় না। ঐসব অবস্থা ও বিষয়ের সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে যতটুকু থাকে ততটুকুর জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পদার্থীয় দেহ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই উহা বিলুপ্ত ও অস্তিত্বহীন হয় না, পুনরুত্থান কালে উহার বিচ্ছিন্ন অংশসমুহের একত্রিকরণ হইবে মাত্র।*

A person who has complete mastery over the astral body can, of course, leave the physical at any time and go to a friend at a distence. If the person thus Visited be clairvoyant, i. e. has developed astral sight, he will see his friend's astral body: if not, such a visitor might slightly densify his vehicle by drawing into it from the surrounding atmosphere particles of matter and thus materialise sufficiently to make himself visitable to physical sight. [Ibid : P, 55]

অর্থাৎ—কোন ব্যক্তি যদি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে সে যে কোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী কোন বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির জ্যোতিদৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা না হয়, তবে আগন্তুক তখন তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ জড়প্রকৃতি হইতে কিছু কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্ম্ম-চোখেই চিনিতে পারে।

* মানবীয় জড়দেহ যতই সুক্ষ্মতর অণু-কণা হইয়া যত দূর-দূরান্তের ব্যবধানেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হউক না কেন—এক এক দেহের সমুদয় অণু-কণাকে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা দ্রুত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এতদ্ভিন্ন মৃত ব্যক্তিকে কবরে ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক উঠান, বসান এবং মৃত ব্যক্তির চীৎকার ইত্যাদি হাল-অবস্থার বর্ণনাসমূহও সাধারণ দৃষ্টিতে এক জটিল সমস্যা পরিগণিত। এই সমস্যার সমাধান এই যে, ঐ সব হাল-অবস্থার স্থান ইহজগতের সমাধিস্থল গর্ত্ত নহে, বরং বরযখী-জগৎ এবং ঐসবের সম্পর্ক গোচরীভূত পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে, বরং অদৃশ্য আত্মা ও জিছমে-মিছলীর সঙ্গে এবং জিছমে-মিছলী মানব দেহের সমপরিমাণ ও সমাকৃতিবিশিষ্ট।

এই পরিচ্ছেদে বোখারী (রঃ) কোরআনের ৩টি আয়াত এবং কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যদ্দারা কবরের আজাব অথবা শাস্তি প্রমাণিত হয়। আয়াত ৩টি এই—

(১) ولو ترى اذ الظلمون فى غمرات الموت والملئكة باسطوا ايديهم - اخرجوا انفسكم - اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم......

অর্থ :—বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইবে যখন পাপীগণ মৃত্যু যাতনার ভীষণ চাপে পতিত হইবে এবং সে অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাহাদের চেহারা ও গর্দ্দানের উপর প্রহার করতঃ তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন যে—তোমরা রেহাই পাইবে না; এখনই তোমাদের আত্মা বাহির করিয়া লওয়া হইবে এবং আজ হইতেই তোমাদিগকে অসহনীয় শাস্তি ও আজাব দান আরম্ভ করা হইবে; যেহেতু তোমরা আল্লার প্রতি মিথ্যারোপ করিতে এবং আল্লার আদেশাবলী হইতে ঘাড় মোড়িয়া থাকিতে। (৭ পাঃ ১০ রুঃ)

এখানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রহিয়াছে যে পাপীদেরকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি ও আজাব দেওয়া হইবে; অথচ আখেরাত তথা দোযখের আজাব হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পরে হইবে যাহার অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল পরে হইবে।

(২) سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم -

অর্থ :—মোনাফেকদিগকে অচিরেই দুইবার আজাব প্রদান করিব; তৎপর তাহাদিগকে এক মস্তবড় ভীষণ আজাবে পতিত করা হইবে। (১১ পাঃ ১২ রুঃ)

একত্রিত করা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের সম্মুখে সহজ হইতেও সহজতর। আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার ন্যায় বুঝানের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান পর্ব্ব অনুষ্ঠানের বহু পূর্ব্বেই ঐ কুদরতের নমুনা আল্লাহ তায়ালা অনুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বীয় রসুল মারফত উহার যুক্তিগত বিবরণ বিশ্ব মানবের জন্য প্রচারও করিয়া দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সেই বাস্তব ঘটনাটি পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করা বিশেষ ফলদায়ক। পুর্ণ ঘটনার হাদীছটি সপ্তম খণ্ডে "আল্লার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা" পরিচ্ছেদে ২৪৪৯ নম্বরে অনুদিত আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম আজাব হইল, মোনাফেকদিগকে ইহজগতে অপমান-অপদস্থ করা। আল্লাহ তায়ালা কিছুদিন পর্য্যন্ত মোনাফেকদের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন, প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম সীমা অতিক্রম করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধিমূলক অপকর্ম্মসমূহকে অহীর মারফৎ প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত এবং অনেককে বাহ্যিক শাস্তির সম্মুখীন করিলেন; ইহা প্রথমবারের আজাব। দ্বিতীয়বারের আজাব হইল, মৃত্যুর সংলগ্ন কবর তথা আলমে-বরযখের মধ্যে শাস্তি; এই দুইবারের আজাবকে নিকটবর্ত্তী আজাব বলা হইয়াছে। তৎপর দোযখের আজাব হইবে, উহাকেই ভীষণ আজাব বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা সর্ব্বাধিক ভীষণ ও অসীম হইবে।

(৩) وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا -

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -

অর্থ ঃ—ফেরাউন ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গোরা (মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই) কঠিন আজাবে বেষ্টিত হইয়া গেল। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে দোযখের নিকটবর্ত্তী করা হইয়া থাকে, (যদ্দারা তাহারা কঠিন আজাব ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের উপর এই শাস্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে) এবং যে দিন কেয়ামত তথা হাশরের হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হইবে সে দিন ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিবেন—ফেরাউন ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গোদেরকে ভীষণ আজাবে (তথা দোযখের) মধ্যে নিক্ষেপ কর। (২৪ পাঃ, ৪ রুঃ)

লক্ষ্য করুন। উল্লেখিত প্রত্যেকটি আয়াতেই মৃত্যুর পরে এবং হিসাব নিকাশের দ্বারা দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে একটি আজাব বা শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে; উহাই আলমে-বরযখ তথা কবরের আজাব।

৭০৮। হাদীছ ঃ—* عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ وَاِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ

نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ

لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ

* বোখারী (রঃ) হাদীছখানা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন, অনুবাদে বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফ ও বিভিন্ন কিতাব হইতে বর্দ্ধিত করিয়া বন্ধনীর মধ্যে এবং ফুট নোটে দেওয়া হইয়াছে।

له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة

فيراهما جميعا - وانه يفسح له في قبره - واما المنافق او الكافر

فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت

اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق

من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين -

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ↑ যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং শববাহকগণ দাফন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিবার পথে রওয়ানা হয় মাত্র, এমনকি তখনও তাহারা এতটুকু সন্নিকটে যে, তথা হইতে তাহাদের পাতুকার শব্দ কর্ণগোচর হয়; এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির নিকট তুইজন ফেরেশতা* উপস্থিত হইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং প্রশ্ন করেন—

[(১) من ربك - ما كنت تعبد -

"তুমি কাহাকে স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও বিধানকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলে তথা কাহার বন্দেগী করিয়া থাকিতে?" মৃত ব্যক্তি যদি খাঁটী মোমেন হইয়া থাকেন তবে তিনি সঠিক উত্তর দিবেন যে, আমি একমাত্র আল্লাকে

↑ একদা হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাস্থিত নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করিলেন, (তথায় কতগুলি কবর ছিল।) তিনি সেখানে বিকট শব্দ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কবর কাহাদের? ছাহাবীগণ আরজ করিলেন ইসলাম-পূর্ব্ব আন্ধকার যুগে কতিপয় কাফের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এসব তাহাদের কবর। তখন হজরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কবরের আজাব এবং দজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা (অর্থাৎ কবরের আজাব) কি? ইয়া রস্থলুল্লাহ (দঃ)! ছাহাবীগণের এই প্রশ্নর উত্তরেই রস্থলুল্লাহ (দঃ) এই বিস্তারিত বিবরণের হাদীছখানা বর্ণনা করিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

* ফেরেশতাদ্বয়ের বিকট কাল মুর্ত্তি, চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণ এবং তাঁহাদের বড় বড় দাঁত অতি ভয়ঙ্কর; তাঁহাদের সঙ্গে বিরাট ভারী গুর্জ্জ থাকিবে এবং তাঁহাদের গর্জ্জন বজ্র-পাতের ন্যায় অতি বিকট, তাঁহাদের একজনকে মোন্‌কার দ্বিতীয় জনকে নাকীর বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ব্যক্তিগত নাম নহে, শ্রেণীগত আখ্যা।

স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও বিধানকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তথা একমাত্র তাঁহারই এবাদত-বন্দেগী করিয়াছি।

(২) مَا دِيْنُكَ তুমি কোন্ দ্বীন বা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, আমি ইসলামকে দ্বীন ও ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম।]

(৩) مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ফেরেশতাদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করিবেন--তুমি তাঁহার প্রতি কি আকিদা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলে?" মোমেন ব্যক্তি উক্তি করিবে—اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ "আমার অকাট্য বিশ্বাস এই ছিল যে, তিনি আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।" [তিনি আমাদের নিকট আল্লার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশাবলী লইয়া আসিয়াছিলেন, আমাদিগকে সৎপথের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছিলাম।

(৪) وَمَا يُدْرِيْكَ "তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে যে, তিনি আল্লার রসুল? মোমেন ব্যক্তি উত্তর করিবে, আমি আল্লার কেতাব কোরআন শরীফ পড়িয়াছি, উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, উহার প্রতিটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।"

তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি ঠিক ঠিকই বলিয়াছ; তুমি খাঁটি বিশ্বাসের উপরই ছিলে, উহার উপরই মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং উহাকে লইয়াই তুমি ইন্‌শা-আল্লাহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছ? সে বলিবে, দুনিয়াতে কাহারও জন্য আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব হয় নাই।]

অতঃপর দোযখের দিকে একটি ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ পথে ইশারায় দেখাইয়া তাহাকে বলা হইবে, ঐ দেখ, দোযখের মধ্যে তোমার জন্য ঐ স্থানটি তৈয়ার করা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি নেক্‌কার হওয়ায় আল্লাহ পাক উহার পরিবর্ত্তে বেহেশতের মধ্যে একটি স্থান তোমাকে দান করিয়াছেন।* [সে দোযখের প্রতি

---

* হাদীছে বর্ণিত আছে—প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন এবং দোযখের মধ্যেও একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। কেয়ামতের দিন মোসলমানদের দোযখস্থ স্থানগুলি কাফেরদিগকে দেওয়া হইবে এবং উহার বদলে কাফেরদের বেহেশতস্থিত স্থানগুলি মোসলমানদের অধিকারে দিয়া দেওয়া হইবে।

উক্ত ঘটনার ইঙ্গিতেই কোরআন শরীফে কেয়ামতের দিনকে "ইয়াওমুত্‌তাগাবুন" তথা হার-জিতের দিন বলা হইয়াছে। মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ঐ দিন যে ভাগাভাগি ও বিনিময় অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে মোসলমানদের জিত হইবে যে, দোযখের স্থানের পরিবর্ত্তে বেহেশত লাভ করিবে এবং কাফেররা বেহেশতের স্থানের পরিবর্তে দোযখের স্থান পাইবে।

তাকাইয়া দেখিবে, উহার অগ্নিশিখাগুলি কিলবিল করিতেছে। অতঃপর তাহাকে তাহার বেহেশতের স্থানটিও দেখান হইবে। তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকিবে না, সে আনন্দে বলিয়া উঠিবে, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার পরিবারবর্গকে এসব বিষয়ের সুসংবাদ দিয়া আসি। তখন তাহাকে বলা হইবে, এ কথা বলিবেন না।

অতঃপর আসমান হইতে তাহার পক্ষে একটি ঘোষণা জারী করা হইবে যে, আমার বন্দা ঠিক ঠিক উত্তর দান করিয়াছে, তাই তাহার জন্য বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্যে বেহেশত হইতে বিছানা আনিয়া দাও এবং বেহেশতের দিকে দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে বেহেশতের পোষাক পরিধান করাইয়া দাও। তখন তাহার বাসস্থানে বেহেশতের সুবাস ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে এবং তাহার বাসস্থানকে দৃষ্টির দুরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং পূর্ণিমা রাত্রের ন্যায় আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং সবুজ বাগ-বাগিচা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে বলা হইবে, আপনি নূতন দুলার ন্যায় আরামের নিদ্রা উপভোগ করিতে থাকুন—হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত। সে উপরোক্ত আরাম আয়েশের মধ্যেই (আলমে-বরযখের) জীবন কাটাইতে থাকিবে।

মোনাফেক-কাফেরকেও প্রশ্ন করা হইবে। [ফেরেশতাদ্বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, (১) তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও বিধানদাতা কে—তুমি কাহার এবাদৎ-বন্দেগী করিয়াছ ? সে বলিবে (হায় হায়।) আমি কিছু জানি না। (২) তোমার দ্বীন ও ধর্ম্ম কি ? সে বলিবে (হায় হায়।) আমি কিছু জানি না।] (৩) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করা হইবে যে, তাঁহার প্রতি তোমার কি আকিদা ও উক্তি ছিল ? সে বলিবে (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না, তবে অন্যান্য লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে কোন উক্তি করিতে শুনিয়া আমিও সেই উক্তি করিতাম। তখন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলা হইবে—কোরআন নিজে বুঝও নাই, পড়ও নাই, কিম্বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুসরণও কর নাই।

অতঃপর তাহাকে লোহার গুর্জ্জ দ্বারা ভীষণ আঘাত করা হইবে (ঐ গুর্জ্জ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হইলে, পাহাড় বালুকাস্তুপে পরিণত হইয়া যাইত।) আঘাতের চোটে সে এত বড় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিবে যাহা তাহার আশে-পাশের সকলে (বরং দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই) শুনিতে পাওয়ার যোগ্য ; অবশ্য মানুষ ও জিন জাতি তাহা শ্রবণ করে না। [এবং তাহার উপর সর্ব্বদার জন্য একটি জীবকে নিয়োজিত রাখা হইবে, উহার হাতে একটি জ্বলন্ত অঙ্গারের চাবুক থাকিবে, তদ্দারা সে তাহাকে অবিরাম আঘাত করিতে থাকিবে। জীবটি বধির হইবে তাই তাহার চীৎকার শ্রবণে কোন প্রকার করুণা প্রদর্শনের সম্ভাবনাই থাকিবে না। এবং বেহেশতের দিকে একটি খিড়কী খুলিয়া

তাহাকে দেখান হইবে এবং বলা হইবে, তুমি যদি খাঁটি মোমেন হইতে তবে তুমি এই বেহেশত স্বীয় বাসস্থানরূপে লাভ করিতে, কিন্তু তুমি কাফের হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের পরিবর্ত্তে তোমার স্থান ঐ দোযখে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া দোযখের দিকে জানালা খুলিয়া তাহাকে দোযখ্ দেখান হইবে। তখন তাহার হায়-আফছুছ—অনুতাপ আক্ষেপ ও নিজের প্রতি ধিক্কারের সীমা থাকিবে না। তাহার বাসস্থানকে অত্যধিক সঙ্কীর্ণ করা হইবে, যাহার চাপে তাহার পাঁজর এক দিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যাইবে। আসমান হইতে আদেশ জারী করা হইবে যে—তাহার জন্য দোযখের বিছানা আনিয়া দাও, তাহাকে দোযখের পোষাক পরাইয়া দাও এবং দোযখের প্রতি তাহার বাসস্থানের দরওয়াজা খুলিয়া দাও, যদ্দ্বারা তাহার প্রতি দোযখের ভীষণ তাপ আসিতে থাকিবে।

৭০৯। **হাদীছ** ঃ—বরা ইবনে আজেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যখন মোমেন ব্যক্তিকে কবরে বসান হয় এবং তথায় ফেরেশতা উপস্থিত হন, তখন সে (প্রশ্নের উত্তরে) সঠিকরূপে বলিতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহই আমার মা'বুদ এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার রসুল। এই বিষয়টিই এই আয়াতের তাৎপর্য্য—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ—খাঁটী মোমেন ব্যক্তি যেহেতু স্বীয় জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যটিকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, আল্লাহই একমাত্র মাবুদ অন্য কেহই মাবুদ নয় এবং হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল: ইহার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ইহ-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ সত্যের উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করেন অর্থাৎ কলেমা-শাহাদতের উপর তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর-জীবনেও তাহাকে উহার উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ কবরের মধ্যে প্রশ্নাবলীর উত্তরে সে ঐ কলেমা শাহাদতের উক্তিকে ঠিক ঠিকরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—পরকালের জীবনে প্রত্যেকের উপর প্রকৃত, খাঁটী ও বাস্তব বিষয় আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। সেখানে কোন প্রকার কৃত্রিমতা বানাউটি জালিয়াতি চলিবে না বা কোন বাস্তব বিষয় লুক্কায়িত থাকিবে না। অতএব যে ব্যক্তি ইহকালীন জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসুল; সে ব্যক্তি পর-জীবনে

পৌঁছিবার পথে এবং পর-জীবনে পৌঁছিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে ঐ সত্যই তাহার মুখে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে তাহার কোন বেগ পাইতে হইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে ইহ-জীবনে নিজের উপর প্রতিফলিত করে নাই সে যতই পটু, যতই বিজ্ঞ ও চতুর হউক না কেন মৃত্যুর পর কখনও ঐ সত্য তাহার মুখে প্রকাশ পাইবে না।

৭১০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফের সর্দারদের মৃত দেহগুলি নিকটবর্ত্তী একটি গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করিয়া আসার পূর্ব্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ গর্ত্তের কিনারায় দাঁড়াইয়া মরা লাশগুলির প্রতি উঁকি দিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের যে সতর্কবাণী ছিল (যে, সত্য ধর্ম্ম ইসলামকে গ্রহণ না করিলে ইহ-জীবনে তোমাদের ধ্বংস হইতে হইবে এবং পর জীবনে আজাব ও শাস্তির সীমা থাকিবে না) তাহা কি তোমরা বাস্তবে ঠিক ঠিক পাইয়াছ ? আমরা ত আমাদের পরওয়ারদেগারের ওয়াদাকে (যে, তিনি সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন) বাস্তবে ঠিক ঠিক পাইয়াছি। ঐ সময় ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন—ইয়া রসুলুল্লাহ ! আপনি মৃত ব্যক্তিদেরে সম্বোধন করিতেছেন ? যাহাদের কোন শ্রবণশক্তিই নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, তাহারা তোমাদের ন্যায়ই শ্রবণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের উত্তর দিবার শক্তি নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই হাদীছখানা উল্লেখ করার সঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) উহার ব্যাখ্যা আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, উল্লিখিত ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বে অর্থাৎ তাহাদের জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত সতর্কবাণী শুনাইয়া থাকিতাম ঐ সময় তাহারা সে সবের প্রতি কর্ণপাত করিত না, সে সবকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা মনে করিত, কিন্তু এখন তাহারা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, আমার সে সব সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) যে, বলিয়াছেন ঐ মরা লাশগুলি শ্রবণ করিয়া থাকে, উহার অর্থ বস্তুতঃ শ্রবণ করা নয়, বরং উপলব্ধি করা।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তি ইহ-জগতের কথাবার্ত্তা শুনিবার শক্তি রাখেনা বলিয়া কোরআন শরীফেই প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— انك لا تسمع الموتى "আপনি মৃতদিগকে কোন কথা শুনাইতে পারিবেন না।"*

* মৃত ব্যক্তি ইহজগতের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া থাকে কি না, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। ছাহাবীগণেরও মতভেদ ছিল ; তাই এ বিষয়ে সঠিকরূপে কিছু বলা অসাধ্য ; ইহা কোন আবশ্যকীয় বিষয়ও নহে। বোখারী (রঃ) ১৮৮ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া থাকে ; প্রমাণে ৭০৮ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে শববাহকদের পাদুকা চালনার শব্দ শুনিবার উল্লেখ আছে।

৭১১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী বৃদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আজাবে-কবরের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার জন্য দোয়া করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন। এতদশ্রবণে আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আজাবে-কবরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আজাবে-কবর বাস্তব বিষয় ; উহা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐদিন হইতে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযান্তেই কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি !

৭১২। **হাদীছ ঃ**—আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রকাশ্য সভায় ওয়াজ করিতেছিলেন। কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ও তিনি বর্ণনা করিলেন ; উপস্থিত মোসলমানগণ (অভিভূত হইয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল ! সতর্ক থাকিও, তোমরা নিশ্চয় দজ্জালের দ্বারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার ন্যায় কবরের মধ্যেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।

৭১৩। **হাদীছ ঃ**—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিকাল বেলা ভ্রমণে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া বলিলেন, এক ইহুদীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। (ইহা উহারই শব্দ)

কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৭১৪। **হাদীছ ঃ**—সায়ীদ ইবনে আ'ছ (রাঃ)এর পৌত্রী বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

৭১৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

অর্থ ঃ—হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুকালে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং অসৎ দজ্জালের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া হইতে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কবরের আজাব হইতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাওয়ার সঙ্গে নিজকে সংযত রাখায়ও সচেষ্ট হইতে হইবে ; বিশেষতঃ

ঐসব গোনাহ হইতে সতর্ক থাকিবে যে সব গোনাহ কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—প্রস্রাব হইতে পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্ক না থাকা বা চোগলখোরী করা। এই গোনাহদ্বয় বিশেষভাবে কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে (১৫৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

মৃত ব্যক্তিকে সকাল-বিকাল তাহার স্থান দেখান হয়

৭১৬। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পর তাহার বাসস্থান প্রতি সকাল-বিকাল দেখান হইয়া থাকে। যদি সে বেহেশতের উপযুক্ত হয়, তবে বেহেশতের বাসস্থান, আর যদি দোযখের যোগ্য হয় তবে দোযখের বাসস্থান। এবং তাহাকে বলা হইয়া থাকে—হিসাব-নিকাশের দিন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ইহাই তোমার বাসস্থান হইবে।

মোসলমানের সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যু হইলে?

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, এই সন্তানগণ বেহেশতী হইবে। বোখারী (রঃ) ৮২ নং হাদীছ দ্বারা এই মতকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। কারণ, যাহাদের অছিলায় মাতা-পিতাগণ বেহেশত লাভ করিবেন, স্বয়ং তাহারা বেহেশত লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি?

০ আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যাইবে তাহারা তাহার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হইবে এবং সে বেহেশত লাভ করিবে।

৭১৭। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশুপুত্র ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের মৃত্যু হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছিলেন, তাহার জন্য বেহেশতে একজন দাই নিযুক্ত করা হইবে।

কাফেরদের নাবালেগ সন্তান মৃত্যু হইলে?*

৭১৭। হাদীছ ঃ-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট মোশরেকদের ঔরষজাত নাবালেগ সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইলেন—আল্লাহ তাহাদিগকে সৃষ্টি করাকালীন নিশ্চিতরূপে অবগত ছিলেন, তাহারা (বাঁচিয়া থাকিলে) কি প্রকারের আমল করিত। (অর্থাৎ তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহই জানেন, তাহাদের শেষ পরিণাম কি হইবে।)

* আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং বহু আলেমগণের মত এই যে, এ বিষয়ে কোনও দিক নির্দিষ্ট না করিয়া ইহার শেষ ফয়ছালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন—এই বিশ্বাস অবলম্বন করতঃ সমস্ত আলোচনা হইতে বিরত থাকিবে।

৭১৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামকে মোশরেকদের নাবালেগ মৃত সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভালভাবেই জানেন, (বাঁচিয়া থাকিলে) তাহারা কি প্রকার আমল করিত। অর্থাৎ সেই অনুপাতেই তাহাদের পরিণাম নির্দ্ধারিত হইবে।

৭২০। হাদীছঃ—عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم :—

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء -

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেকটি মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আল্লার তরফ হইতে এমন একটি শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়া থাকে যে, যদি সে কোন আকর্ষণ বা বাধার বেষ্টনে পতিত না হয়, তবে ঐ শক্তিটি তাহাকে হক্ ও সত্যের দিকে ধাবিত করিবে। কিন্তু কাহারও ইহুদী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে ইহুদী বানায়, কাহারও নাছরানী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে নাছরানী বানায় এবং কাহারও অগ্নিপূজক মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে অগ্নিপূজকে পরিণত করিয়া থাকে। যেমন, পশুপালের বাচ্চা সাধারণতঃ অক্ষত কানযুক্তই প্রসবিত হইয়া থাকে; উহার কান কাটা বা ছিদ্র করা থাকে না, কিন্তু পরে উহার মোশরেক মালিকরা উহার কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া (উহাকে মনগড়া মাবুদ তথা দেব-দেবীর নামে ছাড়িয়া) থাকে।

ব্যাখ্যাঃ—সেকালে আরব দেশে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির বাচ্চাকে কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া দেব-দেবীর নামে ছাড়িবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই উহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানবকে সত্য ও হকের প্রতি ধাবিত করার সমস্ত রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনাই আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন; ঘাড়ে ধরিয়া বলপূর্ব্বক বাধ্যতামূলকভাবে হকের উপর পরিচালিত করেন নাই বটে, কারণ তাহা হইলে সৃষ্টিজগতের মূল রহস্য "পরীক্ষা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ইহা ছাড়া অন্য সব ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। নবী-রসুল পাঠান হইয়াছে, কেতাব নাজেল করা হইয়াছে; তদুপরি সৃষ্টিগতভাবে মানবের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে যেরূপ এক একটি কাজের শক্তি দান করা হইয়াছে কোনও বাধার সৃষ্টি না হইলে আপনা-আপনিই প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার

কাজ সম্পন্ন হইতে থাকিবে। যথা চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, কান দ্বারা শুনা যায় ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগত ভাবেই মানবকে এমন একটি শক্তি দান করতঃ এই পরীক্ষাকেন্দ্ররূপী জগতে পাঠাইয়াছেন যে, কোনও প্রভাব বা বাধার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ঐ শক্তিটি মানবকে সত্য ও হক্কের প্রতি লইয়া চলিবে। কিন্তু মানব দুনিয়াতে আসিবার পর নানাপ্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, নানারূপ বেড়া-জালের বেষ্টনিতে আবদ্ধ হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে তাহার ঐ শক্তিটি নিস্তেজ হইতে থাকে এবং ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ আকর্ষণ ও বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে—মাতা-পিতা তথা পরিবেশ, সোসাইটি (Society) ও সংসর্গ। এসব বেড়া জালকে ভেদ করার জন্যও আল্লাহ তায়ালা অন্য একটি শক্তি দান করিয়াছেন উহা হইতেছে আক্‌লে-ছলীম বা সৎ বিবেক।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা একটি অতি মূল্যবান উপদেশ লাভ হয় যে, যাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে সৎ বানাইবার আকাঙ্খা রাখেন তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, সন্তানকে খারাপ সোসাইটি, অসৎ সংসর্গ ও অবাঞ্ছিত পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখা, যেন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিটি নষ্ট না হয়। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইবে, সন্তানকে ভাল পরিবেশে ভাল সোসাইটিতে, সৎ-সংসর্গে প্রতিপালিত করা, যেন ঐ শক্তিটির আরও অধিক উন্নতি লাভ হইতে পারে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা ছেলে-মেয়েদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন আবহাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ত দুরের কথা বরং তাহাদের সহিত ডাকাত ও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। দ্বীন ও ইসলামের পক্ষে বিষ তুল্য পরিবেশে নিজেরাই তাহাদেরে দিয়া দেই।

আলমে-বরযখে নানাপ্রকার আজাবের বিবরণ

৭২১। **হাদীছ :**—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন খাব দেখিয়াছে কি ? কেহ কিছু দেখিয়া থাকিলে সে উহা বর্ণনা করিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার তাবির বা ব্যাখ্যা দিতেন।

একদা নবী (দঃ) সেই অনুসারে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি ? সকলেই আরজ করিল, আজ আমরা কিছুই দেখি নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি উহা বর্ণনা করিলেন যে, দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া আমাকে এক

পাক-পবিত্র স্থানে লইয়া গেলেন! তথায় যাইয়া দেখিলাম, একটি লোক বসিয়া আছে, অপর একজন লোক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে; দাঁড়ান ব্যক্তির হস্তে একখানা বক্রশীর্ষ লোহার শিক (যেরূপ শিকের দ্বারা তন্দুর হইতে রুটি উঠান হয়)। সে তাহার ঐ লোহার বক্র অংশ ঐ বসা ব্যক্তির মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া তাহার মুখের চিবুক ফাড়িয়া গর্দ্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায়। তদ্রূপ নাকের এক ছিদ্রে ঐ লোহার বক্র মাথা প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দ্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায় এবং চোখের ভিতরও প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দ্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এইভাবে এক পার্শ্বের চিবুক, নাক ও চোখ ফাড়িবার পর অপর পার্শ্বও ঐরূপেই ফাড়ে। এক পার্শ্ব ফাড়িয়া অপর পার্শ্ব ফাড়িতে ফাড়িতে প্রথম পার্শ্ব পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া যায়; পুনঃ পুনঃ উভয় পার্শ্বকে এইভাবে ফাড়িতেছে। (মানুষটিকে কিছু সময় বসাইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়, আবার কিছু সময় উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়।) আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, একজন লোক চিত হইয়া শুইয়া আছে, অপর একজন লোক বিরাট ভারী একটি পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করিতেছে। পাথরটি এত জোরে মারা হয় যে, উহার আঘাতে মাথা চুর্ণ হইয়া পাথরটি ছিটকাইয়া দুরে সরিয়া পড়ে; ঐ পাথরটিকে লইয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার মাথা পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষত অবস্থা-প্রাপ্ত হয়, পূনরায় তাহাকে ঐরূপে আঘাত করা হয়; এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাহাকে আঘাত করা হইতেছে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে এক-স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তন্দুরের ন্যায় একটি অগ্নিকুণ্ড; উহার মুখটি সঙ্কীর্ণ এবং অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় প্রশস্ত। উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে এবং উহাতে ভয়ঙ্কর চিৎকার ও আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে; আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে কতকগুলি উলঙ্গ নর-নারী রহিয়াছে। যখন অগ্নিশিখাগুলি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও উপরের দিকে চলিয়া আসে, মনে হয় যেন তাহারা উহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িবে, কিন্তু অগ্নিশিখা স্তিমিত হইলে আবার তাহারা উহার তলদেশে পড়িয়া যায়; আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কোন্ লোক? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। এবার আমরা একটি নদীর নিকটে পৌঁছিলাম। ঐ নদীটিতে পানি ছিল না, বরং রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; ঐ নদীর মধ্যস্থলে একটি লোক অবিরাম সাঁতার

কাটিতেছে এবং অপর একটি লোক সেই নদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে বহু পাথর খণ্ড স্তূপীকৃত। এবতাবস্থায় মধ্যস্থলীয় লোকটি সাঁতার কাটিয়া কিনারার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, যখন সে কিনারার নিকটবর্ত্তী হইয়া নদী হইতে উঠিয়া আসিবার প্রয়াসী হয় তখন ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি পাথর দ্বারা তাহার মুখের উপর ভীষণ জোরে আঘাত করে যাহার ফলে সে তাহার পূর্ব্ব স্থান—নদীর মধ্যস্থলে চলিয়া যায়। যতবার ঐ ব্যক্তি সেই রক্তের নদী হইতে বাহির হইয়া আসার চেষ্টা করে ততবার ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি তাহাকে ঐরূপে আঘাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাঁহারা বলিলেন, সম্মুখে চলুন। এবার আমরা একটি সুন্দর সবুজ বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, উহার মধ্যে একটি বিরাট বৃক্ষ; বৃক্ষটির গোড়ায় একজন সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধলোক অনেকগুলি ছেলে-মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছেন এবং ঐ বৃক্ষটির কিছু দুরেই অপর এক ব্যক্তি অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির; সে তাহার সম্মুখস্থ বিরাট অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেছে। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া ঐ বৃক্ষটিতে আরোহণ করিলেন। আমরা উর্দ্ধপানে একটি শহরে উপস্থিত হইলাম—যাহার অট্টালিকাসমূহ এবং রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্ম্মিত; সেই শহরে এমন একদল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের শরীরের অর্দ্ধাংশ অতি সুন্দর ও সুশ্রী, কিন্তু বাকী অর্দ্ধাংশ অতি জঘন্য কুৎসিত ও বিশ্রী। আমার সঙ্গীদ্বয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ প্রবাহমান খালে অবতরণ করিয়া ডুব দাও। তাহারা তাহা করিল এবং আমাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল; তখন তাহাদিগকে দেখিলাম, তাহারা পূর্ণাঙ্গে অতিশয় সুন্দর সুশ্রী হইয়া গিয়াছে (৬৭৪ পৃঃ)। অতঃপর আমরা বৃক্ষটির আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম; সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া এমন সুন্দর সুরম্য একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন যে, তার চেয়ে অধিক সুন্দর কক্ষ আমি কখনও দেখি নাই; উহার ভিতরে অনেক বৃদ্ধ, যুবক, নর-নারী ও ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা আমাকে ঐ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষটির আরও উপরে আরোহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এই কক্ষটি প্রথমটি হইতেও অধিক সুন্দর ও মনোরম, উহার মধ্যে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক রহিয়াছে।

আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, সারারাত্র আপনারা আমাকে ভ্রমণ করাইলেন, এখন আমাকে ঐ সব ঘটনা খুলিয়া বলুন যাহা আমি দেখিয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, হাঁ—সর্ব্বপ্রথম আপনি যাহার চিবুক ফাড়িতে দেখিয়াছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। সে এমন এক একটি মিথ্যা গড়াইয়া বলিত যাহা তাহার মুখ হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। আপনি যাহা দেখিয়াছেন উহা তাহারই

শাস্তি। হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ঐরূপ শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। আপনি পাথর দ্বারা যাহার মাথা চূর্ণ করিতে দেখিয়াছেন সে ঐ ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এল্‌ম দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সর্ব্বদা সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইয়াছে, উহা তেলাওয়াত করে নাই এবং দিনের বেলায়ও উহার উপর আমল করে নাই, তাহাকেও এই আজাব কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত দেওয়া হইতে থাকিবে। আর যাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দেখিয়াছেন তাহারা জেনাকার—ব্যভিচারী নর-নারী। আর যাহাকে রক্তের নদীর মধ্যে দেখিয়াছেন, সে সুদখোর দলের একজন। স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত শহরে যে একদল লোক দেখিয়াছেন যাহাদের অর্দ্ধ শরীর সুশ্রী ও বাকী অর্দ্ধ বিশ্রী, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমল বা কার্য্যকলাপ ভাল-মন্দ ও নেক-বদে মিশ্রিত। পরে আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও রহমতের স্রোতে তাহাদের সমুদয় গোনাহ ভাসিয়া গিয়া তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষের গোড়ায় যে সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধ লোকটি দেখিয়াছেন, তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম এবং তাঁহার আশে-পাশের ছেলে-মেয়েগুলি মানুষের ঐসব ছেলে-মেয়ে, যাহারা নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী যিনি অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে ছিলেন তিনি হইলেন "মালেক" নামক ফেরেশতা যিনি দোযখের (এন্তেজামকারীদের) সরদার।

আর বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া পর পর যে কক্ষদ্বয় দেখিয়াছেন—প্রথম কক্ষটি সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের বেহেশত এবং দ্বিতীয় কক্ষটি শহীদদের বেহেশত। আর আমি জিব্রাঈল এবং আমার সঙ্গী মিকাঈল। এখন আপনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখুন। আমি উপরের দিকে তাকাইলাম ; আমার উপরের দিকে বহু উপরে একটি বালাখানা সাদা শুভ্র মেঘ পুঞ্জের ন্যায় দেখিতে পাইলাম। সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, উহা আপনার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত বেহেশতের বাসস্থান। তখন আমি বলিলাম, আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার বাসস্থানে প্রবেশ করি। তাঁহারা বলিলেন, এখনও আপনার পার্থিব জীবন অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, উহা পূর্ণ হইলেই আপনি নিজ বাসস্থানে চলিয়া আসিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—নবীগণের স্বপ্ন অহী, উহা অকাট্য সত্য ও বাস্তব বিষয়। অতএব এই হাদীছ দ্বারা কবর তথা আলমে-বরযখের আজাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। কারণ, আলোচ্য ঘটনায় বর্ণিত সমস্ত আজাবই হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

সোমবার দিন মৃত্যু হওয়া

৭২২। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (অন্তিমশয্যাবস্থায় তাঁহার) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তোমরা কয়টি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, তিনটি সাদা সূতি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলাম, যাহার মধ্যে সাধারণ রকমের জামা ও পাগড়ী ছিল না। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন্ দিন ওফাত পাইয়াছিলেন? আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা উত্তর করিলেন, সোমবার দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন দিন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আজ সোমবার। তখন তিনি বলিলেন, সম্মুখের রাত্র পর্য্যন্ত আমিও আশা করি—(ইহলোক ত্যাগ করিব।) এই বলিয়া তিনি পরিধেয় কাপড়টির প্রতি তাকাইলেন, উহাতে জাফরানের দাগ ছিল। তিনি বলিলেন, এই কাপড়টি ধৌত কর এবং ইহার সঙ্গে আরও দুইটি কাপড় মিলাইয়া আমার কাফন দিয়া দিও। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন এই বস্ত্রটি পুরাতন। তিনি বলিলেন, নূতন কাপড় জীবিতদেরই উপযোগী; কাফনের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐ দিন প্রাণ ত্যাগ করিলেন না; মঙ্গলবার বিকালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ভোর হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া

৭২৩। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আমার মাতা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কোন কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। আমার ধারণা হয়, তিনি অন্তিমকালে কথা বলিতে পারিলে কিছু ছদকা করার অছিয়ত করিতেন। এখন আমি তাঁহার পক্ষে ছদকা করিলে তিনি কি উহার ছওয়াব পাইবেন? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ।

——(০)——

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ এবং আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর

কবরের বিবরণ

৭২৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষায় এই বলিতে থাকিতেন, অদ্য আমি কোন্ স্ত্রীর গৃহে আছি? আগামী কল্য কোন্ স্ত্রীর গৃহে থাকিব? এইরূপ বলিয়া তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। হযরতের বিবিগণ তাঁহার মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি রোগ শয্যায় সর্ব্বদা আয়েশার গৃহেই থাকুন। আমরা এখানে আসিয়া আপনার খেদমত করিব। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশার গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, বিবিগণের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক পালাক্রমে নির্দ্ধারিত দিনসমূহের মধ্যে আমার জন্য নিরূপিত দিনে আমার কক্ষে এবং আমার বক্ষ ও গলগণ্ডের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় হযরত (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার কক্ষে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাদীছে প্রমাণিত আছে, পয়গাম্বরকে ঐ স্থানেই সমাহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য যে স্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (শামায়েল-তিরমিজী)। সুতরাং ছাহাবীগণ রসুলে করিম (দঃ)কে সেই তৈরী কক্ষেই সমাহিত করিয়াছিলেন এবং উহা সাধারণতঃ আবদ্ধ অবস্থায়ই থাকিত। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬৯৬ নম্বর হাদীছে আছে—ইহুদ নাছারারা পয়গাম্বরগণের কবরকে সেজদা করায় তাহাদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নৎ ও অভিশাপ করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ বর্ণনা পূর্ব্বক আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকেও সেজদার স্থান করিয়া নেওয়া হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উহাকে পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন কেহ ঐ স্থানে নামায পড়িতে বা সেজদা করিতে না পারে; নতুবা উহা উন্মুক্তই রাখা হইত।

হিজরী ৮৬ হইতে ৯৬ সাল; মোতাবেক ইংরাজী ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক মোসলমানদের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার

আমলে মসজিদে-নববীর সম্প্রাসারণের প্রয়োজন দেখা দিল। যেহেতু পূর্ব্ব হইতেই উক্ত মসজিদ হযরতের বিবিগণের আবাস গৃহ-সংলগ্ন ছিল, তাই মসজিদ সম্প্রসারণ কল্পে অধিপতি ওলীদ ঐ সকল গৃহ বিবিগণের ওয়ারিসান হইতে ক্রয় করেন এবং তৎকালীন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজের তত্ত্বাবধানে ঐ সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া মসজিদকে প্রশস্ত করেন। সেই সময় হযরতের রওজাস্থল—বিবি আয়েশার কক্ষের পুরাতন দেওয়ালসমূহও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং নূতনভাবে দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়া হযরতের রওজা শরীফকে ঘেরাও করিয়া দেওয়া হয়। কালক্রমে ১২৭১ হিজরীতে তুরস্কের তদানীন্তন সুলতান আবদুল মজীদ খা'ন মরহুম মসজিদে-নববীর পুনঃনির্ম্মাণ করেন এবং প্রয়োজনে উহাকে অধিক প্রশস্ত করা হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রওজা শরীফ মসজিদের ভিতরে, কিন্তু এক কোণে আসিয়া পড়ে।

আল্লার লাখ লাখ শোকর যে, মোসলমানগণ কখনও ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফকে সেজদাস্থল বা তদ্রূপ কোনও অনৈসলামিক কার্য্যস্থলরূপে ব্যবহার করে নাই। এমনকি কোন সময়েই যেন উহার সুযোগ না হয় তদুদ্দেশ্যে রওজা শরীফকে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার উল্লেখ আয়েশা (রাঃ) করিয়াছেন (পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমানে রওজা শরীফের চতুর্দ্দিকে যে দেওয়াল রহিয়াছে, উহার ভিতরের সঠিক অবস্থা দেখা যায় না, কিন্তু ঐ দেওয়াল হইতে প্রায় ১৫।২০ হাত ব্যবধানে চতুর্দ্দিকে লৌহ জালীর দ্বারা উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ঘেরাও করতঃ পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ মসজিদের যে অংশে দাঁড়াইলে রওজা শরীফ মুছল্লিগণের সম্মুখে হয়, সেইদিকে ঐ লৌহ বেষ্টনী কবর শরীফের দেওয়াল হইতে প্রায় ২৫।৩০ হাত দূরে অবস্থিত। তদুপরি সেই লৌহ বেষ্টনীর পর একটি স্থান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ-নামাযের স্থান বলিয়া প্রকাশ; সেই ১৫×৩০ হাত পরিমিত স্থানকেও রেলিং দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। অনাবশ্যকে তথায় দাঁড়াইয়াও নামায পড়িতে দেওয়া হয় না।

মক্কা-মদীনা তথা হেজাযের অধিপতি সউদী গভর্ণমেন্টকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে-খায়ের দান করুন; এই গভর্ণমেন্ট হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ সম্পর্কিয় সম্ভাব্য সকল প্রকার শেরেক বেদ্‌য়া'তকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। রওজা শরীফের চতুস্পার্শ্বে বহু পুলিশ সর্ব্বদা মোতায়ন থাকেন; ঐ পুলিশগণ প্রত্যেকেই শরীয়তের মছলা-মাছায়েল সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ দীনদার। তাঁহারা দিবারাত্র সর্ব্বদাই এই বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখিয়া থাকেন। আমি যখন রওজা শরীফের সংলগ্ন "রওজাতুম-মিন্ রিয়াজিল্ জান্নাহ" নামক স্থানে বসিয়া এই বিষয়টি লিখিতেছিলাম তখনকার একটি

প্রত্যক্ষ ঘটনা—এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার পার্শ্বে বসিয়া রওজা শরীফের দিকে মুখ করিয়া মোনাজাত করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশ তাহাকে ঐকার্য্যে বাধা দিলেন এবং স্বহস্তে ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া বসাইলেন, আর বলিলেন—"এই দিকে কেবলা, এই দিকে মোনাজাত কর।"

আর একদিন আমি নিজে রওজা শরীফের সংলগ্ন ঐ বিশেষ স্থানে বসিয়া বোখারী শরীফের অনুবাদ কার্য্য করিতেছিলাম, তখন আমি পূর্ণরূপে কেবলামুখী হইয়া না বসিয়া কিঞ্চিৎ রওজা শরীফ মুখী হইয়া বসিয়াছিলাম, একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে পিছন হইতে ধরিয়া ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া দিলেন।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ও উহার কার্য্য-পরিচালকগণ সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকে যে, তাঁহারা রওজা শরীফের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তা'জীম করেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ সকল অভিযোগ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার নিজস্ব একটি ঘটনা এ স্থলে বয়ান করিলেই ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একদিন আমি রওজা শরীফের সংলগ্ন স্থানে বসিয়া অনুবাদ করিতেছিলাম। রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্ব প্রায় অর্দ্ধ হাত পরিমিত উঁচু পাকা ভিটির ন্যায়। আমি ঐ উঁচু ভিটির উপর নেহাত মামুলী ভাবে আল্‌গোছে বাম হাতের কনুই রাখিয়া একটু হেলান দেওয়ার ন্যায় বসিয়া লিখিতেছিলাম। একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে বলিলেন "ভিটা হইতে আলগ হইয়া বসুন; ইহা কি হেলান দেওয়ার বস্তু"? আমি তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দানে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একটি রিয়াল বখ্‌শিশ দিলাম।

বর্ত্তমান অধিপতি সুলতান সউদকে আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘজীবি করুন, তিনি মসজিদে-নববীর পুনঃনির্ম্মাণ ও সম্প্রধারণে যে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করিয়াছেন এবং মসজিদে-নববীকে যে ভাবে অদ্বিতীয় শান-শওকতপূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রাণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আজ্‌মত ইজ্জত ও অগাধ মহব্বতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুতরাং পূর্ব্বোল্লেখিত অভিযোগাদি নেহাৎ অমূলক।

৭২৫। হাদীছ :—সুফিয়ান তাম্মার নামক দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবর শরীফকে (কোন সুযোগে) দেখিয়াছি; উহা উটের পিঠের আকারে একটু (মাত্র চারি আঙ্গুল) উঁচু।

৭২৬। হাদীছ :—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের আধিপত্যকালে যখন (মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্ম্মানের সময়) রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্বের দেওয়ালেরও পুনঃনির্ম্মাণ কার্য্য হইতেছিল, তখন (দেওয়ালের গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় জমিন ধ্বসিয়া) শব-দেহের একটি পা খুলিয়া গেল; ইহাতে সকলেই আতঙ্কিত ও বিহবল হইয়া পড়িল। (এমনকি

তদানীন্তন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজ স্বয়ং কার্য্যস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।) সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নাকি? এ বিষয়ে সঠিক ভাবে অবগত হইবার জন্য তাঁহারা কাহাকেও পাইলেন না। অতঃপর ওরওয়া (রঃ) আসিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিলেন, কখনও নয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা কস্মিনকালেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নহে, বরং ইহা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পা।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের খাছ হুকুম অনুসারে নবী (দঃ)কে আয়েশার (রাঃ) কক্ষে সমাহিত করায় ঐ কক্ষ কবরস্থানে পরিণত হইলে পর হযরতের উত্তর পার্শ্বে খালি যায়গায় হযরতের সিনা মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া আবু বকর (রাঃ)কে দাফন করা হয়। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উত্তর পার্শ্বে হযরতের পা মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া ওমর (রাঃ)কে দাফন করা হইয়াছে। সেখানে কেবলা দক্ষিণ দিকে, তাই তাঁহাদের সকলেরই পা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং পূর্ব্বদিকের দেওয়ালস্থলেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেহেতু সে দিকে খলীফা ওমরের পা-ই সর্ব্বাধিক অগ্রগামী ছিল; তাই ওরওয়া (রঃ)-এর বয়ান নিশ্চিতরূপেই সঠিক ছিল।

আয়েশা (রাঃ) স্বীয় ভাগিনা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে আমার সঙ্গীনী হযরতের অন্যান্য বিবিগণের নিকটবর্ত্তী মদীনার সাধারণ কবরস্থান জান্নাতুল-বাকীর মধ্যেই দাফন করিও; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্ত্তী দাফন করিও না। কারণ, ইহা আমি ভাল মনে করি না যে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আমি অন্যান্য বিবিগণের তুলনায় উচ্চ মর্য্যাদা সম্পনা বলিয়া পরিগণিত হই।

● খলীফা ওমর (রাঃ) অন্তিম শয্যায় স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ কর যে, খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার খেদমতে সালাম পাঠাইয়াছে; খবরদার—আমার নামের সঙ্গে তখন "আমীরুল-মোমেনীন" বলিও না। অতঃপর তাঁহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে যে, আমি আমার মুরব্বিদ্বয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে দাফন হইতে আরজু রাখি। এই খবর পৌছিলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই সৌভাগ্যটি আমি নিজের জন্য আশা করিয়া ছিলাম।* এখন আমার নিজের আশার উপর ওমরের আরজুকেই প্রাধান্য দিব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফিরিয়া

* ইহা তাঁহার পূর্ব্বেকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা ছিল। পরবর্ত্তিকালে তিনি নিজেও ইহার বিপরিত অছিয়ত করিয়াছেন যেরূপ একটু পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আসিলেন ওমর(রাঃ) অতিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন—হে আমীরুল-মোমেনীন। আপনার জন্য তিনি অনুমতি দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টিই আমার বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল।

অতঃপর বলিলেন, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগে পর আমাকে কাফন পরাইয়া কাঁধে করিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লইয়া যাইবে এবং পুনঃ আরজ করিবে—খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, (আপনার কক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্ত্তী দাফন হইবার জন্য।) যদি তিনি অনুমতি দান করেন তবে আমাকে ঐ স্থানে দাফন করিও, নতুবা আমাকে সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের কবরস্থানেই দাফন করিও। (সময় উপস্থিত হইলে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।)

মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাব উক্তি করা চাই না

৭২৭। হাদীছ ঃ— عن عائشة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوا -

অর্থ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—মৃত ব্যক্তিদেরে গালি-গালাজ করিও না। তাহারা স্বীয় আমলের প্রতিফল ভোগের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। (যাহা হইবার সেখানে হইবেই; তাহারা দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এখন আর তাহাদেরে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ উক্তি ও তাহার কুৎসা না করা সম্পর্কে হাদীছ ও পরিচ্ছেদ বর্ণনার পর ইমাম বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহারা দ্বীন-ইসলামের শত্রু, যাহারা দ্বীন-ইসলামকে ঘায়েল করিয়াছে এবং উহার ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তথা তাঁহার (missian) মিশনের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে—এই শ্রেণীর লোকদিগকে মানব চোখে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং তাহাদের হইতে লোক সমাজকে সতর্ক করা ও দুরে রাখার জন্য তাহাদের কুৎসা করা এবং তাহাদের মৃত্যুর পরও তাহাদের কুৎসা জারী রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে বোখারী (রঃ) একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটির বিস্তারিত অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে হযরতের জীবনী অধ্যায়ে "নবুওতের তৃতীয় বৎসর" বিবরণে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা আসিবে। হাদীছটির মর্ম্ম এই যে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মিশনের কার্য্য ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে আরম্ভ করার পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালার আদেশমতে একদা কা'বা শরীফের

সম্মুখস্থ সুপরিচিত ছাফা পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া নিজের গোত্রীয়দেরকে ডাকিলেন। ঐ সময় গোত্রীয় প্রধান এবং নিকটতম আত্মীয়দিগকেও বিশেষভাবে ডাকিলেন। সকলে সমবেত হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে তাঁহার মিশনের সম্ভাব্য শত্রুতার ভয়াবহ পরিণতি হইতে সতর্ক করতঃ এক আল্লার বন্দেগীর প্রতি আহ্বান জানাইলেন। হযরতেরই চাচা আবু লাহাব সেই আহ্বানে ক্ষুব্ধ হইয়া এই বাক্যে হযরতের প্রতি বিষোদগার করিল—تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا "সারাদিন তোমার ধ্বংস সাধিত হউক; এই কথার জন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে?" আবু লাহাব সেই মুহূর্ত্ত হইতেই হযরতের মিশনের শত্রুতায় লাগিয়া গেল; তাহার স্ত্রীও এই কাজে তাঁহার কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, বরং অগ্রগামিণী হইয়া চলিল। আল্লাহ তায়ালা আবু লাহাবেরই উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে তাহাদের উভয়ের ইহ-পরকাল ধ্বংস ও উৎসন্নের সংবাদ প্রচার করতঃ তাহাদের কুৎসায় "তাব্বাত ইয়াদা" ছুরা পবিত্র কোরআনের অংশরূপে অবতীর্ণ করিলেন।

আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কুৎসা ও অভিশাপের এই ছুরা কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী আবৃত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ তায়'লা স্বীয় রসুলের ও তাঁহার মিশনের সমস্ত দুশমনকেই এইরূপে ধ্বংস ও উৎসন্ন করুন—আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ
عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى ٥

২৭ মোহার্‌রম, ১৩৭৭ হিজরী,
২৩ আগষ্ট, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ,
শুক্রবার,
পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ্—
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের
রওজা শরীফের সংলগ্ন—বেহেশতের বাগান।